



নারায়ণ

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

তৃতীয় বর্ষ,

দ্বিতীয় খণ্ড,

প্রথম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ সাল

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। পদ্ম-আহারী বাবা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী	৪৮১
২। বাঙ্গলার কথা		৪৮৫
৩। তিমুর মা	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৫৩৮
৪। সাহিত্যে স্বাভাব্য	শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত	৫৪৬
৫। বিরহে পাগল	শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৫৫২



কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
“বহুমতী” প্রেসে,—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪]

পর-আহারী বাবা *

গোলাপের গাজীপুরে, লোকালয় হ'তে দূরে
পাহাড়ের প্রান্তে, এক নিভৃত গুহার,—
ভূমানন্দে নিগমন, করুণার প্রস্রবণ,
যোগ-মগ্ন বতি এক জীবন গোঁয়ার।
ক্ষুধা-ভৃগু নাহি মানে, স্তব্ধ, স্থির মহাধ্যানে,
নিমগ্ন নিম্নত সাধু আপনার মনে ;
নাহি করে দৃকপাঠ, : বহে' যায় দিন-রাত ;
মুদিত নয়ন ছ'টি বসি' পদ্মাসনে।

বহুদিন এইমত সমাধিতে হ'লে গত,
মাঝে মাঝে কভু উঠি', খুলি' গুহা-দ্বার,
সম্মুখে জাহ্নবী-নীরে অবগাহি', ধীরে ধীরে,
আসনে আসিয়া পুনঃ বসেন আবার।
সেই পুণ্য শুভক্ষেণে মহাত্মার দরশনে,
কত শত নর-নারী সেখা আসি' ভিড়ে ;
ভক্তিভরে যুক্ত করে কেহ শুব-স্তুতি করে,
কেহ বা প্রণমে সেই সিন্ধু সন্ন্যাসীরে।

* ঠাকুর শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-মহাপ্রভুর কৃপা-ভাজন শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী-ঐশীত
“শ্রীশ্রীগঙ্গারসঙ্গ” পুস্তকে কথিত একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।—লেখক।

রয়েছে সাক্ষানো সেই গুহা-মাঝে । “কেহ নেই
 —সাবাস্ !” কহিয়া, চোর একে, একে, একে,
 মূল্যবান্ যেইগুলি বাছি’ স্বরা নয় তুলি,
 বাধিতে পুঁটুলি পিছে চে’য়ে চে’য়ে দেখে ।
 এ কি কাণ্ড অসম্ভব ! তুনে’ কা’র কণ্ঠস্বর
 চমকিয়া ওঠে চোর স্বন্ধে বোঝা নিতে ?
 তাড়াতাড়ি চারিদারে চে’য়ে দেখে বারে বারে,—
 ভ্রম বুঝে’, নিজ মনে লাগিল হাসিতে ।
 হির হ’রে, পুঁটুলীটে শেষে, তুলি’ নিল পিঠে ;
 গুহা হ’তে বাহিরিয়া, ছ’পদ চলিয়া,
 হেরি’ কাছে সন্ন্যাসীকে, ফেলে দিল বোঝাটিরে,
 মহাত্রাসে, উর্দ্ধ্বাসে পলাল ছুটিয়া ।
 ছুটিতে ছুটিতে শেষে খামে গৃহ-দ্বারে এসে ।
 চাহিয়া পশ্চাতে পুনঃ কাঁপে “থর-থর”,—
 সেই বোঝা শিরোপর লইয়া, সন্ন্যাসিবর
 ধাইয়া আসিছে পিছে, ও কি ভয়ঙ্কর !
 ভয়ঙ্করের কাছে আসি’ ‘পর-আহারী’ সন্ন্যাসী
 নামারে পুঁটুলীটিরে অবসন্নদেহে,
 বিশ্রাম লভিয়া, পরে কহিল কল্পিত-স্বরে,
 —চোরের সর্ব্বাঙ্গে কর বুলাইয়া নেহে—
 “বৃদ্ধ আমি অতিশয়, এতও কি কভু নয়,
 ষষ্টি ভর করে’ চলা কষ্টকর মোর,
 অথর্ব্ব এ বৃদ্ধ’ শিরে এত বড় বোঝাটিরে
 বহিবারে রেখে এলি ? ওরে, মনে তোর
 কিছুই কি মায়া নাই ? নে রে বুঝে’, নে রে ভাই,
 তোর দ্রব্য তোরে এনে’ দিয়ে গেহু আমি ।
 ‘জীতা রহ বাপজান !— জয় গুরু-ভগবান্ !’
 এত বলি’ উঠিলেন পর-আহারী স্বামী ।

নির্দাক বিষয়ে ভোর এতক্ষণ ছিল চোর,
 ঠাকুর উঠিয়া যেই চলিল আশ্রমে,
 অমনি সে পদে পড়ি’, কেঁদে’ ওঠে ‘হা হা’ করি,
 বুকে হানি’ কর, কহে,—“প্রভু গো, অধমে
 হে দয়াল, ক্ষম, ক্ষম, পাষণ্ড নারকী, মম
 কেহ নাই, কিছু নাই ও গো ও ঠাকুর !
 রক্ষা কর, ক্ষম মোরে !” কহি’ চোর ভূমি’পরে
 আছাড়িয়া পড়ে ।

বাক্সলার কথা

আজ বাঙ্গালীর মহাসভায় আমি বাঙ্গলার কথা বলিতে আসিয়াছি, আপনাদ্বা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, আপনাদের আদেশ শিরোধার্য। আজ এই মিলন-মন্দিরে আমার যোগ্যতা অযোগ্যতা লইয়া জটিল কুটিল অনেক প্রকার বিচারের মধ্যে বিনাইয়া বিনাইয়া বিনয় প্রকাশ করিয়া আমার ও আপনাদের সমস্ত অবস্থা নষ্ট করিব না। দেশের নায়ক হইবার অধিকারের যে অহঙ্কার, তাহা আমার নাই, কিন্তু আমার বাঙ্গলাকে আমি আটপাশে গমস্তা প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্ত, সকল অযোগ্যতা, অক্ষমতা স্বেচ্ছা আমার বাঙ্গলার যে মৃতি, তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি, এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানস-মন্দিরে সেই মোহিনী মৃতি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে! এই যে আটপাশ ও আজীবন শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসা, তাহার অভিমান আমার আছে। সেই প্রেম জলন্ত প্রদাপের মত আমাকে পথ দেখাইয়া দিবে। আপনাদের সকলের সমবেত যে যোগ্যতা, তাহাই আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাকে যোগ্য করিয়া তুলিবে।

সেই ভরসায় আজ আমি আপনাদের সম্মুখে বাঙ্গলার কথা বলিতে আসিয়াছি। যে কথাগুলি অনেক দিন ধরিয়া আমার প্রাণে জাগিয়াছে, যে সব কথা আমার জীবনের সকল রকমের চেষ্টা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে আরও ভাল করিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, যে কথাগুলিকে সত্য বলিয়া জীবনের ধ্যান-ধারণার বিষয় করিয়াছি, সে সব কথাগুলি আপনাদের কাছে নিবেদন করিব। বাহা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে আমার কোন ভয় হয় না, লজ্জা হয় না। হয় তো আমাদের শাসন-কর্তাদের কাছে আমার অনেক কথা অপ্রিয় লাগিবে, হয় তো আমার অনেক কথার সঙ্গে আপনাদের অনেকের মনের মিল হইবে না। কিন্তু “সত্যম্ ক্রমাৎ প্রিয়ম্ ক্রমাৎ ন ক্রমাৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্,” এই বচনের এমন অর্থ নহে যে, বাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, এবং বাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা আছে, তাহা করিও না। সে তো কাপুরুষের কথা, দেশ-ভক্তের রীতি নহে। যে সত্য আমার হৃদয়ের মধ্যে জলিতেছে, বাহাকে চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে হইলে যে পাটোয়ারী বুদ্ধির আবশ্যক, তাহা আমার নাই। আর নাই বলিয়া তার জন্ত কোনও অনুতাপও হয় না। তাই আজ যে কথাগুলি সত্য বলিয়া

বিশ্বাস করি, সেই কথাগুলি প্রিয়ই হউক, কি অপ্রিয়ই হউক, অগ্নানবদনে অকুণ্ঠিতচিত্তে আপনাদের কাছে নিবেদন করিব।

প্রথমেই হয় তো অনেকেরই মনে হইবে যে, এই মহাসভা শুধু রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষুদ্র, এই সভায় বাঙ্গলার কথার আবশ্যক কি? এই প্রশ্নই আমাদের ব্যাধির একটি লক্ষণ। সমগ্র জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধনের স্বভাববিরুদ্ধ। আমরা ইউরোপ হইতে ধার করিয়া এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি, এবং এই ধার-করা জিনিষ ভাল করিয়া বুঝি নাই বলিয়া আমাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক চেষ্টাকে সার্থক করিতে পারি নাই। যে জিনিষটাকে আমরা রাজনীতি বা Politics বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহার সঙ্গে কি সমস্ত বাঙ্গলা দেশের, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির একটা সর্বাঙ্গীন সম্বন্ধ নাই? কেহ কি আমাকে বলিয়া দিতে পারে, আমাদের জাতীয় জীবনের কোন্ অংশটা রাজনীতির বিষয়, কোন্ অংশটা অর্থনীতির ভিত্তি, কোন্ অংশটা সমাজ-নীতির প্রাণ, আর কোন্ অংশটা ধর্মসাধনের বস্তু? জীবনটাকে মনে মনে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া, এই সব মনগড়া জীবন-খণ্ডের মধ্যে কি আমরা অলজ্জা প্রাচীর তুলিয়া দিব? এই কাল্পনিক প্রাচীরবেষ্টিত যে কাল্পনিক জীবন-খণ্ড, ইহারই মধ্যে কি আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা সাধনা আবদ্ধ থাকিবে? আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা আন্দোলনের যে বিষয়, তাহাকে কি বাঙ্গালী জাতির যে জীবন, সেই জীবনের সব দিক্ দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব না? যদি না দেখি, তবে কি সত্যের সন্ধান পাইব?

কথাটা একটু তলাইয়া দেখিলে বেশ স্পষ্ট করিয়া বোঝা যায়। রাজনীতি কাহাকে বলে? এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? আমাদের সাধনার ইহার কোন বিশিষ্ট নাম নাই, আমাদের পূর্বপুরুষগণ ইহার নামকরণ করার আবশ্যক তা মনে করেন নাই। ইউরোপীয় সাধনার যাহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে, তাহার উদ্দেশ্য সঙ্ক্ষেপে বলিতে গেলে রাজ্য প্রজায় যে সম্বন্ধ, তাহা নির্ণয় করা এবং এই সম্বন্ধের মধ্যে যে একটা নিত্য সার্বভৌমিক সত্য নিহিত আছে, তাহাকে প্রকাশ করা। ঐ মতে রাজনৈতিক আন্দোলন বা আলোচনার বিষয় কোন জাতির বা দেশের পক্ষে রাজ্য প্রজায় কি রকম সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহাই বিচার করা। বাঙ্গলার রাজনৈতিক আন্দোলনের অর্থ এই যে, আমাদের দেশে রাজ্য প্রজায় যে সম্বন্ধ, তাহা পরীক্ষা করা ও কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাই বিচার করা। অর্থাৎ সমস্ত রাজ্যটা সন্তাবে ও সংপথে চালনা করিতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা কতটা রাজ্যের হাতে থাকিবে, কতটা প্রজায় হাতে থাকিবে, তাহাই বিচার ও নির্ণয় করা।

কিন্তু ঐ যে রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা চেষ্টা, ইহার সার্থকতা কোথায়? এক কথায় বলিতে হইলে, যে কথা অনেকবার শুনিয়াছি, তাহাই বলিতে হয়, বাঙ্গালীকে মানুষ করিয়া তোলা। বাঙ্গালী যে অমানুষ, তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। আমি যে আপনাকে বাঙ্গালী বলিতে একটা অনির্দ্বন্দ্বীয় গর্ব অনুভব করি, বাঙ্গালীর যে একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, দর্শন আছে, কর্ম আছে, ধর্ম আছে, বীর্য আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে! বাঙ্গালীকে যে অমানুষ বলে, সে আমার বাঙ্গালাকে জানে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া যাক যে, বাঙ্গালীর কতকগুলি দোষ আছে, বাহার সংশোধন আবশ্যক এবং সেই ভাবে ধরিয়া লওয়া যাক যে, বাঙ্গালী অমানুষ। তাহাকে মানুষ করিয়া তোলাই রাষ্ট্রীয় চেষ্টা বা চিন্তার উদ্দেশ্য, এবং সেই ক্ষণেই আমাদের দেশে রাজা প্রজায় যে সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহা বিচার করা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে রাজা প্রজায় কি সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহা বিচার করিতে গেলে, আমাদের যে এখন ঠিক কি অবস্থা, তাহার বিচার করিতেই হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে, আমাদের আর্থিক অবস্থা কিরূপ, তাহা বিচার করিতেই হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে, আমাদের চাষাদের চাষের সন্ধান লইতে হইবে। আমাদের চাষের সন্ধান ভাল করিয়া লইতে হইলে, আমাদের চাষ বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাহার ধোঁজ রাখিতে হইবে। সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে হইবে, কেন আমাদের পল্লীগাম ছাড়িয়া, অনেক লোক সহরে আসিয়া বাস করে, সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বিচার করিতে হইবে যে, সে কি পল্লীগামের অস্বাস্থ্যের জন্য, কি অন্য কোন কারণে? সেই সঙ্গে সঙ্গে অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইবে। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, রাজনীতির সাধন করিতে হইলে আমাদের চাষাদের অবস্থা চিন্তা করা আবশ্যক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামের অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করাও আবশ্যক।

সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিচার করিতে হইবে, আমাদের দেশে যত চাষ-বোণ্য জমী আছে, সব ভাল করিয়া চাষ করিলেও আমাদের অবস্থা সহজ সচ্ছল হয় কি না। যদি না হয়, তবে ব্যবসাবাণিজ্যের কথা আলোচনা ও বিচার করিতে হইবে।

এই সব কথা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে আমাদের চাষের প্রণালী কিরূপ ছিল, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা পূর্বে কিরূপ ছিল, কেমন করিয়া আমরা গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতাম, এ সব কথা তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

শুধু তাহাই নহে, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা আলোচনা করিতে হইবে। কেমন করিয়া আমরা শিক্ষা বিস্তার করিতাম, কেমন করিয়া আমরা আপনাকে শিক্ষিত করিয়া

নইতাম এবং এখন বর্তমান অবস্থায় আমাদের শিক্ষা-প্রণালী কি রকম হওয়া উচিত, রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব কথারই বিচার আবশ্যক।

শুধু তাহাই নহে। আমাদের কৃষিকার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের কি সম্বন্ধ ছিল এবং তাহাতে আমাদের কতটা উপকার, কতটা অপকার সাধিত হইতেছে, এ কথাকেও তাক্ষিল্য করা যায় না। কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিতে পারিলে আমাদের বর্তমান অবস্থায় কি সম্বন্ধ থাকা উচিত, কিরূপে তাহার মীমাংসা হইবে? এই প্রশ্নের মীমাংসা যদি না করা যায়, তবে রাষ্ট্রীয় শক্তির কতটা রাজার হাতে, কতটা আমাদের হাতে পাকা উচিত, এই প্রশ্নের বিচারই বা কেমন করিয়া হইবে?

শুধু ইহাই নহে। আমাদের কৃষিকার্য হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় সামাজিক ব্যবহার পর্যন্ত আমাদের সকল ভাব, সকল ভাবনা, সকল চেষ্টা ও সকল সাধনার সঙ্গে আমাদের ধর্মের কি সম্বন্ধ ছিল ও আছে, তাহার বিচার অবশ্য কর্তব্য। সে দিকে চোখ না রাখিলে সব দিকই যে অন্ধকার দেখিব! সব প্রশ্নই যে অকারণে অস্বাভাবিক-ভাবে জটিল ও কষ্টিন হইয়া উঠিবে। সেই দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কোন মীমাংসাই সম্ভবপর হইবে না।

আমাদের অনেক বাধা, অনেক বিষ। কিন্তু আমাদের সব চেয়ে বেশী বিপদ যে, আমরা ক্রমশঃই আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহারে অনেকটা ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। রাজনীতি বা Politics শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি আমাদের দেশ একেবারে অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া পৌছায়। ইংরাজের ইতিহাসে এই রাজনীতি যে আকার ধারণ করিয়াছে, আমরা সেই সূত্রেরই অর্চনা করিয়া থাকি। বিলাতের জিনিষটা আমরা যেন একেবারে ভুলিয়া আনিয়া এই দেশে লাগাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচি। এ দেশের মাটিতে তাহা বাড়িবে কি না, তাহা ত একবারও ভাবি না। Burke-এর বুলি বাহা স্কুলে কলেজে মুখস্থ করিয়াছিলাম, তাহাই আওড়াই, Gladstone-এর কথামত পান করি আর মনে করি, ইহাই রাজনৈতিক আন্দোলনের চরম। “Seely’s Expansion of England” নামে যে পুস্তক আছে, তাহা হইতে বাছা বাছা বচন উদ্ধার করি। Sidgwick-এর কেতাব হইতে কথার ঝুড়ি টানিয়া বাহির করি, ফরাসী স্কুল, ভার্শিয়ান স্কুল এবং ইউরোপে রাজনীতির যত স্কুল আছে, সব স্কুলের কেতাবে, কোরাণে যত ধারাল বাক্য আছে, একেবারে এক নিঃশ্বাসে মুখস্থ করিয়া ফেলি, আর মনে করি, এইবার আমরা বক্তৃতা ও তর্কে অজের হইলাম, দেখি আমাদের শাসনকর্তারা কেমন করিয়া আমাদের তর্ক খণ্ডন করেন। মনে করি, রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু তর্ক-বিতর্কের বিষয়—বক্তৃতার ব্যাপার মাত্র। আমরা তর্ক করিয়া, বক্তৃতা

করিয়া দিগ্ভিষা যাইব। আমাদের সকল উন্মত্ত ও সকল চেষ্টার উপরে আমাদের ধাব-
করা কথার ভার চাপাইয়া দিই। বাহা স্বভাবতঃ সহজ সরল, তাকে মিছামিছি বিনা
কাবণে ছটিল করিয়া তুলি। শুধু বাহা আবশ্যক, তাকে করি না; দেশের প্রতি যুথ তুলিয়া
চাই না, বাংলার কথা—শাকালীর কথা ভাবি না, আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে
সর্বতোভাবে তুচ্ছ করি। আমাদের বর্তমান অবস্থার দিকে একেবারেই দৃষ্টিপাত করি
না। কাষেই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন। তাই এই অসম্ভব
আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাণের যোগ নাই, এই কথা হয় ত অনেকে
স্বীকার করিবেন না। কিন্তু স্বীকার না করিলেই কি কথাটা মিথ্যা হইয়া যাইবে?
আমরা চোখ বুজিয়া থাকিলেই কি কেহ আমাদের দেখিতে পাইবে না? আমরা
যে শিক্ষিত বলিয়া অহঙ্কার করি, আমরা দেশের কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকি?
আমরা কয় জন? দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে আমাদের কোণার যোগ?
আমরা বাহা ভাবি, তাহারা কি তাই ভাবে? সত্য কথা বলিতে হইলে কি স্বীকার
করিব না যে, আমাদের উপর আমাদের দেশবাসীদের সেরূপ আস্থা নাই? কেন
নাই? আমরা যে ভিতরে ভিতরে ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়াছি। আমরা যে ইংরাজী
পড়ি ও ইংরাজীতে ভাবি, এবং ইংরাজী তর্জমা করিয়া বাংলা বলি ও লিখি, তাহারা
যে আমাদের কথা বুঝিতে পারে না। তাহারা মনে করে, নকলের চেয়ে আসলই
ভাল। আমরা যে তাহাদের ঘৃণা করি। কোন্ কাষে তাহাদের ডাকি?
Government-এর কাছে কোনও আবেদন করিতে হইলে তাহাদের গায়ে হাত
বুলাইয়া একটা বিরাট সভার আয়োজন করি, কিন্তু সমস্ত প্রাণ দিয়া কোন্ কাষে
তাহাদের ডাকি? আমাদের কেন্ কষিটীতে কোন্ সমিতিতে চাষা সভা-শ্রেনীভুক্ত?
কোন্ কাষ তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদের মত লইয়া করি? যদি না
করি, তবে কেন অবনতমস্তকে আমাদের ক্রটি স্বীকার করিব না? কেন সত্য কথা
বলিব না? মিথ্যার উপর কোনও সত্য বা সৎ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই
বলিতেছিলাম, আমাদের যে রাজনৈতিক আন্দোলন, ইহা একটা প্রাণহীন, বস্তুহীন,
অলীক ব্যাপার। ইহাকে সত্য করিয়া গড়িতে হইলে বাংলার সব দিক্ দিয়াই
দেখিতে হইবে। বাংলার যে প্রাণ, তাহারই উপর ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।
তাই বলিতেছিলাম, আজ এই মহাসভায় আমি বাংলার কথা বলিতে আসিয়াছি।

কিন্তু আমি যে বিপদের কথা বলিয়াছি, তাহার জন্ত নিরাশ হইবার কোনই কারণ
নাই। আমাদের এ অবস্থা প্রকৃতপক্ষে অস্বাভাবিক হইলেও ইহার বখাষ্য কারণ
আছে। ইংরাজ যখন প্রথমে আমাদের দেশে আসে, তখন নানা কারণে আমাদের
জাতীয় জীবন দুর্বলতার আধার হইয়াছিল। তখন আমাদের ধর্ম একেবারেই নিভেজ

হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে চিরপুরাতন চিরশক্তির আকর সনাতন হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র মৌখিক আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিব-শক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল; অপর দিকে যে অপূর্ণ প্রেমধর্মবলে মহাপ্রভু সমস্ত বাঙ্গলা দেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেমধর্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি কেবলমাত্র তিলক-কাটা ও মালা-ঠক্ঠকানিতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল। বাঙ্গলার হিন্দুর সমগ্র ধর্মক্ষেত্র শক্তিহীন শাক্ত ও প্রেম-শূন্য বৈষ্ণবের ধর্মশূন্য কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন নবদ্বীপের চিরকীর্তিময় জ্ঞানগৌরব কেবলমাত্র ইতিহাসের কথা—অতীত কাহিনী। বাঙ্গালী জীবনের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। এইরূপে কি ধর্ম, কি জ্ঞানে বাঙ্গলার হিন্দু তখন সর্ববিষয়ে প্রাণহীন শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। আলিবর্দি খাঁর পর হইতেই বাঙ্গলার মুসলমানও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল এবং এই সময় তাহাদের সকল জ্ঞান ও সকল শক্তি বলহীনের বিলাসে ভাসিয়া গিয়াছিল। এমন সময় সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরাজ বণিক-বেশে আগমন করিল এবং অল্প দিনের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপন করিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিল। আমাদের জাতীয় দুর্বলতানিবন্ধন আমরা ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইংরাজ জাতিকে ও তাহাদের সভ্যতা ও তাহাদের বিলাসকে বরণ করিয়া লইলাম। দুর্বলের বাহা হয়, তাহাই হইল। ইংরাজী সভ্যতার সেই প্রথম আলোক সংঘতভাবে ধারণ করিতে পারিলাম না। অন্ধ হইয়া পড়িলাম। অন্ধকারাক্রান্ত দিগ্ভ্রান্ত পথিক যেমন বিষয়ে ও মোহ বশতঃ আপনার পদ প্রাপ্তস্থিত সুপথকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া বহুদূর দুর্গম পথকে সহজ ও সরল মনে করিয়া, সেই পথেই অগ্রসর হয়, আমরাও ঠিক সেইরূপ নিজের ধর্ম কর্ম সকলই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া, নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া, নিজের সাহিত্যকে তুচ্ছতাচ্ছল্য করিয়া, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। সেই ঝোঁক অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও একেবারে যায় নাই। রামমোহন যে দেশে “বিজ্ঞানের তুর্ধ্যধ্বনি” করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই শুনিয়াছিলাম বা মনে করিয়াছিলাম শুনিয়াছি, অন্ততঃপক্ষে বিজ্ঞানের বুলি আওড়াইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু রামমোহন যে গভীর শাস্ত্রালোচনার জীবনটাকে চালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার দিকে ত আমরা দের চোখ পড়ে নাই। তিনি যে আমাদের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে আমাদের উদ্ধারের পথ খুঁজিয়াছিলেন, সে কথা ত আমরা একবারও মনে করি নাই। তার পর দিন গেল। আমাদের স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, আমাদের ঝোঁকটা আরও বাড়িয়া গেল। তার পর বহুদিন সর্বপ্রথমে বাঙ্গলার মূর্তি গড়িলেন,—প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। “বঙ্গ-

জননীকে দর্শন করিলেন। সেই “সুজলাং সুফলাং মলয়জলীতলাং শস্ত্রশ্রামলাং মাতরম্” তাহারই গান গাহিলেন। সবাইকে ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ দেখ, এই আমাদের মা, বরণ করিয়া ঘরে তোল।” কিন্তু আমরা ত তখন সে মূর্তি দেখিলাম না; সে গান শুনিলাম না। তাই বন্ধিম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি একা মা মা বলিয়া রোদন করিতেছি।” তার পর শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন। এই আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন, উহা আমাদের দেশের অনেক অনিষ্ট করিয়াছিল, আবার কেহ কেহ বলেন, আমাদের অশেষ উপকার-সাধন করিয়াছিল। সে সব কথা লইয়া আলোচনা করা আমি অনাবশ্যক মনে করি। এই আন্দোলন যে অনেক দিকে একেবারেই অগ্নি ছিল, তাহা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি যেন সেই আন্দোলনের মধ্যেই বাঙ্গালী জাতির, অন্ততঃপক্ষে শিক্ষিত বাঙ্গালীর আত্মা হইবার একটা প্রয়াস—একটা উদ্ভব দেখিতে পাই। সেইটুকুই আমাদের লাভ। তার পর আরও দিন গেল। ১৯০৩খৃঃ হইতে স্বদেশী আন্দোলনের বাজনা বাজিতে লাগিল। বাঙ্গালী আপনাকে চিনিতে ও বুঝিতে আরম্ভ করিল। রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন—

“বাংলার মাটি বাংলার জল
সত্য কর সত্য কর হে ভগবান্”

বাঙ্গলার জল বাংলার মাটি আপনাকে সার্থক করিতে লাগিল।

কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে জানী শুণী মহাপণ্ডিত আছেন, যাহারা নাকি বলেন যে, এই স্বদেশী আন্দোলন ইহা একটা বৃহৎ ভাস্কির ব্যাপার। আমরা নাকি সব দিকে ঠিক হিসাব করিয়া চলিতে পারি নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশে একটা প্রাণহীন জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। এই মুখস্থ করা জ্ঞানের ক্ষমতা অল্পই; কিন্তু অহঙ্কার অনেকখানি। এই জ্ঞানে যারা জানী, তাহারা সব জিনিষের দাঁড়ি লইয়া মাপিতে বসেন। তাহারা অঙ্কশাস্ত্রের শাস্ত্রী, সব জিনিষ লইয়া আঁক কসিতে বসেন। কিন্তু, প্রাণের যে বক্তা, সে ত অঙ্ক-শাস্ত্র মানে না, সে যে সকল মাপ-কাটা ভাসাইয়া লইয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলন একটা ঝড়ের মত বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বক্তার আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রাণ বধন জাগে, তখন ত হিসাব করিয়া জাগে না। মানুষ বধন জন্মায়, সে ত হিসাব করিয়া জন্মায় না। না জন্মাইয়া পারে না বলিয়াই সে জন্মায়। আর না জাগিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই প্রাণ একদিন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে। এই যে মহা বক্তার কথা বলিলাম, তাহাতে আমরা ভাসিয়া—ডুবিয়া, বাঁচিয়াছি। বাঙ্গলার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাই-

রাছি। বাঙ্গলার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অব-
গাহন করিয়াছি। বাঙ্গলার যে ইতিহাসের ধারা, তাহাকে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি।
বোদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি, সবই যেন চক্ষের সম্মুখে
প্রতিভাত হইল। চণ্ডিদান, বিষ্ণুপতির গান মনে পড়িল। মহাপ্রভুর জীবন-গৌরব
আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞানদাসের গান, গোবিন্দদাসের গান,
লোচনদাসের গান, সবই যেন একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। কবিগোলাদের গানের
ধ্বনি প্রাণের মধ্যে বাজিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধন-সঙ্গীতে আনন্দের মজিলাম।
বুঝিলাম, কেন ইংরাজ এ দেশে আসিল, বুঝিলাম, রামমোহনের তপস্তার নিগূঢ় ম
কি? বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্তি সেই—

“তুমি বিষ্ণু তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম,
স্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে”—

সেই মাকে দেখিলাম চিনিলাম। বঙ্কিমের গান আমাদের “কানের ভিতর দিয়া মরমে
পশিল।” বুঝিলাম, রামকৃষ্ণের সাধনা কি—সিদ্ধি কোথায়! বুঝিলাম, কেশবচন্দ্র
কেন কাহার ডাক শুনিয়া ধর্মের তর্করাজ্য ছাড়িয়া মর্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।
বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম, বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান
হউক, খৃষ্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট
প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে,
অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্তব্য আছে। বুঝিলাম, বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী
হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টিস্রোতের মধ্যে
এক বিশিষ্টসৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপবৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটি বিশিষ্টরূপ হইয়া
সুটিয়াছে। আমার বাঙ্গলা সেই রূপের মূর্তি। আমার বাঙ্গলা সেই বিশিষ্টরূপের
প্রাণ। যখন জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন।
সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম, সে রূপ বিশিষ্ট, সে রূপ অনন্ত! তোমরা
হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর—আমি সে রূপের বানাই লইয়া মরি।

স্বদেশী আন্দোলন হিসাব না করিয়াই আসিয়াছিল, হিসাব না করিয়াই চলিয়া
গেল। কিন্তু এখন আমাদের হিসাব করিবার সময় আসিয়াছে, মা দেখা দিয়াছেন—এখন

যে পুজার আয়োজন করিতে হইবে। হিসাব করিয়া ফর্দ তৈয়ারি করিতে হইবে, হিসাব করিয়া পুজার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। এই যে মহা বস্তায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল, এখন যে, সব পতিত জমী আবাদ করিয়া সোনা ফলাইতে হইবে। বিশ্বাস রাখিও, সোনা ফলিবেই।

এখন আমাদের ইহাই বিচার্য্য যে, কেমন করিয়া এই নব-জাগ্রত বাঙ্গালী জাতিকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া তুলিতে পারি। সেই কারণে সেই দিক্ দিয়াই দেখিতে হইবে, আমাদের বিকাশের জন্য কি কি আবশ্যক এবং তাহা কি করিয়া পাইতে পারি।

এই বিচার লইয়াই সম্প্রতি একটা গোল বাধিয়াছে। ইউরোপে নাকি কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, এই যে জাতিগত ভাব—ইংরাজীতে যাহাকে “Nation Idea” বলে, ইহা নাকি একেবারেই কাল্পনিক, কোন বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। কোন বিশিষ্ট জাতির নাকি কোন একটা স্বতন্ত্র মূল নাই। প্রত্যেক জাতির রক্তের মধ্যে অন্যান্য জাতির রক্ত মিশ্রিত আছে। আচার-ব্যবহারে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে সকল বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে আদান-প্রদান চলিয়াছে এবং এই আদান-প্রদানের মধ্যে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কোন বিশিষ্ট জাতির জাতিত্বের ফল নহে। এই জাতিত্বের ভাব পোষণ করিলে নাকি জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম ও সংঘর্ষ বাড়িয়া যাইবে ও সমগ্র মানবজাতির অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিবে। কথাটি অনেকদিনকার, কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন করিয়া প্রচারিত হইতেছে, কাষেই আমাদের দেশেও ছুই একজন পণ্ডিত তাহা ধরিয়া বসিয়াছেন, এবং এই মতের জোরেই আমাদের এই নব-জাগ্রত জাতীয় জীবনাকাজ্জাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইউরোপের এই মত ইউরোপে অনেক বড় বড় পণ্ডিত অনেকবার খণ্ডন করিয়াছেন; আমি ভরসা করি, এবারও করিবেন। তাঁহাদের সমস্তা তাঁহারাি পূরণ করিবেন। কিন্তু সূর্য্যের চেয়ে বালীর তাপ বেশী; আমাদের দেশে এই সব নকল পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এত বেশী যে, তাহাদের কোন মতকে কিছুতেই খণ্ডন করা যায় না। এমন কি, যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলকে সত্য করিবার কামনার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ—এখন আর রবীন্দ্রনাথ—এবার আমেরিকায় ঐ মতটি নাকি খুব জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাটি কোন কাগজে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং পড়িতে পারি নাই, Modern Reviewতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পড়িয়াছি, হয় ত সমস্ত না পড়িতে পাইয়া তাঁহার মতের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছি, কিন্তু যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই মতের, এই ক্ষেত্রে

বাঙ্গালী জাতির এই মহাসভায় সভাপতির আসন হইতে প্রতিবাদ হওয়া উচিত মনে করি।

এই সমস্ত মতটাই বস্তুহীন, বিশ্বমানবের ছায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত মানব-জাতির মধ্যে সত্য ভ্রাতৃত্ব জাগাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে বিকশিত করিতে হইবে। তাহার পূর্বে এই ভ্রাতৃত্ব অসার কল্পনা মাত্র। জাতি ভুলিয়া দিলে বিশ্ব-মানব দাঁড়াইবে কোথায়? যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির বিকাশ না হইলে একটি পরিবারের উন্নতি হয় না, যেমন পরিবারসমূহের উন্নতি না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না, যেমন সমাজের উন্নতি না হইলে জাতির উন্নতি হয় না, ঠিক তেমনি সেই একই কারণে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট জাতির উন্নতি না হইলে সমগ্র মানবজাতির উন্নতি হয় না। বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় যে রক্তই প্রবাহিত হউক না কেন, সে রক্ত আর্থাই হউক কি অনার্থাই হউক, কি আর্থ্য-অনার্থ্যের মিশ্রিত রক্তই হউক, বাহ্য সত্য, তাহা সত্য-কামের মত স্বীকার করিতে বাঙ্গালী কখনও কুণ্ঠিত হইবে না— বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় যে রক্তই প্রবাহিত হউক না কেন, বাঙ্গালী যে বাঙ্গালী, সে কথা আর ত সে ভুলিতে পারে না, সে যে বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলে বাড়িয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলের সঙ্গে নিত্যই যে তাহার আদান-প্রদান চলিতেছে। আর সেই আদান-প্রদানের মধ্যে যে একটা নিত্য সত্য জাগ্রত স্বপ্নের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই স্বপ্নের উপর বাঙ্গলার জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা। অজ্ঞাত জাতির সহিত ব্যবসাবাণিজ্য শিক্ষা-দীক্ষার যে আদান-প্রদান, তাহাও এই জাতিত্বের লক্ষণ। জাতিত্বের গুণেই এক জাতি দান করিতেও সক্ষম হয়, গ্রহণ করিতেও সক্ষম হয়। ইহা সেই জাতির অবস্থার বিষয়, স্বভাবের বিষয়। তার পর বিরোধের কথা, জাতিত্বের প্রভাবে যে কতকটা বিরোধ জাগিয়া উঠে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। সেও যে জাতির স্বাভাবিক ধর্ম, তা বলিয়াই জাতিগুলোকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। প্রত্যেক পরিবার মধ্যে প্রত্যেক সমাজে বিরোধ-বিসংবাদ ত লাগিয়াই আছে, তা বলিয়াই কি সেই ব্যক্তিগণের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, না উড়াইয়া দিতে হইবে? শত প্রকারের বিরোধ-বাদ বিসংবাদের মধ্যেই মানুষ মানুষ হইয়া উঠে ও নিগনের পথ খুঁজিয়া পায়। এই যে সব বিশিষ্ট জাতিসমূহ, ইহাদের পক্ষেও ঐ কথাই খাটে। এই বিরোধ-বিসংবাদ সংঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই এই সব বিশিষ্ট জাতি সমস্ত মানবজাতির যে মিলন-মন্দির, সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে ও হইবে।

সংসারে প্রত্যেক জিনিষের প্রত্যেক ভাবের দুইটা মুখ আছে, এই যে বাদবিসংবাদ, ইহারও দুইটা মুখ। আমরা এক মুখ দেখি আর এক মুখ দেখি না। বিরোধ আছে চক্ষে দেখিতেছি, মনে জানিতেছি, ইহাকে অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু এই

বিরোধেরই অপর মুখে যে মিলন, তাহা দেখিতে পাই না বলিয়া অস্বীকার করিয়া থাকি। ইউরোপে আজ যে ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত, এই অনলে ইউরোপের সকল ঈর্ষা, বিদ্বেষ, নৈষ্ঠ, অপার শক্তির অভিমান-জনিত যে হীনতা, অসৌম্য স্বার্থপরতার যে মলিনতা, সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। আমি দেখিতেছি, চক্ষে স্পষ্ট দেখিতেছি, এই পবিত্র ভাষ্য-সমাধির উপরে ইউরোপ তাহার মিলন-মন্দির রচনা করিতেছে। সকল প্রকার হীনতা ও স্বার্থপরতার ধর্মই এই বে, সে নিজের আবেগে নিজের বিনাশ-সাধন করে এবং সেই বিনাশের মুখে পরান্নরক্তি জাগাইয়া দেয়। সেই পরান্নরক্তি না জাগিলে যথার্থ মিলন অসম্ভব। অনেকে হয় ত মনে করেন, এই বে কলিযুগের কুরুক্ষেত্র, ইহাতে ইউরোপের ধ্বংস অবশ্যস্বাবী। আমি বলি, কখনও না। সকল যুদ্ধক্ষেত্র যে ধর্মক্ষেত্র, সকল ইতিহাস যে ভগবৎলীলার পুত পুণ্যকাহিনী, ভারতের কুরুক্ষেত্রের ফলে কি তখনকার ভারত মিলনপথে অগ্রসর হয় নাই? নবজীবন লাভ করে নাই? আর্ঘ্য অনার্যের মধ্যে কি একটা স্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হয় নাই? আমরা অমঙ্গলের দিকটাই দেখি, কিন্তু তাহার সঙ্গে জড়িত যে মঙ্গল, সেই দিক দেখিতে ভুলিয়া যাই।

ইউরোপ আজ অসৌম্য হৃৎকষ্ট, ধাতনা-বেদনা, অর্ক অনশনের মধ্যেই মিলন-পথে পা বাড়াইয়া আছে। অহঙ্কারের অবসান না হইলে প্রেমের জন্ম হয় না। এই বে হৃৎকষ্ট-কষ্টে আজ ইউরোপকে বাধিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা সেই প্রেম-মিলনের আগমন-প্রতীকার প্রসববেদনা। এই সমরানল নির্কাপিত হইলে দেখিতে পাইবে, ইউরোপ আপনার স্বার্থপরতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বাস করিও, একদিন দেখিবে, যে প্রবল অপ্রতিহত বেগে ইউরোপ আজ তাহার স্বার্থ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে এবং সমস্ত প্রাণ পণ দিয়া সেই স্বার্থপরতাকেই পোষণ করিতেছে, সেই ইউরোপ তেমনি অপ্রতিহত বেগে ঠিক সেই রকম সমস্ত প্রাণপণ দিয়া সে নিজের ও জগতের যথার্থ মঙ্গল-সাধন করিতেছে। এই সমর, এই বিরোধ যে জাতিত্বের ফল, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু এই সমরক্ষেত্রের অপর পারে যে মিলনমন্দির রচিত হইতেছে, তাহাও যে এই জাতিত্বেরই ফল, সে কথা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? যদি কোন দিন সূদূর ভবিষ্যতে সমস্ত মানবজাতি লইয়া একটা যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে, তখন সমস্ত বিশিষ্ট জাতিগুলি নিজ নিজ স্বভাব-ধর্মের পথ অবলম্বন করিয়া অপূর্বরূপে বিকশিত হইয়াছে এবং সেই যুক্তরাজ্যে সকল জাতিরই সমান অধিকার। কিন্তু আমার মনে হয়, এই বিশিষ্ট জাতিসমূহ সেই অবস্থায় উপস্থিত হইলে সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্য কোন রাজত্বেরই আবশ্যক হইবে না।

এই যে বাঙ্গালী জাতির জাতিত্বের দাবী, ইহার সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা

আলোচনা আবশ্যক। আমি এমন কথা বলিয়াছি—‘আমার কাছেই অনেকে বলিয়াছেন যে—আমাদের পক্ষে জাতিত্বের গৌরব করা নিতান্ত অসম্ভব, কারণ, এই যে জাতিত্বের ভাব, ইহার সমস্তটাই আগাগোড়া বিলাতের আমদানি—একটা ধারকরা সামগ্রী মাত্র। এটা যে তাঁহাদের বুঝিবার ভুল, তাহা আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমি আগেই বলিয়াছি, কোন একটা বিশিষ্ট দেশের সঙ্গে সেই দেশবাসীদের যে নিত্যসম্বন্ধ, তাহারই উপরে জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, এ সম্বন্ধ যাহা নিত্য আবহমান কাল হইতে আছে ও চিরদিনই থাকিবে, তাহার প্রতি এতকাল এমনভাবে আমাদের চোখ পড়ে নাই; হইতে পারে, আমাদের সভ্যতা ও সাধনার এই সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট নাম রাখা হয় নাই; ইহাও হইতে পারে, ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাধনা, তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস লইয়া এমন করিয়া হুড়মুড় করিয়া আমাদের বাড়ির উপর না পড়িলে, হয় ত এত সহজে এত শীঘ্র আমাদের জাতিত্বের চৈতন্য হইত না—তাহা বলিয়া কি যাহা আমাদের, আমাদেরই দেশের, যাহা বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলের সঙ্গে অণুতে অণুতে প্রাণে প্রাণে জড়াইয়া আছে, তাহাকে বিলাতের আমদানি বলিয়া সমস্ত বাঙ্গালীজাতিকে অপমান করিব? যাহা চিরকাল আছে, তাহাকে দেখিতে পাই নাই, বুঝিতে পারি নাই বলিয়া কি ধরিয়া লইতে হইবে যে, তাহার কোন অস্তিত্বও ছিল না? বিজ্ঞান-জগতে যে বড় বড় সত্য আবিষ্কার হইয়াছে, সে সব সত্যই যে সনাতন—তাহাদের সত্তা বা অস্তিত্ব ত কোন বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানবিদের উপরে নির্ভর করে না? মাধ্যাকর্ষণ যেমন নিউটনের জন্মাইবার আগেও ছিল, আমাদের জাতির জাতিত্ব তেমনি ইংরাজ আসিবার আগেও ছিল। আমরা দেখিতে পাই নাই বলিয়া যে ছিল না, তাহা নহে। ইউরোপ হইতে একটা বিপরীত সভ্যতা আসিয়া আমাদের জীবনে আঘাত করিল, সেই আঘাতে আমাদের চৈতন্য হইল, সেই মুহূর্তেই আমাদের জাতির যে জাতিত্ব, তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম। এমন করিয়াই ত মনুষ্য-জীবনে আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়, বাহিরের রূপ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আত্মাকে আঘাত করে, সেই আঘাতেরই ফলে আমরা আপনাকে দেখিতে পাই, কিন্তু যাহা দেখি, তাহা ত বাহিরের নয়, তাহা আমাদের প্রাণের বস্তু। আমাদের নবজাগ্রত বাঙ্গালী জাতির যে জাতিত্ব, তাহা আমাদেরই প্রাণবস্তু, বিদেশের নহে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভগবৎ-কৃপায় আমাদেরই প্রাণের মধ্যে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি—তাহাকে ধার করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার করিয়া লইয়া আসি নাই।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথার বিচার ও আলোচনার আবশ্যক। আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি, আমাদের দেশে ইংরাজের আগমন বিধির বিধান। আমার প্রকের বন্ধু শ্রীর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ১৯১৫খৃঃ অব্দের কংগ্রেসের সভাপতির

অভিভাষণে এই কথাই বলিয়াছিলেন—এই কথার গূঢ় মর্ম্ম কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এই কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিয়া থাকি। এই দুইটি কথাই মূলে এক কথা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সম্ভবপর কিনা, এই বিষয়ে যে অনেক মতভেদ আছে। সেই সব ভিন্ন ভিন্ন মতের মর্ম্ম-কথাটি কি, তাহা তলাইয়া বুঝিলে জাতির জাতিত্বের কথা আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। Keeling লিখিয়াছিলেন—“The East is East, and the West is West, never the twain shall meet” অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিরকালই ভিন্ন ভিন্ন থাকিবে, তাহাদের মিলন অসম্ভব।

আবার বিলাতে ও আমাদের দেশে এমন অনেকে আছেন, যাহারা বলেন যে, এই মিলন একেবারে অবশ্যস্বাবী। স্থার রবীন্দ্রনাথ এবার আমেরিকায় বলিয়াছেন যে—জাতির বদলে একটা Universal brotherhood of mankind হইবে অর্থাৎ সমস্ত মানবজাতি ভ্রাতৃত্বাবে একত্র হইবে। বোম্বাইএর কংগ্রেসে স্থার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বলিয়াছেন :—

“The East and the West have met—not in vain. The invisible scribe, who has been writing the most marvellous history that has ever been written, has not been idle. Those who have the discernment and the inner vision to see will note that there is only one goal, there is only one path.”

অর্থাৎ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ব্যর্থ হয় নাই, যে অদৃশ্য বিধাতাপুরুষ এতাবৎকাল পর্য্যন্ত রচিত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে আশ্চর্য্য লেখা লিখিতেছেন, তিনি তা নিশ্চিন্ত হইয়া নাই। যাহাদের বিচারবুদ্ধি ও দিব্য চক্ষু আছে, তাহারা বলিবেন যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের একই ইষ্ট, একই পন্থা। এই বিষয়ে আমি যতই চিন্তা করি, মনে হয়, এই দুইটা কথাই সত্য, আবার দুইটা কথাই মিথ্যা, ইহার কোনটাই একেবারে সত্য নয়। দুইটা একেবারে বিপরীত রকমের সভ্যতা ও সাধনা লইয়া এই যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, ইহাদের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা কোথায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বদলে আমি ইংলও ও বাঙ্গলা দেশ ধরিয়া লই, তাহা হইলে কথাটা অনেক পরিমাণে সরল হইয়া আসিবে। এই মিলন কত প্রকারে হইতে পারে, তাহা বিচার করা যাক্। আমাদের ও ইংরাজের মিলনের মর্ম্ম যদি এই হয় যে, আমরা ইংরাজের ইতিহাসের সাহায্যে সেই ছাঁচে গড়িয়া উঠিব অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশটা একটা নকল ইংলও হইবে, আমাদের নর নারী নকল সাহেব-মেম হইয়া উঠিবে, আমাদের শিক্ষাপ্রণালী ঠিক হুবহু বিলাতের মত হইবে, আমাদের চাষবাস ব্যবসা-

বাণিজ্যের চেষ্টায় সমস্ত দেশটাই যথার্থ গৃহস্থের আশ্রম না হইয়া, একটা বৃহৎ ভীষণ কলের কারখানা হইয়া উঠিবে, তাহা হইলে আমি বলি, এ মিলন একেবারে অসম্ভব। অনেকে হয় ত বলিবেন, কেন অসম্ভব ?

এই সহরে ত অনেকেই ইংরাজী রকমে জীবনযাপন করেন। আহা! বিহারে, আচারে ব্যবহারে, চালচলনে ইংরাজের সহিত তাঁহাদের কোন পার্থক্যই দেখা যায় না। কলিকাতায় আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ত এক রকম বিলাতের ছাঁচেই ঢালা, আর কলিকাতায় যাহা দেখা যায়, তাহা যে ক্রমশঃ দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তবে কেমন করিয়া বলা যায় যে, আমরা বিলাতের ছাঁচে গড়িয়া উঠিব না ? আমার কথা এই যে, নকল সাজা সহজ, কিন্তু যথার্থ নকল হওয়া বড়ই কঠিন। সাজা জিনিষটা খেলার ব্যাপার, একদিন থাকে, তার পর থাকে না; কিন্তু হওয়া জিনিষটার সঙ্গে রক্তমাংসের সম্বন্ধ আছে, কোন একটা জাতিকে কিছু হইতে হইলে তাহার স্বভাবধর্মের মধ্যে সেই হওয়া জিনিষটার বীজ থাকা চাই। আমার কিছুতেই মনে হয় না, বাঙ্গালীর স্বভাবধর্মের মধ্যে ইংলণ্ডের সভ্যতা ও সাধনার বীজ আছে, সুতরাং এই অর্থে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মিলন অসম্ভব, এবং এইভাবে দেখিতে গেলে Keeplingএর কথাই ঠিক বলিয়া মনে হয়, প্রাচ্য প্রাচ্যই থাকিবে, প্রতীচ্য প্রতীচ্যই থাকিবে, ইহারা কখনও মিলিবে না।

তবে কি এই ছুইটা জাতি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিজ নিজ সত্তা হারাইয়া একটা নূতন রকমের দোরাঁসলা জাতি গড়িয়া উঠিবে, না একটা নূতন বর্ণশব্দ জাতির উৎপত্তি হইবে ? এ কথা অর্কচীনের কথা, ইহার বিচারের কোন আবশ্যকতা নাই।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, এই মিলনের অর্থ এই যে, ইংরাজের যাহা কিছু ভাল, আমরা লইব, আমাদের যাহা কিছু ভাল, তাহা ইংরাজ লইবে এবং উভয়ের যাহা কিছু মন্দ, তাহা বিসর্জন করিতে হইবে। এ কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি না। আমাদের কি ইংরাজের যাহা ভাল যাহা মন্দ, তাহা কি এমন পৃথকভাবে জাতির জীবনের মধ্যে অবস্থিতি করে যে, একটা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া আর একটা লওয়া যায় ? একটা বিশিষ্ট জাতির ভালমন্দ যে এক সঙ্গে সেই জাতির রক্তমাংসের সঙ্গে জড়ান। খাঁটি ভালটুকু ছিঁড়িয়া লইবে কি করিয়া ? এমন করিয়া ত ছেঁড়া যায় না। একটা জাতির জীবন ত ঠিক ইটের এমারত নয় যে, ঠেকা দিয়া খানিকটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সে দিকটা আবার নূতন ধরণে নূতন উপকরণে গড়িয়া তুলিবে। কোন জাতির সংস্কার অন্য জাতির আদর্শে সম্ভব হয় না। আমাদের যে সব সংস্কারের আবশ্যক, তাহা আমাদের স্বভাবধর্মের মধ্যে যে সব শক্তি নিহিত আছে, তাহার বলেই হইবে। বিলাতের সমাজশক্তির বলে আমাদের

আবশ্যকীয় সংস্কার সাধিত হইবে না—হইতেই পারে না। দুইটা জিনিষ যেমন আঠা দিয়া দিয়া ছোড়া লাগান যায়, ঠিক তেননি করিয়া ত বিলাতের ভালটুকু আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে ছোড়া লাগান যায় না। এ যে জীবনের লীলা—জীবন বিকশিত হয়, তাহার বিকাশের মধ্যে যাহা নাই, সে ত তাহার সঙ্গে ছোড়া লাগে না।

এই কথাটি আর একদিক্ দিয়া দেখা যায়। ধরিয়া লও যে, বিলাতের ভালটুকু তুলিয়া আনিয়া আমাদের জীবনের মধ্যে ঢালাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু তাহার ফলে কি হইবে, বিলাতি সামাজিক প্রথা বা অবস্থা যদি আমাদের মধ্যে ঢালাইয়া দেওয়া যায়, তবে সেই প্রথা বা অবস্থার বাহা স্বাভাবিক ফল, তাহা ফলিবেই, এবং তাহার ফলে আমাদের দেশের যে বিশিষ্ট রূপ, তাহা নষ্ট হইয়া বাঙ্গালী-সমাজ একটি দ্বিতীয় বিলাতি সমাজ হইয়া উঠিবে। এমন করিয়া আর একটা জাতির প্রতিধ্বনি হইয়া উঠিলে আমাদের বাচিয়া থাকার সার্থকতা কোথায়?

এভাবে বাহারা আমাদের দেশে বিলাতি সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন, তাহাদের চেষ্টা করিতে দাও, আমাদের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। আমি জানি, বাঙ্গালী জাতির একটা বিশিষ্ট জাতিত্ব আছে, তাহার একটা বিশিষ্ট স্বভাব-ধর্ম আছে, সেই স্বভাবধর্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশ করিবে, এবং যাহা সেই স্বভাবধর্ম-বিরুদ্ধ, তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া এই সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে।

তবে এই যে মিলন—বাহাতে অনেকেই বিশ্বাস করেন এবং আমিও বিশ্বাস করি, সেই মিলনের বথার্থ মর্ম্ম কি? এই বিষয়টা দুই দিক্ দিয়া দেখা যায়, ইহাকে জাতিত্বের দিক্ দিয়া অর্থাৎ বাঙ্গালী জাতির যে জাতিত্ব ও ইংরাজ জাতির যে জাতিত্ব, এই দুইটি সত্যের দিক্ দিয়া দেখা যায়। আর একটা দিক্ দিয়াও দেখা যায়, সেটা আমাদের নিজ নিজ শাসন-বিভাগ অর্থাৎ গবর্ণমেন্টের দিক্ দিয়া।

এই শেষোক্ত দিক্ দিয়া বিচার করিতে হইলে ইহা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, দুইটি স্বতন্ত্র জাতি নিজ নিজ বিশিষ্টরূপেই বিকশিত হইয়াও এই দুইটি জাতির শাসন-বিভাগের উপরদিকে একটা একচ্ছত্র যোগাযোগ থাকিবে। বাঙ্গালী জাতির ও ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরস্পরের শাসন-বিভাগের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এবং সমস্ত ভারতবর্ষের যে শাসন-বিভাগ, তাহার সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ, একটা বাস্তবিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবেই উঠিবে। কিন্তু সেই সম্বন্ধের ভিতরের প্রকৃতি কি হইবে, বাহিরের আকার কি হইবে, তাহা এখনও ঠিক করিয়া বুঝা এবং বলা অসম্ভব। শ্রীর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বোম্বাইএর কংগ্রেসে বলিয়াছিলেন :—

“It seems to me that having fixed our goal it is hardly necessary

to attempt to define in concrete terms the precise relationship that will exist between England and India when the goal is reached."

অর্থাৎ :—আমাদের যে উদ্দেশ্য, তাহা সম্পূর্ণভাবে সফল হইলে ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যে ঠিক কি সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা নির্ধারণ করিবার চেষ্টা আমার মতে এখন অনাবশ্যক।

আমারও ঠিক তাহাই মনে হয়, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, এমন সম্বন্ধ হইতে বা থাকিতে পারে না, যাহাতে আমাদের ও ইংরাজের জাতীয় স্বভাবধর্মের বিনাশ-সাধন হইবে। শুধু-জাতিত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর বস্তু-মিলনভূমি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আমি আগেই বলিয়াছি, দুইটি জাতি যখন নিজ নিজ প্রকৃতির মধ্যে নিজ নিজ স্বভাবধর্মের গুণে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাদের মধ্যে বস্তু-আদান-প্রদান ও মিলন সম্ভব হয়। যখন ইংরাজ ও বাঙ্গালী এই উন্নত জাতিই সেই প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, তখনই তাহাদের মধ্যে প্রকৃত মিলন হইবে। প্রকৃত মিলনের ফল এই যে, শত শত ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্টরূপে বিকশিত স্বতন্ত্র জাতিসমূহ বিধাতার সৃষ্টিশ্রোতে ভাসিতেছে, ফুটিতেছে, ইহাদের সকলের মধ্যেই যে একটা একত্র আছে, এই সব ভিন্নরূপের যে স্বরূপ, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয় না। জাতিত্ব মরে না—শুধু সকল জাতির মধ্যে সকল বিশিষ্টরূপের মধ্যে যে একত্র আছে, তাহাই জাগিয়া উঠে। এই জগতই ইংরাজ এ দেশে আসিয়াছিল। এইখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বস্তু-মিলন। এই ক্ষেত্রেই Universal Brotherhood of man সম্ভব। তাই শুধু এই দিক দিয়া দেখিলেই দেখা যায়, the East and the West have met—not in vain. অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যে একত্র হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইবে না।

এখন দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশের উন্নতিসাধন করিতে হইলে আমাদের এই নব-জাগৃত জাতিত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, আমাদের ইতিহাসের ধারাকে উপলব্ধি করিয়া ও সাক্ষী রাখিয়া আমাদের দেশের সকল দিকের বর্তমান অবস্থা আলোচনা করিতে হইবে এবং সেই আলোচনার ফলে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের স্বভাবধর্ম-সম্বন্ধে অথচ সার্বভৌমিক উন্নতি সুশীল হইতে পারে, তাহা নির্ধারিত করিতে হইবে।

কৃষকের কথা

আমাদের বর্তমান অবস্থার কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই আমাদের কৃষিজীবীর কথা মনে আসে, তার পরই আমাদের দারিদ্রের কথা মনে হয়। কৃষকের কথা ও দারিদ্রের কথা একই কথা বলিয়া মনে হয়। আমরা সকলেই জানি যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাবে কৃষিকার্যই আমাদের উপজীবিকার প্রধান উপায়। আমরা সকলেই জানি যে, বাঙ্গালী জাতির মত এত দরিদ্র জাতি বোধ হয় জগতে আর কোথাও নাই। কিন্তু ঘোর দারিদ্রের প্রকৃত অবস্থা বোধ হয় ভাল করিয়া জানি না, সম্যক্রূপে উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা ত একেবারে এক মুহূর্তে দরিদ্র হইয়া পড়ি নাই—আমরা যে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে ককালসার হইয়া পড়িয়াছি। তাই এই অতি সত্য বথার্থ অবস্থা আমরা ঠিক ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। বিদেশীরা যখন প্রথম আমাদের দেশে আসে, তখন তাহারা আমাদের সোনা-রূপার প্রাচুর্য দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। সে সোনা-রূপা আসিত কোথা হইতে? বাঙ্গলা দেশে ত সোনা-রূপার খনি নাই, তবেই বলিতে হইবে যে, আমাদের কৃষিকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যে আমরা অনেক অর্থ উপার্জন করিতাম।

সরকারী কাগজপত্রে পাওয়া যায় যে, আমাদের সমস্ত জনসংখ্যা ধরিলে এবং আমাদের সমস্ত চাষযোগ্য ভূমি হিসাব করিলে জন পিছে দুই বিঘারও কিছু কম থাকে। এই দুই বিঘা জমি চাষ করিয়া একজনের সমুদয় খরচ নির্বাহ করা অসম্ভব। তার পরে অনাবৃষ্টি আছে, হুর্বৎসর আছে, আমাদের চাষারা রোগক্লিষ্ট স্বাস্থ্যহীন—এই দুই বিঘা জমিও বার মাস পরিশ্রম করিয়া ভাল করিয়া কাষে লাগাইতে পারে না।

সরকারী কাগজ হইতে ইহাও দেখা যায় যে, জন প্রতি বৎসরে সাত মণ করিয়া খাদ্য-শস্ত্র-আবশ্যক হয়। আমাদের সমস্ত বাঙ্গলা দেশে এই হিসাবে বৎসরে বত্রিশ কোটি কুড়ি লক্ষ মণ খাদ্য-শস্ত্রের আবশ্যক। আমি এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির যে বাঙ্গলা, তাহার কথা না বলিয়া গবর্ণমেন্টের হিসাবে যে বর্তমান বাঙ্গলা, তাহারই কথা বলিতেছি। আমাদের উৎপন্ন হয় মোটে চব্বিশ কোটি আশী লক্ষ মণ। তাহা হইতে প্রায় এক কোটি মণ প্রত্যেক বৎসরে রপ্তানি হইয়া যায়। খাদ্য-শস্ত্রের আমদানি বড় একটা বিদেশ হইতে হয় না, সুতরাং যেখানে আমাদের বত্রিশ কোটি কুড়ি লক্ষ মণ খাদ্য-শস্ত্রের আবশ্যক, সেখানে থাকে মাত্র তেইশ কোটি আশী লক্ষ মণ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির বৎসরে যদি সাত মণ করিয়া খাদ্য-শস্ত্র বথার্থ আবশ্যক হয়, তাহা

হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, এক কোটি কুড়ি লক্ষ লোকের আহারের ব্যবস্থা নাই। আবার আর একদিক্ দিয়া দেখিলে আমাদের দারিদ্রের কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায়। সরকারী কাগজে পাওয়া যায় যে, আমাদের সকল রকম চাষের উৎপন্ন দ্রব্য অর্থাৎ যব, গম, ছোলা, সরিষা ইত্যাদি, পাট, চিনি, তামাক—এই সকল উৎপন্নের দাম একশ' ত্রিশ কোটি টাকা এবং সরকারী কাগজপত্র অনুসারে প্রত্যেক জনের বৎসরে ত্রিশ টাকা করিয়া আর। আমার হিসাবে প্রত্যেকের বৎসরিক আর ষোল টাকা হইতে কুড়ি টাকার মধ্যে। কুড়ি টাকাই হউক বা ত্রিশ টাকাই হউক, এই টাকায় কোন চাষাই তাহার নিত্য আবশ্যকীয় অভাবগুলিও পূরণ করিতে পারে না,—গবর্ণমেন্টের জেলেও প্রত্যেক ব্যক্তির পিছে বৎসরে আটচল্লিশ টাকা করিয়া খরচ হয়!—ইহা কি আমাদের ঘোর দারিদ্রের স্পষ্ট প্রমাণ নহে?

আমাদের রাজকর্মচারীদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, বাঙ্গলায় অনেক পরিমাণে “গুপ্তধন” (Hidden wealth) আছে অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশে নাকি অনেকে অলঙ্কার ব্যবহার করেন এবং অনেকে টাকা পুতিয়া রাখেন। বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যে কাহারও কখনও টাকা পুতিয়া রাখিবার সুযোগ বটিয়াছে বলিয়া আমার ত মনে হয় না। পুরাকালে অনেকে টাকা পুতিয়া রাখিতেন, এইরূপ প্রবাদ আছে সত্য, কিন্তু যদি এইরূপ কেহ টাকা পুতিয়া রাখিয়া থাকেন, তবে সে মাটিতে পোতা টাকা মাটির মধ্যেই লুকাইয়া আছে, আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহার বড় একটা সন্ধান পায় নাই। অলঙ্কারের বিষয় একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, খুব অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া বাঙ্গালীর মেয়েরা রূপার অলঙ্কারই পরিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকায় আমাদের দেশে সেই সোনার দামের ওজনে সব দ্রব্যেরই দাম ঠিক হয়।

ইহার ফলে আমাদের দেশের রূপার দাম কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই যে বৎকিঞ্চিৎ রূপার অলঙ্কার আমাদের দেশে আছে, তাহার মূল্য একটা আকস্মিক ও আমাদের দেশের পক্ষে অস্বাভাবিক কারণে অনেকটা কমিয়া গিয়াছে,—ইহাও আমাদের দারিদ্রের আর একটা কারণ। আমাদের এই ঘোর দারিদ্রের আরও প্রমাণ আবশ্যক হইলে সরকারী কাগজেই তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বাঙ্গলা দেশে এমন গ্রাম নাই—যেখানে অন্ততঃপক্ষে শতকরা পঁচাত্তর জন ঋণগ্রস্ত নহে। এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে শতকরা একশ' জনই ঋণদ্বারা পীড়িত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কৃষি-কাষের উৎপন্ন হইতে চাষা ত জীবন ধারণ করিতেই পারে না এবং যাহা কিছু অর্জন করে, তাহারও একটা অংশ মহাজনের ঘরে গিয়া পড়ে। মানুষ ভাল করিয়া জীবন ধারণ না করিতে পারিলে মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব। আমি বিলাতি আরামের

আদর্শের (Standard of Comfort) কথা বলিতেছি না, কিন্তু শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্ত, মনকে শান্ত ও প্রসন্ন রাখিবার জন্ত এবং অনাবৃষ্টি ও দুর্বৎসরের যে বিপদ, তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্ত যে অর্থের আবশ্যক, সেই পরিমাণ অর্থাগমের ব্যবস্থা যদি না থাকে, তবে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব।

আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি যে, অভাবে স্বভাব নষ্ট, আমাদের চাষাদের অবস্থা ভাল করিয়া ভাবিতে গেলে এই ঘোর দারিদ্রতানিবন্ধন হুইদিক্ দিয়া আমাদের স্বভাব নষ্ট হইতেছে, একদিকে অর্থভাবে আমাদের যে মনুষ্যত্বের আদর্শ, তাহা সাধন করিতে না পারিয়া আমরা দিন দিন শক্তিহীন, ধর্মহীন, মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া পড়িতেছি ; আবার অন্য দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে আমাদের মধ্যে সেই একই কারণে চুরি, ডাকাতি ও অন্যান্য অনেক প্রকার দুর্কার্য বাড়িতেছে ; সুতরাং যে দিক্ দিয়াই দেখা যায়, আমাদের এই ঘোর দারিদ্রকে দূর করিতে হইবে।

প্রথম কথা এই যে, আমাদের গ্রাম-সমূহ ম্যালেরিয়াতে উৎসন্ন বাইতেছে—পল্লী-সমাজ বাঙ্গালীর সভ্যতা-সাধনার কেন্দ্রস্থল, সেই কেন্দ্রস্থল যদি ব্যাধিছুষ্ট হইয়া তাহার সম্মুখীন শক্তি হারাইয়া ফেলে, তাহার ফলে সমস্ত জাতিটাই অক্ষম ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই অস্বাস্থ্য নিবন্ধন পল্লীগ্রাম ক্রমশঃই জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে, এক দিকে ম্যালেরিয়ার আতঙ্ক, আর এক দিকে বড় বড় সহরে বিলাতি ব্যবসা-বাণিজ্যের লোভ ও মোহ, কাজেই এই বড় বড় সহরগুলো এক একটা বৃহৎ অজগর সর্পের মত গ্রামবাসীদের টানিয়া টানিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে ; সুতরাং আমাদের প্রথম কার্য গ্রামের ও দেশের স্বাস্থ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

এই অস্বাস্থ্যের সঙ্গেও আমাদের দারিদ্রের যোগ আছে। শরীর দুর্বল হইলেই ব্যাধিমন্দির হইয়া পড়ে, আমাদের এক হাতে এই দেশের স্বাস্থ্যকে রক্ষা করিতে হইবে, আর এক হাতে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে দারিদ্র, তাহা ঘুচাইতে হইবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে চাষাদিগকে সেই সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে হইবে, গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ করিতে হইবে, নূতন পুকুরিণী খনন করিতে হইবে, পুরাতন পুকুরিণীর সংস্কার করিতে হইবে, বন জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে এবং চাষারা বাহাতে আরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন-ভাবে জীবন-যাপন করিতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দিতে হইবে। অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে হইলে চাষাকে কম সুদে তাহার আবশ্যকীয় টাকা ধার দিবার জন্ত গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীদের উপকারের জন্ত তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ছোটখাট ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের কার্যের তালিকা ত এই—কিন্তু কাজ করিবে কে ? রাজসরকার, না আমরা ? সে কথা পরে বলিতেছি।

আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য

যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই বুঝা যায় যে, শুধু কৃষিকার্যে আমাদের চলিবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য না হইলে আমাদের এই ঘোর দারিদ্র্যের অবসান কিছুতেই হইবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বিচার করিতে হইলে আমাদের কি ছিল, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে, এবং যাহা ছিল, তাহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার আরও উন্নতি-সাধন করিতে হইবে।

আমাদের বাণিজ্য নাই, তাই মা লক্ষ্মীও বাঙ্গলা ছাড়িয়া গিয়াছেন, বাঙ্গলার সুখ-দুঃখও সেই সঙ্গে সঙ্গে কুরাইয়া গিয়াছে, আছে শুধু সুখের মোহ আর দুঃখের বস্ত্রণা ও অবসাদ। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে আজ আমরা নিজের সুখদুঃখ ভুলিয়াছি, কিন্তু এমনই ত আমরা ছিলাম না, সবই ত আমাদের ছিল, পেটের ভাত, কটির লজ্জা-নিবারণ—আমরা নিজেরাই আমাদের সে লজ্জা নিবারণ করিতাম। আলিপনা দেওয়া আদিনা, মুক্ত আকাশ, শ্রামল পল্লীবীধি, শ্রমলক অন্ন, পরস্পরের প্রীতি—সবই আমাদের ছিল। আজ ঘরে লক্ষ্মী নাই, তাই আমরা লক্ষ্মীছাড়া,—কেন আমরা লক্ষ্মীছাড়া হইলাম? দোষ আমাদেরই,—সব দোষই কি আমাদের? ইতিহাস নিজকৃত দোষকে কখনও ত্যাগ করে না। তবে প্রবলের সংঘাতে দুর্বলের দোষ শতগুণ বাড়িয়া যায়। আমাদের সে দময়কার ইতিহাস ঘোর অন্ধকারে মর্শ্বভেদী নিঃশ্বাসে তপ্ত ও সিক্ত, সে কথার বিচার আর করিয়া কাজ নাই, বিচার করিলেই গরল উঠিবে। আজি মিলনের দিনে সে কথা ভোলাই ভাল। একদিন ছিল—বাঙ্গলা শুধু নিজের লজ্জা নিবারণ করিত না, জগতের ঘরে ঘরে কাপড় বিলাইত। সে বসন ও বৈভব জগতের নরনারীর সৌন্দর্য্য কুটাইয়া তুলিবার অতুলনীয় উপাদান ছিল। ইংরাজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গলার সেই বৈভব নষ্ট হইয়া গেল। কেন নষ্ট হইয়া গেল, কে নষ্ট করিল? ইতিহাসের সাক্ষ্য?—আমি আগেই বলিয়াছি, সে কথা ভোলাই ভাল। সেই দূর শতাব্দীর অন্ধকারে বধন চোখ ফিরাইয়া দেখি—সকলই বিত্তীষিকামর, ভয় হয়, মনে হয়, সে কি স্বপ্ন! আমরা বাস্তবিকই মল্লযুদ্ধ হারাইয়াছিলাম, দাবি করিবার কিছুই ছিল না, শুধু প্রাণের দাবি ছিল। হার, দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী আমরা বণিকের যুগকাষ্ঠে আমাদের শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য সকলই বলি দিলাম। আমাদের ঘরে ঘরে চরকা ভাঙিয়া গেল, আমাদের হস্তপদ ছিন্ন করিলাম, জীবন্ত অগ্নিতে সকলই দাহ করিয়া দিলাম, আমাদের ঘরের লক্ষ্মীকে গুলি-

টিপিয়া মারিয়া ফেলিলাম। আমরা যে অক্ষম তাই—দোষ কারও নয়, দোষ আমাদেরই, আমরা “স্বথাত সলিলে ডুবিয়া মরিলাম।” অনাচারে, অশ্রদ্ধায়, শক্তিহীনতায়, ভক্তিহীনতায় আমাদের গৃহধর্মকে, আমাদের স্বভাব-ধর্মকে বিসর্জন দিলাম।

আমার বাঙ্গলার ঘরে ধান ছিল, ঘরের গাই দুধ দিত, জলাশয় মাছ দিত, তৃণ-শ্রাম শস্তক্ষেত্র, গোচারণ-ভূমি ছিল, গাছের ফল ছিল, খড়ের ছাউনির বর ছিল, সুনীল আকাশ ও সবুজ গাছের ও মাঠের পানে চাহিলে চোখ জুড়াইয়া যাইত। চাষা সারা দিনের পরিশ্রমের পর ঘর্মাক্ত-কলেবরে সন্ধ্যাদীপ-জ্বালা-ঘরে মেঠোশুরে প্রাণের গান গাহিতে গাহিতে ফিরিয়া আসিত। বাঙ্গলার পুকুরের জল তখন মিঠা ছিল, চাষা বৎসরে ছয় মাস তাহার পেটের জন্ত খাটিত, তাহার ঘরে ধানের মরাই ছিল, বাকি ছয়মাস সে গৃহস্থালী করিয়া বাঙ্গলার স্বভাব-ধর্ম-সঙ্গত চিরকালের অভ্যাস বশতঃ নানাবিধ পণ্যদ্রব্য তৈয়ারি করিত। সেই পণ্যদ্রব্যই বিশ্বের হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত। সে চাষা এখন নাই, সে গৃহস্থালী এখন নাই, সে গৃহধর্ম ও এখন নাই,—আর সে গৃহও এখন নাই। ঘরে চাল নাই, গরু দুধ দেয় না, তৃণ-শ্রাম ক্ষেত্র শুকনা কাঠ হইয়া কাটিতেছে, ঘরে সন্ধ্যাদীপ পড়ে না, দেবতা উপবাসী—সেবা হয় না, পেটের দায়ে হালের গরু বেচিয়া কোন রকমে খাইয়া বাঁচে। জলাশয় শুকাইয়া কাদা হইয়াছে, জলকষ্টে—বিভিন্ন জলের অভাবে নানা প্রকার ব্যাধি আসিয়া চাষার সে স্বাভাবিক ক্ষুধা একেবারে নষ্ট করিয়াছে, তাহার যে সহজ সরল স্বাভাবিক জীবন ছিল, তাহা হারাইয়া উৎকট ব্যাধি লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। যে সুখ তাহাদের ছিল, তাহা আর নাই। নাগপাশ—অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জার মজ্জায়—অবশ হইয়া পড়িয়া আছে।

কেন এমন হইল, কি পাপে যা লক্ষ্মী আমাদের ত্যাগ করিলেন? ইতিহাসের সাক্ষ্য যাহাই হউক, ভিতরের কথা ভাবিয়া দেখিলে দোষ আমাদেরই। যে আপনাকে দুর্বল করিয়া রাখে, দুর্বল হইতে দেয়, তাহার বলহীনতা যে তাহারই দোষ। নিজের ঘরের ধন “চৌকি না দিয়া” যে পরের হাতে তুলিয়া দেয়, দোষ তাহার,—না, সেই সুযোগ পাইয়া যে সব ধনরত্ন লইয়া যায়—সেই সুযোগ-প্রার্থীরা? আমরা যে সেই সময় নিজের ঘরকে পর করিয়াছিলাম ও নিজের প্রাণের আদর্শ তুলিয়াছিলাম, শুধু পরের দোষ দিলে ত আমাদের প্রার্থিত হইবে না।

ভুল কোথায়? ভুল আদর্শের সংঘাত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শের যে বিরোধ, সেই বিরোধেই আমাদের এই দুর্বল শক্তিহীন অবসন্ন দেহ। নিজের বাঁচাইয়া রাখিবার শক্তি ছিল না, সেই দৌর্বল্যই আমাদের দোষ, সে দোষ ত এখনও যায় নাই, ~~আমরা~~ আগিয়া—নিজের আদর্শ পাইয়াও নিজের আদর্শকে তুলিয়া ধরিতে পারিতেছি



না, সেই আদর্শের সংঘাত এখনও চলিতেছে, এখনও ত আমাদের নিজের আদর্শকে পরের হাতে তুলিয়া দিয়া সচ্ছন্দে বাস করিতেছি! যে ভুলে নিজের আদর্শকে ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই ভুলের মোহ যে এখনও কাটাইতে পারিতেছি না। বিলাতের আদর্শ বিলাতেই শোভা পায়, তাহা বিলাতেই থাকুক, আমাদের সে আদর্শকে ত্যাগ করিতে হইবে। জীবন গড়িবার সময় ত্যাগের সময়—ভোগের নয়। আমাদের এখন বিলাতি আদর্শ জনিত যে বিলাসের ভোগ, তাহাকে সবলে ছই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। জীবনকে সহজ সবল করিতে হইবে, জীবনের ধারা ও গতির মুখ একেবারে ফিরাইয়া দিতে হইবে। প্রতীচ্যের যে Industrialism—এই Industrialism, যাহাকে শিল্প-চেষ্টা কি সকল রকমের বাণিজ্য-চেষ্টা বলিলেও ঠিক বুঝা যায় না—সেই Industrialism যাহা আমাদের দেশে কখনও ছিল না ও আমাদের স্বভাব ও ধর্মের মধ্যে থাকিতেই পারে না, সেই-Industrialism ধীরে ধীরে চোরের মত আমাদের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে। আমাদের স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে যে, এই Industrialism আমাদের দেশে চলিবে না, চলিতে পারে না, বাঙ্গলার আদর্শ তাহা নয়। বাঙ্গলার মাটিতে যাহা হয়, বাঙ্গলার ধাতে যা সম্ভব, তাহাকেই বরণ করিতে হইবে।

বাঙ্গলার নাই কি! ছিল না কি! কি ছোরে, কি কল-কল স্রোতে গঙ্গা সাগরের সঙ্গে মিশিতেছে। আজিও পদ্মা জলোচ্ছ্বাসে কি উদ্দাম ভাবের ভাঙ্গন অটুট রাখিয়াছে, কি তোড়ে ব্রহ্মপুত্র কলকলনাদে গ্রামের পর গ্রাম ভাসাইয়া যায়, আর যখন দামোদর ঘোর ঘর্ষর রবে নাচিয়া উঠে, আজিও তাহার গতি কেহ ত রোধ করিতে পারে না, সাগরের অশ্রান্ত গর্জন আজিও ত থামে নাই। বৃদ্ধ হিমালয় তাহার ছই বাহু লইয়া আজিও তেমনি দাঁড়াইয়া আছেন, তমালতালীবনরাজি-নীলা আজিও আছে—বাহার উপরে বাঙ্গলার প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার স্বভাব-ধর্মের বিকাশ হইয়াছিল, সেই সব ত তেমনি আছে, তবে নাই কি? বাঙ্গলার যে মন্দিরে মন্দিরে মসজিদে মসজিদে সাধন-সঙ্গীত ধ্বনিত হইত, আজিও ত সেই মন্দির আছে, মসজিদ আছে, তবে নাই কি? সে বল, সে স্বাস্থ্য, সে ধৈর্য, সে আত্মস্থ জাগ্রত অবস্থা সবই তমের অবসাদে ডুবিয়াছে। দেশ আছে, দেশের আদর্শ চলিয়া গেল কেন? জাতি আছে, সেই জাতির যে প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি, তাহা ভাসিয়া গেল কেন? সে গ্রাম নাই কেন? সে পল্লী নাই কেন? সে পল্লীসমাজ নাই কেন? বাঙ্গলার যে শত শত গ্রাম লইয়া শত শত সমাজ ছিল, সে সমাজ নাই কেন? ধর্ম, নর, স্বাস্থ্যহীন, কককেশ, ককালসার প্রাণীর দল ক্রমশঃ মরণোত্তর পশুর মতন পান-পুকুরের ধারে পথে পড়িয়া ধুকিতেছে কেন? আজ যে বাঙ্গালীর



আধপেটা খাইয়া লোক-চক্ষের অন্তরালে চোখের জল চোখে শুকাইতেছে, তাহার কথা ভাবি না কেন? মাগের ছেলে ম্যালেরিয়ায়, প্রোশা-যকুতে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে, তাহার খোঁজ রাখি না কেন? আজ যে আমরা Industrialism, Industrialism বলিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছি, Joint Stock Company—বনিয়াদি জুয়াচুরির জন্ত অহোব্রাত্ম মাথার বান পায়ে ফেলিতেছি, কংগ্রেস, কন্ফারেন্স ডাকিয়া একটা বড় রকমের ধারকরা Indian Nation তৈয়ারি করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি—এই সব চেষ্টা যে আমাদেরকে কোন্ পথে কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি? কেহ কি আমায় বলিয়া দিতে পার, আজ দুই শত বৎসরের ভিতর কয়টা নূতন পুষ্করিণী খনন হইয়াছে, কয়টা নূতন দেউল রচিত হইয়াছে, কয়টা নূতন অন্নচ্ছত্র খোলা হইয়াছে, গঙ্গার তীরে তীরে কয়টা ঘাট নূতন বানান হইয়াছে, পথে পথে অশ্বখ-বটের বিবাহ দিয়া তাহার তলাখানি সান্নিধ্য হইয়া—পথশ্রান্ত নরনারীর বিশ্রাম-সেবার জন্ত—কয়টা নূতন বট অশ্বখের সেবা-সংস্কার হইয়াছে, কেহ কি আমাকে বলিয়া দিতে পার? কয়টা পল্লী, কয়খানা গ্রাম আজ বাঙ্গলার আছে? ঘর ভাঙ্গিয়াছে, ব্যবসা গিয়াছে, বাণিজ্য গিয়াছে, রসকন্ বাহা ছিল, সকলই দুরাইয়া শেষ হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু তবু কি আমাদের চৈতন্য হইবে না? সে কালে যখন গ্রামে গ্রামে দুর্গোৎসব হইত, পল্লীতে পল্লীতে বারমাসে তের পার্কে ছিল, তখন সকল গৃহস্থ সকল গ্রাম কেমন একপরিবার হইয়া উঠিত, সুখ দুঃখ, আনন্দ উল্লাস, উৎসব এক সঙ্গে ভাগ করিয়া উপভোগ করিতাম, এখন সে আনন্দ কই, সে উৎসব কই? এখন ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বৎসরে একবার সাক্ষাৎ হয় না, খুড়া, ভাইপো, ভাইঝি Cousin হইয়াছে—পরিবারের সে সুখ নাই, শান্তি নাই, আনন্দ নাই। একটা প্রবল সভ্যতার সংঘাতে আমরা শক্তিহীন আরও দুর্বল শতচ্ছিন্ন হইয়া নিষ্কিন্তু হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু এখনও আমাদের ঘূমের ঘোর ভাল করিয়া ভাঙ্গে নাই, এখন মিল-ফ্যাক্টরির কথা ভাবিতে গেলে আমাদের জিবে জল আসে, আমাদের মধ্যে বাহাদের সামান্য কিছু টাকা আছে, তাহার Cheap labour-এর কথা ভাবিয়া লোভে, মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়েন,—এই যে দাসত্ব-অনুকরণ-মোহ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমাদের জীবনের উপরে চাপিয়া বসিয়াছে, তাহাকে না সরাইতে পারিলে আমাদের বাঁচিবার আশা নাই।

Industrialism বাঙ্গলা দেশে চালাইতে আরম্ভ করিলেই আবার নূতন করিয়া আমাদের বিনাশের পথ প্রস্তুত হইবে। বিলাতি-ফ্যাক্টরি-রান্স তাহার রান্সসী মায়া আমাদেরকে একেবারে শেষ করিয়া ফেলিবে। বিলাতি কারখানায় নানান কারখানা করিবে, নিজেরা সেই কলকারখানায় কলের চাকর মত ঘুরিব, প্রাণহীন শুক জড়বৎ হইয়া সেই চাকর দাঁতের সঙ্গে মিলাইয়া আমাদের লাগাইয়া দিব—সেই দাঁতে দাঁতে লাগিয়া



থাকিব, বিছাভের কল টিপিরা ধনী মালেক আমাদের চালাইবে, তাহাদের টাকা আছে, আমাদের পোকা-পড়া—রস রক্ত অস্থি মজ্জা আছে, যতদূর পারিবে, মালেক আমাদের রসভার হরণ করিবে। এই Industrialism যতটুকু আমাদের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, তাহারই কল দিয়া ইহাকে বিচার করা যায়। কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী গ্রামের কি ভীষণ অবস্থা। সহরের বাঙ্গালীবাবুরা বিলাসের চক্চকানিতে চকিত হইয়া বেশ স্নেহের মোহেই বাস করিতেছে। এত যে ছুঃখ, এত যে কষ্ট, এত যে দারিদ্রের পীড়ন, তাহাও বিলাতি সভ্যতা বা বিলাসের জন্ত অকাতরে সহ করিতেছে। কালে যে কি হইবে, তাহার ভাবনা নাই, চিন্তা নাই। আর বাবুদের ছাড়িয়া দিলে বাহা থাকে, তাহার চিন্তা আরও ভীষণ। গঙ্গার দুই ধারে বাঁধ আর কলের চিম্নির ধোঁয়া, মা গঙ্গা আর পুতসলিল নাই, সহরের ও মিলের সকল ময়লা তিনিই গ্রহণ করেন, কলের চিম্নি দেশ শুধু কালী ও ধোঁয়ার ভরিয়া দিতেছে। স্বাস্থ্যের দেখা নাই, একটা মিলে অনেক লোকের সমাবেশ, এই চিম্নিই তাহাদের জীবনী শক্তি কাড়িয়া লইয়াছে। কেহ কলের চাকার দাঁত হইয়া আছে। কেহ একটুকু ফরসা কাপড় পরিয়া সেই প্রাণ দিয়া বুকের রক্ত ঢালা শ্রমলব্ধ অর্থের ভার ওজন করিয়া, মাথায় করিয়া মালেকের সিঁদুকে তুলিয়া দিতেছে। আমাদের শ্রমজীবীদের যে নৈতিক জীবন, তাহা এই মিল-ক্যান্টরিতে একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সব রকমের মাদকতা বাড়িয়াছে! হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক মিলের কাছে কাছে যত শুঁড়ি-খানা আছে, তাহাদের আর শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, এই Industrialismকে সর্বতোভাবে বর্জন করা নিতান্ত আবশ্যক। ইউরোপেও এই Industrialismএর বিরুদ্ধে ইউরোপের অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরাজকাল অনেক কথা বলিতেছেন, এই Industrialismএর ফলে ইউরোপের কি দুর্দশা—মানুষগুলা, রক্তমাংসের মানুষগুলাকে পাথরের আর লোহার চাকা তৈয়ারি করিয়া কেলিয়াছে। তাহার খাটে শুধু পেটের দায়ে, কিন্তু মানুষ শুধু ত তার পেট লইয়াই মানুষ নয়। তাহার সহজাত ভোগের, প্রবৃত্তির ক্ষুধা আছে, সে ক্ষুধাও পেটের ক্ষুধা অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়, সে বাহা অর্জন করে, সে তাহা শুধু পেটের জন্ত ব্যয় করিতে পারে না। সকল রকমেই সে চাপে পিষ্ট হইতেছে। নেশার ডুবিতেছে। পারিবারিক সুখ-সচ্ছন্দতা সম্বন্ধে জ্ঞান হারাইয়া কেলিতেছে, বহুতর অসম্মত অনাবশ্যক অভাব জুটাইতেছে, ফলে সামাজিক অত্যাচারে যত প্রকার পাপের সৃষ্টি হয়, সেই সব বীভৎস সর্বদাহী দেহ-মন-পোড়ান রোগে ভুগিতেছে ও পাপের অন্ধতমে ডুবিতেছে।

আমাদের মধ্যে অনেকের ইউরোপের এই ভীষণ ছবি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আগি দেখিয়াছি, বিলাতের যে কোন মিল-ক্যান্টরি হউক না কেন, তাহার সম্মুখে সন্ধ্যার সময়

দাড়াইয়া থাকিলে বাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সারা জীবনে তোলা যায় না। Industrialismএ যে ধনের বৃদ্ধি হয়, সে ধনীর ধনবৃদ্ধি, সাধারণ লোকের অবস্থা যেমন ছিল, তেমনি থাকে। ধনীর ধনবৃদ্ধি হইলেই ধনের অত্যাচার আরম্ভ হয়। এই প্রবল ধনীর অত্যাচারে ইউরোপ আজ নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছে, ধর্ম তাহাদের ধারণ করিতে পারে না। বখেটে অর্থ-বৃদ্ধি, কিন্তু টাকা মালেকের, মালেকান্ স্বত্বও মালেকের, এই সব মালেকের দল ধন-কুবের হইয়া উঠে, কিন্তু টাকা ছড়াইয়া পড়িতে পার না। সমাজের যে স্থানে অর্থশক্তি বদ্ধ হইয়া পড়ে, সেই স্থানেই শক্তি-সম্পন্ন হয়; কিন্তু অন্তান্ত স্থানে অবসাদ, অন্ধকার! শক্তির ধর্মই বিকিরণ সম্প্রসারণ, তবেই শক্তির শক্তিশ্র ও অস্তিত্ব বজায় থাকে, শক্তি বজায় না থাকিলে সব কলই বিকল হইয়া পড়ে। ইউরোপের এই কলকারখানার কল, শ্রম ব্যর্থ হইয়া আকাশ পানে নিরর্থক চাহিয়া আছে এবং যে সব শ্রমজীবীদের রক্ত-মাংস দিয়া এত অর্থ অর্জিত ও সঞ্চিত হইয়াছে, সে অর্থও সার্থক হয় নাই। ইহারই ফল Strik Combine Socialism! খৃষ্টান ইউরোপ গত তিনশত বৎসরের Industrialismকে বরণ করিয়া খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করিয়াছে। মানুষকে মানুষ ও দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে এবং শুধু অর্থের পন্থাতে ধাবিত হইয়া নিজের জীবনকে পিষিয়া মারিতেছে। আমরাও কি এই Industrialismকে বরণ করিয়া আমাদের জীবনকে অমানি করিয়া সকল রকমে ব্যর্থ করিয়া দিব?

জীবন এক অখণ্ড সত্য। ব্যক্তি ও সমষ্টি তাহার এক স্বাভাবিক জীবন্ত প্রকাশ, জীবনকে খণ্ড করিয়া দেখাই মন্ত ভুল। পঞ্চপ্রদীপ সাজাইয়া আরতি করিয়া পাঁচটি আলোকে এক করিয়া দেবতার কাছে তুলিয়া ধরাই অখণ্ড জীবনের পরিচয়। সমস্ত জীবনকে সেই ঈশ্বরের অনুমুখী করাই শ্রেষ্ঠ সত্য। ব্যক্তি ও সমাজ এক সঙ্গে মহাসত্য, উভয়েই পবিত্র। শুধু যে তাহারা উভয়ে মহাসত্য, তাহা নহে, আমাদের মনুষ্য-জীবনের ধর্ম ও মহাসত্য তাহাই। ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির নিজস্ব সংবিৎ, সমাজ জাতির আত্মস্ব সংবিৎ। সত্য কাহাকেও ত্যাগ করিয়া ফুটিয়া উঠে না। ব্যক্তিত্ব যদি সমাজকে বাদ দিয়া আপনাকে বড় করিয়া তোলে, তাহাতে ফল হয় অত্যাচার, আর সমাজ যদি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বাদ দিয়া আকাশে গৃহ নির্মাণ করিতে চায়, তবে সে চেষ্টাও ব্যর্থ। উভয়েই যখন সত্য, তখন উভয়কে এই সঙ্গে অখণ্ডভাবেই ধরিতে হইবে। ইউরোপে Industrialismএর ফলে তাহার সমাজ নষ্ট হইতে চলিয়াছে, আর ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ফুটিবার সুযোগ পায় নাই। তবে এই Industrialism ইউরোপে কতকটা সয়, কেন না, ইউরোপের স্বভাবধর্মের ভিতর দিয়াই ইহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইউরোপ আপনার চেষ্টায় আপনার স্বভাব-ধর্মের বলে সুস্থ ও সবল হইলে এই ব্যাধি দূর হইয়া যাইবে। এই যে ইউরোপে আজি সমরানল প্রজলিত,

ইহা কি অনল অন্ধরে এই ব্যাধি কি, দেখাইয়া দিতেছে না? ইউরোপ তাহার সমস্তার পূরণ আপনিই করিবে। আমি আগেই বলিয়াছি, এই সমরানল নির্বাপিত হইলে দেখিবে, ইউরোপ তাহার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

কিন্তু আমরা অকারণে ইউরোপের ব্যাধি আমাদের দেশে আনিয়া তাহাকে পোষণ করি কেন? সমস্তটাই যে আমরা আনিয়াছি, আমি এমন কথা বলি না, ইহার কতকটা যে ইংরাজের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে, সে কথা মানিয়া লইতেই হইবে। কিন্তু ইহার অনেকটা যে আমরা মোহাবিষ্ট হইয়া আপনারা আনিয়াছি, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। আমরা আহারে ব্যবহারে, আচারে বিচারে, ভাষায় ভাবে, ধর্মে কর্মে, সমস্ত জীবনক্ষেত্রে, প্রতিপদক্ষেপে বিলাতের অনুকরণ করিয়াছি। মন্দিরের বদলে সভা করিয়াছি, সদাশ্রমের বদলে হোটেল করিয়াছি, থিয়েটার করিয়া আনন্দের মূল্যে ভূভিক্ষে দান করি, লটারি করিয়া অনাথ আশ্রমের টাকা তুলি, দেশে যত রকমের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার সহজ উপায় ছিল, তাহার বদলে বিলাতি খেলা আমদানি করিয়াছি, জাতিসঙ্কর, বর্ণসঙ্কর, ভাবসঙ্কর, নিজেদের প্রাণ, রক্তকেও সঙ্কর করিয়া প্রাণে প্রাণে ফেরত হইতে চেষ্টা করিতেছি। অর্থোপার্জন যে আমাদের প্রকৃত জীবনযাপনের উপায় মাত্র, তাহা ভুলিয়া গিয়া বিলাতি Industrialism এর নকল করিয়া অর্থ উপার্জনের জন্তই জীবনযাপন করিবার চেষ্টা করিতেছি। সাবধান, এখনও সময় আছে, বক্ষিমচন্দ্র আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, সে বাণী তখন শুনি নাই, এখন শোনা ও বোকা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কমলাকান্তের দপ্তরে তিনি বলিয়াছেন :—

“আবার আমাদের দেশ ইংরেজী মূলক হইয়া এই বিষয়ে বড় গুণগোল ব্যাধিয়া উঠিয়াছে, ইংরেজী সভ্যতা ও ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মেট্রিয়ল প্রম্পেরিটির উপর অহুস্রাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইংরেজজাতি বাহ্যসম্পদ বড় ভালবাসেন—ইংরেজী সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন—তাহারা ৫ সিরা এদেশের বাহ্যসম্পদ-সাধনেই নিযুক্ত—আমরা তাহাই ভাল ভাবিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষে অশ্রান্ত দেবমূর্তি সকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে। সিদ্ধ হইতে ঋদ্ধপুত্র পর্যন্ত কেবল বাহ্যসম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে, দেখ, কত বাণিজ্য বাড়িতেছে, দেখ, কেমন রেলওয়েতে হিন্দুভূমি জাগনিবদ্ধ হইয়া উঠিল, দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ্ কেমন বস্ত্র! দেখিতেছি, কিন্তু কমলাকান্তের বিজ্ঞাপ্ত এই, তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের স্থখ বাড়িবে? • • • কি ইংরেজী, কি বাঙ্গলা সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, স্পিচ, ডিবেট, লেকচার, বাহা কিছু পড়ি বা শুনি, তাহাতে এই বাহ্যসম্পদ ভিন্ন আর কোন বিষয় কোন কথা দেখিতে পাই না। হর হর বম্ বম্! বাহ্যসম্প-

দের পূজা কর। হর হর বম্ বম্! টাকা রানির উপর টাকা ঢাল! টাকা ভক্তি, টাকা মুক্তি, টাকা মতি, টাকা গতি! টাকা ধর্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ! ও পথে যাইও না, দেশের টাকা কমিবে! ও পথে যাও, দেশের টাকা বাড়িবে! বম্ বম্ হর হর! টাকা বাড়িও, টাকা বাড়িও, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ অর্থপ্রসূতি, ও মন্দিরে প্রণাম কর! যাতে টাকা বাড়ে, এমন কর, শূণ্য হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে থাকুক, টাকার কনুয়ানিতে ভারতবর্ষ পুরিয়া যাউক! মন? মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই, টাকশালে আমাদের মন ভাঙে গড়ে। টাকাই বাহ্যসম্পদ! হর হর বম্ বম্! বাহ্যসম্পদের পূজা কর, এই পূজার তাম্র-শ্রদ্ধার্থী ইংরেজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত, এডাম স্মিথ পুরাণ এবং মিল তন্ত্র হইতে এই পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়। এই উৎসবে ইংরেজী সংবাদপত্র সকল ঢাক-ঢোল, বাঙ্গলা সংবাদপত্র কাঁসীদার, শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য এবং হৃদয় ইহাতে ছাগ-বলি। এই পূজার ফল ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক, তবে আইস, সবে মিলিয়া বাহ্যসম্পদের পূজা করি, আইস যশোগঙ্গার জলে ধোত করিয়া বঞ্চনাবিবদলে মিষ্টকথা-চন্দন মাখাইয়া এই মহাদেবের পূজা করি! বল হর হর বম্ বম্! বাজা ভাই ঢাক-ঢোল, ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড়! বাজা ভাই কাঁসীদার ট্যাং ট্যাং ট্যাং নাট্যাং নাট্যাং নাট্যাং। আনুন পুরোহিত মহাশয়! মন্ত্র বলুন! আমাদের এই বহুকালের স্বতটুকু লইয়া স্বধা স্বাহা বলিয়া আগুনে ঢালুন।”

এই Industrialism এর যজ্ঞে শুধু হৃদয় নহে, এই নবজাগরিত বাঙ্গালীজাতির বে আত্মা, তাহাই ছাগবলি, আমাদের মরিবার ইহাই প্রশস্ত পথ, আমাদের বাঁচিতে হইলে ইহাকে বর্জন করিতেই হইবে।

আমি আগেই বলিয়াছি যে, শুধু কৃষিকার্যে আমাদের জীবন ধারণ করা অসম্ভব। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে। কিন্তু সে উপায় বিলাতি Industrialism নহে। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যেরও একটা বিশিষ্ট রীতি আছে, পদ্ধতি আছে। আমাদের বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের মধ্যে আমাদের স্বভাবধর্ম সে রীতি, সে পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছে। মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলে আমাদের ইতিহাসের ইঙ্গিতকে মানিয়া চলিলে সে পদ্ধতি সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমরা দেখিতে পাই, আমাদের দেশে চিরকালই চাষা তাহার কৃষিকার্যের সঙ্গে সঙ্গে সে আপনার আবশ্যকীয় জিনিষপত্র অর্থাৎ খাদ্য ও পরিধানের বস্ত্র আপনিই তৈয়ারি করিয়া লইত। তাহার লজ্জানিবারণের জন্য ম্যানুফেকচারের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইত না। তাহা ছাড়াও চাষাদের ঘরে ঘরে অনেক কুটীর-শিল্পের চলন ছিল, সুতরাং এই কুটীর-শিল্প-পণ্য ও কৃষিকার্যের দ্বারা তাহার যথেষ্ট অর্থাগম হইত। কিন্তু বর্তমান

অবস্থার তাহার। এত ব্যাধি-পীড়িত যে, কৃষিকার্য ছাড়া আর কোন কাৰ্যই করিতে পারে না। কুটীরশিল্পজাত যে পণ্য, তাহা এক রকম উঠিয়া গিয়াছে, পূর্বে আমাদের বাঙ্গলায় ঢাকা, টাঙ্গাইল, ত্রিপুরা, ফরাসডাঙ্গা, সিমলা, শান্তিপুর ও আরও অনেক স্থানে কাপড় প্রস্তুত হইত। এখনও যে একেবারে হয় না, তাহা নহে। কিন্তু প্রায় মরিয়া আসিয়াছে। তুলার চাষ উঠিয়া গিয়াছে, আমাদের দেশে কি এখন এমন তুলা আফ্রিকা ও উৎপন্ন হয় না, চাষ করিলে কি সেটুকু ফসল ফলে না, বাহাতে আমাদের মোটা কাপড় লজ্জানিবারণের জন্য তৈয়ারি হইতে পারে? এখনও ত আমরা উপবীতের সূতা আমরা নিজেরাই তৈয়ারি করি, সে সূতা যেমন মোটা হয়, তেমনি সরুও ত হয়। যে ভাবে পূর্বে আমরা কাপড় ও সূতা তৈয়ারি করিতাম, চরকার আবার কেন তেমনি ভাবে সূতা কাটিয়া কাপড় তৈয়ারির ব্যবস্থা করি না? আমাদের গৃহস্থের ঘরে পূর্বে যেমন সংসারের কাজ ও ক্ষেতের কাজ সারিয়া আপনাদের লজ্জানিবারণের পরিধের বসন নিজেরাই তৈয়ারি করিয়া লইতাম, তেমনি করিয়া আবার করিতে হইবে। ম্যান্চেস্টারের মিহি বিলাতি ধুতি আর নানাপ্রকারের মাছ-পাড়, বাগান-পাড় বাহা ঢাকার তাঁতির হাতে বুনা হইত, তাহারই নকলে ছাপা কাপড় পরিতেছি ও পরাইতেছি। কাঁসা-পিতলের বাসন বাহা মুরশিদাবাদ, ঝাংড়া, ঢাকা, এমন কি, কলিকাতার কাঁসারিপাড়ারও তৈয়ারি হইত, তাহা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, তাহার বদলে বিলাতি এনামেলের বাসন আর নানাপ্রকার ফুল লতাপাতা কাটা ব্রাজিল কাচের বাসন আমাদের ঘরে ঢুকিয়াছে। এইরূপে আমাদের দেশে কাগজ তৈয়ারি হইত, হাতীর দাঁতের অনেক রকম জিনিষ তৈয়ারি হইত, সোনা-রূপার অনেক প্রকার অলঙ্কার আমরা তৈয়ারি করিতাম, দিল্লী রক্তের ছোপান কাপড়ের যে শিল্প-ব্যবসা আমাদের দেশে অনেক স্থানে ছিল, তাহা প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিহুকের শিল্প, ডাকের সাজ ও অনেক প্রকার শিল্পের কাৰ্য বাহা এক সময় আমাদের দেশের গর্ব ছিল, আজ তাহা তেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় যে, আমাদের চাষার। নিজেরদের আবশ্যকীয় দ্রব্য নিজেরাই প্রস্তুত করিত, কৃষিকার্য ত করিতই, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে কুটীর-শিল্পের অনেক শিল্প-পণ্য অবসর-সময়ে প্রস্তুত করিত। বাহার। কৃষিকার্য করিত না, তাহার। অকৃত্রিম শিল্প-পণ্য প্রস্তুত করিয়া আমাদের দেশে ও জগতের হাটে হাটে বিক্রয় করিত। অবশ্য তখন আজকালকার মত কলকারখানার যে প্রতিযোগিতা, তাহা ছিল না। কলকারখানার উপরে যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত, তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা যে পারিব না, এ কথা নিশ্চিত। তবে আমাদের লুপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যকে উদ্ধার করিতে হইলে ও তাহাদের উন্নতিসাধন করিতে হইলে, আমাদের কি কি উপায়

অবলম্বন করা উচিত? আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা বিলাতি Industrialism বর্জন করিব। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানের পণ্য-সমূহের সঙ্গে আমরা প্রতিযোগিতা করিয়া জয়লাভ করিতে পারিব না। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাব করিয়া আমাদের উপায় স্থির করিতে হইবে।

প্রথম কথা, আমাদের বিলাস-বর্জন। আমরা চাল বিগ্‌ডাইয়া ফেলিয়াছি, যাহা বিগ্‌ডাইয়াছে, তাহাকে ফিরাইতে হইবে। সকল প্রকার আক্রমণ হইতে নিজেকে সম্বলের সহিত রক্ষা করাই মানুষের ধর্ম, আমাদের জীবনের সেই একমাত্র মূল সূত্র। এই বিলাস, এই অযাচিত অবসাদ, জড়তা যাহা আমাদের নানাপ্রকার অস্বাস্থ্য ও ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে শুধু ভদ্রলোকের গৃহে নয়, কৃষকের কুটীরে পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, তাহাকে জীর্ণবস্ত্রের মত পরিহার করিতে হইবে। মোটা কাপড় যদি আমাদের কটিতে বাধা দেয়, সেই বেদনা আমাদের অকাতরে আপনার ও দেশের কল্যাণের জন্য সহ্য করিতে হইবে। এই বিলাস-বর্জনে যে সংযম আবশ্যিক, সেই সংযমের সাধন করিতে হইবে এবং আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ভদ্রলোকের ঘরে যাহা আরম্ভ হইবে, চাষার ঘরে তাহা অল্প দিনের মধ্যেই প্রচার হইয়া পড়িবে। এই সংযম আমাদের জীবনকে ধর্ম করিবার জন্য নয়, কাহারও ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করিবার জন্য নয়, আমাদের প্রত্যেকের প্রাণকে উদ্ধৃত্ত করাইয়া, আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের সংবিলম্বে আগরণের পথে আনিয়া, সমাজ ও সংবিলম্বে সহিত এক সূত্রে বাঁধিয়া দিবার জন্য। এই সংযমে ব্যক্তিও বাঁচিবে, সমাজও বাঁচিবে এবং আমাদের বাঁচিয়া উঠা পরিপূর্ণরূপে সার্থক হইবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক্ দিয়া দেখিতে হইলে এই সংযম ও বিলাস-বর্জনের ফলে আমরা অনেক অনাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের হাত হইতে রক্ষা পাইব। বাঙ্গলার জীবন সর্বদাই সহজ সরল, তাহা কখনও বিচিত্র বিলাসের মধ্যে জটিল হইয়া উঠিতে পারে নাই, যখনই জটিল হইয়াছে, তখনই তাহার শক্তি হ্রাস হইয়াছে। আজ যদি বিলাতি সভ্যতার ফলে আমাদের সরল জীবনকে জটিল হইয়া উঠিতে দিই, তবে নিশ্চয় জানিও যে, আমাদের উন্নতির পথে অনেক বাধা-বিঘ্ন আসিয়া জুটিবে। যে প্রতিযোগিতায় আমরা অসমর্থ, সেই প্রতিযোগিতায় আমাদের লিপ্ত হইতে হইবে এবং তাহাই আমাদের ধ্বংসের কারণ হইবে।

তার পরেই আমাদের দেখিতে হইবে যে, আমাদের দেশের কোথায় কোথায় কি কি পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইত, সেই সব ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সেই সব পণ্যশিল্পের আবার নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সকল চেষ্টায় যে ভিত্তি অর্থাৎ পল্লীগ্রামের ও সহরের স্বাস্থ্য, তাহাকে পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যের প্রধান কারণ বিত্তপানীয় জলের অভাব, যেমন

করিয়াই হউক, আমাদের সেই পানীর জলের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং আমাদের লুপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার ও কৃষিকার্যের উৎকর্ষ-সাধন করিতে হইলে আমাদের—

- (১) ইতিহাসের বাণীকে মনে রাখিতে হইবে।
 - (২) ইউরোপীয় Industrialismকে বর্জন করিতে হইবে।
 - (৩) বড় বড় সহরগুলো যে অজগর সর্পের মত পল্লীগ্রাম হইতে টানিয়া আনিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে, তাহা বন্ধ করিতে হইবে।
 - (৪) তাহা বন্ধ করিবার একমাত্র উপায় পল্লীগ্রামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।
 - (৫) পল্লীগ্রামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও সম্ভাবিত করিতে হইলে তাহার অস্বাস্থ্য দূর করিতে হইবে, কৃষক বাহাতে সুস্থ-শরীরে বারমাস পরিশ্রম করিতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে।
 - (৬) কৃষক তাহার কৃষিকার্য ছাড়া বাহাতে তাহার নিজের আবশ্যকীয় দ্রব্য-গুলি প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার উপায় দেখাইয়া দিতে হইবে।
 - (৭) তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্য ছাড়াও কৃষকেরা ঘরে ঘরে কি কি শিল্পপণ্য প্রস্তুত করিতে পারে, তাহাও দেখাইয়া দিতে হইবে।
 - (৮) আমাদের দেশে যে সব শিল্পপণ্য প্রস্তুত হইত, তাহার অনুসন্ধান করিয়া আবার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।
 - (৯) এই সব শিল্পপণ্য লইয়া ছোট ছোট অনেকগুলি কারবার দেশের সর্বত্রানে ছড়াইয়া দিতে হইবে।
 - (১০) যে সব পণ্যদ্রব্য আমাদের নিত্য আবশ্যকীয়, তাহা রাখিয়া ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানের অন্তঃসমুদয় পণ্যদ্রব্য বর্জন করিতে হইবে।
 - (১১) যে সব পণ্যদ্রব্য আমাদের দেশে সহজে প্রস্তুত হয়, সেই সম্বন্ধে আমাদের শিল্পীদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইবে। এই শিক্ষা সহজ উপায়ে দিতে হইবে।
 - (১২) এই সব ছোট ছোট ব্যবসায়িক ফলপ্রসূ করিতে হইলে, তাহাদের টাকা দিয়া সাহায্য করিতে হইবে, এবং সেইজন্য জেলার জেলার জেলাবাসীদের সাহায্য ও তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে।
- এই ত আমাদের দেশের কৃষিকার্যের উৎকর্ষসাধন ও লুপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের উপায়। কিন্তু এই উপায় অবলম্বন করিবার উপায় কি, অর্থাৎ এই উপায় অবলম্বন করিলে যে সব কার্য করিতে হইবে, তাহা আমরা করিব, না গবর্ণমেন্ট করিবে? ইহা করা উচিত, উহা করা উচিত বলিলেই ত বাজটা আপনা আপনি হইয়া উঠে না, এই কাজের ভার কে লইবে, সেই কথা পরে বলিতেছি।

আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা

যেমন সব বিষয়ে উন্নতিসাধন করিতে হইলে, আমাদের ইতিহাস ও স্বভাব-
ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার সম্বন্ধে বিচার করিতে
হইলেও সেই দৃষ্টি আবশ্যিক। শিক্ষার মূল কথাটি কি? মানুষের যে অন্তর্নিহিত
শক্তি, তাহার যে আত্মসংবিৎ, তাহার ঘুম ভাঙাইয়া দেওয়া, সিংহকে জাগাইয়া
দেওয়া, প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার ধর্মকে ফুটাইয়া তোলাই শিক্ষাদীক্ষার
কার্য। এই অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্ভূত করিতে পারিলে দীক্ষা সম্পূর্ণ হয়।
তখন প্রাণের পরতে পরতে আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে, ধর্ম তাহাকে আশ্রয়
করে, প্রেম তাহাকে আনিষ্টন করে এবং মানুষ প্রকৃতপক্ষে মানুষ হইয়া
উঠে। এই পরিপূর্ণ মানুষকে বিকাশ করাই শিক্ষার বিশিষ্ট কার্য। এই শিক্ষাই
বাঙ্গলার মাটির দান, তাহার প্রাণের বাণী। এই শিক্ষার কার্য পুরাকালে আমাদের
দেশে অনেক প্রকারে সাধিত হইত, গুরুর গৃহে, সংসারের সকল অনুরূপের মধ্যে,
পল্লীতে পল্লীতে বাজা-গানে, কবি-গানে, কথকতার মধ্যে, ভাগবত-পাঠে, রামায়ণ-গানে,
চণ্ডীর গানে, ধর্মঠাকুরের কপায়, হরিসতার সংকীর্ণনে, মেয়েদের ব্রত উদ্‌যাপনে—
এইরূপ নানা প্রকারে আমাদের দেশে সরল উপায়ে শিক্ষার বিস্তার হইত। দেশের
বড় বড় টোলে, বিক্রমপুরে, নবদ্বীপে, কাশীতে, সংস্কৃত সাহিত্যে, শাস্ত্র ও দর্শনের
সাহায্যে আমাদের দেশের সেই সরল শিক্ষাই আরও গভীরভাবে প্রচারিত হইত।
যে দেশের চাষারা চাষ করিতে করিতে—

“মন রে তুমি কৃষিকাজ জান না,
এমন মানব-জনম রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা।”

এই বলিয়া গান ধরে; যে দেশের মাঝিরা দাঁড় টানিতে টানিতে—

“মন মাঝি তোর বইঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না”

বলিয়া তান তোলে; যে দেশের মেয়েরা—

“তুলসী তুলসী নারায়ণ
তুমি তুলসী বৃন্দাবন।

তোমার তলে ঠেকাই মাথা
 তন তুলসী প্রাণের কথা ।
 তুলসী তোমায় করি নতি
 রেখ ধরম আমার পতি ।
 তোমার তলে দিলেম আলো
 পরকালে রেখো ভাল ।”

এই মন্ত্র বলিতে বলিতে তুলসীতলার সাক্ষ্যপ্রদীপ জালিয়া ভক্তিতরে প্রণাম করে,
 যে দেশে পণ্যব্যবসায়ী হাট হইতে ফিরিবার সময় খেয়া পার হইতে হইতে—

“দিন ত গেল সন্ধ্যা হ’ল
 হরি, পার কর আমারে”

বলিয়া গান গায়; যে দেশের বিবাহের অনুষ্ঠানে, গার্হস্থ্যধর্মের প্রথম সোপানে পদক্ষেপ
 করিতে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়—

“ও ঈশে একপদী ভব, সা মামনুত্রতা ভব”

ঈশ্বরলাভের নিমিত্ত প্রথম পদনিষ্ক্রেপ কর এবং আমার অনুত্রতা হও, যার সপ্তম
 পদক্ষেপে—

“ও সখ্যে সপ্তপদী ভব, সা মামনুত্রতা ভব ।”

আমার সহিত সখ্যবন্ধন কর ও আমার অনুত্রতা হও—

“ও সমঞ্জস্তু বিশ্বৈ দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নো ।

সন্মাতরিখা সন্মাতা সমুদেষ্টি দধাতু নো ॥”

বলিয়া গৃহকে, গার্হস্থ্য আশ্রমকে, গৃহধর্মকে সকল জীবনের সঙ্গে, সকল কর্মের সঙ্গে
 ভগবান্কে গাঁথিয়া লয়; যে দেশের তর্পণের শেষ কথা—

“আব্রহ্মস্তুত্বপর্ষ্যস্তুং জগৎ তৃপ্যতু”

যে দেশে সকল কর্মে ও সকল কর্মশেষে প্রাণ-মন খুলিয়া “বিষ্ণু-প্রীতি-কামনারে”
 বলিয়া অঞ্জলি দান করিতে হয়; যে দেশের মাটিতে বিখরাজ্যের, প্রাণরাজ্যের সকল
 রূপ, সকল রস, সকল সৌন্দর্য্য সন্তোষ করিয়া, সকল জ্ঞান-সমুদ্র শোষণ করিয়াও
 ভগবৎপ্রেম ও করুণার নিজেকে ডুবাইয়া, মহাপুরুষ ভোগের বীরস্বৈ, ত্যাগের বীরস্বৈ
 তারত্বরে বলিয়া উঠেন—

“ন ধনং ন জনং ন স্তন্দরীং কবিতাম্ বা জগদীশ কাময়ে ।

নম জন্মানি জন্মনীধরে ভবতাদভক্তিরহৈতুকী স্বয়ি ॥”

সে দেশের শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শ কি এবং কি রকম সহজ সরলভাবে সেই শিক্ষার বিস্তার হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না।

কিন্তু আমাদের সকল আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শও হীন হইয়া পড়িয়াছে এবং আমরা সেই একই কারণে সহজ সরল উপায় ছাড়িয়া দিয়া, শিক্ষা-দীক্ষাকে জটিল ও দুর্লভ করিয়া তুলিয়াছি। এখন আমাদের দেশে বাহাকে উচ্চশিক্ষা বলে, তাহা বিস্তার করিবার জন্য ইউনিভারসিটির একটা বিরাট স্তম্ভ খাড়া করিয়াছি। রামমোহন যে ইংরাজী ভাষার শিক্ষা ও যে ইংরাজী ভাষার সাহায্যে দেশের শিক্ষাবিস্তার করিবার পন্থা দেখাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা হয় ত ঠিক সেই সময়ে আবশ্যকীয় ছিল। কিন্তু এখন আমার মনে হয়, ইংরাজী শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষাবিস্তার করার অনেক দোষ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। আমাদের হাব-ভাব, আচার-ব্যবহার সবই এত ইংরাজী-নবীস হইয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, শিক্ষিত বাঙ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের কোন যোগ নাই। এই শিক্ষার ফলে আমরা বস্তুর সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়া তাহার প্রাণের কাছে গিয়া তাহাকে ছুঁইতে পারি নাই, কেবল উপর হইতেই দেখিয়াছি, আর কতকগুলো ইংরাজী শব্দ মুখস্থ করিয়াছি। আমরা মানুষ হইয়া উঠি নাই, একটু বেনী চালাক হইয়াছি মাত্র। বক্তৃতার সময় সেই মুখস্থ করা কথাগুলো তোতার মত আওড়াইয়া যাই এবং সেই কথার বুড়ি বোঝাই করিয়া মাথার করিয়া বেড়াই। কিন্তু কথা এক জিনিষ, আর প্রকৃত জ্ঞান আর এক জিনিষ—এই কথাটি আমাদের সর্বদাই মনে রাখা উচিত। একটু বিচার করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে, বাহারা ইংরাজী শিক্ষা পায় নাই, বাহাদের তোমরা অশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা কর, তাহাদের দয়া-মায়্যা আছে, ধর্ম-আছে, তাহারা মানুষের হৃৎক বোঝে, অতিথিসেবা করে, দেবতাকে ভক্তি করে। আমাদের যে স্বভাবজাত শিক্ষার মানুষকে মাটির মানুষ করে, সে শিক্ষা তাহাদের আছে। আমার মনে হয়, আমাদের এই নব-জাগরিত জাতিকে প্রকৃত জ্ঞানের দিকে চালনা করিতে হইলে, আমাদের উচ্চশিক্ষা আমাদেরই ভাষায় দিতে হইবে। নিজের ভাষা শিখিতে হইলে নিজের জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে হইবে এবং আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার যে সরল সত্যবাণী, তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই সব দিকে চোখ রাখিয়া যে উচ্চশিক্ষা, তাহাই প্রকৃত পক্ষে উচ্চ। আমরা এখন যে উচ্চশিক্ষা পাই, তাহা একটা ধার করা জিনিষ, তাহার সঙ্গে সেই কারণে আমাদের দেশের স্বভাবধর্মের সঙ্গে যোগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

অধু তাহাই নয়, এই যে একটা অলীক শিক্ষা আমাদের দেশে বিস্তারিত হইতেছে,



ইহার জন্য এত আড়ম্বর কেন, এত রকম আড়ম্বরের মধ্যে যে শিক্ষার প্রাণটুকু মরিয়া যায়। দেশে টাকা নাই—ছেলেরা বই কিনিতে পারে না, বই কিনিবার জন্য ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তবু যেখানে একখানা বই হইলে চলে, সেখানে পাঁচখানা বইয়ের ব্যবস্থা। এই ছেলেদের শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে কত রকম সরল উপায় ছিল, এখন বৃহৎ প্রাণাধ না হইলে শিক্ষা হইতে পারে না। আমরাই শিশুকালে বাগির কাগজে অঙ্ক কসিতাম, কলেজে পর্য্যন্ত সেই কাগজেই আমাদের কাষ চলিত। এখন স্কুলের নিম্ন-শ্রেণী হইতে কল-করা ভাল কাগজের বাধান খাতা না হইলে নাকি লেখা-পড়া হয় না! যে বিলাসকে বর্জন করাই আমাদের বাঁচিবার একমাত্র উপায়, এই উচ্চশিক্ষার প্রণালী ও ব্যবস্থা সেই বিলাসকেই বাড়াইয়া দিতেছে। বড় বড় কলেজের বোর্ডিংএর জন্য খুব বড় বড় বাড়ীর আবশ্যক। এই সব দ্বিতল বাড়ীতে থাকা বাহাদের অভ্যাগ হইতেছে, তাহারা কি আর তাহাদের নিজ নিজ পল্লীগ্রামের কুটীরে গিয়া থাকিতে পারিবে? এই যে শিক্ষাবিস্তারের উপায়, ইহা ত আমাদের দেশের উপায় নহ, তবে কেন আমরা ইহার বিপক্ষে আন্দোলন করি না! লাভ ও এইটুকু মাত্র যে, বিলাতের ক্যাক্টোরিতে যেমন নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়, আমাদের এই ইউনাইভারসিটি-ক্যাক্টোরিতে বিএ, এমএ, পি এচ্ ডি, পি আর এস, এইরূপ কতকগুলি জীব তৈয়ারি হয়, প্রকৃত মানুষ তৈয়ারি হয় না। শিক্ষা-দীক্ষার যে মূল উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াছি, সে উদ্দেশ্যের অন্তরায় হয়। এই শিক্ষাতে আমাদের ছাত্রদিগের আত্মসংবিলম্বিত জননের তরে বিসর্জন দিবার পথ করিয়া দেয়। এই উচ্চশিক্ষার শিক্ষিত বাঙ্গালী আত্মমত্তরী, অহঙ্কারী, সে আত্মজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, জ্ঞানের রাজ্যে দাসখত লিখিয়া দেয় আর বিজ্ঞানের বড়াই করে। তাই বলিতে-ছিলাম, ইহার জন্য এত আড়ম্বর কেন? এত ধনব্যয় কেন?

বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে বাঙ্গলা পড়া হইত না, এখন হয়, এই লইয়া সময় সময় আমরা অহঙ্কার করি। বাঙ্গলা ভাষাকে বাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে সমস্ত বাঙ্গালীরই কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকা উচিত। শুনিয়াছি, এই চেষ্টার মূলে স্তার আন্তোনিও মুখোপাধ্যায়। তিনি যে এ বিষয়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, সন্দেহ নাই, এবং সেই জন্য তিনি দেশের ও দেশের ধন্যবাদভাজন। কিন্তু আমাদের ভাষাকে কি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করিয়াছে? আমি শুনিয়াছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষার জন্য বাঙ্গলা কবিতা পড়ান হয় না, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে বাঙ্গলা কবিতার কোন বই পাঠ্য-পুস্তক হইতে পারে না। আমি শুনিয়াছি, এই নিয়মের উদ্দেশ্য—শুধু বাঙ্গলা লিখিবার রীতি শিখান হইবে, আর কিছু হইবে না। এ কথা শুনিয়া আমি অবাক হইয়াছিলাম। বাঙ্গলা

ভাষার যে অশেষ-সম্পদ, তাহাতে কি বাঙ্গলা ছাত্রের কোন আবশ্যক নাই? বাঙ্গলা ভাষা কি শুধু একটা রীতির বিষয়? বাঙ্গলা ভাষার যে অনন্ত সৌন্দর্য আছে, বাঙ্গলা সাহিত্যের যে একটা অতল প্রাণ আছে, সে কথা ভুলিয়া গিয়া কি আমাদের শিক্ষা-প্রণালী নির্দ্ধারিত করিতে হইবে? আমার বাঙ্গলা ভাষা যে রাজরাণী, আপনার গৌরবে সে যে গরবিনী। এই যে তোমরা বল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা প্রবেশ করিয়াছে, মনে রাখিয়া, তাহার যে নিজস্ব গৌরব, সে গৌরবে তাহাকে প্রবেশ করিতে দাও নাই, সামান্য দাসীর মত তোমাদের এই কারখানার মধ্যে একটা কোণায় তাহাকে বসিবার একটু ঠাই দিয়াছ মাত্র।

আমি আজ বাঙ্গলার মহাসভায় সাহস করিয়া বলিতেছি যে, এই শিক্ষা-দীক্ষার প্রণালী সমূলে পরিবর্তিত না করিলে, ইহার মুখ ফিরাইয়া না দিতে পারিলে, ইহাকে আমাদের দেশের যে স্বভাবধর্ম, আমাদের দেশের যে সত্যতা, সাধনা, তাহার সহিত যোগ করিয়া না দিতে পারিলে ও এই শিক্ষাকে সাধারণের সহজসাধ্য করিয়া না তুলিতে পারিলে, আমাদের ঘোর বিপদের কথা।

তার পর, বাহাকে আমরা নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা বলি, তাহার কথা। কেহ কেহ বলেন, ছোর করিয়া আমাদের দেশের সকলকেই ক, খ আর এ, বি, সি, ডি, পড়াইতে হইবে, না করিলে তাহারা মাহুষ হইবে না। এই কথা কি কেহ তলাইয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন? না অস্ত্রাস্ত্র দেশে আছে বলিয়াই আমাদের দেশে চালাইতে হইবে? আমাদের দেশের চাষারা যে মাহুষ, আমাদের চেয়ে তাহাদের মাহুষ্য কোন রকমেই যে কম নয়। আমাদের ইউনিভার্সিটি যেমন একটা বৃহৎ, প্রকাণ্ড, অশেষ ব্যয়সাধ্য বিরাট কলের কারখানা হইয়া উঠিয়াছে, নিম্ন-শিক্ষার জন্যও কি ঠিক ঐরূপ একটি কারখানা তৈয়ারি করিতে হইবে? ইহার উপরে কি আবার লক্ষঃলক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে? আমি স্বীকার করি যে, আমাদের চাষাদের লেখা-পড়া শিখান উচিত; কিন্তু মোহাই তোমাদের, তাহাদের আবার কারখানার ভিতরে জুড়িয়া দিও না। আমাদের চাষারা সহজ জানে ও অনেক দিনকার সাধনার বলে সত্য। তাহাদের ক, খ, কি এ বি, সি, শিখান এমন একটা কঠিন ব্যাখ্যার নহে। আমরা ইচ্ছা করিলে তাহা অতি সহজেই সম্পন্ন করিতে পারি। তাহার জন্য অনেকগুলো স্কুলের দরকার নাই, অনেকগুলো মাষ্টারের দরকার হইবে না, অনেকগুলো বাঙ্গলা ইংরাজী কেতাবের দরকার হইবে না, কলকরা কাগজের বীধান খাতারও আবশ্যক হইবে না। ইংরাজী শিক্ষায় তাহাদিগকে খুব পণ্ডিত করিয়া তোলারও আবশ্যক নাই। আমাদের গ্রামে গ্রামে যে সকল পুরাতন প্রথা ছিল, সেই সব পুরাতন জিনিষগুলো আবার চালাইয়া দেও। তাহার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ছই একটা মোড়লের বাড়ীতে ছই একটা

নৈশবিজ্ঞানর স্থাপন কর। তাহা হইলেই আমাদের চাষাদের যে শিক্ষা আবশ্যক, সেই শিক্ষার সহজেই বিস্তার হইবে। বাঙ্গলার মাটিতে, বাঙ্গলার ভাষায় যে শিক্ষা সহজে দেওয়া যায় এবং যে শিক্ষা বাঙ্গালী তাহার স্বভাবগুণে সহজেই আয়ত্ত করে, সেই শিক্ষাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

ফল কথা, উচ্চশিক্ষাই হউক, কি নিম্ন-শিক্ষাই হউক, সকল রকমের শিক্ষাকেই বাঙ্গালী জাতির যে শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শ, তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আগেই বলিয়াছি, বাঙ্গালীর শিক্ষার আদর্শ কি—সজ্জপে বলিতে গেলে শিক্ষাকে শুধু কথার বাপার না করিয়া তাহাকে বার্থ করিয়া তুলিতে হইবে। ধার-করা বিজ্ঞানের অহঙ্কার হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে। প্রকৃত বিজ্ঞান চর্চার তাহাকে নিযুক্ত করিতে হইবে। তাহাকে সর্বতোভাবে অন্তর্মুখী করিতে হইবে এবং সর্ববিষয়ে আমাদের জাতির স্বভাবধর্মের পূর্ণবিকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেই শিক্ষাকে সার্বভৌমিক করিয়া তুলিতে হইবে।

এই ত উপায়। কিন্তু ইহা সাধিত হইবে কিরূপে? এ কার্য আমাদেরই করিতে হইবে কি গবর্ণমেন্টের করিতে হইবে, সে কথা পরে বলিতেছি।

কাষের তালিকা ত শেষ হইল, এখন কি উপায়ে এই সব কাজ হাতে করিয়া করিতে হইবে, তাহারই বিচার করিব। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলিয়া রাখি, একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, কেন এখন পর্যন্ত কন্দক্ষেত্রে আমাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। আমাদের দেশের জনসাধারণকে লইয়া আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হই নাই, তাই আমাদের দেশ আমাদের কোন কাষই আপনায় বলিয়া গ্রহণ করে নাই। আমাদের উচ্চশিক্ষার অভিমান, অর্থের অভিমান, আমাদের বর্ণের অভিমান, আমাদের ধর্মের অভিমান, আমাদের এমনি অন্ধ করিয়া দিয়াছে যে, বাহাদের লইয়া দেশের রক্ত, মাংস, প্রাণ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদেরই বাদ দিয়া আমরা দেশের কার্যকে সার্থক করিতে চাই। বাহার বাহা নাই, সে তাহারই বড়াই করে। বাহার প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই, সে শিক্ষার বড়াই করিবে না ত কে করিবে? আমরা—দেশের বাবুরা—প্রকৃত পক্ষে অশিক্ষিত, তাই আমাদের এত শিক্ষার অভিমান। আমরা গেরে অশিক্ষিত লোকেদের সঙ্গে মিশিব কি করিয়া? তাই আমরা তাহাদের সঙ্গে পৃথক্ হইয়া কাষ করিতে যাই। আমাদের মধ্যে বাহারা প্রকৃতপক্ষে ধনী, তাহারা ধনগর্বে এতই ক্ষীণ হইয়া উঠিয়াছে যে, সাধারণ লোকের সঙ্গে আদান-প্রদান করিতে নিজেদের অপমানিত বোধ করে। আবার আর এক দল আছে, বাহাদের টাকা নাই অথচ টাকার অভিমান আছে। তাহারা বহুদিনের বসতবাটা ও জীর গহনা বন্ধক দিয়া কত্তার বিবাহ দেয় এবং নিতান্ত নিলাজের মত সেই বিবাহে জাঁকজমক করে।

তাহারা প্রাণে প্রাণে জানে যে, তাহারা নিতান্তই গরীব ; কিন্তু তাহারা ত আর লাজল লইয়া চাষ করে না, তাহারা যে মাসান্তে মাঠিরানার টাকা লইয়া পকেট বন্ধন করাইতে করাইতে বাড়ী ফেরে। সহরে যিনি বাবু, পল্লীগ্রামে তাঁর একটু সম্পত্তি আছে ; বাহার আর বার্ষিক সাড়ে তিন টাকা—সেইখানে তিনি ভুঁইয়া। যিনি সহরে বাবু ও পল্লীগ্রামে ভুঁইয়া, তিনি যদি চাষকে ডাকিয়া এক সঙ্গে কাষ করেন, তাহার মান থাকে কি করিয়া ? তাই বলিতেছিলাম, টাকার অভিমান আমাদেরকে অন্ধ করিয়াছে। এই যে ‘শিক্ষিত’ আর ‘অশিক্ষিত’, এই যে ‘ধনী’ অথবা টাকা না থাকিয়াও টাকার ‘অভিমानी’ আর বাস্তবিকই বারী গরীব, ইহাদের মধ্যে নূতন করিয়া একটা বর্ণভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের দেশে এখন শাস্ত্রে বাহাকে বর্ণাশ্রম বলে, তাহার চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না,—তাই আমাদের বর্ণাশ্রম-ধর্মের এত বড়াই। এখন ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের আলোচনা কমই করে, কেরানীগিরি করে, ওকালতি করে, ব্যারিষ্টারি করে, জজও হয়, সকল প্রকার ব্যবসাবাদিজ্য করে, জুতার কোকান দেয় ও ভাঁটখানার মালিক হয়, ‘অশ্বিন ছাদে’ বলিয়া শ্রাভের মন্ত্র পড়ায়। মন্ত্র পড়াইবার সময় কার্তিকে মাসি বলিতে শ্রীমান্ কার্তিকচন্দ্রের মাতৃ-সমা বোঝে, বিসর্গ অমুখ্যারে পূর্ণ ভূরি ভূরি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াও শাস্ত্রের বিন্দুবিসর্গ জানে না,—এ হেন যে ব্রাহ্মণ, ইহার বর্ণাশ্রম-ধর্মের বড়াই কেন ? এখন বৈষ্ণব-কার্যসূত্র তাহাদের নিজ নিজ কার্যের যে গণ্ডী, তাহার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, ব্রাহ্মণেরা যে সব কার্য করে, অগুরু মন্ত্র পড়ান ছাড়া, তাহারাও সেই সব কাষই করে। তবে বৈষ্ণব ও কার্যসূত্র এই বর্ণাশ্রম-ধর্মের বড়াই কেন ? আমি ত ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, কার্যসূত্র মধ্যে কার্যগত কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না। এই যে ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম, তাহা বাংলার কোথাও খুঁজিয়া পাই না, তাই এই বর্ণাশ্রম-ধর্মের তাৎপর্য বুঝিতে পারি না। আমি এ ক্ষেত্রে কোন সামাজিক প্রশ্ন তুলিতে চাই না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম ভাল কি মন্দ, কি বর্ণাশ্রম আবার নূতন করিয়া, আমাদের বর্তমান স্বাভাবিক অবস্থার অনুযায়ী করিয়া গঠিত করা উচিত কি না, তার কোন কথাই এ ক্ষেত্রে উঠিতে পারে না। আমি শুধু এই কথাই বলিতে চাই, আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়, গড়িয়া তুল। কিন্তু তাহার আগে বাহা মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে, সেই প্রাণ-হীন জিনিষটাকে টানাটানি করিয়া, মিথ্যা অহঙ্কার ও অভিমানের সৃষ্টি কর কেন ? এখন যে আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত কার্যক্ষেত্র, এই যে দেশের কাষ, তাহা হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া মিলিয়া মিশিয়া করিতে হইবে—ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, কার্যসূত্র, শূদ্র, চণ্ডাল, সব একত্র হইয়া না করিলে কোন কার্যই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। যে বর্ণাশ্রম-ধর্মের অভিমান এই কার্যের অন্তরায়, আমি সেই অভিমানের কথাই বলিতেছিলাম। বাহারা বর্তমান

বাঙ্গলার চারি কোটি বাট লক্ষের মধ্যে চারি কোটি, বাহার দেশের সার বস্তু, বাহার মাথার ঘাম পারে ফেলিয়া মাটী কর্ষণ করিয়া আমাদের জন্ত শস্ত উৎপাদন করে, বাহার বোর দারিদ্রের মধ্যেও মরিতে মরিতে বাঙ্গলার নিজের সভ্যতা ও সাধনাকে সজাগ রাখিয়াছে, বাহার সর্বপ্রকার সেবার নিরত থাকিয়া আজিও বাঙ্গালীর ধর্মকে অটুট অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, বাহার আজিও শুদ্ধচিত্তে সরল প্রাণে মর্মে-মর্মে বাঙ্গলার মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়, মসজিদে মসজিদে প্রার্থনা করে, বাহাদের জন্ত বাঙ্গালী আজিও বাঙ্গালী, বাহার বাঙ্গলার মাটী ও বাঙ্গলার জলের সঙ্গে এক হইয়া, বাঙ্গালী জাতির জাতিত্বকে জানে কি অজ্ঞানে সাধিকের অধির মত জাগাইয়া জাগাইয়া রাখিয়াছে, বাহাদের আমরা বিলাতী শিকার মোহে, আইন-আদালতের প্রভাবে, জমিদারের খাজনা জাব্যস্তাবে কি অগ্রাধ করিয়া বাড়াইবার জন্ত, শত প্রলোভন দেখাইয়া, শত অত্যাচার করিয়াও একেবারে নষ্ট করিতে পারি নাই, বাহার বাস্তবিকই বাঙ্গলা দেশের একাধারে রক্ত মাংস প্রাণ, তাহার বড় কি আমরা বড়? কোন্ সাহসে, কিসের অহঙ্কারে তাহাদের জল স্পর্শ করি না, কাছে আসিলে ঘৃণিত কুকুরের মত তাড়াইয়া দিই? এত অহঙ্কার কিসের? এত দাস্তিকতা কেন? আমরা, বাহার হিন্দু হিন্দু বলিয়া চীৎকার করি, আক্ষালন করি, সেই আমরা যে দিনে দিনে হিন্দুধর্মের যে মর্মান্বন, সেখানে ছুরিকা আঘাত করিতেছি! এমনই আমাদের মোহ, আমরা কি তাহা দেখিয়াও দেখিব না—বুঝিয়াও বুঝিব না? বর্ণাশ্রমিয়ান লইয়া এমনই করিয়া মরণের পথে তাসিয়া বাইব? ঐ যে মা ডাকিতেছেন—সাবধান! সাবধান! ওঠ! জাগ! মিথ্যা অভিমানকে বর্জন কর! ঐ যে বাঙ্গলার কৃষক সমস্ত দিন বাঙ্গলার মাঠে মাঠে আপনার কাষ ও আমাদের কাষ শেষ করিয়া দিবা অবসানে ঘর্মাক্তকলেবরে বাঙ্গলার কুটীরে কুটীরে, বাঙ্গলার গান গাইতে গাইতে ফিরিতেছে, উহার মুসলমান হউক, শূদ্র হউক, চণ্ডাল হউক, উহার প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! অহঙ্কারী! মাথা নোরাও, মাথা নোরাও, তোমার সম্মুখে যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! অবিশ্বাসী! তোমার শুক প্রাণে আবার বিশ্বাস জাগাও, জাগাও! তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! আততায়ী! তোমার হাতের ছুরি ফেলিয়া দাও—জন্মের মত ফেলিয়া দাও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! ডাক! ডাক! সবাইকে ডাক! প্রাণের ডাক শুনিলে কেহ কি না আসিয়া থাকিতে পারে? ওঠ! জাগ! ডাক! আপনার কল্যাণকে জাগাও! বল, এস তাই, তুমি মুসলমান হও, খৃষ্টিয়ান হও, শূদ্র হও, চণ্ডাল হও, তোমাকে আলিঙ্গন করি, এ যে আমার কাষ—এ যে তোমার কাষ, এ যে মায়ের কাষ! একবার তবে ডাকার মত ডাক, দেখিবে সকলেই আসিবে, দেখিবে সকল কার্যই সার্থক হইবে! আমি আবার বলি, উঠ, জাগ, ডাক। আপনার কল্যাণকে জাগাও!

উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—

—নাশ্তঃ পস্থা বিস্ততে অরনার !

এক সঙ্গে কাষ করিতে হইবে, কিন্তু কি প্রণালীতে কাষ করিব ? আমাদের সরল জীবন অনেকটা জটিল হইয়া পড়িয়াছে । তাই নিয়ম চাই—প্রণালী চাই । আমাদের কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে সমস্ত বাঙলা দেশটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া লইতে হইবে, সে ভাগ নূতন করিয়া করিতে হইবে না । গবর্ণমেন্ট আমাদের দেশটাকে জেলায় জেলায় ভাগ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের কাষ চলিবে । এই প্রত্যেক জেলায় একই রকম নিয়ম, একই রকম প্রণালীতে কাষ করিতে হইবে । আমি একটি জেলা আমার মনে রাখিয়া এই কার্য্য-প্রণালীর কথা বিচার করিতেছি । আপনারা মনে রাখিবেন, এই একই কার্য্যপ্রণালী সমস্ত জেলাতেই চালাইতে হইবে । প্রত্যেক জেলাতেই অনেকগুলি গ্রাম আছে । জনসংখ্যা ও কার্য্যের সুবিধা অনুসারে, কতকগুলি গ্রাম লইয়া, এক একটি পল্লী বা গ্রাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । এই সব গ্রামের ১৬ বছরের যুবক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্কীর্ণেবে সকলেই এই সমাজভুক্ত হইবে । তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে । তাহারা সকলে মিলিয়া পাঁচজন পঞ্চায়েত নির্বাচন করিবে । এই পঞ্চায়েতের উপর ঐ সকল গ্রামসমূহের সকল কার্য্য—সকল শুভাশুভের ভার অর্পিত হইবে । তাহারা গ্রামের পথ-ঘাটের ব্যবস্থা করিবেন । গ্রামের স্বাস্থ্য কি করিয়া রক্ষা করা যায়, তাহার উপায় নির্ধারণ করিয়া, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবেন । তাহারা এই সকল গ্রামে আমাদের দেশের যে সকল যাত্রা, গান ইত্যাদির কথা বলিয়াছি, সেই সব আবার চালাইতে চেষ্টা করিবেন । যে নৈশবিজ্ঞান্যের কথা বলিয়াছি, তাহা তাহারাই স্থাপন করিবেন । চাষাকে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে, যে সকল শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, তাহার ব্যবস্থা করিবেন । তাহারাই আবশ্যকীয় নূতন পুষ্করিণী খনন করাইবেন ও পুরাতন পুষ্করিণী সংস্কার করাইবেন । সমস্ত গ্রামগুলি যাহাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহা দেখিবেন । চাষারা যাহাতে বারমাস পরিশ্রম করিয়া নিজেদের আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিতে পারে ও অন্তান্ত কি কি শিল্প-পণ্যও প্রস্তুত করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া, এই সব কার্য্যের উপায় করিয়া দিবেন । এই পল্লী-সমাজ প্রতি পল্লীতে একটি সাধারণ ধান্মাগার স্থাপন করিবেন । প্রত্যেক গৃহস্থ চাষামায়েই সেই ধান্মাগারে তাহাদের ক্ষেতের ফসল হইতে কিছু কিছু করিয়া ধান্ম দিবে । পল্লী-সমাজ সেই ধান্মাগার যাহাতে সুরক্ষিত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন । যখন অজন্মা, দুর্ভিক্ষ বা বীজের অভাব থাকে, তখন

পল্লীসমাজ, চাবাদের প্রয়োজনমত হিসাব করিয়া ধার দিবেন। পরে আবার কসল হইলে তাহারা সেই পরিমাণ ধান্ত ধানাগারে পূরণ করিয়া দিবে।

এই সব গ্রামবাসীদের মধ্যে কোন কলহ অথবা ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মকদ্দমা উপস্থিত হইলে, উক্ত পঞ্চায়েতই তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন এবং বড় বড় ফৌজদারী ও দেওয়ানী মকদ্দমা তদন্ত করিয়া সবডিভিসন ও জেলার আদালতে পাঠাইয়া দিবেন। তাহাদের সেই তদন্ত-বিবরণই সব আদালতে নালিশ ও আর্জী বলিয়া গৃহীত হইবে। ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে অন্য নালিশ বা আর্জী গৃহীত হইবে না।

এইরূপে প্রত্যেক জেলার জনসংখ্যা অনুসারে ২০টি ২৫টি পল্লীসমাজ থাকিবে, এই প্রত্যেক পল্লীসমাজে পাঁচ জন পঞ্চায়েত ব্যতীত, জেলা-সমাজের অন্ত জনসংখ্যা অনুসারে পাঁচ হইতে পঁচিশটি পর্যন্ত সভ্য নির্বাচন করিবেন। এই পল্লীসমাজের নির্বাচিত সভ্য লইয়া জেলা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক পল্লীসমাজ এই জেলা-সমাজের অধীনে সকল কার্য নির্বাহ করিবে। এই জেলা-সমাজ--

- (১) সেই জেলা-ভুক্ত সকল পল্লীসমাজের কার্য তদন্ত করিবে।
- (২) সকল পল্লীসমাজের শিক্ষা-দীক্ষার কার্য বাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তাহার উপায় করিয়া দিবে ও জেলার বে রাজধানী, তাহার শিক্ষা-দীক্ষার ভার লইবে।
- (৩) কৃষিকার্য ও কূটীর-শিল্পের বাহাতে উন্নতি ও প্রসার হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া কার্যে পরিণত করিবে।
- (৪) সকল পল্লীসমাজের অধীনে সেই সব গ্রাম তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তদন্ত করিবে ও সকল পল্লীসমাজ সেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সংপথে চালাইয়া লইবে। ইহা ব্যতীত জেলার বে মহর বা রাজধানী, তাহারও স্বাস্থ্যরক্ষার ভার জেলা-সমিতির অধীনে থাকিবে।
- (৫) জেলার মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতে পারে, তাহা নির্ধারণ করিয়া ও উপযুক্ত লোক নির্বাচন করিয়া ছোট-খাট ব্যবসা চালাইয়া দিবে।
- (৬) গ্রামে গ্রামে আবস্তকীয় চৌকীদার নিযুক্ত করিবে। এই চৌকীদারগণ পল্লীসমাজের পঞ্চায়েতের অধীনে ও জেলা-সমাজের তত্ত্বাবধানে কার্য করিবে।
- (৭) জেলার সাধারণ পুলিশের ভার জেলা-সমাজের হাতেই থাকিবে।
- (৮) সেই জেলার বে সব আইনের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, তাহা জেলা-সমাজের হাতে থাকিবে না। তাহারা সম্পূর্ণরূপে হাইকোর্টের অধীনে থাকিবে।
- (৯) এই জেলা-সমাজের সভ্যসংখ্যা জেলার জনসংখ্যা অনুসারে দুই শত হইতে পাঁচ শত পর্যন্ত হইবে।
- (১০) এই জেলা-সমাজ একজন সভাপতি নির্বাচন করিবে, এবং প্রত্যেক

বিষয়ের জ্ঞাত ভিন্ন সভা গঠিত করিবে। কিন্তু প্রত্যেক সভাই এই জেলা-সমিতির অধীনে কার্য্য করিবে।

(১১) জেলার কৃষিকার্য্য, কুটীরশিল্প ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের জ্ঞাত, অর্থের সুবিধার জ্ঞাত একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিবে। এই ব্যাঙ্কের শাখা প্রত্যেক পল্লীসমাজেই একটি একটি করিয়া থাকিবে। এই ব্যাঙ্ক বাহাতে ভাল করিয়া চলিতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। চাষারা মহাজনদের নিকট হইতে দাননা না লইয়া এই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইবে, এবং তাহারা বাহাতে খুব কম সুদে টাকা ধার পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যাঙ্ক বাহাতে জেলার সকলের সমবেত চেষ্টার দ্বারা চালিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১২) জেলা ও পল্লী-সমাজের কোন কার্য্যেই গবর্ণমেন্টের কোন কন্ট্রোলারী সংশ্লিষ্ট থাকিবে না।

(১৩) জেলা-সমাজ ও পল্লী-সমাজের সকল কার্য্য-নির্বাহের জ্ঞাত ট্যাক্স করিয়া আবশ্যকীয় টাকা উঠাইবার ক্ষমতা জেলা-সমাজের হস্তে নিহিত থাকিবে।

(১৪) পল্লীসমাজ ও জেলাসমাজের এই সমস্ত কার্য্য-প্রণালী স্থিরীকরণ করিবার জ্ঞাত ও ক্ষমতা দিবার জ্ঞাত আবশ্যকীয় আইন করিতে হইবে।

(১৫) এই আইন কার্য্যে পরিণত হইলে, এখন যে সব Local Board ও District Board আছে, তাহা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

(১৬) এই জেলাসমাজকে আবশ্যকীয় ক্ষমতা দিতে হইলে জেলার Magistrateএর এখন যে ক্ষমতা আছে, তাহার আবশ্যকীয় পরিবর্তন করিতে হইবে।

(১৭) এই জেলা-সমাজ-সমূহকে বঙ্গীয় কার্য্য-নির্বাহক সভার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই কার্য্যপ্রণালী অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্বে ইহাতে আরও অনেক জিনিষ সন্নিবেশিত করিতে হইবে। আমি শুধু মোটা মোটা কথাগুলির উল্লেখ করিয়াছি।

এই কার্য্যপ্রণালী অনুসারে কার্য্য না করিলে, আমাদের সিদ্ধিলাভ করা একেবারে অসম্ভব। আমাদের জাতীয় জীবনকে প্রতিষ্ঠিত ও পরিপুষ্ট করিতে হইলে, ইহাই একমাত্র উপকরণ। আমি ইহাকে Home Rule বলিতে চাহি না, স্বরাজ বলিতে চাহি না, স্বায়ত্তশাসন বলিতে চাহি না। আমাদের দেশে আপনার কাষ আপনি করিয়া লইবার যে পুরাতন প্রথা ছিল, আমি সেই পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিয়াই এই কার্য্য-প্রণালী স্থিরীকৃত করিয়াছি। আমি বিশ্বাস করি ও সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের দেশের আগামর সাধারণের আপনার আবশ্যকীয়

কাষ আপনি করিয়া লইবার যে কৃতিত্ব বা ক্ষমতার আবশ্যক, তাহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের মধ্যে বাহাদের অশিক্ষিত বহিরা এতাবৎ তুচ্ছতাচ্ছল্য করিয়া আসিয়াছি, তাহাদের জীবনের মধ্যে একটা বড় সভ্যতা ও সাধনা আছে। আমাদের চাষায়া যতই মূর্খ নিরক্ষর হউক না কেন, তাহারা আপনাদের ভাল-মন্দ বিচার করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। আর যদি কোন বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হয়, তাহার ব্যবস্থা ত এই কার্যপ্রণালীর মধ্যেই আছে।

আমি যে বলিলাম যে, আমাদের পূর্ব পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিয়া এই কার্য-প্রণালী নির্ধারণ করিয়াছি। সেই কথাটি আরও একটু বুঝাইয়া বলি। আমাদের দেশে রাজার কর্তৃত্ব অনেক প্রকারে সীমাবদ্ধ ছিল। রাজা কর লইতেন, স্বাক্ষর-পণ্ডিতেরা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া আইন বলিয়া দিতেন, কিন্তু আমাদের ঘরের কাষ আমরা নিজেরাই করিতাম, আমাদের জীবনযাপনের সকল উপায় আমরাই করিতাম।

আমি যে পল্লী বা গ্রাম্য-সমাজের কথা বলিয়াছি, তাহা আগেও ছিল। আমি যে নির্বাচনের কথা বলিয়াছি, তাহা আগে হয় ত অব্যক্ত ছিল, আমি তাহাকে ব্যক্ত করিতে চাই। আগে আমাদের জীবন আরও অনেক বেশী সরল ছিল, যে পঞ্চায়েতের কথা আমি বলিয়াছি, তাহা পুরাকালে গ্রাম্য-সমাজের মধ্যে বেন আপনা-আপনিই ফুটিয়া উঠিত। পল্লী-সমাজের যে পঞ্চায়েত, তাহা এমন পাঁচজনেই হইতেন, বাহাদের উপর পল্লীসমাজের দৃষ্টি সহজভাবেই আপনা-আপনিই পড়িত। পল্লীবাসীদের মধ্যে যে প্রীতি জাগরিত ছিল, তাহা কোন কথা না বলিয়া, কোন আড়ম্বর না করিয়া বেন নিঃশব্দে অগন্ধিতে সেই পাঁচজনকে দেখাইয়া দিত। সেই পাঁচজন, পঞ্চায়েতের অধিকার, স্বভাবগুণে সহজভাবে আকর্ষণ করিতেন ও পল্লী-সমাজবাসীরা সেই একই স্বভাবগুণে, সেই একই প্রকার সহজ সরলভাবে সেই অধিকার মানিয়া লইত। আমি যে সব কার্যের কথা বলিয়াছি, বিনা নির্বাচনে নির্বাচিত সেই পঞ্চায়েত সেই সব কার্যই করিত। জমিদারের কাছে আবেদন করিয়া পুকুর কাটাইয়া সংস্কার করিয়া লইত। সহজভাবে শিক্ষা-দীক্ষা বিস্তার করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিত, পল্লীসমাজভুক্ত গ্রাম সকলের স্বাস্থ্যরক্ষার কার্য মিষ্ট কথা বলিয়া গারে হাত বুলাইয়া করাইয়া লইত। পল্লী-সমাজের কোন চেষ্টা, কোন কার্য তাহাদের অমতে, কি তাহাদের সাহায্য না লইয়া হইতে পারিত না।

এই যে অব্যক্ত নির্বাচন, ইহাও গ্রামবাসীদের বাক্যহীন মতের উপরই নির্ভর করিত। আমরা এখনও কথায় কথায় বলি, ‘গারে মানে না আপনি মোড়ল’, এই কথার তাৎপর্য কি? অর্থাৎ পল্লীসমাজ বাহাকে না মানিবে, সে মোড়ল হইতে পারিবে না। এই যে তখনকার ‘মানা’ ও এখনকার আমার প্রস্তাবিত ‘নির্বাচন’, এই দুইয়ের

মধ্যে কোন স্বাভাবিক পার্থক্য বা বিরোধ আছে কি ? আমি তাই বলিতেছিলাম, এই যে অব্যক্ত নির্বাচন আমাদের দেশে চিরকাল চলিয়া আসিয়াছিল, আমি আজ তাহাকে ব্যক্ত করিয়া তুলিতে চাই। ইহা একেবারেই বিদেশী নয়, সম্পূর্ণভাবে স্বদেশী। ইহা আমাদের অস্থিমজ্জাগত নিজস্ব সামগ্রী।

তবে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, যাহা অব্যক্ত ছিল, তাহাকে ব্যক্ত করিতে চাই কেন ?—যে পল্লীসমাজ ছিল, তাহাকে ছাড়িয়া জেলাসমাজ করিতে চাই কেন ?—এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। আমাদের জীবন যে পরিমাণে সহজ সরল ছিল, সে পরিমাণে আর সহজ সরল নাই। অনেকটা জটিল হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামের সঙ্গে জেলার একটা স্বাভাবিক যোগ হইয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অধীনে নানাপ্রকার কার্যকর্মে নিযুক্ত থাকিয়া গ্রামের লোক অনেকে জেলার সবডিভিসনে, সহরে ও রাজধানীতে আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই পুরাকালে যেখানে পল্লীসমাজই জীবনের কেন্দ্র ছিল, এখন জেলার রাজধানী সেই কেন্দ্রস্থান অধিকার করিয়াছে। তাই সমস্ত জেলাকে একটা বড় পল্লীসমাজ জ্ঞান করিয়া, সমস্ত পল্লীসমাজগুলি এই কেন্দ্রসমাজের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যিক। অনেকে হয় ত বলিবেন যে, আমাদের রাজপুরুষেরা আমাদের হস্তে এত ক্ষমতা দিবেন কেন ?—একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, আমি ত বেশী ক্ষমতার দাবী করি নাই ; আমাদের নিজের ঘরের কাষ যদি না করিতে পারি, তবে আমরা কোন্ কাষে লাগিব ? যদি তাঁহারা বলেন, আমরা এ কার্যের উপযুক্ত নই—তবে আমার উত্তর এই যে, তোমাদের অধীনে দেড়শ' বছর থাকিয়া, আমাদের এ ক্ষমতা যদি না জাগিয়া থাকে, তবে কি কোন কালে এই ক্ষমতা জাগিবার কোন সম্ভাবনা আছে ? আমি ত কোন নূতন ক্ষমতার কথা বলিতেছি না, যে ক্ষমতা আমাদের চিরকাল ছিল, তাহাকে একটু বাড়াইয়া, আমাদের বর্তমান অবস্থার অনুযায়ী করিয়া, সেই ক্ষমতাই আমি বাক্সলার মহাসত্য দাবী করিতেছি। ইহা ত্রাঘা, ইহা ধর্মসঙ্গত। কোন মুখে এখন তোমরা বলিবে যে, আমরা এই ক্ষমতা ব্যবহার করিবার নিতান্ত অসুপযুক্ত ? আমি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার পরিবর্তন বা পরিসর এই ক্ষেত্রে চাহিতেছি না। সে দাবী যখন করিতে হইবে, তখন করিব। আমি সমস্ত বঙ্গের কার্যনির্বাহক সভার সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতেছি না। বঙ্গের ব্যবস্থাপক-সভা ও কার্যনির্বাহক-সভা তোমরা এখন যে রকমে চালাইতেছ, সেই রকমেই চালাও। আমি আজ সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে চাই না, আমি শুধু এই চাহিতেছি, যাহা আমাদের নিতান্ত ঘরকন্নার কাষ, সে ক্রাঘ করিবার অধিকার না দিলে আর চলে না। তোমাদের মুখেই শুনি যে, আমাদের ক্রমবিকাশের উপায় তোমরা করিয়া দিবে।

সে কথা যদি সত্য হয়, আজ তাহার প্রমাণ দাও। আমরা Zuluও নয়, Hot-tentotও নয়, আমরা সত্য জাতি। যে কাষ আমরা চিরকাল আপনা-আপনি করিয়া আসিয়াছি, আজ তাহা একটু বাড়াইয়া করিতে পারিব না কেন?

আমার বিশ্বাস হয় না যে, আমাদের যিনি রাজা, এই ক্ষমতটুকু আমাদের হস্তে দিতে তাঁহার কোন আপত্তি আছে বা হইতে পারে। তিনি আমাদের দেশে আসিয়া যে আশাব বাণী বলিয়াছিলেন, তাহাতেই আমরা আশাবিত হইয়া আছি। আমাদের এই কার্যপ্রণালী অবলম্বন না করিলে, আমাদের যে সব দিকে সর্বনাশ হইবে। তাহাই ভাবিয়া চিন্তিয়া, হিসাব করিয়া আমরা আজ এই দাবী করিতেছি। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে, বিলাতের পার্লামেন্টের মহাসভার ইহাতে কোন আপত্তি হইবে বা হইতে পারে। রাজার আপত্তি নাই, পার্লামেন্টের আপত্তি হইবে না, কিন্তু এ দেশে যাহারা আমাদের রাজার গোমস্তা, যাহারা এ দেশের রাজকার্য পরিচালনা করেন, তাঁহাদের আপত্তি হইতে পারে। যেটুকু ক্ষমতা আমরা চাহিতেছি, সেটুকু ক্ষমতা এখন যে তাঁহাদের হাতে। মানুষের স্বভাবই এই যে, নিজের ক্ষমতা কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। কি আপত্তি তাঁহারা তুলিবেন, আমি ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু সব বিষয়েই ওজর-আপত্তি তোলা সহজ, এবং তর্কে সেই ওজর-আপত্তির প্রতিষ্ঠা করা আরও সহজ। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, এ দেশে এমন কোন ইংরাজ কি আছেন, যিনি বুকে হাত রাখিয়া বলিতে পারিবেন যে, আমরা বাস্তবিকই এইটুকু ক্ষমতারও অধিকারী নহি?

তাঁহারা হয় ত বলিতে পারেন—আমি ছই একখানা ইংরাজী কাগজে এই মর্মেয় কথা পড়িয়াছি, যে দেশে এনাকিষ্ট অত্যাচারের এত প্রাচুর্য, সে দেশে জনসাধারণের হাতে এই ক্ষমতা দিলে তাহার অপব্যবহার হইবে। এই কথা শুধু বাহিরের দিক দিয়া দেখিতে গেলে প্রথমে সত্য বা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই কথার বাস্তবিক কোন অর্থ নাই। প্রথমেই আমাকে বলিতে হয় যে, যাহাদের এনাকিষ্ট বল, তাহারা বস্তত পক্ষে এনাকিষ্ট নহে। তাহারা রাজবিদ্রোহী, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাহারা আইনের কাছে অপরাধী, সুতরাং দেশের রাজশক্তিকে অটুট অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ইহাদের শাসন ও দণ্ড অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু সেই শাসনের সঙ্গে সঙ্গে কি কারণে এই যুবকবৃন্দ রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া না দেখিলে এই শাসন সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইবে না। আমি যত দূর বুঝিতে পারি, আমার বিশ্বাস হয় যে, আমাদের দেশে এমন কোন এনাকিষ্ট নাই, যে সত্য সত্যই ইংরাজ গবর্নমেন্ট উঠাইয়া দিয়া, তাহার পরিবর্তে অন্য কোন

বিদেশী গবর্ণমেন্ট স্থাপিত করিতে চাহে। তবে তাহারা কেন রাজ-বিদ্রোহী হইল? এই প্রশ্নের উত্তর কি ইহাই নহে যে, স্বদেশী আন্দোলনের পরে আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের মনে ও প্রাণে দেশের জন্ত কাযে লাগিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে? অর্দ্ধদশ-যোগের সময় কলিকাতা সহরে ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামে তাহারা বথার্থ কার্য্য করিবার যে ক্ষমতার প্রমাণ দিয়াছে, তাহা আমাদের রাজকর্ম্মচারীরা পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন। সেই দিন যখন দামোদরের বস্তার অনেক গ্রাম, অনেক সহর ভাসিয়া গিয়াছিল, আমাদের দেশের যুবকবৃন্দ দলবদ্ধ হইয়া সেই সব বস্তাপীড়িত নিরাশ্রয় গ্রামবাসীদের যে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাতে কি তাহাদের দেশের জন্ত কার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই? এই যে একটা প্রবল কার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা ও :কার্য্য করিবার ক্ষমতা, ইহা স্থানিতাবে দেশের কোন্ কাযে লাগিতেছে? আমার মনে হয়, এই কায করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধেও কাযে লাগিতে না পারার দেশের যুবকদের মধ্যে একটা অসহিষ্ণুতার ভাব—একটা নৈরাশ্রের বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই রাজদ্রোহিতা সেই অসহিষ্ণুতা ও সেই নৈরাশ্রেরই ফল! আমি আগেই বলিয়াছি যে, ইহাদের শাসন আবশ্য কর্তব্য। অপরাধীর দণ্ড না হইলে রাজত্ব রক্ষা করা অসম্ভব। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই অপরাধের যে মূলভূত কারণ, তাহাও দূর করিতে হইবে। তাহাদের মনের এই যে বিশ্বাস যে, রাজকর্ম্মচারীরা তাহাদের স্থানিতাবে দেশের কল্যাণের জন্ত কোন কার্য্য করিবার সুযোগ দিবেন না, সেই বিশ্বাস একেবারে দূর করিতে না পারিলে এই যে রাজদ্রোহের সূচনা, তাহাকে নিমূল করা যাইবে না। তাহাদের গালাগালি দেওয়া সহজ ও স্বাভাবিক। কিন্তু শুধু গালাগালি দিলে ও দণ্ড দিলেই তা ব্যাধির আরোগ্য হয় না।

যদি স্বীকার করিয়া লই যে, আরও কঠিন শাসন না হইলে এই ব্যাধির শাস্তি হইবে না, তবে যাহারা এই ব্যাধিগ্রস্ত, তাহাদেরই শাসন কর এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণকে দেশের কাযে লাগাইয়া এই ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা কর। দেশে রাজদ্রোহের সূচনা হইয়াছে বলিয়া দেশের লোককে দেশের কায করিতে না দিলে, সেই রাজদ্রোহেরই পথ প্রশস্ত হইবে। তাহাতে তোমাদেরও অমঙ্গল, আমাদেরও অমঙ্গল। কিন্তু তোমাদের যতটা ক্ষতি না হউক, আমাদের একেবারে সর্বনাশ—এই নবজাগ্রত বাঙ্গালীজাতির যে জীবন, তাহা একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে। আজ এই :সমগ্র বাঙ্গলার মহাসভার সভাপতিস্বরূপ আমি বক্তৃকরে তোমাদের নিকট এই নিবেদন করিতেছি যে, আমার কথার বিশ্বাস না হইলে আমাদের দেশের গণ্যমান্ত লোক—তাহাদের উপর দেশবাসীদের প্রজ্ঞা-

ভক্তি আছে, এমন করেকজনকে লইয়া একটা ছোট কমিটি করিয়া দেও। তাঁহারা দেশের এই রাজদ্রোহ-সূচনার যে বখাৰ্ণ কারণ, তাহা অনুসন্ধান করুন এবং এই রাজদ্রোহিতা দূর করিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা নির্ধারণ করুন। আমার বিশ্বাস হয় না যে, কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী এমন কেহ আছেন—যিনি একটু তলাইয়া অনুসন্ধান করিলে আমার মত খণ্ডন করিতে পারিবেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা উঠিতে পারে। আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, এই রাজদ্রোহিতার সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের অনেক লোকেরই সহানুভূতি আছে। এ কথাও তাঁহাদের বুঝিবার ভুল। এই রাজদ্রোহী যুবকদের ছুইটা দিক্ আছে। আমাদের এই নবজাগৃত জাতীয় জীবনকে রক্ষা করিবার জন্য ও দেশের কার্য নিজের হাতে করিবার জন্য তাহাদের যে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সেই তাহাদের একটা দিক্। আমাদের বাঙ্গলার জনসাধারণের সেই দিক্ দিয়া ও সেই কারণে তাহাদের সহিত সহানুভূতি আছে। আবার, দেশের কাযে লাগিতে পারিতেছে না বলিয়া পথভ্রান্ত হইয়া যে কার্যে তাহারা নিযুক্ত হইতেছে এবং শত প্রকারে রাজার কাছে এবং দেশের কাছে যে সব অপরাধে তাহারা অপরাধী হইতেছে, সেই দিক্ দিয়া তাহাদের সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণের কোন সহানুভূতি নাই। আমাদের রাজপুরুষদের এই ভুল বুঝিবার যে কারণ নাই, আমি এমন কথা বলিতে পারি না। বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিলে ইহা মনে হইতে পারে,—একটু অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিলে ইহা আরও বেশী মনে হইতে পারে যে, এই সব রাজদ্রোহী যুবকদের সঙ্গে সমস্ত বাঙ্গলা দেশের একটা যোগ আছে, আমাদের দেশের জনসাধারণের তাহাদের সঙ্গে একটা সহানুভূতি আছে। কিন্তু একটু ধৈর্য ধরিয়া তলাইয়া দেখিলেই ভুল ধরা পড়িবে। এই ভুল বিশ্বাসের কারণ কি? ইহার বাস্তবিক কারণ কি ইহা নহে যে, আমাদের দেশের লোকই বিশ্বাস করেন যে, এই সব যুবকদিগের প্রাণ আছে, দেশের প্রতি একটা প্রাণস্পর্শী মমতা আছে এবং দেশের কায করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে? এবং সেই কারণেই তাঁহারা মনে করেন যে, তাহাদের একেবারে ধ্বংস না করিয়া, তাহাদের মুখ কিরাইয়া, মতি-গতি বদলাইয়া যথার্থ দেশের কাযে লাগাইয়া দেওয়া উচিত। আমি বাহা বলিলাম, হয় ত আমাদের অনেকেই তাহা সাহস করিয়া স্বীকার করিবেন না। কিন্তু অবশ্য তর্ক না করিয়া যদি সত্য কথা বলিতে হয়, তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বাহারা রাজদ্রোহী, তাহাদের মতি-গতি কিরাইয়া তাহাদের যে দেশবাৎসল্য, তাহা দেশের কাযে লাগাইয়া

দিবার যে বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, তাহা রাজদ্রোহিতার সঙ্গে সহানুভূতি নহে, তাহা রাজদ্রোহকে কোন মতেই সমর্থন করে না, বরং তাহা বথার্থ রাজ শক্তির সহায় এবং রাজদ্রোহের স্বভাববিরুদ্ধ। এই কথা তলাইয়া না বোঝাই আমাদের রাজপুরুষদিগের ভুল এবং এই সত্য কথা খুলিয়া বলিয়া আমাদের রাজপুরুষদের সাহায্য না করাই আমাদের ভুল। বাহা সত্য, তাহা স্বীকার করিবার সাহস যদি আমাদের না থাকে, তবে কেমন করিয়া আমরা বাক্যলার জাতীয় জীবনের যে ব্রত, তাহা উদ্‌ঘাপন করিব?

আর একটা তর্ক উঠিতে পারে, তাহারও বিচার আবশ্যক। আমাদের রাজপুরুষেরা ইহাও বলিতে পারেন যে, হিন্দু-মুসলমানে ভাব নাই, হিন্দুদের মধ্যে বর্ণে বর্ণে প্রীতি নাই, এই অবস্থার সমস্ত হিন্দু ও হিন্দু-মুসলমানে একত্র হইয়া একযোগে কায করা অসম্ভব। হিন্দুদের মধ্যে বর্ণভেদজনিত যে বাদ-বিসংবাদ, তাহা একত্রে কায্য না করিতে পারিয়া আরও বাড়িয়া বাইতেছে। যে কায সকলের আবশ্যকীয় ও সকলের মঙ্গলপ্রদ, সেই কায একত্র করাই মিলনের প্রশস্ত উপায়। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বাস্তবিক কোন অসম্ভাব নাই। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে ত একেবারেই ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কয়েক জন স্বার্থপর ব্যক্তির প্ররোচনার একটা অসম্ভাব সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র; সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। গ্রামের ভিতর গিয়া অনুসন্ধান করিলেই আমার কথা যে সত্য, তাহা প্রমাণীকৃত হইবে। আমি দেখিয়াছি, মুসলমান ও হিন্দু চাষাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে। দাদা, চাচা, মামু বলিয়া তাহারা পরস্পরকে সম্বন্ধস্থত্রে বান্ধিয়া লইয়াছে। তাহারা একই রকম কায করে, একই ভাষায় কথা বলে এবং তাহাদের আচার-ব্যবহার অনেকটা একই রকম। নিজ নিজ বিশিষ্ট ধর্মের একটা পার্থক্য আছে, কিন্তু সে পার্থক্য শুধু বাহিরের দিকে— তাহাদের জাতিগত যে ঐক্য, তাহার অন্তরায় হয় নাই। সুতরাং এই যে বর্ণগত ও ধর্মগত পার্থক্য, তাহা আমাদের একত্র হইয়া কায করিবার কোন বাধা জন্মাইবে না। বরং একত্র হইয়া কায করিলেই বাহ্যিক পার্থক্য ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আন্তরিক মিলন আরও সত্য, আরও জীবন্ত হইয়া উঠিবে।

আর একটি আপত্তির কথা আমি শুনিয়াছি। সেটা এই। আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, যে কার্যপ্রণালীর কথা আমি বলিয়াছি, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে কলদায়ক করিতে হইলে প্রত্যেক কার্যের সঙ্গে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের কি সবডিভিসনের হাকিমের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত। সে কথা আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। হয় ত এই সব রাজকর্মচারীদের আমাদের দেশের কাষের সঙ্গে যোগ থাকিলে,

এই কাৰণলা বৰ্ত্তমানে—শুধু বাহিৰেৰ দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে—আরও ভাল কৰিয়া সাধিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা যে দাবী কৰিতেছি, তাহার মূল মৰ্ম্ম এই যে, আমরা চিরকাল নিজের কাৰ্য্য নিজেয়াই কৰিয়াছি এবং সেই একত্ৰ কাৰ্য্য কৰিবার যে স্বাভাবিক অভ্যাস, তাহা আবার জাগৰিত কৰিতে চাই। এই সব ছোট-খাট কাৰ্য্যে তোমরা যদি আমাদের সঙ্গে আঠার মত লাগিয়া থাক, তবে আমাদের কোন কাৰ্য্যেই স্বাভাবিক ক্ষুৰ্তি হইবে না এবং নিজের কাৰ্য্য নিজে কৰিবার যে মৰ্যাদা, তাহা হইতে আমরা চিরকালের জন্ত বঞ্চিত হইব। কাৰ্য্য একটু ধাৰাপ হওয়াও ভাল, কিন্তু নিজের কাৰ্য্য পরে কৰিয়া দিলে সব কাৰ্য্যই বিফল হইবে। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন নিজের উপায় নিজে কৰিবার, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবার একটা গোবর আছে এবং তাহাতে যেমন ব্যক্তির জীবনের পূৰ্ণ বিকাশ হয়, সেইরূপ জাতীয় জীবনেও নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইয়া নিজের কাৰ্য্য নিজে কৰিলে জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক ও সম্পূৰ্ণ বিকাশ হয়। জাতীয় জীবনের সম্পূৰ্ণ বিকাশ না হইলে তাহার সার্থকতা কোথায়? আমাদের মরণ-বাঁচন, শুভাশুভ, আমাদের নব-জাগৃত জাতির যে জীবন এই কাৰ্য্যপ্ৰণালীর উপর নির্ভর কৰিতেছে। আমাদের যে দাবী, তাহা ভাৱের উপর; আমাদের ধৰ্ম্ম তোমাদের ধৰ্ম্ম, সকলের ধৰ্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তোমরাই বাৰে বাৰে বলিয়াছ যে, আমাদের জাতীয় জীবনকে পুষ্ট কৰাই তোমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের জাতীয় জীবন পুষ্ট কৰিবার যে এই একমাত্র উপায়, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আজি এই সামান্য দাবী পূৰণ কৰিবার সময় আসিয়াছে। এখন যদি তোমরা আমাদের এই দাবী পূৰণ না কর, তবে তোমাদের মুখের কথাৰ উপর আর আস্থা রাখিব কি কৰিয়া? আর তোমাদের কথাৰ উপর যদি আমরা বিশ্বাসস্থাপন কৰিতেই না পারি, তবে আমরা বাঁচিয়া কি কৰিব?

এই যে আপনাত কাৰ্য্য আপনি কৰিবার অধিকার, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও ছুই একটি বড় বড় কথাৰ আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা যে শুধু আমাদের বয়স্কায় কাৰ্য্য কৰিতে চাই, তাহা নহে। সমস্ত দেশবাসীর যে ভাৱ, তাহাও অংশ লইতে চাই। বোম্বাই-কংগ্রেসে সার সত্যেন্দ্ৰপ্ৰসন্ন সিংহ আমাদের সৈন্ত-বিভাগে প্ৰবেশ কৰিবার সহকে যে কথা বলিয়াছিলেন, সেই কথা আমাদের দেশের সকলেরই মৰ্ম্মের কথা। আমাদের চোখ ফুটিয়াছে। তোমরাই চোখ ফুটাইবার সাহায্য কৰিয়াছ। এখন জগতের যে দিকে চাই, দেখিতে পাই, সকল দেশেই দেশবাসীরা অস্ত্ৰধাৰণ কৰিয়া দেশ-রক্ষা কৰিতে প্ৰস্তুত। আমাদের অস্ত্ৰধাৰণ কৰিবার যে অধিকার নাই, ইহাতে কি আমরা মৰ্ম্মে-মৰ্ম্মে বেদনা অনুভব কৰি না? অস্ত্ৰধাৰণ কৰিবার অধিকার আমাদের না দিলে এই যে নবজাগৃত দেশবাসী, ইহাৰ কি অপমান করা হয় না? এই অধিকার

হইতে আনাগিগকে বঞ্চিত করার কি কোন আশংক্য কারণ থাকিতে পারে? সকল দেশেই অস্ত্রধারণ করিবার অধিকার আছে। আমাদের থাকিবে না কেন? অস্ত্রধারণ সম্বন্ধে আইন রাখিতে হয় রাখ, কিন্তু সেই আইন জাতি-ধর্ম-নির্কীর্ণভাবে সকলের প্রতি সমভাবে চালাইয়া দিও। তাহা না হইলে আমরা নিজেদের অপমানিত মনে করিব। সেই অপমানের উপর কোন সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। মেক্লে যে আনাগিগকে অপমান করিয়া গিয়াছে, সে কথাই যে একদিন আমরাও বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমরা করিয়াছি, এখনও করিতেছি। তোমরা যে একদিন ঐ কথা বলিতে দিয়াছিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। বাঙ্গালী যে কাপুরুষ, সে ভ্রান্ত বিশ্বাস আমাদের নাই, তোমাদেরও নাই। এমুলেন্স-কোর সম্বন্ধে বাঙ্গালী যে বীরত্ব দেখাইয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাইও না। সে দিন যে বাঙ্গালীর ডবল কোম্পানীর সৃষ্টি করিবার মনস্থ করিয়া আনাগিগকে আহ্বান করিলে, ভাবিয়া দেখিও, সে দিন বাঙ্গালীকে কি কঠিন পরীক্ষার ভিতর ফেলিয়াছিলে। সিপাহী-বিদ্রোহের পর হইতে বাহাদিগকে কোন দিন অস্ত্রধারণ করিতে দেও নাই, বাহাদিগকে কোন প্রকারে সমর-শিক্ষা দেওয়া উচিত বিবেচনা কর নাই, বাহাদের সৈনিকের কার্য্য করিবার অনুপযুক্ত মনে করিয়া সকল সামরিক চেষ্টা হইতে বহুদূরে রাখিয়াছিলে এবং বাহাদের মধ্যে এই অনুপযুক্ততা সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ একই কথা বলিয়া যে একটা ভূতের বিশ্বাস জাগাইয়া দিয়াছিলে, একদিন হঠাৎ সেই বাঙ্গালীকেই সমরক্ষেত্রে আহ্বান করিলে! যদি আমরা সেই আহ্বান শিরোধার্য্য করিয়া ডবল কোম্পানী গড়িয়া দিতে না পারিতাম, তবে কি চিরকাল তোমরা বলিতে না যে, বাঙ্গালী অনুপযুক্ত? তাহাদের অস্ত্র ধারণের কোন অধিকার নাই, তাহাদের জন্য সৈনিক-বিভাগে কোন স্থানই হইতে পারে না? আমরা ত তাহাই বুঝিলাম। অশেষ কষ্ট করিয়া, অশেষ যত্ন করিয়া ডবল কোম্পানী গড়িয়া দিলাম। এই যে কঠিন পরীক্ষার ভিতর আনাগিগকে ফেলিয়াছিলে, সেই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলাম। বাঙ্গালী প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, সে সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করিবার সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত ও অধিকারী। এখন অস্ত্র-ধারণের অধিকার আমরা দাবী করিতে পারি। এখন জাতিধর্ম-নির্কীর্ণভাবে সম-অধিকারে আমরা সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ করিবার দাবী করিতে পারি। এই সৈনিকবিভাগে দেশীয় ও বিদেশীয়দের মধ্যে যে একটা পার্থক্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছ, তাহা ভুলিয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। ইংরাজ যে কমিসন পাইবে, বাঙ্গালী সে কমিসন পাইবে না কেন? লেফটেনেন্ট, ক্যাপ্টেন, কর্নেল হইবার ক্ষমতা শুধু ইংরাজের থাকিবে কেন, আমরা চিরকালই অমাদার হাবিলদার থাকিব কেন? মনে রাখিও, যে লালপন্টনেরও সাহায্যে তোমরা একদিন বাঙ্গালার ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলে,

সে লালপন্টন বাঙ্গালী। যদি যোগ্যতার কথা বল, আমি ত যোগ্যতারই পরীক্ষা চাই। কিন্তু সেই পরীক্ষা সমভাবে জাতিধর্মনির্কির্ষে করিতে হইবে। আমরা বিচারের প্রার্থী, পরীক্ষার প্রার্থী। আমরা অমুগ্রাহের ভিখারী নহি।

এই যে সৈন্য-বিভাগে প্রবেশ করিবার আমাদের এত আগ্রহ কেন, তাহা যদি জ্ঞানিতে চাও, তবে খুলিয়া বলি। এই যে জাতিতে জাতিতে মহাসংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, এই সংঘর্ষের মধ্যে যে কে শত্রু, কে মিত্র, বুঝিয়া উঠা কঠিন। আজি যাহারা মিত্র, কালই তাহারা শত্রু হইয়া উঠিতে পারে। আমরা চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি, জাপান তাহার পণ্য-দ্রব্য দিয়া আমাদের দেশ ভরিয়া দিতেছে। দলে দলে জাপানী আসিয়া আমাদের সহরে বাস করিতেছে। এই যুদ্ধের ফলে তাহারা অনেক অর্থ উপার্জন করিতেছে। কারও সর্বনাশ, কারও পোষ্যমাস। এই যুদ্ধে অনেকের সর্বনাশ হইলেও কিন্তু জাপানের পোষ্যমাস। এই ভীষণ সমরে জাপান যে আমাদের মিত্র, তাহা ত একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। জাপান ত জার্মানীর শিষ্য। কে বলিতে পারে যে, এই সমরানল নির্কাপিত হইলে আবার জাতির সংঘর্ষে নূতন করিয়া সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইবে না? কে বলিতে পারে যে, সেই সমরে জাপান আমাদের শত্রু হইবে না? আবার যদি সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয়, কে জানে, কুশিরা কোন্ দিকে থাকিবে? আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি যে, বাঙ্গালী জাপানকে চায় না, জার্মানীকেও চায় না, কুশিয়াকেও চায় না। বাঙ্গালী তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া তাহার দেশরক্ষার যে ভার, সেই বোঝার ভারের অংশ মাথার তুলিয়া লইতে চায়। তাই বাঙ্গালী অস্ত্রধারণের অধিকার চায়,—তাই বাঙ্গালী সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ করিবার দাবী করিতেছে। এই যে বাঙ্গালীর নবজাগ্রত আকাঙ্ক্ষা, ইহাকে তাচ্ছিল্য করিও না, এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না করিয়া ইহাকে অপমানিত করিও না।

বাঙ্গালীর এই আকাঙ্ক্ষার সম্বন্ধে আর একটা কথা বলি। কলিকাতাতে আজিকালি বাঙ্গালী বালকদের ভবিষ্যতে সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত করিয়া তুলিবার যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাকে পোষণ করা আমাদের ও আমাদের রাজপুরুষদিগের অবশ্য কর্তব্য। এই Boy Scout Movement আমাদের স্কুলে স্কুলে সহরে সহরে ছড়াইয়া দিতে হইবে। ইহাতে যে আমাদের বালকদিগকে ভবিষ্যতে সমরোপযোগী করিয়া তুলিবে, কষ্ট-সহিষ্ণু, শ্রম-সহিষ্ণু করিবে, দয়া-দাক্ষিণ্য ও পরোপকার-ব্রত শিক্ষা দিবে এবং সর্বতোভাবে প্রকৃত পক্ষে মানুষ করিয়া তুলিবে।

আমরা যে শুধু অধিকার চাহিতেছি, তাহা ত নহে। সেই অধিকারের জন্য যে স্বার্থ-তাগ আবশ্যক, আমরা ত তাহাতে কুণ্ঠিত নহি। বাঙ্গালীকে সমর-শিক্ষা দিবার জন্য এবং সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ করাইবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা বাঙ্গালী দরিদ্র

হইলেও যোগাইতে প্রস্তুত। স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে আমরা কেমন করিয়া অধিকারের দাবী করিব ?

এই যে প্রস্তাবিত সমর-ঋণ, ইহা কি আমাদের স্বার্থত্যাগের সত্য প্রমাণ নহে ? যে বাহা পারে সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে। যে যত পারে, আরও সংগ্রহ করিয়া আনিবে। তোমরা ভাবিয়া দেখিও যে, শুধু অর্থের হিসাবে ইহাতে বাঙ্গালীর যথেষ্ট ক্ষতি। যে টাকা উঠিতেছে, তাহার অধিকাংশই ইংলণ্ডে কিংবা অন্য অন্য দেশে ব্যয়িত হইবে। ইহার খুব অল্প অংশই এ দেশের জনসাধারণের হাতে ফিরিয়া আসিবে। এই টাকার যে সুদ, তাহা আমাদের রাজস্ব হইতেই দিতে হইবে। সুতরাং শুধু অর্থের দিক্ দিয়া দেখিলে ইহাতে বাঙ্গালীর বিশেষ ক্ষতি। কিন্তু বাঙ্গালী ত কোন দিন কোন জিনিষ শুধু অর্থের দিক্ দিয়া দেখে নাই এবং দেখাও ধর্মসম্মত বিবেচনা করে না। শুধু অর্থের দিক্ দিয়া দেখিলে যে সব দিক্ দেখা হয় না। এই যে ইউরোপে ঘোর সমর চলিতেছে, ইহার সঙ্গে কি বাঙ্গালীর সুখদুঃখ জড়িত নাই ? এই সমরে ইংলণ্ডের জয়লাভের উপর কি বাঙ্গালীর আশা-ভরসা নির্ভর করিতেছে না ? এই সমর-ঋণে বাঙ্গালীর বাহা দেয়, তাহা যদি বাঙ্গালী সংগ্রহ করিয়া না দিতে পারে, তাহা হইলে আমরা কেমন করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিব ? যেমন করিয়াই হউক, এই সমর-ঋণ প্রস্তাবকে সম্পূর্ণভাবে সার্থক করিতেই হইবে। ইহাতে যে স্বার্থত্যাগের আবশ্যক, তাহাই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি।

শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, ইংরাজ আমাদের অনেক উপকার করিয়াছে এবং তাহার জন্য আমাদের চিরকালই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকা উচিত। এ কথা অনেকবার বাঙ্গালীর কাছেও শুনিয়াছি, ইংরাজের কাছেও শুনিয়াছি। ইংরাজ আমাদের দেশে আসিয়া যে একটি বিপরীত সভ্যতা ও সাধনার আদর্শ আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছে এবং সেই বাহিরের আবাতেই যে আমাদের জাতীয় জীবনের নব-প্রতিষ্ঠার সাহায্য করিয়াছে, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি এবং চিরকাল স্বীকার করিব। এ দেশে ইংরাজের আগমন যে বিধির বিধান, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এবং চিরদিনই করিব। ইংরাজের আগমন হইতে যে আমাদের দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হইতেছে ও হইবে, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি ও চিরকাল স্বীকার করিব। এই কারণে আমার যে স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা, তাহা আমার চিরকালই আছে ও চিরকালই থাকিবে। কিন্তু এই কৃতজ্ঞতার আর একটা দিক্ আছে, তাহা যেন ইংরাজ ভুলিয়া যায় না। এ দেশে আসিয়া রাজস্ব বিস্তার করিয়া কি ইংরাজের কোন লাভ হয় নাই ? জগতের ইতিহাসে বাঙ্গলা দেশে আসিবার আগে ইংরাজের যে স্থান ছিল, এখনও কি ঠিক সেই স্থান ? এই দেশের ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে

সঙ্গে কি ইংরাজের অবস্থার শত সহস্র গুণ উন্নতি হয় নাই? সমগ্র মানবসমাজে ইংরাজ যে আজ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাতে কি বাঙ্গলার, সমস্ত ভারতবর্ষের কোন হাতই ছিল না? এই যে কৃতজ্ঞতা, ইহা কি শুধু আমাদেরই? ইংরাজের কৃতজ্ঞ হইবার কি কোন কারণ নাই? সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় না কেন? এই যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন, ইহাতে আমাদের ও তোমাদের পরস্পরের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আমরা চিরকালই আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আসিতেছি ও কার্যক্ষেত্রে সহস্র প্রকারের সেবা দ্বারা তাহার প্রমাণ দিয়াছি। তোমাদের যে কৃতজ্ঞতা, তাহার প্রমাণ আজি চাই। শুধু মুখের কথায় আর আমরা ভুলিব না। আমাদের যে নিজের হাতে নিজের কাজ করিবার নিতান্ত ঞ্চরসঙ্গত আকাঙ্ক্ষা, সে আকাঙ্ক্ষা যদি পূর্ণ না কর—এই সামান্ত অধিকার যদি আমাদের না দাও, তবে তোমাদের কৃতজ্ঞতার কোন অর্থ নাই।

তাই আজ তোমাদের কাছে আমার প্রাণের নিবেদন জানাইতেছি। যে কার্য করিবার অধিকার চাহিতেছি, তোমরা প্রাণে প্রাণে জান, সেই অধিকার প্রাপ্ত হইবার জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। মনকে চোখ-ঠার দিও না। ভাবের ঘরে চুরি করিও না। বৃথা তর্ক করিয়া সত্যকে ঢাকিবার চেষ্টা করিও না। আজি আমাদের জীবন-চাকল্যকে শাস্ত কর। আমাদের এই নব-জাগ্রত জীবনকে সমস্ত প্রাণ দিয়া মর্মে-মর্মে পোষণ কর। ঐ যে ইউরোপের সমর-ক্ষেত্রে চিতার আগুন জলিতেছে, ঐ শ্মশান-ভস্মের উপর মিলন-মন্দির স্থাপন কর! হাত বাড়াইয়া আমাদের হাত ধর! তোমাদের ও আমাদের মিলন সত্য বপার্থ হইয়া উঠুক! তোমরাও ধন্ত হও, আমরাও ধন্ত হই এবং এই মিলনের যে বপার্থ বাণী, তাহা আপনাকে সার্থক করুক।

আমার স্বদেশবাসীদের নিকট আমার প্রাণের নিবেদন এই যে, বাঙ্গলার কথা বেন অচিরে বাঙ্গালীর কার্যে পরিণত হয়। সমবেত চেষ্টা চাই, সকলের উদ্যম চাই, বাঙ্গালীর স্বার্থত্যাগ চাই। এই যে জীবন-যজ্ঞ, ইহা শুদ্ধ-চিত্তে পবিত্র-প্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। সকল বিদ্বেষ, সকল স্বার্থ ইহাতে আহুতি দিতে হইবে। ইহাতে বর্ণধর্ম-নির্কিংশেবে সকলকে আহ্বান করিতে হইবে। কর্মক্ষেত্রে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না, নিরাশ হইলে চলিবে না। যে অধিকার আজি আমরা দাবী করিতেছি, তাহা বুদ্ধি-সঙ্গত, ঞ্চর-সঙ্গত, আমাদের স্বভাবধর্ম-সঙ্গত, মানুষের স্বাভাবিক অধিকার-সঙ্গত, আমাদের ধর্ম-সঙ্গত, জগতের ধর্ম-সঙ্গত। এই অধিকার হইতে আমাদের কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না। একবার এস, আমরা সকলে সম্মুখে বলি—“চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের, তাহা চাই।” একবার এস, আমরা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান সম্মুখে বলি—“চাই এই

অধিকার আমাদের, বাহা আমাদের, তাহা চাই।” একবার এস, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, কার্বয়, শূদ্র, চণ্ডাল, সব একত্র হইয়া সম্মুখে বলি,—“চাই এই অধিকার আমাদের, বাহা আমাদের, তাহা চাই।”—সকল প্রজা যখন এক হইয়া আন্তরিক মিলনে মিলিত হইয়া বলে ‘চাই’, জগতে এমন কোন রাজশক্তি নাই—বাহা সেই সমবেত আকাঙ্ক্ষার অপ্রতিহত বেগ রোধ করিতে পারে! এস ভাই খৃষ্টিয়ান, খৃষ্টের নামে প্রাণে প্রাণে বল ‘চাই!’ এস ভাই মুসলমান, তুমি আল্লাহর নামে প্রাণে প্রাণে বল ‘চাই!’ এস ভাই হিন্দু, তুমি নারায়ণের নামে প্রাণকে সাক্ষী রাখিয়া বল ‘চাই!’ ঐ যে মা ডাকিতেছে! এস এস, সবাই এস! সম্মুখে বিস্তৃত কার্য্য, এস এস, সবাই এস! বল ঈশ্বর! বল আল্লাহ, বল নারায়ণ, বল বন্দে মাতরম্।

তিনুর মা

(১)

শ্রামী হৃদয় মাজি সাত দিনের জরে বিনা চিকিৎসার বিনা পণ্যে যখন স্ত্রীপুত্রের মায়া কাটাইয়া লোকান্তরের যাত্রী হইল, তখন ভগী তিন বছরের ছেলে তিনুর হাত ধরিয়া পথে দাঁড়াইল। একমাত্র ভগবান্ ছাড়া তাহাদের দেখিবার লোক কেহ রহিল না।

হৃদয় মাজি দিন-মজুরী করিয়া দিন কাটাইত; রোজ আনিত, রোজ খাইত। বে দিন মজুরী না জুটিত, সে দিন ধার করিত, ধার না মিলিলে উপবাস দিত। সম্পত্তির মধ্যে ছিল জমার জমীর উপর একখানি কুঁড়ে, আর তাহার পিছনে পানভরা একটি ছোট ডোবা। ডোবার পাড়ে একটি তেঁতুলগাছ ছিল, কিন্তু তাহার ফলভোগ ছাড়া, গাছ বেচিবার বা ডাল কাটিবার অধিকার ছিল না। সুতরাং হৃদয়ের মৃত্যুতে স্ত্রী ভগী নিরুপায় ও নিঃসম্বল হইয়া শুধু ভগবান্কে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু ভগবান্ তাহার ডাক শুনিতে পাইলেন কি না, ভগী তাহা জানিতে পারিল না।

ভগীর তখনও বয়স যায় নাই, সুতরাং পাড়ার কেহ কেহ উপদেশ দিল, “ভগী, তুই সাঙ্গা ক’রে ফেল্।” কেহ বা বলিল, “যখন একটা ছেলে আছে, তখন আর কেন? ছেলেটাকে মানুষ কর, তোর কষ্ট দূর হবে।” ভগী উভয় পক্ষের পরামর্শই সার দিল, কিন্তু কি করিবে, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। ছেলেটাকে মানুষ করিলে কষ্ট দূর হইবার সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু আপাততঃ ছেলেকে বাঁচাইবার উপায় কি? দুই বেলা তাহার মুখে কি দিবে? সাঙ্গা করিলে হয় তো ইহার একটা উপায় হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে যদি ছেলের কষ্ট হয়, অস্বস্তি হয়? ভগী ব্যাকুলভাবে তিনুকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিত।

এ দিকে বাহারা সাঙ্গার উমেদার ছিল, তাহারা ভগীর নিকট কোনরূপ সম্ভাবজনক উত্তর না পাইয়া একে একে সরিয়া পড়িল। ভগী আপনার জীবিকাার্জনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল।

ভগী সকালে উঠিয়া বামুনপাড়ায় ধান ভানিতে যাইত। ছেলেকে টেঁকিশালার বসাইয়া ধান ভানিত। সূখা হইলে ছেলে কাঁদিত। বাহাদের ধান ভানিত, তাহারা দয়া করিয়া একমুঠা মুড়ি দিলে ছেলেকে তাহাই খাওয়াইয়া শান্ত করিত।

মধ্যাহ্নে পারিশ্রমিক চাউল লইয়া বরে আসিত এবং সে চাউলের কিয়দংশ পোরাকির
 ক্ষত রাপিয়া অবশিষ্টাংশ দোকানে দিয়া রুণ-তেল আনিত। তাহার পর স্নান করিতে
 গিয়া পুকুর হইতে শুষ্ক-কলমী শাক, গেঁড়ী, শামুক তুলিয়া আনিয়া তরকারির
 যোগাড় করিত। যে দিন চাউল কম পাইত, সে দিন ভাতে বেশী জন ঢালিয়া ফেন
 খাইয়া ক্ষুধিবৃত্তি করিত।

এইরূপে আহারকার্য শেষ করিয়া অপরাহ্নে আবার ধান ভানিতে যাইত।
 যে চাউল পাইত, তাহাতে রাত্রির আহার চলিত।

অল্প-বিস্মৃধে ধান ভানিতে না পারিলে নিজে উপবাস দিত, আর কাহারও বাড়ী
 হইতে একমুঠা ভাত বা ফেন মাগিয়া আনিয়া ছেলেকে খাওয়াইত।

বর্ষার ঘরের চালের পুরাতন তালপাতা পচিয়া ঘরে জল পড়িতে লাগিল। ভগী
 লোকের পায়ে হাতে ধরিয়া তালপাতার যোগাড় করিল, কিন্তু বাক্সের অনেক
 খোসামোদ করিয়া ঘর সারাইল। ভগী কিছুকে কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক দিতে গেল, কিন্তু
 কেনারাম তাহা লইল না। সেও ভগীর পানিপ্রার্থীর একজন উমেদার ছিল। কিন্তু
 ভগীর নিকট কোন আশ্বাস না পাওয়ার আপাততঃ বিধবার পানিগ্রহণের আশা ত্যাগ
 করিয়া ঘর সারিবার কাজে ননোনিবেশ করিয়াছিল। প্রণয়লাভে হতাশ হইলেও
 কেনারাম ভগীর নিকট পরসা লওয়া সম্বন্ধ বিবেচনা করিল না।

(২)

জীবিকার উপায় একরকম হইয়াছিল বটে, কিন্তু ছেলে লইয়া ভগী মহাবিপদে
 পড়িল। তাহার শত উপদেশেও সে চার বৎসরের ছেলেটা কিছুতেই বুঝিল না যে, সে
 অস্পৃষ্ট চাউলের ছেলে, শুচিস্বপ্ন ব্রাহ্মণগৃহে তাহাকে কত সাবধানে থাকিতে হইবে।
 সে ঘরে-দোরে বসিলে সে স্থানে গোময়স্পৃষ্ট জলের ছড়া দিতে হইবে, তাহাকে
 ছুঁইলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে, তাহার উচ্ছিষ্টস্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

ভগী ছেলেকে ঢেঁকিশালার বসাইয়া রাখিয়া ধান ভানিত। চঞ্চল ছেলে কিন্তু
 সারাদিন এক জায়গায় বসিয়া থাকিতে পারিত না, মা একটু অনমনস্ক হইলেই ছেলে
 উঠিয়া পলাইত। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর মেয়েদের চীৎকারে ভগী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িত।
 “ঐ কাপড়টা ছুঁয়ে দিলে, এই মাথা খেলে গো, মেয়েটাকে ছুঁয়ে ফেলেছে, বা বা,
 গা ধুয়ে এসে মাথার গঙ্গাজল দে, ও মা, কল্লো কি গো! গায়ের কাছ দিয়ে
 ছুটে গেল, এই অবেলার আবার নেয়ে মরতে হবে? ভালো সর্ব্বনেশে ছেলে বাপু! না
 ভগী, এমন করলে তোর ধানভানা চলবে না।”

ভগী আন্তেবাস্তে ঢেঁকি হইতে নামিয়া ছেলেকে ধরিয়া আনিত। বাড়ীর গৃহিণী

তিরস্কার করিয়া বলিতেন, “তুই ছেলেটাকে আঁচলে বেঁধে আনিব কেন বল তো, ঘরে রেখে আসতে পারিস না?”

ভগী সবিনয়ে উত্তর করিত, “ঘরে কে আছে মাঠাকরুণ, কার কাছে রেখে আসব?”
গু। নাই বা কেউ রইল, ঘরে থাকবে, পাড়ায় খেলে বেড়াবে।

ভগী। ভয় হয় মা, পাছে জলে-ধলে পড়ে যায়।

গৃহিনী চোখ কপালে তুলিয়া বলিতেন, “হাঁ, জলে ডুবে ম'লো আর কি? জলে ডুব্বারই ছেলেটা কি না। আমাদের বামুন-কায়েতের ঘরের ছেলে না কি?”

বামুন-কায়েতের ছেলে ছাড়া অপর-জাতির ছেলে যে জলে ডুবিয়া মরিতে পারে না, এ বিশ্বাস ভগীর ছিল না, সুতরাং সে ছেলেকে ছাড়িয়া বাইতে পারিত না। তবে বাড়ীর গৃহিনীদের তিরস্কার যখন নিতান্ত অসহ্য হইত, তখন সে দড়ি দিয়া ছেলেকে বাঁধিয়া রাখিত। ছেলে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ঠোট কুলাইয়া কাঁদিত, ভগী অন্তরিক্তে মুখ ফিরাইয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া ধান ভানিতে থাকিত।

এই ছোঁয়াছুঁয়ি ছাড়া আরও একটা গোলযোগ ছিল। বামুনদের ছেলেরা খাবার লইয়া বাইত, তিনু তাহা দেখিয়া খাবারের জন্ত বায়না ধরিত। ভগী নানা কথায় ছেলেকে শাস্ত করিবার প্রয়াস পাইত, নির্কোষ ছেলে কিন্তু শাস্ত হইত না, বায়না ছাড়িয়া কান্না ধরিত। বাড়ীর মেয়েরা তিনুর উদ্দেশে কতকগুলি বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিয়া শেষে ডাইন-চোখো হতভাগা ছেলেটার সম্মুখ হইতে সরিয়া বাইবার জন্ত আপনাদের ছেলেদিগকে উপদেশ দিত। ছেলেরা কিন্তু সে উপদেশ পালন করিত না, মেয়েরাও তাহাদের অজীর্ণরোগের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া পড়িত। এ দিকে মেয়েদের বাক্যবাণ, তাহার উপর ছেলের কান্না, ভগী আর সহ্য করিতে পারিত না, ছেলের মুখে পিঠে চড়চাপড় বসাইয়া দিত। ছেলে প্রহারের জ্বালায় আরও হাত-পা আছড়াইয়া আরও জোরে জোরে চীৎকার করিতে থাকিত। তাহার সেই শূকরশাবকবৎ উচ্চ-চীৎকারে বাড়ীর লোকেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত; তাহারা ভগীকে তিরস্কার করিয়া, তিনুকে গালি দিয়া আপনাদের কর্ণজ্বালায় প্রতিশোধ লইত। ভগী চুপ করিয়া সব শুনিত, শুনিতে শুনিতে তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইত। কিন্তু তাহার কাঁদিবারও বো ছিল না। তাহার চোখে জল দেখিলেই বাড়ীর মেয়েরা বাড়ীর অমঙ্গল আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিত এবং সে যদি একরূপ সকালে সন্ধ্যায় চোখের জল ফেলে, তবে সে যেন বাড়ীতে না আসে, একরূপ নিষেধাজ্ঞাও প্রচার করিত।

ভগী চোখের জল চোখে চাপিয়া অনেক অমুন-বিনয় দ্বারা সে নিষেধ-আজ্ঞার প্রত্যাশার করাইত। ইহা ছাড়া যে তাহার অন্য উপায় ছিল না।

এইরূপে ভগী ছেলেকে মানুষ্য করিতে লাগিল। কেনারাম মাঝে মাঝে

আসিয়া সাঙ্গা করিবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিল, ভগী কিন্তু সে উপদেশে কণ-
পাত করিল না।

সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া এবং গালাগালি ও তিরস্কার শুনিয়া ভগী
রাত্রিতে যখন আপনার ভাঙ্গা কুঁড়েটুকুর ভিতর ছেলেকে বুকে লইয়া শুইত, তখন
যেন মুহূর্তে তাহার সকল বেদনা, সকল কষ্ট মুছিয়া বাইত, সে যেন উপর হইতে
কাহার আশীষপূর্ণ ধন্যবাদ শুনিতে পাইত।

(৩)

“ভগী !”

“কেনে গা বাবাঠাকুর ?”

“তিনে কোথায় ?”

“তার জ্বর হ’য়েছে, কেঁথা মুড়ি দিয়ে প’ড়ে আছে।”

“প’ড়ে থাকলে হবে না, তাকে একবার উঠতে হবে।”

“কেনে ?”

“তাকে একবার মুণ-হাটে যেতে হবে।”

ভগী ভীত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “এই রাতে, জল-ঝড়ে ?”

হাতের লাঠিটা মাটিতে ঠুকিয়া কেদার রায় বলিলেন, “জল-ঝড়, তা কি
হ’য়েছে ? আমার অম্লার অস্থখ বেড়েছে, ওষুধ আনতে হবে।”

ভগী বলিল, “কাল সকালে গেলে হবে না ?”

মাধা নাড়িয়া রায় মহাশয় বলিলেন, “উহঁ, ডাক্তার বন্ডে, রাত্রে মধ্যই
ওষুধ চাই।”

ভগী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রায় মহাশয় বলিলেন, “ডেকে দে ভগী,
ওষুধ না পেলে অম্ল্য বাঁচবে না।”

“বাঁচবে না ?” ব্যগ্রকণ্ঠে ভগী বলিয়া উঠিল, “বাঁচবে না ?”

রায় মহাশয় বলিলেন, “হাঁ, ডাক্তার বন্ডে, এই রাত্রে মধ্য ওষুধ না পেলে
বাঁচান ভার হবে।”

ভগী। কিন্তু তিমুর যে জ্বর বাবাঠাকুর !

রায়। ও সামান্য জ্বর, কিছুই নয়, তুই ডেকে দে।

ভগী মুখ বাড়াইয়া আকাশপানে চাহিল ; দেখিল, সমগ্র আকাশ কালো মেঘে
ভরা, ঝন্ ঝন্ বৃষ্টি পড়িতেছে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ হানিতেছে, পূবে বাতাস হ হ
করিয়া ছুটিয়াছে।

রায় মহাশয় ডাকিলেন, “ভগী !”

ভগী বলিল, “তাই তো বাবাঠাকুর, এই ছুজোগ ।”

রায় মহাশয় অস্থির-কণ্ঠে বলিলেন, “দেবী করিস্ না ভগী, এক দণ্ডে রোগ কত বেড়ে যেতে পারে । আমি ব্রাহ্মণ, আজ এই রাত্রে তোর ছুয়ারে এসেছি, আমার অমূল্যকে বাঁচা ।”

রায় মহাশয়ের গলার স্বরটা ভারী হইয়া আসিল । ভগী ধীরে ধীরে গিয়া ঘরে ঢুকিল ; মুহূ-কোমল-কণ্ঠে ডাকিল, “তিহু !”

“মা !”

“একবার উঠতে পারবি বাপ ?”

“কেনে মা ?”

“রায় ঠাকুর এসেচে । ওনার ছেলের বড্ড ব্যামো, ওষুধ আনতে হুণ-হাটে যেতে হবে ।”

তিহু পাশ ফিরিয়া বলিল, “বুকটা বড্ড ভারী মা ।”

ভগী বলিল, “কি করবি বাব, বামুনের ছেলে বাঁচে না ।”

তিহু ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, বলিল, “বিষ্টি পড়ছে না ?”

ভগী বলিল, “হাঁ, এই কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে নে ।”

ভগী একখানা ছোঁড়া কাপড় তিহুর হাতে দিল । তিহু সেখানা গায়ে জড়াইয়া উঠিল, এবং ঘরের কোণ হইতে লাঠিটা লইয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল । রায় মহাশয় বলিলেন, “আর তিহু, তোকে লঠন আর একটা ছাতা দেব ।”

“আচ্ছা, চল” বলিয়া তিহু উঠানে নামিল । রায় মহাশয় অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, “ভগী, আমার অমূল্য যদি বাঁচে, সে তোর গুণেই বাঁচবে । তোর ধার কখন শুধতে পারব না ।”

ভগী কোন উত্তর করিল না ; সে দুই হাত বুকের উপর রাখিয়া নীরব-নিষ্কন্দ-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল । তিহুকে সঙ্গে লইয়া রায় মহাশয় চলিয়া গেলেন ।

তিহু এখন আর ছেলেমানুষটি নাই, বোল বছরের বুঝা হইয়াছে । সে এখন খাটিয়া পরসা আনে, আনিয়া মায়ের হাতে দেয় । ভগী সেই পরসার ঢেলেকে খাওয়ার, আপনি খায় । আর নিজে ধান ভানিয়া, গোবর কুড়াইয়া বাহা পায়, তাহা জমাইয়া রাখে । ভগীর কষ্ট সার্থক হইয়াছে, ছেলেকে মানুষ করিয়াছে, তাহার হুঃখ বুচিয়াছে ।

লোকে বলে, “তিহুর মা, এবার তিহুর বিয়ে দে ।”

ভগী আহ্লাদের হাসি হাসিয়া বলে, “পাঁচজনে আনীক্বাদ কর মা, বিয়ে দেব বৈকি ।”

ভগী সেই আশাতেই কিছু কিছু জন্মায়। ছই পাঁচ টাকা জন্মিয়েছে, আর কিছু জন্মিয়েই ছেলের বিয়ের চেষ্টা দেখিবে; বো বরে আনিয়া জীবনের সাধ-আহ্বান পূর্ণ করিবে।

(৪)

ভোরের সময় তিমুর আলিয়া ডাকিল, “মা!”

ভগী সারারাত জাগিয়াই বসিয়াছিল। ছেলের সাড়া পাইয়া সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল; ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, “কে রে, তিমুর এলি?”

তিমুর বলিল, “হাঁ, বিছানা ক’রে দে।”

ভগী দেখিল, বৃষ্টিতে তিমুর কাপড়-চোপড় সব ভিজিয়া গিয়াছে, শীতে সর্বশরীর ঠক ঠক কাঁপিতেছে, গা দিয়া ঘেন আগুন ছুটিতেছে, বুকের বাথায় সে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। বিছানা পাতাই ছিল; ভগী ছেলেকে কাপড় ছাড়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

তিমুর সেই বে শুইল, আর উঠিতে পারিল না, কথা কহিবারও শক্তি রহিল না। ভগী ভয় পাইয়া রঘু ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। রঘু ডাক্তার পড়া-শোনা না করিয়াই কেবল স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে ডাক্তারি করিয়া বেড়াইত। সে আসিয়া তিমুর নাড়ী টিপিল, জিভ দেখিল, বুকে চোঙ্গ বসাইয়া বুক পরীক্ষা করিল। তার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, “ব্যারামটা কঠিন, বাতশ্লেয়া জ্বর, একুশ দিন ভোগ। তবে ভয় নাই, শীগ্গীর দু’টো টাকা দে।”

টাকা পকেটে পুরিয়া ডাক্তার ঔষধ দিয়া গেল। তিমুর ঔষধ খাইতে লাগিল, কিন্তু রোগ কমিল না। তিন দিনের দিন বুকের ভিতর হইতে জাঁতার মত শব্দ বাহির হইতে লাগিল, গলার স্বর বন্ধ হইয়া আসিল, ছই হাত দিয়া বিছানা আঁচড়াইতে লাগিল। কেনারাম আসিয়া বলিল, “ক’রেছিন্ কি রে মাগী, এ বে গুলো বিকার।”

ভগী কাঁদিতে লাগিল, কেনারাম তাহাকে টাকার যোগাড় করিতে বলিয়া দুখ-হাটের বড় ডাক্তার রাসবিহারী বাবুকে ডাকিতে গেল।

ভগীর হাতে যে ছই চারি টাকা জন্মিয়াছিল, তাহা তখন রঘু ডাক্তারের পকেটে গিয়াছে। সুতরাং ভগী টাকার জন্ত রায় মহাশয়ের নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়িল।

রায় মহাশয় কিন্তু টাকা দিতে পারিলেন না। তাঁহার নিজের ছেলের ব্যারামে বিস্তর টাকা খরচ হইয়াছে, গহনা বাঁধা দিয়া আজকাল এক পয়সার কম সন্দেশে টাকা পাওয়া যায় না, আর সেসকল টাকা দিলেও ভগীর নিকট হইতে তাহার আর পুনঃ-প্রাপ্তির আশা নাই; ইত্যাদি অনেক কথাই বলিলেন। ভগী তবু ছাড়ে না, কাঁদাকাটা করে। শেষে রায় মহাশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “মব্ মাগী,

কেন টাকা নষ্ট করবি? তিনে কি বাচবে? আমি সব ডাক্তারের মুখে শুনেছি, হাতী আড় করলেও ও ফিরবে না।”

ভগী ফ্যান ফ্যান করিয়া রায় মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রায় মহাশয় তখন সে দিনের রাত্রির পারিশ্রমিকস্বরূপ একটা সিকি ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া গেলেন। ভগী সিকিটা লইল না, কিছুক্ষণ নীরব-নিম্পন্দ-ভাবে বসিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। বাইবার সময় সে দেখিয়া গেল, রায় মহাশয়ের পুত্র অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে, সে বালিশ ঠেস দিয়া বসিয়া বেদানা খাইতেছে।

পথে বাইতে বাইতে ভগী সিংহবাহিনীর মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে পুরোহিত তখন পূজা করিতেছিলেন। ভগী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে লুটাইয়া পড়িল; আর্ন্তকর্মে চীৎকার করিয়া বলিল, “মা গো, আমার তিনেকে বাঁচিয়ে দে মা, তোকে বুক চিরে রক্ত দেব।”

তাহার আকুল কণ্ঠের প্রতিধ্বনি মন্দিরমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুরোহিত তখন উদাত্তস্বরে পড়িতেছিলেন—

“শরণাগতদীনান্ত-পরিত্রাণপরায়ণে ।

সর্বস্বার্থিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥”

(৫)

বড় ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া বলিলেন, “ডবল নিমোনিয়া, জীবনের আশা খুব কম।” ভগী কাদিতে লাগিল, ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখিয়া দিয়া, তদ্বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ভিজিট লইয়া চলিয়া গেলেন। ভিজিটের টাকা কেনারাম নিজের ঘর হইতে আনিয়া দিল। ডাক্তার স্বরূপ তদ্বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, বড় লোকের ঘরেই তাহা সম্ভব, চাঁড়ালের ছেলে তিনুর সেরূপ তদ্বিষয় হইল না। রোগও উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। ভগী কাদিয়া কাদিয়া শুধু ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।

ভগবান্ কিম্ব তাহার ডাকে সাড়া দিলেন না। সাত দিনের দিন মধ্যাহ্নকালে তিনু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। ভগীর বুকফাটা চীৎকারে চাঁড়ালপাড়া কাঁপিয়া উঠিল। কেনারাম আসিয়া ভগীর বুক হইতে তিনুর শব্দেহ ছিনাইয়া লইয়া বাহ করিতে গেল। ভগী হতশাবক কপোতীর মত রাস্তার লুটাইয়া কাদিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময় রায় মহাশয় পুত্রের আরোগ্য জন্ত সিংহবাহিনীর পূজা দিয়া ঢাক বাজাইয়া সেই পথে ফিরিতেছিলেন। ভগী “বাবাঠাকুর গো !” বলিয়া চীৎকার

করিয়া তাঁহার পায়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িল। রায় মহাশয় তন্তুভাবে পশ্চাৎপদ হইয়া হাত নাড়িয়া নিষেধ করিতে করিতে বলিলেন, “ছুঁস্নে, ছুঁস্নে, এখনি মায়ের প্রসাদ সব নষ্ট হ’য়েছিল আর কি!”

ভগী শূন্যদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল। রায় মহাশয় পাশ কাটাইয়া পুত্রের হাত ধরিয়া চলিয়া গেলেন এবং যাইতে যাইতে আনন্দোৎসবসময়ে পথে অশুভ-সন্দর্শন জন্ত মনে মনে সিংহবাহিনীর নিকট পুনরায় পাঠা মানসিক করিতে লাগিলেন।

প্রতিবেশিনী বিমলা আসিয়া ভগীর কাছে দাঁড়াইল এবং সহানুভূতির স্বরে বলিল, “আহা, তিমুর মা, পরের ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের ছেলেটা হারালি!”

ভগী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং চোখ মুছিয়া দূরগত রায় মহাশয়ের ছেলের দিকে চাহিতে চাহিতে বলিল, “আমার ছেলে আমার কপালে গেছে; পরের দোষ কি মা? মা কালী করুক, পরের ছেলে বেঁচে থাক।”

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্যে স্বাভাব্যতা

La nature est pleine de variétés et de moules divers : il y a une infinité de formes de talents. Critique, pourquoi n'avoir qu'un seul patron ?

Sainte-Beuve.

আর সব জিনিষের ছায় সাহিত্যেও তখনই সজীব সচল, তখনই প্রাণে প্রাণে ভরিয়া উঠে—যখন সে বন্ধনহীন, যখন সে স্বচ্ছভাবে খেলিতে পারে, যখন স্বাধীনতার মুক্তির প্রেরণা তাহার মধ্যে তরঙ্গায়িত দূরপ্রসারিত। আপনাকে যথা অভিরুচি ছড়াইয়া দিয়া বত দিক্ হইতে পারে, জীবনের খাদ্য আহরণ করে, তাহাকে পুষ্ট সমৃদ্ধ মহনীয় করিয়া তোলে, নানা ভাবের নানা ভঙ্গিমার বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রতিভাকে বিকশিত করিতে থাকে। জীবনের লক্ষণ বৈচিত্র্য, তাই জীবন্ত সাহিত্যেরও প্রকাশ বহুভঙ্গিম সৃষ্টির মধ্য দিয়া। কিন্তু যখনই আমাদের প্রধান চেষ্টা হয়, বিধিনিষেধের দ্বারা সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিতে, কোন বিশেষ ধারা বিশেষ রীতির মধ্যেই তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে, তখনই আমরা সাহিত্যের মরণসজ্জা প্রস্তুত করিতে থাকি। একথা সত্য, সাহিত্যে চাই অকৃত্রিম, সর্বদাঙ্গসুন্দর, মহত্তম সৃষ্টি, আবর্জনার বাহুল্য কাটিয়া ছাঁটিয়া, একটা সত্যধর্মকে আশ্রয় করিয়াই তাহাকে গড়িয়া তোলা। সে জন্ত প্রয়োজন এক প্রকার আদর্শ, স্বচ্ছাচারের পরিবর্তে একটা সংঘম, গ্রহণ-বর্জনের একটা নিয়ম। কিন্তু সেই আদর্শকে সূত্র-নিবদ্ধ না করাই শ্রেয়ঃ। সৌন্দর্যের প্রতি—রসের প্রতি অকুণ্ঠিত অনুরাগ, উদার গুণগ্রাহিতা জাগাইয়া তোলা এবং প্রত্যেককে আপন আপন অন্তরের কবি-অনুভূতির পথে মুক্তভাবে চলিতে দেওয়া, জীবন্ত স্থায়ী সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে ইহাই আবশ্যক। সাহিত্যের ধর্মকে যখন সঙ্কুচিত করিয়া ফেলি, আদর্শের মধ্যে যখন এইরূপ এক উদার প্রসার পাই নাই, মানব-আত্মাকে কবি-প্রতিভাকে আপন বিসারের জন্ত বহু ও বিচিত্র প্রণালী কাটিয়া লইতে দিই না, মহিষ্ঠ গরিষ্ঠ সত্যধর্মসমবিত্ত করিতে বাইয়া সাহিত্যকে যদি কোন অস্বাভাবিকতার মধ্যে ধরিয়া লইতে চাই, তবে হুই এক জন অমানুষী প্রতিভার মধ্যে সে কৈবল্যমুক্তির আবির্ভাব দেখিলেও দেখিতে পারি ; কিন্তু নীচে সাধারণের মধ্যে সাহিত্যের জীবনমূলটি শুকাইয়া উঠিতেই দেখিব।

উনবিংশ শতাব্দীৰ মধ্যভাগে ভিক্টর হিউগো নথন ফরাসী সাহিত্যে তাৰেৰ ভাৱিমাৰ বিপ্লব ঘটাইতেছিলে, পুৰাতনেৰ সৰ্ব্বোৰ্ণ আভিজাত্যটি ভাঙিয়া স্বাধীনতাৰ স্বাভাৱ্য মুক্ত জীৱনেৰ শ্ৰোত বহাইতে চাহিতেছিলে, তখন পুৰাতনেৰ দল তাৰম্বৰে বলিতেছিলে, হিউগোৰ ভাষা ফরাসীভাষা নহ, তাঁহাৰ কবিতাৰ ফরাসী কবিতাৰ প্ৰাণধৰ্ম নাই, তিনি ক্লাসিক নহেন। ইহাদেৰ মুখপাত্ৰ হইয়া ফরাসী কবি-প্ৰতিভাৰ তথাকথিত কোটিটি অক্ষুণ্ণ ৰাখিবাৰ ক্ষত দাঁড়ান নিসার (Niard)। এই নিসাকে লক্ষ্য কৰিয়া উদাৰদৃষ্টি সমালোচক সেন্সবাত বলিতেছেন, “প্ৰকৃতি বৈচিত্ৰ্যে ভৰা, সেখানে কত ৰকমাৰী ছাঁচ। প্ৰতিভাৰও অনন্ত ৰূপ। তবে সমালোচক, তুমি কেন এক মনিবেৰই দাসত্ব কৰিতে থাকিবে?”

বাস্তবিক পক্ষে ইতিহাস ইহাৰ সাক্ষ্য দেয়, সাহিত্যে যেখানে উদাৰ প্ৰতিষ্ঠা পায় নাই, যেখানেই সাহিত্যসৃষ্টিৰ একটা বিশেষ মানদণ্ড পণ্ডিত-আদৰ্শ স্থাপন কৰিয়াছি, একটা কৌণীন্য গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছি, সেখানে তদনুযায়ী এক মহনীয় মহামন্ত্ৰ সৃষ্টি কৰিতে পাৰিলেও তাহাৰই মধ্যে আবার পতনেৰ বীজ বপন কৰিয়াছি। ইংলেণ্ডে মিল্টন, ফরাসীতে কৰ্ণেই, ৰাসীন, লাভিনে ভৰ্জিল হোৱাস এইৰূপ আভিজাত্যভিমানী কবি, এবং ইহাদেৰ সহিত আমাদেৰ কালিদাস-ভবভূতিৰও নাম কৰা বাইতে পাৰে। ইহাৰা সকলেই ছিলেন ৰাজপৰিষদেৰ গুণিজনেৰ কবি—বিজ্ঞাবান্, মাৰ্জিতবুদ্ধি, পৰিশুদ্ধকৃতি, শোভনকৰ্মী শিল্পী। বাহা গড়িয়াছেন, তাহাকে ঘৰিয়া মাৰ্জিয়া, সূন্দৰ কৰিয়া, ঐশ্বৰ্য্য ভৰিয়া তবে গড়িয়াছেন। তাঁহাৰা ৰচিয়াছেন ৰাজজনোচিত হৰ্ম্যাবলী, মৰ্ম্মৰে বিস্তৃত, মণিমাণিক্যখচিত—সাধাৰণেৰ সেখানে যেন সসম্মেই পদাৰ্পণ কৰিতে হয়। ইহাৰা প্ৰথম পথপ্ৰদৰ্শক, যে আদৰ্শ ইহাৰা স্থাপিত কৰিয়াছিলে, তাহা তাঁহাদেৰ প্ৰাণেৰ অন্তৰাত্মাৰ বস্তু। তাঁহাৰা ছিলেন প্ৰতিভাবান্, তাই তাঁহাদেৰ সৃষ্টি অনবত্তাক, জীবন্ত, মহনীয়—সকলেৰ পূজাৰ্হ। কিন্তু পৰে বাহাৰা আসিয়াছেন, পূৰ্ববৰ্ত্তিগণেৰ আদৰ্শটি সম্মুখে ৰাখিয়াছেন; কিন্তু অন্তৰে সেই একই জলন্ত অন্তৰ্ভূতি ৰাখিতে পাৰেন নাই, তাঁহাদেৰ নিকট সে আদৰ্শ হইয়া পড়িয়াছে শাস্ত্ৰবিধান—কষ্টকল্পনামাত্ৰ। সাহিত্যেৰ ধাৰাটি শিষ্টাচাৰটি অক্ষুণ্ণ ৰাখিতে গিয়া হাৰাইয়াছেন স্বাভাৱ্য, নিজেৰ প্ৰাণেৰ উপলক্ষি; হাৰাইয়াছেন সাহিত্যসৃজনেৰ মূলমন্ত্ৰটি। তাই দেখি, মিলতনেৰ পৰেই পোপ, কৰ্ণেই’ৰ পৰেই বোদ্রাগো, ভৰ্জিলেৰ পৰেই ওভিদ ষ্টাস, কালিদাসেৰ পৰেই ভটি বাণভট্ট।

লাতিন ও গ্ৰীক সাহিত্যেৰ তুলনা এই প্ৰসঙ্গে খুবই শিক্ষাপ্ৰদ। গ্ৰীকেৰ সৌন্দৰ্য্য-বোধ—ৰসবোধ ছিল উদাৰ-বিস্তৃত। তাহাদেৰ দৃষ্টিৰ মধ্যে ছিল একটা ব্যাপকতা, নমনীয়তা—উহা চলিত স্ৰবলগ্নিত তরঙ্গতঙ্গে। তাহাদেৰ কবিত্বপ্ৰতিভাৰ যুক্তিৰ

দূরপ্রসারিত অবকাশ, স্বচ্ছন্দগতির বিচিত্র ভঙ্গিমা। অন্তর্পক্ষে বীরকর্মী বস্তুতাত্ত্বিক লাতিন জাতির মধ্যে ভাবুকতার, কল্পনাশ্রিয়তার সে লীলায়িত রোধাপাতের নৈপুণ্য ছিল না। তাহারা জিনিষকে দেখিত ক্ষুদ্রদৃষ্টিতে, জিনিষকে ধরিতে চাহিত জিনিষের যে স্পষ্ট ফুট সহজগ্রাহ্য অঙ্গ, তাহার সহারে। কাটিয়া ছাঁটিয়া, ঘসিয়া মাজিয়া সব পদার্থকে একই ছাঁচে গড়িতে তাহাদের আনন্দ। বিজয়ী জাতি তাহারা—বহুজাতি, বহুদেশ, বহুধর্মকে পিষিয়া এক মহাজাতি, মহাদেশ, মহাধর্মের পরিণত করিতে চাহিয়াছিল, সব অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিল এক নামে—রোম। সাহিত্যেও তেমনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল একটা আদর্শ—বীরের গম্ভীর আরাব, বিজয়ীর দৃষ্ট তেজস্ ওজস্, সেনানীর মুখে সে আদেশ-বাণীর অক্ষরকার্পণ্য, রাজাশাসনের কঠোর স্পষ্টতা, বাগ্মিতার ধীর প্রসারিত পূর্ণতা। প্রাকৃতজনের (plebs) হাবভাবে কথায় চিন্তায় যে সহজবিগলিত গডালিকা-প্রবাহ, যে সদা-চঞ্চল উচ্ছ্বলগতি, তাহাকে রোম অবহেলার চক্ষেই দেখিয়াছে। সে চাহিয়াছে আভিজাত্যের (Patricii) গুরুতার গাম্ভীর্য। আর রোমনগরী যে আদেশ প্রচার করিয়াছে, যে আদর্শ দেখাইয়াছে, সমস্ত রোমসাম্রাজ্য তাহাকে অবনত-মস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে—তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া কেহই রোমক নামের অমর্যাদা দেখাইতে সাহস পায় নাই। সাহিত্য হউক অথবা রাজনীতি সমাজনীতি যাহাই হউক, সকল ক্ষেত্রে একমাত্র গুরু রোমনগরী। গ্রীক কিন্তু তাহার প্রতিভাকে এইরূপ একই কেন্দ্রে সম্পৃতিত করিয়া রাখে নাই। রোমনগরীর জ্ঞান এথেন্স গ্রীক-সভ্যতার তেমন সর্বগ্রাসী কেন্দ্র হইয়া পড়ে নাই—বতটুকু হয়, তাহা বহু পরে। গ্রীসের প্রত্যেক প্রদেশই একটা স্বাভাবিক—একটা জাগ্রত বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ভাবকে একই প্রকরণে ঢালে নাই, ভাবকেও কোন একটি ধারায় আবদ্ধ রাখে নাই। প্রত্যেকেরই আপন আপন প্রেরণা ও ভঙ্গিমার স্বতঃস্ফুরণে এমন বিচিত্র মহনীর গ্রীক-সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। এই স্বাধীনতা, এই বৃদ্ধ অঙ্গসঞ্চালনের অভাবে লাতিন সাহিত্য অল্প দিনেই পশু হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রকৃত প্রতিভা দেখাইয়াছে দুই একটি বিষয়ে মাত্র। গ্রীস কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত দিকে, কত বিষয়ে, সাহিত্যের কত প্রকরণে আপনাকে বিকশিত করিয়া দিয়াছে।

সাহিত্যে উচ্ছ্বলতা-দোষও যেমন আছে, ঠিক শুচিদোষও তেমনি আছে। সাহিত্যকে যাহারা রমণীয়, মহনীর, পরিভ্রম করিয়া তুলিতে চাহেন, তাহাদের মধ্যে এক দলের এই শুচিব্যাধি খেলিয়াছে রূপ বা গড়নটি লইয়া। নামে তাহাদের লক্ষ্য classic manner, বস্তুতঃ কিন্তু তাহারা জড়াইয়া পড়েন আভিজাত্যের ঠাটটি লইয়া। সাহিত্যে আভিজাত্য চাই, কিন্তু প্রধানতঃ তাহা অন্তরাঙ্গার আভি-

জাত্য। classic soul বাহ্যিক, classic manner তাঁহাই সহজসিদ্ধি। মহিষ্ঠ গরিষ্ঠ বলিয়া বিশেষ একটি কোন ধাৰা নাই। কাব্যের আত্মপরিষ্করণ, বিশ্ব কবির কবিত্বশক্তি বহুৰূপী। তাহাকে দুই এক জন কবির বা দুই একটি কবিসংজ্ঞার ভঙ্গিমায় আবদ্ধ রাখা চলে না। বিষ্ণুর মত কবিত্বপ্রতিভাও “অনবধা-রণীৰমীদুস্তয়া রূপমিয়ন্তয়া বা।” আমাদের শাস্ত্রে ছত্রচামরা দি কয়েকটি বক্তৃতাৰ চিহ্নৰূপ নিৰ্দিষ্ট হইয়াছে। সাহিত্যৰাজকেও যে সেইৰূপ কোন বিশেষ পরিচ্ছদ বা চিহ্নে মণ্ডিত কৰিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। যখন বলি, মহাকাব্যে এতগুলি সৰ্গ থাকিবে, নাটকে এতগুলি অঙ্ক থাকিবে, নাটকের এই এই গুণ থাকিবে, এই এই উপমা দিতে পারিবে, আরগুলি পারিবে না অথবা আখ্যানিকায় আখ্যানবস্তুটির প্রথম হইতেই আরম্ভ কৰিবে, মাঝখান হইতে (“in medias res”) পারিবে না, তখন যে কিৰূপ সাহিত্যসৃষ্টি হয়, তাহা বলা নিশ্চয়োজ্ঞ। সাহিত্যে আর এক গুণবিষয় আছে—এটি আধুনিক যুগেই দেখা দিয়াছে, তাহা হইতেছে সাহিত্যের উপর “নীতিকতা”, ধাৰ্মিকতা, শীলতার দাবী। সাহিত্যের মুক্ত বিকাশ যদি চাই, তবে এ বন্ধনটিও কাটিতে হইবে। জীবন্ত কি মৃত, কোন ভাষাতেই এ উদাহরণ পাই না যে, শীলতা, সাধুতা, এমন কি, আধ্যাত্মিকতার পদতলে সাহিত্য আপনাকে নিগড়িত কৰিয়াছে। ফরাসীৰ কথা ছাড়িয়াই দিলাম, লাতিন সাহিত্য—বাহ্যিক আদৰ্শে এতখানি শোভনতা, বাহ্যশীলতা, গুরুগম্ভীরতার স্থান, সেখানেও উদ্ভূত হইয়াছেন কাতুল (catullus) ওভিদ। আর সংস্কৃত লৌকিক সাহিত্যের ত কথাই নাই, বৈদিক ঋষিদিগের আধ্যাত্মিকতা ব্যাখ্যানের মধ্যেও এমন কথা পাই—আধুনিকগণ বাহ্যকে অশ্রাব্য বলিয়াই নির্দেশ কৰিবেন।

সাহিত্যের আত্মার স্বাধীন উন্মুক্ত গতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ শেক্সপীয়ার। শেক্সপীয়ার আলংকারিক হউন আর নৈতিক হউন, কোন শৃঙ্খলেই আপনার প্রতিভাকে বাধিয়া রাখেন নাই। ক্লাসিকের আত্মস্থ গাম্ভীৰ্য্য, রোমাণ্টিকের উচ্ছ্বসিত প্রগল্ভতা, জ্ঞানিগুণিজনমূলভ মার্জিত বাক্যবিন্যাস ও ধীর চিন্তাশীলতা, প্রাকৃত জনের দোলাচলচিত্তবৃত্তি ও তদনুরূপ কথাভঙ্গি—সকলের মধ্য দিয়া তাঁহার সৃষ্টি সকল রসের আধার এক বিরাট মহাসাগর-তুল্য। শেক্সপীয়ারের কবিপ্ৰেরণা প্রকৃতির মতনই অবাধে অজস্রগতিতে আপনাকে ছুটাইয়া দিয়াছে, তাই তাহাতে এত বৈচিত্ৰ্য, তাই তাহা এত জীবন্ত। পিউরিটান কবি মিল্টনের উপরেও তাই শেক্সপীয়ারের স্থান। শেক্সপীয়ারের জ্ঞান মোলিগেরও কোন বিশেষ মতবাদ বা শাস্ত্রদায়িকতার মধ্যে আপনাকে ধরা দেন নাই। তাঁহার প্রতিভায় কচির উদার-

প্রসার লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। রাসীনের সে পরিপাটী আভিজাত্য, কর্ণেই'র সে গর্কোন্নত মহীয়ত্ব, তাহাদের মধ্যে পাই কেমন একটা সঙ্গীর্ণতা। সেই জন্তই মৌলিয়ারকে তাঁহাদেরও উপরে স্থান দিতে ইচ্ছা হয়।

কাব্যসৃষ্টির মূল কথা এইখানে, আখ্যানবস্তুর যে মূল্য থাকুক না, ভঙ্গি-
কার যে মর্যাদা থাকুক না, সকলের উপরে হইতেছে কবির সে নিগূঢ় অনির্কচনীয়
শক্তি—আত্মার তপঃ-অভিব্যঞ্জনা। এই মূল শক্তিটির আধার যে কবি, তিনি
সহজেই তাঁহার সকল ভাব, সকল ভঙ্গিমাই এক নৈসর্গিক আভিজাত্যে মণ্ডিত
করিয়া তুলিয়াছেন। ফলতঃ আমরা মনে করি, কবির এই মৌলিক উৎসটি
হইতে যখন আমরা দূরে চলিয়া যাইতেছি, যখন আত্মার সে স্বাধীন বিহার-প্রাঙ্গণ
সঙ্কুচিত হইয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে, তখন কবির ত্রাণগাধর্য রক্ষা
করিবার নিমিত্ত বিশেষ আদর্শ, বিধিনিষেধ স্থাপন করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি,
তখন কবিশক্তির একটা বিশেষ প্রকরণ স্থিরনির্দেশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি।
উদারতা প্রসারতা যখন হারাইতে বসিয়াছি, তখন একটা বিশেষ অঙ্গকেই অতিকার
করিয়া তুলিয়াছি। সাগরের অনন্ত বিস্তারের পরিবর্তে চাহিয়াছি শৈলশিখরের
উত্তম সৈধ্য, মর্ম্মরের দৃষ্ট শোভনীয়তা। সেই জন্তই বোধ হয়, সফোক্লা হইতেও
হোমর গরীয়ান, কালিদাস হইতেও বাণীকি গরীয়ান। কিন্তু ব্যক্তিগত
হিসাবে বাহাই হউক না, সমগ্র একটি জাতির সাহিত্য যদি এইরূপ একমুখী
এক আদর্শায়ুযায়ী হয়, তবে সে সাহিত্য শুকাইয়াই উঠিবে। আমাদের সংস্কৃত
সাহিত্যেও ইহাই ঘটয়াছে। যে দিন মাছুষের আগে বসাইয়াছি শিল্পীকে, যে
দিন কেবল অভিরূপভূষ্টি পরিষদের জন্তই কাব্য সৃষ্টি করিয়াছি, সেই দিন
হইতেই সংস্কৃত সাহিত্য ক্রমে ক্রমে লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে আরম্ভ করিয়াছে,
অবশেষে পাণ্ডিত্যের তর্কের শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া বাষ্প হইয়া উড়িয়া
গিয়াছে।

যথার্থ কাব্য, মহনীয় সাহিত্য, প্রকৃত আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে কোন
বিশেষ আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া নয়, কালিদাস, বাণীকি বা বৈদিক কবির পন্থাটি
দেখাইয়া নয়; কিন্তু সমগ্র জাতির নিগূঢ় সারস্বত প্রতিভাকে জাগাইয়া তুলিয়া।
প্রাচীন গ্রীসে আপামর এইরূপ গুণী ছিল, সকলেই মার্জিতরুচি, উচ্চতাবের
ভাবুক, সমস্ত জাতিটি—দেশটিই ছিল বাণী দেবীর জীবন্ত বিগ্রহ। সফোক্লার
নাটক দেখিতে দলে দলে লোক—সাধারণ লোক সব—এথেন্সের রঙ্গালয়ে ছুটিত।
বর্তমান যুগে সুলভ অপেরা দেখিতে আবালবৃদ্ধবনিতার যেমন আগ্রহ, উৎসাহ,
পরিতৃপ্তি, আন্তরিকতা দেখিয়া গ্রীসের জনসম্মত তেমনি উদ্বেলিত হইয়া উঠিত,

তদপেক্ষা গভীৰভাৱেই নাট্যৰসেৰ আনন্দ উপভোগ কৰিত। গ্ৰীসেৰ Intelligentsia গুণিসম্বাদ ছিল সমস্ত গ্ৰীকজাতি। গ্ৰীসেৰ বহুবলৱিত সাহিত্য-প্ৰতিভাৰ ইহাই মূল। প্ৰকৃত সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে হইলে, তাহাৰ বিচিত্ৰ বিপুল বিকাশ দেখিতে হইলে ৰাজনীতিও যেমন Peuple Roi, সাহিত্যও তেনেই গড়িয়া তুলিতে হইবে Peuple Intelligentsia. ইউৰোপে ৰেনেসাঁসেৰ যুগে আবার ৰোমান্টিকেৰ যুগে এইৰূপ একটা বিপুল Intelligentsia'ৰ উদ্ভব হইয়াছিল, ইউৰোপেৰ শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি এই দুই স্ৰোতৰ মুখে।

ত্ৰিনিগুনীকান্ত গুপ্ত।

বিরহে পাগল

রাজা উর্সনীকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। ভরতমুনির শাপে উর্সনীও বর হই-
রাছে। দেবরাজ ইন্দ্র উর্সনীকে রাজার হাতে হাতে ন্যপিত দিয়াছেন। পাটরাণী
সতীনপনা ভুলিয়া উর্সনীকে ভগিনী বলিয়া মনে করেন। সুতরাং রাজা ও উর্সনী
দুইয়ে এখন এক। রাজা যদি মহাদেব হইতেন, হয় ত অর্ধনারীশ্বর মূর্তি হইয়া
যাইতেন। এ প্রণয়-মিলনে যে সুখ, রাজার তাহার চরম হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু
রাজধানী আর ভাল লাগিতেছে না। এখানে লোকজন অনেক, কাজকর্ম অনেক,
ব্যাঘাত অনেক; সুতরাং এ জায়গাটা ছাড়িতে হইবে। এমন জায়গায় যাইতে হইবে,
যেখানে রাজা দেখিবেন উর্সনী, আর উর্সনী দেখিবেন রাজা। তবেই তো মিলনের
চরম হইবে! তবেই তো বৈতভাবে অধৈতজ্ঞান হইবে! জায়গাটাও মনোরম
হওয়া চাই; নেহাৎ মরুভূমিতে হইবে না, বনে জঙ্গলে হইবে না, পাহাড়-
পর্বতেও হইবে না। যেখানে ক্রেশ, কষ্ট, দুঃখ, শ্রম, ক্লান্তি, ইহার একটিও
থাকিবে অথবা একটুও থাকিবে, সেখানেও অধৈতজ্ঞানের ব্যাঘাত হইবে।
তাই উর্সনী স্থির করিলেন, গন্ধমাদন যাইতে হইবে। বরফের পাহাড়ের নিকটে,
অথচ তত শীত নহে, তত বরফ পড়ে না, এমন জায়গায় গন্ধমাদন নামে এক পর্বত
আছে। পর্বতের গায়ে, পাশে, মাথায় কেবল ফুল ফুটিয়া আছে। ফুলের গন্ধে যে
শুধু চারিদিক আমোদ করিয়া আছে, এমন নহে; এ গন্ধে লোকেও পাগল হয়।
কেহ কেহ বলে, সেখানে গেলে লোকে কেবল হাসিতে থাকে; এত হাসি হাসে
যে, হাসিতে হাসিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে। ফুলের ধূলায় আকাশ ভরিয়া যায়।
বদরিকাপ্রমের উত্তরে বরফের পাহাড়ের ঠিক নীচে এইরূপ একটি পাহাড় আছে,
উহাকেই গন্ধমাদন বলে। শীতকালে বরফ পড়ে। গরমের সময় বরফ গলিয়া
গিয়া নানারূপ সুগন্ধি ফুলের গাছ গজাইয়া উঠে। বর্ষায় যখন ফুল ফুটে, তখন
গন্ধমাদন নামটি সার্থক হয়।

উর্সনী রাজাকে বলিলেন, 'চল আমরা দুজনে গন্ধমাদন যাই। সেখানে
আমাদের সঙ্গে আর কেহই থাকিবে না। রাজ্যের ভার মন্ত্রীদের উপর দাও;
নিশ্চিন্ত হইয়া আমরা দুজনে সেখানে থাকি। চাকর-চাকরানী, খানসামা,
খিদমদগার কিছুই দরকার নাই। তোমার সঙ্গে কেবল থাকিবে তোমার

অপরূপ রূপ, আর সে রূপ দেখিবার জন্য থাকিবে কেবল আমার হৃদি চক্ষু। সে পাহাড়ের উপর দিয়া একটি নদী ধীরে ধীরে বহিতেছে; ধীরে ধীরে বহিতেছে বলিয়া দেবতার। তাহার নাম রাখিয়াছেন মন্দাকিনী। মন্দাকিনীর দুই দিকে এখন প্রকাণ্ড চড়া, সে চড়ায় কেবল বালি। চল, সেই চড়ায় গিয়া আমরা বেড়াই। প্রণয়ের মিলনের সেই তো স্থান।’

সমস্ত গ্রীষ্মকালটা রাজা ও উর্ষনী মন্দাকিনীর তীরে গন্ধমাদন পর্বতে একে-বারে জনশূন্য স্থানে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। সমস্ত জগৎ-হইতে তফাৎ হইয়া তথায় তাঁহারা দুজনেই—নূতন জগৎই বল, আর নূতন স্বর্গই বল, বা নূতন বৈকুণ্ঠই বল, নূতন সুখাবতীই বা বল, গড়িয়া লইলেন।

তাঁহারা কিরূপে সেখানে কালযাপন করিয়াছিলেন, কবি কালিদাস সে কথা বলেন নাই। কিন্তু সেটা সকলেই মনে মনে আঁচিয়া লইতে পারেন। কিন্তু চিরদিন কখনও সমান যায় না। গ্রীষ্ম যায়—বর্ষা আসে, এমন সময় একটি বিস্তা-ধরের মেঘে দৈবক্রমে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজা একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, উর্ষণীর এটুকুও সহ্য হইল না। সেখানে ভালবাসার মাত্রাটা বড় বেশী, সেখানে রাগের মাত্রাও খুব বেশী। আমি যাহাকে ভালবাসি, সে আর একজনের দিকে চাহিবে! উর্ষণী তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। রাজা অনেক অনুন্নয়-বিনয় করিলেন, উর্ষণীর রাগ পড়িল না। তিনি রাগে গর-গর হইয়া মন্দাকিনীর বালির উপর দিয়া চলিলেন; রাজাও সঙ্গে সঙ্গে বাইতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। অনেক দূর গিয়া উর্ষণী একটি বাগান দেখিতে পাইলেন। তিনি যেমন বাগানে ঢুকিতে গেলেন, অমনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

রাজা চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, কোথাও উর্ষণী নাই। রাজা তখন একা—একেবারে একা। একজন সঙ্গী ছিল, তাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। এ যে ভয়ানক একা! তাহার উপর গন্ধমাদনের গন্ধ। সে গন্ধে অন্য লোক তো একেবারেই পাগল হয়। তাহার উপর এই অসুখ বিরহ! মিলনের আশাও নাই। কালিদাস একবার এইরূপ বিরহে ফেলিয়া একটি বেচার। যক্ষকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিলেন; তাই সে জড় পদার্থ মেঘকে দূত করিয়া আপন স্ত্রীর নিকট খবর পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার তো আশা ছিল, বৎসরের পর আবার মিলন হইবার আশা ছিল। সে সেই আশার বুক বাধিয়া বাঁচিয়াছিল, তবে বর্ষা আসায় তাহার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গিয়াছিল; তাই সে একটু পাগলামী করিয়াছিল। কিন্তু এবার তো সে আশা নাই। উর্ষণী অপরূপ, সে অদৃশ্য হইয়া গেল, কোথায় গেল, তাহার ঠিকানা নাই।

যদি আসে তো কবে আসিবে, তাহার ঠিকানা নাই, তাহাতে স্থানটা গুরুমাদন, আবার বর্ষা আসিতেছে। সুতরাং রাজা একেবারে পাগল হইয়া গেলেন—উন্মাদ পাগল হইয়া গেলেন। এ দিকে উর্ধ্বশী ও দিকে উর্ধ্বশী ভাবিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দিন-রাত্রি নাই, কেবল ছুটাছুটি। এগন সময়ে মেঘ উঠিল। রাজার বা ষেটুকু জ্ঞান ছিল, তাহাও লোপ হইল। ভালবাসার সানখী কাছে থাকিলেও মেঘ উঠিলে মনটা কেমন কেমন করে, কি যেন হারাইয়াছি, হারাইয়া যেন সব অন্ধকার দেখিতেছি বলিয়া মনে হয়; তাহা পাইব কি না ভাবিয়া অধীর হইতে হয়। রাজা বেরূপ অবস্থায় পড়িয়াছেন, তাহাতে তিনি যে পাগল হইবেন—উন্মাদ হইবেন—হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইবেন—সব উন্টাপান্টা করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি?

কালিদাস মেঘদূতে বক্ষকে পাগল করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পাগল সাজাইতে পারেন নাই। এখানে রাজাকে পাগল সাজাইয়াছেন। বিক্রমোর্ধ্বশীর চতুর্থ অঙ্কের আরম্ভেই লিখিয়াছেন—“ততঃ প্রবিশতি উন্মত্তবেষো রাজা” রাজা উন্মত্ত অর্থাৎ পাগলের বেশে প্রবেশ করিলেন। কোন কোন পুথিতে রাজা যে আসিতেছেন, সেটা জানাইয়া দিবার জন্য একটি প্রাকৃত গান আছে। গান যে কে গাহিল, তাহার নির্ণয় নাই, বোধ হয় যেন নেপথ্য হইতেই কেহ গাহিয়া দিল, কিন্তু নেপথ্যে বলিয়া যেমন অস্ত্র অস্ত্র জায়গায় লেখা থাকে, তেমন লেখা কিছুই নাই। তাই পণ্ডিতেরা মনে করেন, এ পুথির পাঠ ঠিক নয়। নাই হউক ঠিক; কিন্তু উহাতে রাজার পাগল-বেশের একটা বর্ণনা আছে। গানে বলিতেছে—

“হাতী আপন ভালবাসার বিরহে উন্মাদ হইয়াছে, নানারূপ উন্টাপান্টা পাগলামীর লক্ষণ দেখাইতেছে। গাছের পাতা আর ফুল ছিঁড়িয়া দেহের সম্মুখভাগটা সাজাইয়াছে, আর বনের ভিতর ঢুকিতেছে।” গান গাওয়ার পরই রাজা আসিলেন। তাঁহার দৃষ্টি আকাশের দিকে, সেটা একটা পাগলেরই লক্ষণ—সাজগোজ ও পাগলের মত। আসিয়াই রাগে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—“রে ছুরায়া রাক্ষস, তুই আমার ভালবাসার জিনিস চুরি করিয়া কোথায় ঘাইতেছিস?” খানিক এদিক ওদিক দেখিয়া আবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—“পাহাড়ের আগা থেকে আকাশে উঠিয়া আমার উপর তীর ছুড়িতেছিস?” খানিক পরে ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন,—“হায় হায়! এ ত ছুরায়া রাক্ষস নয়, এ যে নূতন মেঘ। এ ত ধনুক নয়, এ যে রামধনু। এ ত বাণ নয়, এ যে বৃষ্টির ধারা। এ ত উর্ধ্বশী নয়, এ যে বিদ্যুৎ, যেন কষ্টিপাথরে সোনার দাগ।”

বোধ হয়, বৃষ্টির ধারা পাগলের মাথায় পড়ায় সে একটু স্তম্ভ হইল। তাহার জ্ঞান কতকটা ফিরিয়া আসিল। সে তখন টের পাইল, বাহা রাক্ষস ভাবিয়াছিল, তাহা

রাক্ষস নয়, বাহাকে উর্ধ্বশী ভাবিয়াছিলাম, সে উর্ধ্বশী নয়। যে পুথির কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাহাতে এইখানে রাজা মুচ্ছিত হইয়া পড়েন লেখা আছে, আপনার ভ্রম বুঝিয়া নজ্জিত হন লেখা আছে, মেঘের কাছে নাপ চাওয়ার কথা লেখা আছে, আরও কত কি কথা আছে; কিন্তু সে সব কথা এখন আর বলিব না। যদি বারান্তরে সে সকল পুথির কথা বলিতে পারি, বলিব। এখন রাজার পাগলামীটি কালিদাস যেমন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, তাই বলি। তবে যখন অন্য পুথির কথা পাড়িয়া রসভঙ্গ করিয়াছি, তখন একটা কথা বলিয়া রাখি যে, আমরা ঐ বাড়তি কথাগুলি কালিদাসের বলিয়া বিশ্বাস করি না, তাহার কারণ এই, কালিদাস কখন কোন বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করেন না। তিনি বেশ জানিতেন, সব অত্যাচার সহ্য যায়—রাজার অত্যাচার সহ্য যায়, ধর্মের অত্যাচার সহ্য যায়, পুলিশের অত্যাচার সহ্য যায়, ভালবাসার অত্যাচার সহ্য যায়; কিন্তু কবির অত্যাচার সহ্য যায় না। কবি যে কথাটি তাঁহার ভাল লাগিয়াছে, সেইটি ফেনাইয়া ফুলাইয়া বাড়াইয়া লোকের উপর অত্যাচার করিবেন, এটা কেহই সহিবে না। তাই কালিদাস কখনও কোনও জায়গায় বাড়াবাড়ি করেন নাই। আর বাড়াবাড়ি করেন নাই বলিয়াই আজ তাঁহার এত আদর। তিনি “জগতের কালিদাস” হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। রাজা বলিলেন,—“তাই ত, এ যদি মেঘ, রাক্ষস নয়; ওটা যদি বিছাৎ, উর্ধ্বশী নয়; তবে উর্ধ্বশী গেল কোথায়? সে ত অঙ্গরা; বড় রাগ হইয়াছে বলিয়া কি দেবশক্তিতে লুকাইয়া আছে? তা ত হ’তে পারে না। সে ত বেশীক্ষণ রাগ করিয়া থাকে না। তবে কি সে স্বর্গে চলিয়া গেল? সেও ত হ’তে পারে না, আমার উপর তার যে বড় টান। তবে কি তাহাকে কেহ হরিয়া লইয়া গিয়াছে? সেও ত হ’তে পারে না, অম্বরেও আমার কাছ থেকে তাকে হরিয়া লইয়া বাইতে পারে না। তবে তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না কেন? এ ব্যাপারটা কি?” রাজা একবার এদিক্, একবার ওদিক্, একবার ডাহিনে, একবার বামে দেখিতে লাগিলেন আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—“যাদের ভাগ্য মন্দ, তাদের ছুঃখের পর ছুঃখই আসে। এই দেখ না—একে ত উর্ধ্বশী কাছে নাই, আমি যাতনার ছট্‌ফট্ করিতেছি, তাহার উপর আবার মেঘ দেখা দিতেছে। দিনে আর গরম থাকিবে না, আমায় সমস্ত দিনই বিরহেই কেবল ছট্‌ফট্ করিতে হইবে। তাই বা কেন হইবে? কেনই বা কষ্ট পাইব? মূনিরা ত বলেন, ‘রাজা কালস্ত কারণম্।’ আমিই যদি কালের কারণ হইলাম, আমি কেন বলি না, বর্ষা, তুমি এখন আসিও না। তাহা হইলেই ত সব চুকিয়া যায়। কিন্তু তাও কি হয়? আমি যে রাজা বনে একলা রহিয়াছি, তবুও ত আমি রাজা। আমার ত রাজার চিহ্ন কিছুই নাই; কিন্তু বর্ষাকালে আমার সব রাজচিহ্ন আনিয়া দিতেছে। দেখ না, মেঘ আমার চাঁদোয়া

হইয়াছে। রাজার চাঁদোরায় সোনার কাজ করা থাকে; বিজ্ঞাণ্ডুলিই সে সোনা-
লির কাজ। রাজার চামর থাকে; হিঙ্গল গাছের বড় বড় মঞ্জরীগুলি চামরের
কাজ করিতেছে। রাজার ভাট—চারণ থাকে; মেঘের ডাক শুনিয়া ময়ূরেরা ডাকি-
তেছে, তাহাতেই ভাট-চারণের কাজ হইতেছে। সওদাগরেরা রাজাকে ভেট দেয়;
পাহাড়গুলিই সওদাগর হইয়াছে আর পাহাড়ের গা ধুইয়া কত কি আমার নিকটে
আসিয়া পড়িতেছে, তাহাই আমার ভেট হইতেছে।

দূর হউক ছাই, ও সব কথা আর ভাবিব না। বেশভূষার গরব ক'রে আর কি
হবে? যাই, তাহারই সন্ধান যাই—বার বিহনে সব অন্ধকার দেখিতেছি। এদিক্
ওদিক্ দেখিতে দেখিতে একটি ভূঁই-চাঁপা ফুল রাজার চোখে পড়িয়া গেল, তাঁহার বোধ
হইল যেন, তাঁহার “ভালবাসা”র চোখটি দেখিতে পাইলেন। রাগে যেন উর্বশীর চোখে
জল আসিয়াছে, আর চোখের কোণ লাল হইয়া উঠিয়াছে। ভূঁইচাঁপার পাপড়ীগুলি
একটু লালচে হয়, আর বর্ষার তাহার ভিতরে জল থাকে। ভূঁইচাঁপা দেখিয়া রাজা
অধীর হইয়া উঠিলেন;—বলিলেন, তিনি যে কোন্ পথে গিয়াছেন, কেমন করিয়া টের
পাইব? বনের বালিতে বর্ষার জল পড়িয়াছে, তাহার উপর দিয়া যদি তিনি চলিয়া
যাইয়া থাকেন, তাহা হইলে ত তাঁহার পায়ের দাগ দেখিয়াই চিনিতে পারি। কারণ,
সে দাগটি পিছন দিকে গভীর হইবে, আর সে দাগের পাশে আলতার দাগ
থাকিবে।

এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া, আনন্দে আটখানা হইয়া রাজা বলিলেন, “বাঃ, বাঃ! পেয়েছি
—পেয়েছি। এই যে তাঁহার বুকের কাপড়, সবুজ চেলি, ঠিক যেন শুক পাখীর পেটের
রঙ। রাগে যখন তাঁর চোখের জল পড়িয়াছে, সে জল ঠোঁটের উপর পড়িয়াছে।
লাল রঙকরা ঠোঁটে লাল রঙ গলিয়া সে জল লাল হইয়া গিয়াছে, আর বুকের কাপড়ে
পড়িয়াছে। বোধ হয়, রাগে চলিয়া যাইবার সময় কাপড়খানি খসিয়া পড়িয়াছে।”
বেশ করিয়া কাপড়খানি রাজা ঠাহরাইয়া দেখিলেন আর বলিয়া উঠিলেন, “হায়
হায়! এ যে কাপড় নয়, ঘাসের জমীর মাঝে মাঝে ইন্দুকীট রহিয়াছে।”

ইন্দুকীট নামে রাঙা রাঙা ছোট্ট ছোট্ট এক রকম পোকা আছে। বর্ষার প্রথম
ভাগে তাহার গাঠের অনেক জায়গা ছাইয়া থাকে। ঘাসের জমীর উপর ইন্দু-
কীটের ঝাঁক পড়ায় সবুজ চেলির উপর রঙ গোলা চোখের জলের মত বোধ
হইতেছিল।

এ নির্জন বনে কাহার কাছে তাহার সন্ধান পাই বলিয়া পাগল চারিদিকে চাহিতে
লাগিল; দেখিল, একটা ময়ূর, বর্ষার জলে যে জায়গায় শিলাজতু ভিজিয়া রহিয়াছে,
তাহারই একটা পাখরের উপর আনন্দেতে বাড় উচা করিয়া কেকা রব করিবার

চেঁটার আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “ময়ূর হে, তুমি কি আমার প্রিয়াকে দেখিয়াছ ? সে এই বনে কোথায় আছে কি বলিতে পার ?”

গেল বা ! আমার কথার জবাব না দিয়াই নাচিতে লাগিল । নাচে কেন ? কিসে ওর এত আনন্দ হয়েছে ? বুঝেছি—বুঝেছি, আমার ভালবাসার ধন নাশ হইয়াছে, ময়ূরের বড় আনন্দ । এত দিনে উহার পেখমের আর কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না, তাই এত আনন্দ । উর্ধ্বশীর খোঁপা যখন খুলিয়া যাইত, আর তাহার কুলগুলি দেখা যাইত, তখন যে কেহও ময়ূরের পেখমের দিকে চাহিতও না । আজ সে নাই, তাই এত আনন্দ । যাক্ যাক্, পরের হুঃখে যার সুখ, সে পাষাণকে কোন কথা আর জিজ্ঞাসা করিব না ।

বাঃ ! এই যে এদিকে একটি কোকিলা জামগাছের ডালে বসে আছে । আজ ওর ভারি আনন্দ ; গীত শেষ হইয়াছে, বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে । পাখীর মধ্যে কোকিলই পণ্ডিত, আমি ইহাকে জিজ্ঞাসা করিব ।

ওহে কোকিল, তুমি ত মদনের দূত, মান ভাঙাতে তোমার মত এ ছনিয়ায় আর কে আছে ? হয় তাকে আমার কাছে এনে দাও, না হয় আমার তার কাছে নিয়ে চল । কি বল্লে ? আমি তাকে এত ভালবাসি, তবে সে কেন চলে গেল ? শোন তবে, সে চটেছে ; কিন্তু কেন, সে কথা আমি বলিতে পারি না । আমি তার কাছে এতটুকুও অপরাধ করি নাই । স্ত্রী ত স্বামীর প্রভু, যা খুলী করিতে পারে, অপরাধের অপেক্ষা তাঁর নাই ।

এ কি ? কথা কহিতে কহিতে আপনার কাজে মন দিলে ? পরের হুঃখ যতই বড় হউক, সেটা ঠাণ্ডা । নহিলে আমি এই এত হুঃখ জানাইতেছি, আমার কথার কান না দিয়া কোকিলটা জামের ডাঁশা ফল চুষিতে লাগিল—মনে করিয়াছে বুঝি ওর প্রিয়ার অধর ।

যা হোক, ওর স্বরটি বেশ মিষ্ট—যেন উর্ধ্বশীর কণ্ঠস্বর । ওর উপর রাগ করিয়া আর কি করিব ? বাই, অন্ত দিকের দৈখি গে ।

ডান দিকে যে নুপুরের শব্দ শুনিতেছি । প্রিয়া কি এই দিকে আসিয়াছেন ? যাই, দেখি গিয়া । কিছু দূর গিয়া—ছি ছি ! হাঁসের শব্দ, চারিদিক্ মেঘে কাল হইয়া গিয়াছে, হাঁসগুলো মানস-সরোবরে ঘাইবার জন্য বাস্ত হইয়াছে, এ তাদেরই শব্দ, নুপুরের শব্দ নয় । যতক্ষণ ইহারা মানসে না চলিয়া যায়, তারি মধ্যে গিয়া জিজ্ঞাসা করি, তাঁর কোন খবর পাই কি না ।

ওহে পক্ষিরাজ, মানস-সরোবরে এর পর যেয়ো । মুখে পঞ্চখরচের জন্য যে মৃণালধণ্ড লইয়াছ, তাহা একবার রাখ, আমার উদ্ধার কর, আমার তাঁর খবর দাও,

তার পর বেয়ো। সাধুলোক আপনার কাজের চেয়ে পরের উপকারকে গুরুতর বলিয়া মনে করেন।

যখন মুখ উচা করিয়া চারিদিকে চাহিতেছে, তখন বোধ হয় বলিতেছে—আমরা বড় ব্যস্ত, দেখিতে পাই নাই।

যদি তুমি পুকুরের পাড়ে তাহাকে নাই দেখিতে পাইয়াছ, তবে তুমি তাহার গতিটা সমস্তই চুরি করিলে কিরূপে? তা হবে না, তুমি আমার কান্টাকে ফিরাইয়া দাও, তুমি তাহার ঠমকটা ত চুরি করিয়াছ, তখন তাহাকেও চুরি করিয়াছ। কোনও অংশ পাওয়া গেলে, চোরকে সমস্ত চোরাইমাল দিতে হয়, তা বুঝি জান না? বাঃ! পাছে আমি রাজা—চোরের শাসন করি, তাই ভয়ে উড়িয়া গেল।

আবার খানিক ঘুরিয়া ফিরিয়া রাজা দেখিলেন, চক্রবাক ও চক্রবাকী বেড়াইতেছে। ভাবিলেন, এইবার ঠিক হইয়াছে, ইহার কাছে ঠিক খবর পাইব। ওহে চক্রবাক, আমার ভালবাসার যে সামগ্রী ছিল, তাহার নিতম্বও চক্রের মত। সে আমার ছাড়িয়া গিয়াছে। আমি বড় আশা করিয়া তোমার জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে কোথায় গেল, বলিতে পার কি?

এমন সময় চক্রবাক কক্ কক্ করিয়া উঠিল। রাজা ভাবিলেন, ও বোধ হয় আমার চিনে না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছে ‘কঃ কঃ’? স্বর্ঘ্য ও চন্দ্র আমার মাতামহ আর পিতামহ; ছই-স্বী আমার আপনি বরণ করিয়াছিল;—এক পৃথিবী, আর এক উর্ধ্বলী।

বাঃ! এ যে চূপ করিয়া রহিল। তুমি ত ভারি মজার লোক হে! যদি চকী পদ্মের পাতার আড়ালে থাকে, তা হলেও তুমি সে কোথায় গেল, ভাবিয়া চীৎকার করিয়া দেশ মাতাইয়া তোল। গৃহিনীর উপর তোমার এতই টান যে, তুমি কিছুতেই তফাৎ থাকিতে পার না। আর আমি আমার ভালবাসার সামগ্রী হারাইয়া কাতর হইয়াছি, তুমি আমার তাহার খবরটাও দিতে পারিলে না, এতে আর কি বলিব, আমার ভাগ্যই মন্দ।

বাই, এখানে ত হ’ল না, অন্য দিকে বাই। রাজা ছ এক পা গিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। এই পদ্মফুলটা দেখিয়া আমি আর বাইতে পারিতেছি না। এটার ভিতর একটা ভগ্ন বক্স আছে, আর সেটা গুণ্ গুণ্ করিতেছে। আমি অধর দশন করিলে সে যখন ফঁাস ফঁাস করিত, তখন তাহার মুখপানি ঠিক এই রকমই দেখাইত। আমি ঐ ভোমরাটাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। এখান থেকে চলে গেলে, এর পর হয় ত ছঃখ হবে, কেন তাকে জিজ্ঞাসা করি নাই?

মধুকর! আমার গৃহিনীর চোখ দুটি মন্দ চকোরের মত, তুমি আমার তাঁর খবর দাও!

অথবা সে স্নানরৌকে তুমি একেবারেই দেখ নাই। তার মুখের স্নানর গন্ধ যদি পাইতে, তাহা হইলে কি আর এই পদ্মকুলটার উপর তোমার আস্থা থাকিত ?

যা হোক, অস্ত্র জারগায় যাই। এই যে একটি হাতীর সঙ্গে হাতিনী কেলিকদম্ব-গাছের কাঁধে শুঁড় লাগাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাড়াতাড়ি করিব না। হাতিনী শুঁড় দিয়া একটি টাটকা কচি শল্লকীর ডাল ভাঙ্গিয়া উহাকে দিতেছে। আটার মদের গন্ধ বাহির হইতেছে। ও ডালটা বেচারা খাইয়া লউক, তাহার পর উহাকে বিরক্ত করিব। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন, হাতীর আহার শেষ হইল। তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “ওহে হাতী, তুমি আমার স্থির-বোধনা প্রিয়তমাকে দূর হইতেও দেখিয়াছ কি ?” এমন সময় হাতী গর্জন করিয়া উঠিল। রাজা বড় খুসী ; মনে করিলেন, বুঝি খবর দিবে। না হবে কেন ? ও হ’ল হাতীর রাজা, আমি হলেম মানুষের রাজা, পরস্পর একটা টান ত আছেই। দেখ ভাই, আমি হলেম রাজাদের রাজা, তুমি হাতীর রাজা ; তোমার দান অনবরত মোটাধারে ঝরিতেছে, আমার দানেরও বিরাম নাই ; উর্ধ্বশী আমার স্ত্রীলোকের মধ্যে রহ, তোমার হাতিনীও তোমার যুথের মধ্যে রহ। তোমার আমার তফাতের মধ্যে এই যে, আমি বিরহে কাতর, আর এ ছুঃখটা তোমার কখন সহিতে হয় নাই। তা ভাই, তোমরা সুখে থাক, আমি আমার কাজে যাই।

এই যে সুরভিকন্দর নামক একটি পাহাড় দেখা যাইতেছে, এটি বড় রমণীয় স্থান, অপরূপা ইহাকে বড় ভালবাসে। সেও ত অপরূপা, সে কি ইহার কাছে কোথাও আছে ? বলিয়া রাজা চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। কি কষ্ট ! মেবে যে সব ছাইয়া আছে, কিছুই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে যদি এক একটা বিহ্বল নলপায়, তবুও কিছু দেখা যায় ; তাও ত হয় না। যা হোক, পাহাড়টাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া যাইব না। ওহে গিরিরাজ ! তোমার নিতম্ব ত বড় প্রকাণ্ড ; তাহারও ত তাই। তাহার বুকে জারগা নাই ; দেহের যেখানে পাপ, তাহার সেইখানটাই নীচু। সে কি তোমার কোন বনে আশ্রয় লইয়াছে ?

বাঃ ! চুপ করিয়া রহিল যে ? দূরে আছে বলিয়া বোধ হয় শুনিতে পায় নাই। কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করি।

গিরিরাজ, একটি সর্কীপস্নানরৌ বামা এই বনাশ্বে কি তোমার চোখে পড়েছে ? খানিক কান খাড়া করিয়া রাজা বলিলেন, বাঃ, কি বল্ছে ! চোখে পড়েছে। বেশ, তবে হয় ত আরও ভাল খবর শুনিতে পাইব। তবে বল ত ভাই, সে কোথায় ? কান খাড়া করিয়া শুনিলেন, সে কোথায় ? ও সর্কনাশ ! এ ত প্রতিধ্বনিমাত্র, শুহামুখ হইতে প্রতিধ্বনি হইতেছে। রাজা হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন ;—বলিলেন, বড় ক্লান্ত হইয়াছি, এই ঝরণার ধারে ব’সে একটু তরঙ্গের বাতাস খাই।

এই নদীটি দেখিয়া আমার মন বড় প্রসন্ন হইতেছে। উর্বরীই বুঝি আমার অপরাধের কথা মনে করিয়া মনের ঝাল ঝাড়িবার জন্য নদী হইয়া গিয়াছে; তাঁহার জড়পই নদীর তরঙ্গ হইয়াছে। হাঁসগুণা পার হইতে যাইতেছে, আর নদীর টানে তাহাদের সারিগুলি বাঁকিয়া বাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন চন্দ্রহার ঝুলিতেছে, পাখীগুণা ভয় পাইয়া শঙ্ক করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন চন্দ্রহার ঝন্ঝন্ করিতেছে। কেনা হইয়াছে আর নদীর বেগে সরিয়া সরিয়া যাইতেছে; বোধ হইতেছে যেন শাদাকাপড় রাগের চোটে খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। পাথরের উপর জল আছড়াইয়া পড়িতেছে ও বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া যাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন রাগে চলিয়া যাইতে যাইতে উছট খাইয়া পড়িতেছে।

যাহা হউক, আমি উহার নিকট আমার প্রার্থনা জানাই। দেখ, আমি তোমার একান্ত অনুরক্ত। কখনও মিষ্ট ছাড়া কড়া কথা কই না। তুমি যা চাও, কখনও না বলি না, না বলিতে চাইও না; আমার কি অপরাধ দেখিলে যে, আমায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছ? আমি ত তোমার দাস।

হায় হায়! এটা দেখিতেছি সত্য সত্য নদী, নহিলে আমার ছাড়িয়া দিয়া সমুদ্রের দিকে যাইবে কেন? সমুদ্রের নিকট অভিসার করিবে কেন? যাই হউক, কষ্ট না করিলে মঙ্গললাভ হয় না। যাই, সেইখানেই যাই—যেখানে উর্বরী অদৃশ্য হইয়াছিলেন। বাইতে বাইতে রাজা বলিলেন, ভালই হইয়াছে, তিনি যে পথে গিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এই সেই লাল কদন-কুলের গাছ, গ্রীষ্মের শেষে মাহার একটি ফুল তিনি আপনার মস্তকের ভূষণ করিয়াছিলেন, তখনও সব কেসর ফুটে নাই, উচু-নীচু হইয়াছিল। বাঃ! এই যে একটা হরিণ বসিয়া আছে, উহাকে একবার খবরের জন্য জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি :—

উহার রঙ গাঢ় কাল। বনশোভা দেখিবার জন্য কাননশ্রী যেন আপনার কটাক্ষ ফেলিয়া রাখিয়াছেন। [কবিতা কটাক্ষকে কাল বলিয়া বর্ণনা করেন। মৃগের রঙ কাল, যেন কাননশ্রীর কটাক্ষ।]

কি, আমার অবজ্ঞা করিয়া অশ্রু দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল! না না, মৃগী উহার নিকটে আসিতেছিল, মৃগশিক্ত স্তনপানের ইচ্ছায় উহাকে আসিতে দিতেছে না। তাই একদৃষ্টে গলা বাঁকাইয়া সেই দিকেই চাহিয়া আছে। অহে যুধপতি, আমার তাঁহাকে কি বনে দেখিয়াছ? তাঁহার লক্ষণ বলিয়া দিই, শোন। তোমার প্রিয়ার যেমন বড় বড় চোখ, তাঁহারও তেমনি। ইহাকেও দেখিতে যেমন সুন্দর, তিনিও তেমনি সুন্দর।

এ কি, আমার কথা শুনিলা না, স্ত্রীর দিকেই চাহিয়া রহিল। হ'বেই ত—অবস্থা

থারাপ হইলে সকলেই অবজ্ঞা করে। আমি এখান থেকে—আগ্রহ সহকারে দেখিয়া—
পাথরের ফাটালের মধ্যে এ কি দেখা বাইতেছে? প্রভাষ চারিদিক লেপিয়া ফেলিয়াছে।
— অথচ দিনের মারা হরিণের মাংস ত নয়। আগুনের ফুলকি হইবে কি? তাহাও ত
হইতে পারে না। কারণ, আগুন হইতে এইমাত্র বেশ এক পললা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।
(ভাল করিয়া দেখিয়া) লাল অশোক-ফোলোর মত একটি মণি। সূর্য্য যেন ইহাকে
তুলিয়া লইবার ক্ষমতা হাত বাড়াইতেছেন।

মণি আমার মন হরণ করিতেছে। তুলিয়া লই। অথবা তুলিয়া লইয়াই বা
কি করিব? কাহার মাথার এ মণি দিব? মন্দারফুলে সুগন্ধি বাহার মাথায় এই মণি
দিব, তাহাকেই পাইতেছি না। কেন শুধু চোখের জলে এই এমন মণিটি মলিন
করিব?

রাজা এই কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় কে নেপথ্য হইতে বলিয়া দিল,—‘বৎস,
এই মণি তোমাদের মিলন করাইয়া দিবে। পার্শ্বতীর পায়ের আন্তায় এই মণির
উদ্ভব। কাছে রাখিলে শীঘ্রই তোমার বাহিতকে পাইবে।’

রাজা কান খাড়া করিয়া এই সকল কথা শুনিলেন ও বলিলেন, “আমায় এ উপদেশ
কে দিতেছেন, বোধ হয়, কোনও মুনি এ কথা বলিলেন। ভগবান্, আপনি উপদেশ
দিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিলেন।” মণিটি তুলিয়া লইয়া রাজা বলিলেন,—
“হে মণি, তোমার কল্যাণে যদি আমি তাহাকে পাই, তাহা হইলে, শিব যেমন চন্দ্র-
কলাকে আপনার শিরোভূষণ করিয়াছেন, আমিও তেমনই তোমাকে আমার
শিরোভূষণ করিব।”

কিছু দূর গিয়া রাজা একটি লতা দেখিলেন, তাহাতে একটিও ফুল নাই। তথাপি
দেখিয়াই তাহার প্রতি তাঁহার বড়ই ভালবাসা হইল। বলিলেন, “লতাটি যেন
উর্ধ্বশী। মধুকরের শব্দ নাই, লতাটি নিঃশব্দ হইয়া রহিয়াছে। আমি পায়ে ধরিলেও
আমায় ত্যাগ করিয়া গেছেন বলিয়া যেন উর্ধ্বশী পলাইতেছেন ও চিন্তায় চূপ
করিয়া আছেন। ফুলের সময় চলিয়া গিয়াছে বলিয়া ইহার একটিও ফুল নাই। মানিনী
উর্ধ্বশী যেন সমস্ত আভরণ ত্যাগ করিয়া শূন্য হইয়া বসিয়া আছেন। মেঘের জলে
লতার সব কচি পাতাগুলি ধুইয়া গিয়াছে। চোখের জলে প্রিয়ার যেন ঠোঁট ছটির
লাল রঙ ধুইয়া গিয়াছে। এটি ত ঠিক আমার প্রিয়ারই মত, আমি উহাকে আলি-
ঙ্গন করিব।” বলিয়া লতাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখনই লতাটি উর্ধ্বশী হইয়া
গেল। রাজা তাঁহার স্পর্শস্থল লাভ করিয়া চক্ষু যুজ্জিত করিলেন। বলিলেন,
“এ ঠিক যেন উর্ধ্বশীরই স্পর্শ। আমার শরীর জুড়াইয়া গেল। কিন্তু বিশ্বাস
নাই। কতবার ‘এই উর্ধ্বশী’ ‘এই উর্ধ্বশী’ বলিয়া মনে করিয়াছি, আবার তখনই

তাহা অসম্ভব হইয়া গিয়াছে ; অতএব সহসা চক্ষু খুলিব না ।” অনেকক্ষণ থাকিয়া চক্ষু খুলিলেন ; দেখিলেন, তাঁহার আলিঙ্গনে উর্ধ্বশী ।

উর্ধ্বশী রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, “এটি কার্তিকের বাগান । তিনি চির-কুমার । সুতরাং জ্বীলোকের এ বাগানে প্রবেশ নিষেধ । যে প্রবেশ করিবে, তখনই সে বেড়ার লতা হইয়া যাইবে । আমি রাগে এ সব কথা ভুলিয়া বাগানে ঢুকিতে গিয়া লতা হইয়াছিলাম । কিন্তু আমার সকল ইন্দ্রিয়ই ঠিক ছিল ; আপনি যাহা যাহা করিয়াছিলেন, সবই দেখিয়াছি । গোরুর আনৃত্য যে মণি হইয়াছে, সেই মণি আপনার সঙ্গে ছিল, তাহারই স্পর্শে আমি আবার যা ছিলাম, তাই হইয়াছি । নিয়ম এই যে, ঐ মণিই লতাকে ফের মানুষ করিতে পারে ।” রাজা এই সকল কথা শুনিয়া মণির যথেষ্ট আদর করিলেন । উর্ধ্বশী মণিটি লইয়া মাথায় রাখিলেন । উর্ধ্বশীর মুখখানি প্রভাত-সূর্য্যের আলোর নূতন ফোটা পদ্মের মত শোভা পাইতে লাগিল ।

কিছুক্ষণ পরে রাজা ও উর্ধ্বশী মেঘে চড়িয়া রাজধানী প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

বিক্রমোর্ধ্বশীর চতুর্থ অঙ্কটা বোধ হয় মেঘদূতের উপর টেকা । কালিদাস আপনারই উপর আপনি টেকা দিয়াছেন । বক্ষদের প্রণয়ই প্রাণ । বক্ষদের বর্ণনা করিতে গিয়া কালিদাস কুমারসম্ভবে বলিয়াছেন :—তাহাদের বয়স যৌবনেই শেষ হয় অর্থাৎ তাহাদের প্রৌঢ়-বৃদ্ধাবস্থা নাই ; কুসুমামুখ ছাড়া তাহাদের অন্তক নাই অর্থাৎ তাহারা বে জীবনে কষ্টটুকু পায়, সেটুকু বিরহেরই কষ্ট ; তাহাদের চেতনা যায় কখন—যখন তাহারা জ্বীমস্তোগে ক্লান্ত হইয়া পড়ে । মেঘদূতেও কালিদাস বলিয়াছেন :—আনন্দ ভিন্ন অশ্রু কোনও কারণে তাহাদের চক্ষে জল পড়ে না ; কুসুমশরের তাপ ভিন্ন তাহাদের আর তাপ নাই—সে তাপও ভালবাসার জ্বিনিস পেলেই মিটিয়া যায় ; তাহাদের বিচ্ছেদও প্রণয়-কলহ ভিন্ন অশ্রু কোনও কারণেই জন্মায় না ; যৌবন ভিন্ন তাহাদের অশ্রু বয়সও নাই । কালিদাসের মেঘদূতের এই কবিতাটি কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলেন বলিয়াই কুমার-সম্ভবের শ্লোকটিও উদ্ধার করিতে হইল । বক্ষ অপরাধ করিয়াছিল, রাজকাজে অবহেলা করিয়াছিল, তাই রাজা তাহাকে বিরহ-সাজা দিয়াছিলেন । যে হেতু, বিরহ ভিন্ন তাহাদের অশ্রু সাজাই নাই । বিরহের মেয়াদ এক বৎসর । সেই মেয়াদের মধ্যে মেঘ দেখিয়া বক্ষ পাগলপারা হইয়া যায় ; মেঘকে মানুষ বলিয়া মনে করে ও তাহাকে দিয়া আপনার জ্বীর কাছে “আমি বাঁচিয়া আছি” এই খবর দিবার চেষ্টা করে । মেঘদূতে এই পর্য্যন্ত ।

বিক্রমোৎসর্গীতে কালিদাস অতি প্রাচীন কালে গিয়াছেন, সৃষ্টির এক রকম গোড়ায়। ব্রহ্মা প্রথম মন হইতেই সৃষ্টি করিতেন। প্রজাপতিরা তাঁহার মনের সৃষ্টি। দুই তিন পুরুষ এইরূপ গেলে স্ত্রীপুরুষ-সংযোগে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। পুরুষবা সেই সময়ের লোক, তাঁহার পিতামহ চন্দ্র ও মাতামহ সূর্য। বলিতে গেলে সৃষ্টির প্রথম মানুষই তিনি। কারণ, তাঁহার পিতা বৃধ দেবতা। কালিদাসের বড় বুকের পাটা, তাই তিনি প্রথম মানুষের প্রণয় ও বিরহ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অন্ত কবি হইলে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। এ প্রণয়ের পাত্র পৃথিবীতে মিলিল না। স্বর্গ হইতে অমরা ধরিয়া আনিতে হইল। সেও বোধ হয়, প্রথম অমরা-সৃষ্টির প্রধান অমরা। এই দুই জনের প্রণয় ও বিরহ বর্ণনা করিতে গিয়া কালিদাস অদ্ভুত গুণপনা দেখাইয়াছেন। প্রণয়ের কথা এবার বলিব না; বিরহের কথাই বলিব। অদ্ভুত উপায়ে বিচ্ছেদ। এই দুটিতে এক হইয়া আছে—হঠাৎ একজন অকৃত্রিম হইয়া গেল। যে রহিল, সে একেবারে পাগল হইয়া গেল। স্বভাবের অল্পম শোভার মধ্যে সে তাহার ভালবাসার সামগ্রী খুঁজিতে লাগিল। প্রথম মেঘের কোলে সোদামিনী দেখিয়া মনে করিল, এই উর্বরী, কাল প্রকাণ্ড রাক্ষস তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া বাইতেছে। মেঘ পাহাড়ের ডগা ছাড়াইয়া উঠিল, সে মনে করিল, রাক্ষস পলাইতেছে। মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, সে ভাবিল, রাক্ষস শত শত বাণ বর্ষণ করিতেছে। ক্রমে মোহ ভাঙিয়া গেল, দেখিল, মেঘ, বিদ্যুৎ, পাহাড়, আর জলের ধারা।

তাহার পর একটি ভূইচাঁপা ফুল দেখিল। পাপড়িগুলি একটু লাল, উপর হইতে জল পড়িয়া ফুলটি ভরিয়া রহিয়াছে। মনে হইতেছে, যেন উর্বরীর চোখ, রাগে চোখের কোণ একটু লাল হইয়াছে, আর জলে চোখ ভরিয়া গিয়াছে। আবার একটা নদী দেখিল; মনে হইল, তাহার শরীর। ছোট ছোট তরঙ্গ উঠিতেছে। মনে হইল, যেন রাগে তাহার ক্র ভাঙিয়া গিয়াছে। হাঁসগুলি সারি বাঁধিয়া নদী পার হইতেছে, নদীর তোড়ে সে সারি বাঁধিয়া বাইতেছে, আর হাঁসগুলি প্যাঁক প্যাঁক করিয়া শব্দ করিতেছে। বোধ হইল যে, তাহার চন্দ্রহার মাঝখানে বাঁধিয়া বুলিয়া পড়িয়াছে, আর তাহাতে বুন্ বুন্ করিয়া শব্দ হইতেছে। ফেনা উঠিতেছে, বোধ হইতেছে যেন, কাপড় টানিয়া লইয়া বাইতেছে। পাথরে পাথর জল আছড়াইয়া পড়িতেছে, বোধ হইতেছে যেন, রাগে চলিতে চলিতে পদস্থলন হইতেছে। কিন্তু শেষ জানা গেল, সেটা স্ত্রী-লোক নহে—নদী।

আবার একটা লতার কাছে গেল। বৃষ্টির জলে তাহার সব কচি কচি পাতাগুলি ধুইয়া গিয়াছে; বোধ হইল যেন, ঠোঁটের উপর যে লাল রঙ করা ছিল, চোখের জলে

তাহা খুঁজিয়া গিয়াছে। এ ফুল ফুটিবার সময় নহে, সুতরাং একটি ফুল নাই। রাজা মনে করিলেন, যেন রাগ করিয়া সে গহনা ফেলিয়া দিয়াছে। ফুল নাই, ভোমরা আর শব্দ করে না; মনে হইল যেন, মানিনী মানভরে চুপ করিয়া আছে; যেন ভাবিতেছে, কেন মান করিলাম, এত সাধিল, কেন তারে ফেলিয়া আসিলাম?

এই ত এক রকম পাগলামী, আর এক রকম পাগলামী বাক্যে তাকে জিজ্ঞাসা করা—“ওগো, আমার তাকে তুমি দেখেছ কি?” একবার ময়ূরকে জিজ্ঞাসা করিল;—কোন জবাব নাই। একবার হাঁসকে জিজ্ঞাসা করিল;—জবাব নাই। একবার হাতীকে জিজ্ঞাসা করিল;—জবাব নাই। পাহাড়কে জিজ্ঞাসা করিল;—জবাব নাই। জবাব না পাইলে রাগ হইতেছে, ক্ষোভ হইতেছে, আপনাকে দিকার দিতেছে, অদৃষ্টের নিন্দা করিতেছে। একবার কোকিলকে জিজ্ঞাসা করিল, সে মন দিয়া রাঙা রাঙা চাম চুষিয়া খাইতে লাগিল। এবার তাহার উপর রাগ নাই—“আহা, তোমার গলার স্বর আমার তাঁর মত, তোমার উপর রাগ করিব না।” একবার চক্রবাককে জিজ্ঞাসা করিল, সে “কঃ কঃ” করিয়া উঠিল। অমনি পাগল বলিল,—“কি, আমি কে, জান না তাহা? ‘তুমি কে, তুমি কে’ জিজ্ঞাসা করিলে? আমার ঠাকুরদাদা চাঁদ, আর সূর্য্য আমার দাদামহাশয়।” এইরূপে কত যন্ত্রণায় কত রকম পাগলামী করিল। হাঁসকে বলিল, “তুমি চোর, তুমি তাহার ঠমক চুরি করিয়াছ। চোরাই মালের কোন অংশ পাওয়া গেলে সবটাই চুরি করিয়াছ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। তুমি আমার তাঁকে আনিয়া দাও।” আবার পাগলামী—বলিল, “আমি রাজা, আমার হুকুম, বর্ষাকালে তুমি আসিও না।” আবার কি মন গেল, বলিল, “আহা, তুমি এস, এস, আমি রাজা, আমি এই বনে একা, তোমা হ’তে আমার রাজচিহ্ন সব পাওয়া বাইবে—চাঁদোয়া, ছাতা, চামর তুমিই দিতেছ।”

এই সমস্ত পাগলামীটি—এটা একটা সৌন্দর্য্যের খনি। পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে যে সুন্দর জায়গা, কালিদাস রাজাকে আর উর্কলীকে সেইখানে লইয়া গিয়াছেন। ছটিতে এক হইয়া থাকিলে ত পরস্পরের সৌন্দর্য্যে হৃদয়েই ডুবিয়া থাকে, তাই কিছুকালের জন্য একটিকে সরাইয়া আর একটিকে দিয়া সেই সৌন্দর্য্যটুকু প্রকাশ করিয়া দিলেন। সমস্ত সৌন্দর্য্যের পিছনে একটা উৎকট দুঃখের ছায়া।

বন্ধ বিরহে পড়িয়া মেঘকে দূত করিয়াছিল। রাজা বিরহে পড়িয়া মেঘকে রাগস করিলেন। আবার বধন মিলন হইল, তখন হৃদয়ে সেই মেঘে চড়িয়া প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে আপনাদের রাজধানীতে গেলেন। কালিদাসের হাতে মেঘবেচারার নানা অবস্থা হইল।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

নারায়ণ

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

তৃতীয় বর্ষ,

দ্বিতীয় খণ্ড,

দ্বিতীয় সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩২৪ সাল

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। ধর্ম-প্রচারে রবীন্দ্রনাথ ...	শ্রী: — ...	৫৬৫
২। নিরুপ-রাতে (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ বি, এ,	৫৬৯
৩। আদি-রস ...	শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ...	৫৭০
৪। উত্তরাধিকারী ...	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৫৭৮
৫। শ্রীমঙ্গল-রসকারিকা ...	শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডি	৫৮৮
৬। মানস-বৃন্দাবন (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৫৯৫
৭। কমলের-ছংখ ...	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ...	৫৯৬
৮। শ্রাম না এল (কবিতা) ...	শ্রী— ...	৬০৮
৯। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী	৬১০
১০। অচেনা দূতী (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী	৬২১
১১। কোমলে কঠোর ...	শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৬২৩
১২। একটি মোকদ্দমার রায় ...	শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন সিংহ	৬২৯
১৩। ছনিয়ায় ছদিন ...	শ্রীজগদম্বা দেবী	৬৩৮
১৪। রূপাস্তর ...	শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ	৬৪২
১৫। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ...	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়	৬৪৪



কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
“বসুমতী” প্রেসে,—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।”

নারায়ণ

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা]

[আশ্বিন, ১৩২৪

ধর্ম-প্রচারে রবীন্দ্রনাথ

কিছুদিন পূর্বে জাপানের একটি মত উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাই যে, পাশ্চাত্যে অথবা পাশ্চাত্যভাবে প্রভাবান্বিত প্রাচ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ যে সর্ববাদিসম্মত প্রশংসা পাইয়াছেন, প্রচারক রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তেমনটি পাইতেছেন না। কর্মজগতের ভাষা তিনি যে ভাষা ব্যবহৃত করিতেছেন, অনেক মনোবীহী তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না কেন, এই কথাটিই এবার আমরা একটু তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিব। প্রথমেই আমাদের মনে রাখা উচিত যে, রবীন্দ্রনাথ হইতেছেন কবি। আর কবির যাহা সাধারণ দোষ, তাহা যে রবীন্দ্রনাথে পাইব, ইহা কিছু আশ্চর্যের নয়। কবির দোষ কল্পনাশ্রিত। কিন্তু যে কবি শুধু কল্পনাশ্রিত নহেন, কল্পনাকে সত্যের মধ্যে—ভবিষ্য-দৃষ্টির মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন, সে কবিও দোষমুক্ত নহেন। কবির প্রকৃতিই হইতেছে একটি দিক—একটি ভঙ্গিমার সত্যটি উপলব্ধি করা। তাহার দৃষ্টি যতই গভীর হউক না, প্রধানতঃ তাহা খণ্ড অনুভূতি, তাহা চলিয়াছে ক্ষুদ্রের দ্বারা। যে জিনিসটিকে তিনি ধরেন, তাহাকে আবেগভরে আলিঙ্গন করেন, তাহার মধ্যে জগতের যতটুকু, সেইটুকুকেই ক্ষুট, বিরাট, জাজ্বল্যমান করিয়া তুলেন। কিন্তু অবশিষ্ট যাহা কিছু, সে সব তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত, অথবা একেবারে বহির্ভূত না হইলেও গোপলির অস্পষ্ট আলোকে প্রতিবিম্বিত মাত্র। রবীন্দ্রনাথেরও ভুল এইখানেই যে, তাহার কবি-অনুভূতিটিকে কর্ম-জগতে সর্বস্ব করিয়া লইয়াছেন, জগতের সমস্তখানিকে আলিঙ্গন করিবার পক্ষে তাহাকেই পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন।

জগৎকে কিং কখনও একটি সংজ্ঞার মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না, সৃষ্টিরহস্য একটিমাত্র কোন মন্ত্রের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হয় না, মানুষকেও একটি মানদণ্ড অনুসারে কাটিয়া ছাঁটিয়া খাড়া করা চলে না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন মিত্রদেব, তাহার মন্ত্র প্রেম—করুণা, মৈত্রী, সামঞ্জস্য, সম্মেলন, সুধমা, সৌন্দর্য, আলো, আকাশ, মনঃসংযোগ। কিন্তু সৃষ্টির জীবনের মানুষের এ একটা দিক্ মাত্র—যতই আবশ্যকীয় মননীয় হউক না কেন, তবুও একটা দিক্ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ যে দিক্টি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই, তাহা হইতেছে শক্তি—বীৰ্য্য, তেজ, বুদ্ধি, সংঘর্ষ, ধূলি, ঘনঘটা, ঝড়, ক্রোধের বিভূতি। সৃষ্টির মানুষের ধর্মের ব্যাখ্যা কেবল প্রেমের মধ্যেই নয়, শক্তির মধ্যেও। আধুনিক যুগে শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া তাহারই অভিব্যক্তির জগতের ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন নীটস। নীটসও একটি অঙ্গেরই উপর, একটি তত্ত্বেরই উপর সমস্ত জোর দিয়াছেন, তাই সেই ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ। শুধু অসম্পূর্ণই নয়, দোষযুক্ত। তিনি শক্তিকে ধরিতে গিয়া শক্তির যে সকল আনুসঙ্গিক বিকৃতি, তাহাকেও নিত্যবস্তু করিয়া লইয়াছেন। মানুষকে বীর শক্তিমান হইতে উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু সেই সঙ্গে মদ, মাংসখ্যা, ক্রুরতা, অত্যাচারপ্রিয়তা এ সকল বিসর্জন দিতে পারেন নাই। ঠিক সেই-রূপই রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন প্রেমের সুধুমাটি দিয়া মানুষকে গড়িতে। কিন্তু প্রেমের সাথে আসিয়া পড়িয়াছে প্রেমের বিকার—অতিমাত্র নমনীয়তা কমনীয়তা, কেমন একটি সামর্থ্যের অভাব। সামঞ্জস্য প্রীতির উপর লোভের সঙ্গে আসিয়াছে স্বন্দমাত্রেরই প্রতি অবজ্ঞা, পৃথিবীর কণ্টকাকীর্ণ ধূলি-ধূসরিত পথে চলিতে কেমন এক অস্বস্তি। রাজসিক নীটস অন্তর্জাতার ফলে যেমন পশু-জগতের প্রতি হেলিয়া পড়িয়াছেন, সাম্বিক রবীন্দ্রনাথও তেমনি পরীর দেবতা। এঞ্জেলের জগতের প্রতি অতিমাত্র পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। কেহই—নীটসও নয়, রবীন্দ্রনাথও নয়—মানুষকে, মানুষের প্রয়োজন প্রেরণাকে অথবা উদার দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই।

নবযুগের মূলমন্ত্র হইতেছে “জীবন”—রবীন্দ্রনাথ এই জীবনেরই উপাসক, তাহার নিকট হইতে এই শিক্ষাটিই আমরা লাভ করিয়াছি। পুরাতন সন্ন্যাসের—বৈরাগ্যের—সমাধির মন্ত্র ছাড়িয়া তিনি আমাদেরকে “অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মুক্তির স্বাদ” পাইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। পার্থিব জগতের মধ্যে, সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জীবনরস গ্রহণ করা, কর্মজীবনের শত বৈচিত্র্যের মধ্যেই আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করা—রবীন্দ্রনাথের ইহাই লক্ষ্য। নব্যভারত, বিশেষতঃ নব্যবাক্সলা এই জন্তই তাঁহাকে একজন নেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু জীবনের ব্যাখ্যা দিতে যাইয়া তিনি যে সঙ্গীর্ণতাটুকু আনিয়া ফেলিয়াছেন, জীবনের সাধনারই অতি প্রয়োজনীয়

অঙ্গগুলির উপর তিনি যে তাচ্ছিল্য বা বিরক্তি দেখাইয়াছেন, সেইটুকু আবার বিশেষ-রূপে নির্দেশ করা আমরা আবশ্যক মনে করি।

রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন সেই জীবন—বাহ্য আনন্দপূর্ণ, স্বস্তিপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ, যেখানে হৃদয় নাই, বৈপরীত্য নাই। বিশ্বমানব অন্তরে অনুভব করিয়াছে প্রেমময় ভগবান, সকলে সকলের সহিত নিরবচ্ছিন্ন মিলনমূর্ত্তে সংগৃহীত, ভুলিয়া গিয়াছে ধর্মগত জাতিগত দেশগত বিরোধ-বৈষম্য, সকলে চলিয়াছে সৌন্দর্য্যের সৌরভের পূজা করিয়া, এক অপূর্ব ভাবাবেশে মুগ্ধ হইয়া। আদর্শ-জীবনে এ সকলেরই স্থান আছে। কিন্তু কেবল ঐটুকু বলিলেই তাঁহার সব কথাখানি বলা হইল না। আমরা যেন অনুভব করি, রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ চাহেন, বৈচিত্র্য চাহেন, কিন্তু যতদূর পারেন, সে সকলকে সন্ন্যাসীর শাস্ত নিশ্চল হৃদ্যভীত ব্রহ্মেরই নিকটে লইয়া গিয়াছেন। তপঃশক্তির বীৰ্য্যের বিক্রমের রেশ মানুষ যে অনুভব করিতেছে, রবীন্দ্রনাথ তাহার একটা যথার্থ স্থান দিতে পারিতেছেন না। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্ভব সম্ভব যে সংঘর্ষ, যে বৈরি-ভাব, তাহা কি কেবলই হয়, কেবলই মোহের খেলা, তাহার অন্তরে কি কোন সত্য বস্তুই নাই? ব্যক্তির সম্ভব দেশের জাতির যে স্বাভাব্য, যে ভাগবত একটা প্রাণ আছে, আমরা তাহা বিশ্বাস করি। আদর্শ-জীবনের মহা সম্মেলন আর বর্তমানের সংঘর্ষ-বিসংবাদ এই দুয়ে একটা নিগূঢ় যোগ আছে; শুধু যোগ নয়, একটা ঐক্যই আছে। আমরা বলি, বর্তমানের হৃদয়কে চাপা দিয়া বা পিষিয়া দূর করা উচিত নয়। তাহাকে ফুটিয়া উঠিতে দিয়া, সকল ব্যক্তিরই আত্ম-স্বাভাব্যতার পূর্ণ প্রসারে মহাসামঞ্জস্যটিকে বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিতে হইবে। নতুবা জীবন পাইতে পারি, কিন্তু জীবনকে সমরসের এক শাস্ত ক্রীড় ভাবুকতা দিয়াই ভরিয়া তুলিব। তার পর বর্তমান জগতের যে অতিমাত্র কর্মবহুল জীবন—তাহার স্থূল দৃষ্টি, তাহার বৈশ্ব-ধর্ম, তাহার উদ্ব্যস্ততা, ব্রহ্মতা, মত্ততা লইয়া যতই কুৎসিত হউক না কেন, কিন্তু তাহারই মধ্যে রহিয়াছে সম্ভাবনা, জীবনকে—জগৎকে তীব্রতরভাবে স্পষ্টতরভাবে আলিঙ্গন করিবার প্রয়াস, শক্তির খেলাকেই মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিবার ইচ্ছিত, জাগতিক প্রতিষ্ঠানকে নিত্য নব নব সৃষ্টি দিয়া ফলপ্রসূ করিবার মহান্ প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ যে জীবনের ছবি আঁকিতেছেন, তাহা দেখিয়া আমাদের মনে পড়ে, শাস্ত্রসাম্পদ, বিগ্রবিরহিত লোকালয়ের মলিনতাহীন আলোর কুটীরখানি।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথকে ঠিক এই ভাবে লইতে অনেক স্বীকার পাইবেন না। তাঁহার দেখাইয়া দিবেন, রবীন্দ্রনাথ সমাজের, ধর্মের ভণ্ডামীর সহিত কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার বিদ্রূপবাদী, তাঁহার অট্টহাস কত ক্ষেত্রে কত ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, স্বদেশীর যুগে তাহার অধিময় থাকোই না বাঙ্গালী বালক নাচিয়া উঠি-

রাছে? আর আজ যে ইউরোপে তিনি প্রচারকার্যে লিপ্ত—তাহা কি সমস্ত ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা নয়? আমরা বলি, এ সকলে এইটুকু প্রমাণ হয়, যুদ্ধ করিবার একটা সহজ প্রেরণা—ক্ষান্ত্রশক্তি, মানুষের মধ্যে কি সত্যকার বস্তু। কথার অস্বীকার করিতে যাইয়া ভগ্নিমায় রবীন্দ্রনাথ তাহা প্রকটিত করিয়া ফেলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে স্মরণ করাইয়া দেন শঙ্করের কথা—ইহবিমুখ সন্ন্যাসী—যিনি আ-হিমালয় কুমারিকা বিধ্বস্ত করিয়া প্রচার করিতেছেন, তিনি নৈকর্য্য; কিন্তু প্রকৃত কথা হইতেছে, রবীন্দ্রনাথের তবে সংঘর্ষের ব্যাখ্যা নাই, হৃদয়ের যে কি প্রয়োজনীয়তা, কি অব্যর্থতা, তাহার যথাযথ নির্দেশ নাই। এমন কি, আমরা বলিতে পারি, কণ্ঠেরও স্থান নাই। কণ্ঠ হইতেছে তপঃশক্তির জাগ্রত প্রয়োগ—রবীন্দ্রনাথ মনে করিবেন, তাহার অব্যর্থ ফল ঘেব, হিংসা, জুরতা পাশবিকতা। তিনি চাহেন বসভোগাত্মক কণ্ঠ। তিনি জীবনের যে কিছু বৈচিত্র্য চাহেন, তাহা মিলনেরই নানা ভাবের রসাস্বাদন। আমরা এ সকলই স্বীকার করি। কিন্তু ইহা প্রতিষ্ঠা মাত্র, ইহা অন্তরের একটা ভাব বা অবস্থা। কিন্তু ইহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, এমন কি, ইহাকে অটুট স্টুট স্থিরপ্রতিষ্ঠ রাখিবার জগুই—আমরা সকল হৃদয়, সকল সংঘর্ষ, সকল পার্থিব ধূলিমলিনতার লিপ্ত হইতে শঙ্কান্বিত হইব না বা দ্বিধা-বোধ করিব না। কারণ, হৃদয় তখন শুধু হৃদয় নয়, সংঘর্ষ তখন শুধু সংঘর্ষ নয়, পৃথিবী শুধুই পৃথিবী নয়। এ সকলের মধ্যে একটা উচ্চতর ক্ষেত্রেরই পরিপূর্ণ প্রেরণা খেলিতেছে দেখিব।

এ কথা সত্য, স্বদেশীর যুগে রবীন্দ্রনাথে আমরা দেখিয়াছিলাম কিছু অগ্নির খেলা, কিন্তু বাতাসের প্রথম প্রকোপেই তাহা নির্দাপিত হইয়া গেল। সে একদিন ছিল—মুকুণ্ড যে দিন বাটাল হইয়া উঠিয়াছিল, পশুও গিরি লজ্জিতে চোঁচা করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও রুদ্রদেবতার আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ অতিমাত্র কবি। সৌন্দর্য্য সুবর্ণা নমনীয়তা কমনীয়তার আশ্বাদ তিনি অতিমাত্র পাইয়াছেন। কৃষ্ণের বংশী তাঁহাকে মোহিত করিয়াছে। কিন্তু কালো যে কৃষ্ণেরই আর এক ভগ্নিমা—সে করাগ মূর্তিতে যে কি সৌন্দর্য্য, কি মহিমা, কি নিত্য-সত্য, তাহা তিনি সম্যক দেখিতে চাহেন নাই। হইতে পারে, ইউরোপে তাঁহার শাস্তিপ্লুত বাণীর প্রয়োজন আছে। কেবল ইহপরাশ্রয় ভোগুমত্ত দস্তনধর-রক্তাক্ত সে রাক্ষসের দেহে অতি-জগতের সৌরভ-প্রলেপ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এ কথা-টুকুও মনে রাখা আবশ্যক, পণ্ড হউক, পিশাচ হউক, রাক্ষস হউক, অশুর হউক, পূর্ণজীবনে, সিদ্ধের জীবনে এ সকল রকম প্রকৃতিরই স্থান আছে, সকলেরই একটা অব্যর্থ সামঞ্জস্য আছে। জীবনের কোন বিভূতি—অহংকারবশে আমাদের কাছে তাহা যতই অপ্রিয়, যতই কদাকার বোধ হউক না কেন—মায়ী নহে, মতিভ্রম নহে।

প্রকৃত কর্মী যিনি, তিনি জীবনের যে নগ্ন-মনোবিভ্রান্তকারী চঞ্চলতা, তাহাতে পরিশ্রান্ত বোধ করিবেন না, সকল অবাঞ্ছনীয় জিনিসের মধ্যে থাকিতেও অস্বস্তি বোধ করিবেন না। সেখান হইতে ছুটিয়া জনতা হইতে দূরে প্রকৃতির কোলে মুক্ত শিশু আকাশতলে ভগবানের সৌম্যমূর্তিটিকে ধ্যানে তৃপ্ত থাকিবেন না। বন্দ বাঞ্ছনীয় জিনিস না হইতে পারে, কিন্তু বন্দ দেখিয়াই যে শিহরিয়া উঠা, তাহাও কিছু বাঞ্ছনীয় নহে। অহংকার, ক্রুরতা, বাসন আদর্শ-জিনিস না হইতে পারে, কিন্তু প্রীতি পরার্থপরতা সান্ত্বিকতার আবরণে একটি জিনিস আমাদেরকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে—গীতাকার তাহার নাম দিয়াছেন ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ভাগ্য, কার্পণ্যদোষ—সে জিনিসটির বিরুদ্ধে আমাদের সাবধান থাকা উচিত। অর্জুনের মত মহাকর্মীর মধ্যেও এ ভাব স্থান পাইয়াছিল—সেটুকু দূর করিতে শ্রীভগবানের কতখানি আশ্রয় করিতে হইয়াছিল! আমরা ত মনে করি, আদর্শ-মানুষ যিনি, আদর্শ-মহাত্মার সাধক যিনি, তিনি জগতের সমস্ত বন্দে গা ঢালিয়া দিয়া, জীবনের শত অসুন্দর ব্যাপারের কাদা-মাটিতে লিপ্ত হইয়া তাহারই মধ্য হইতে নিজের অন্তরে বাহিরের জগতে একটা উচ্চতর মহত্তর সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন সৃষ্টি করিয়া চলিবেন।

শ্রী :—

নিবুম-রাতে

নিবুম-রাতে আমার হাতে কাঁপে পরশ তার,
আমার, নিবুম চোখের আলোক বেয়ে তাহার অভিসার।
দিনে আমার দৈন্য-মাথা, মুখটি থাকে ঘোমটা ঢাকা,
রাতে সিঁথে তারা আঁকা জ্বলে মাণিক-হার।
ঝিমি-ঝিমি কাঁকন বাজি ভরে আমার প্রাণ
অসাড় আঁধার-হৃদয়-তারে অনাহত গান।
বুকে আমার মুখটি ঢাকি, শ্বাসিয়া উঠে থাকি থাকি,
নিবিড় তাহার কালো আঁখি ঘেরে চারি ধার।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ বি, এ।

আদি-রস

ভয় বস্তুটা অধিকাংশ স্থলেই অজ্ঞতামূলক। যে সকল জানে, তার কোনও ভয় থাকে না। প্রাচীনেরা বিশ্বের সাকল্যকে আনন্দ বলিতেন। অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান—এ সকল খণ্ড-ভগ্ন। পরিপূর্ণ ভগ্ন, পরম ভগ্ন, আনন্দ-বস্তু। এই বস্তুকে আনন্দ-ব্রহ্মও বলা হয়। এই বস্তু ব্রহ্মের আনন্দ।

“আনন্দাক্ষেপ ধর্ম্মানি ভূতানি জায়ন্তে।

আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।

আনন্দং প্রসূত্যাভিসংবিশন্তি।”

আনন্দ হইতে ভূতগ্রাম উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন হইয়া আনন্দের দ্বারা জীবিত রহে; অস্ত্রমে আনন্দেতে প্রবেশ করে। এই আনন্দই সৃষ্টিমূল। এই আনন্দই বিশ্বের আদি, মধ্য এবং অন্ত। এই আনন্দই বিশ্বের সাকল্য। এই জগৎ এই আনন্দকে বা সাকল্যকে যে জানে, সে কখনও কাহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হয় না।

এই আনন্দ-বস্তুকে বাক্য প্রকাশ করিতে পারে না। অস্তরিত্ত্ব মনও ইহাকে মনন করিয়া শেখ করিতে পারে না। এ বস্তু ইন্দ্রিয়াতীত, তদ্ব্যপেক্ষ অমুভূতি-গ্রাহ্য।

এই আনন্দই আদি-রসের প্রাণ। উপনিষদ এই জগৎই নরদাম্পতীর যৌন-সম্বন্ধের আনন্দের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে ব্রহ্মানন্দের সজাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

এই তত্ত্বটি যাহারা বুঝেন, তাহারা আদিরসাম্প্রিত বলিয়া মহাজন-পদাবলীর নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন না। আদি-রসের নিন্দা নাস্তিক্য-বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। অথবা, এ সকল নিন্দকেরা আদিরস বস্তুটি যে কি, ইহা বুঝেন না ও জানেন না, এই কথাই বলিতে হয়।

স্ত্রী-পুরুষের যৌন-সম্বন্ধ হইতে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহাকেই আদি-রস কহে। আমাদের রসতত্ত্বে ও বৈষ্ণব মহাজন-পদে ইহাকেই মাধুর্য্য কহিয়াছেন।

সংসারে সন্তানোৎপাদনের জন্তই স্বামি-স্ত্রী-রূপে নরনারীর যৌন-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়। সন্তানোৎপন্ন না হইলে বংশধারা ও সমাজস্থিতি রক্ষা পায় না। প্রজনন বাতীত জীবস্থিতি রক্ষা পায় না। এই জগৎই প্রজনন সাধারণ জীবধর্ম্ম। মনুষ্য-সমাজে এই প্রজাতিই দাম্পত্য-সম্বন্ধের মূখ্য উদ্দেশ্য।

কিন্তু বিধাতার রাজ্যে সকল প্রয়াসের ও সকল কৰ্মের সঙ্গেই আনন্দ-রস মিশিয়া থাকে। আনন্দ হইতেই সৃষ্টির উৎপত্তি, আনন্দের উপরেই সৃষ্টির স্থিতি, আনন্দে-তেই সৃষ্টির গতি বলিয়া, সৃষ্টির সকল ব্যাপারই আনন্দাশ্রিত। আনন্দের প্রেরণাতেই জীব জীবনধারণ করে ও জীবনের নানাবিধ কৰ্মে নিযুক্ত হয়।

“কো হেবাভ্যাং কঃ প্রাণ্যাং
বদেব আকাশ আনন্দো ন শ্রাং?”

কেই বা শরীর-চেষ্টা করিত, কেই বা প্রাণধারণ করিত, যদি এই আকাশে আনন্দ-বস্তু না থাকিতেন?

“এবো হেবানন্দয়াতি”

ইনিই লোকসকলকে আনন্দদান করেন।

এই সার্বজনীন আনন্দধর্মপ্রভাবে জীবের প্রজনন-প্রয়াসেও আনন্দ আছে। এই আনন্দ-বস্তুকেই আলঙ্কারিকেরা **আদি-রস** कहিয়াছেন।

ইতরজন্মরাও এই রস আন্বাদন করে; কিন্তু অবশে—প্রকৃতের্বশাৎ—প্রকৃতির বশে। সজ্ঞানে আগ্রহ হইয়া নহে। এইরূপ প্রকৃতি-বশে, অর্থাৎ কেবলমাত্র রক্তমাংসের টানে, ইন্দ্রিয়সুখের লালসায়, যেখানে নরনারী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেখানে এই আকর্ষণকে কাম কহে।

এই কামও হয় বস্তু নহে। এই কামই সৃষ্টিধারা রক্ষা করিতেছে। প্রজা উৎপাদন করে বলিয়া এই কাম ভগবদ্বিভূতির মধ্যে গণ্য হইয়াছে। “প্রজননশাস্ত্রি কন্দর্পঃ”—প্রজনন হেতু আমিই কন্দর্প বা কাম। এই কাম সংসারধর্মের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। ইংরাজিতে ইহাকে sex-attraction বলে। এই ঘোন-আকর্ষণের বা sex-attraction-এর উপরেই যুরোপীয়েরা আধুনিক Eugenics'এর বা সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। আমাদের প্রাচীনেরা ইহাকেই পবিত্র দাম্পত্য-সম্বন্ধের ভিত্তি করিতে চাহিয়াছিলেন। এই জন্যই, সে আদর্শদ্রষ্ট হইয়াও, আমরা বিবাহ-কালে, কন্যাসম্প্রদানের পরে, তাঁহাদের রচিত অপূর্ণ কামস্বভিটি পড়িয়া থাকি।

সম্প্রদানকর্ম শেষ হইলে, সম্প্রদত্তা কন্যাকে গ্রহণ করিয়া, জামাতা প্রথমেই এই কন্যার উপরে আপনার অধিকার ত্যাগ করিয়া বলেন—“ও কন্তেয়ং প্রজাপতি-দেবতাকা”—এই কন্যা আমার নহে, অর্থাৎ আমার বথেষ্টভোগের জন্য এই কন্যা সম্প্রদত্ত হয় নাই। এই কন্যা প্রজাপতি-দেবতার—যিনি প্রজাসৃষ্টি ও প্রজারক্ষা করেন, তাঁহার। এই বলিয়া এই কামস্বভিটি পাঠ করেন :—

“ও ক-ইদং কস্মা আদাং কামঃ কামায়াদাং
কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশং ।”

এই সম্প্রদত্তা কতাকে কে সম্প্রদান করিল? কাহাকে সম্প্রদান করিল? কাম সম্প্রদান করিয়াছেন। কামকেই সম্প্রদান করিয়াছেন। কামই দাতা, কামই প্রতিগ্রহীতা, এই কাম পরমাখ্যাত্তে প্রবেশ করিয়াছে।

এমন যে কাম, তাহাকে হেয় বলিব কেমনে?—তবে যে-বোন-সম্বন্ধের উদ্দেশ্য কেবল ক্ষণিক ইন্দ্রিয়রসভোগ মাত্র, কিন্তু প্রজোৎপাদন নহে, যে কাম কেবলমাত্র উপভোগপরায়ণ, তাহা অতি হেয় বস্তু, সন্দেহ নাই।

এ সংসারে যাহা আপনার সার্থকতালাভ করে না, তাহাই হেয় হইয়া পড়ে। বোন-আকর্ষণ সাধারণতঃ প্রজা-সৃষ্টি করিয়া সার্থক হয়—জীবতত্ত্বের ক্ষেত্রে ইহাই, এই sex-attraction'এর বা বোন-আকর্ষণের চরম সার্থকতা। জীবতত্ত্ব বা বায়লজি Biology' ইহার উপরে যায় না। প্রজনন-ব্যাপারে জীবকে নিয়োজিত করিবার জন্যই প্রকৃতি জীবের বোন-সম্বন্ধের বা sex relation'এর মধ্যে এতটা আনন্দের উৎস সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবতত্ত্ব বা বায়লজি এ-ছাড়া আর কোনও কথা জানে না, কহিতেও পারে না। কিন্তু রসতত্ত্ব বলে—এহ বাহ্য, ইহাও বাহিরের কথা।

গাছে ফুল ফোটে ফল ধরিবার জন্য, সত্য কথা। কিন্তু কেবল ফোটারই কি নিজের একটা সার্থকতা নাই? ময়ূরের পুচ্ছ, কুক্কুটের মুকুট, প্যারেডাইজ পাখীর অপূর্ণ পর্ণ-গৌরব, সিংহের কেশর,—এ সকল কি কেবল প্রজোৎপাদনেরই ছলাকলা। ময়ূর দেখিয়া ময়ূরী, কুক্কুট দেখিয়া কুক্কুটী, সিংহ দেখিয়া সিংহিনী যে আকুল হইয়া ছুটিয়া যায়, এই আকুলতার কি আপনার কোনও সার্থকতা নাই? নাই বা যদি সঙ্গম ঘটে, নাই বা যদি প্রজাসৃষ্টি হয়, নাই বা যদি ফল ধরে, নাই বা যদি ছানা জন্মে,—তাহা হইলেই কি অমন সৌন্দর্য্য, অমন সাধ একেবারে নিফল হইয়া যায়? প্রজাসৃষ্টি ছাড়া এই অপূর্ণ বোন-লীলাতে বা sex-romance'এ কি আর কোনও কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না? জীবতত্ত্ব বা বায়লজি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না।

মনস্তত্ত্ব বা Psychology এই বিশ্বব্যাপী বোন-লীলার মধ্যে প্রজাসৃষ্টি ছাড়াও আর একটা বস্তু দেখিতে পায়। সেই বস্তুটিই এই বোন-আকর্ষণের বা sex-attraction'এর অব্যবহিত বা immediate লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যটি আপনাকে অবাধে, নিঃশেষে, বিলাইয়া দেওয়া—আত্মদান বা আত্মবলি। কীটপতঙ্গের পালকে চড়িয়া ও পায়ে জড়াইয়া আপনার নিগূঢ় প্রাণবস্তুর বনস্থলীময় ছড়াইয়া দিবার জন্যই অচল বৃক্ষলতাদি অমন রূপরসগন্ধের পসরা সাজাইয়া দাঁড়াইয়া

রহে। ময়ূর-ময়ূরী, কুকুট-কুকুটী, সিংহ-সিংহিনী সকলেই আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিবার জন্তই পরস্পরকে দেখিয়া অমন পাগল হইয়া পরস্পরের কাছে ছুটিয়া যায়। এই বিশ্বব্যাপী বোন-লীলার মধ্য হইতে আশ্বদান ও আশ্বসাৎ করিবার একটা অতি বলবতী বাসনা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। পরস্পরকে পরস্পরের মধ্যে ছড়াইয়া দিবার জন্ত, পরস্পরকে পরস্পরের নিকটে নিঃশেষে বিলাইয়া দিবার জন্ত, একে অন্তের মধ্যে একে অন্তকে হারাইয়া ফেলিবার জন্তই ত এই বোন-সঙ্গম-চেষ্টা প্রকাশিত হয়। প্রজাসৃষ্টি ত একটা আনুষঙ্গিক ঘটনা মাত্র। এই আশ্বদান ও আশ্বসাৎ, এই আশ্ববিস্তৃতি ও আশ্ববিস্তৃতিই ত এখানে মুখ্য কথা। এটি হইলেই ত এই সঙ্গম-চেষ্টা সফল হইল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রজা-সৃষ্টি হয়, ভাল। কিন্তু তাহা ত মূল লভ্য বা মূল্য নহে, কেবল ফাউ মাত্র। জীবতত্ত্বের বা বায়লজির দিক্ দিয়া দেখিলে, বাহা মূল লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়, রসতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা একটা উপলক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়।

ফলতঃ তলাইয়া দেখিলে, এখানে রসতত্ত্বের আর জীবতত্ত্বের ব্যাখ্যার মধ্যে যে কোনও বিশেষ বিরোধ আছে, এমনও মনে হয় না। যে একাত্মতা-লাভের জন্ত যুন-দম্পতি পরস্পরের অঙ্গসঙ্গলোভে একে অন্তের প্রতি আকৃষ্ট হয়, প্রজোৎপাদন করিয়া, কিয়ৎপরিমাণে সেই একাত্মতাই লাভ করিয়া থাকে। পিতামাতার শুক্র-শোণিত-মিশ্রণে সন্তানের দেহ উৎপন্ন হয়। তাহাদের প্রাণের যোগে যে সন্তানের প্রাণ ফুটিয়া উঠে না, তাহাদের মনের মিলনে যে সন্তানের মানস-জীবন গড়ে না, তাহাদের উভয়ের বুদ্ধি মিলিয়া যে সন্তানের বুদ্ধির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করে না,—এ কথাই কি বলিতে পারি? বরঞ্চ সন্তান প্রায়ই যে পিতামাতার রূপগুণ লাভ করে, ইহাই ত দেখিতে পাই। ইহাই ত আধুনিক ইউরোপের Eugenics বা সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের ভিত্তি। স্তত্রাং দম্পতি-যুগল আপন আপন বোন-আকর্ষণ বা sex-attraction'এর প্রেরণায় যে একা-ত্মতালাভ, যে আশ্বদান ও আশ্বসাৎ করিবার জন্ত আকুলি-বিকুলি করেন, প্রজাসৃষ্টির দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে যে তাহারই সফলতালাভ হয়, ইহা অস্বীকার করা যায় না। প্রজাসৃষ্টিতে এই আশ্বদান ও আশ্বসাৎ করিবার বাসনা যদি পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিত, তবে সন্তানোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে, কিংবা সন্তানোৎপাদনশক্তির লোপে এই বাসনাও পরিতৃপ্ত বা নিঃশেষ হইয়া যাইত।

উদ্ভিদের বা ইতর জীবজন্তুর কথা আমরা সাক্ষাৎভাবে কিছুই জানি না। আমাদের অন্তরের অন্তত্বের দ্বারা তাহাদের বাহিরের ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা করিয়া, উদ্ভিদ ও ইতর জন্তুর জীবনের রহস্য কতকটা ভেদ করিতে চেষ্টা করি মাত্র।

আমাদের আরোপিত অর্থ এ ক্ষেত্রে কতটা সত্য হয়, ইহা বলা অসম্ভব ও অসাধ্য। বাহির হইতে দেখিয়া যতটা বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে মনে হয় যে, প্রজোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের যৌন-প্রবৃত্তি বা sex-instinct এবং যৌন-আকর্ষণ বা sex-attraction উভয়ই কিছু কালের জন্য লোপ পাইয়া যায়; এবং প্রজোৎপাদনের সম্ভাবনা একেবারে নষ্ট হইলে এই প্রবৃত্তি এবং আকর্ষণ একান্ত-ভাবে নষ্ট হইয়া যায়। কথটা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে।

কিন্তু ইতরজন্তু সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, মানুষের মধ্যে প্রজাসৃষ্টির শক্তি শেষ হইলেও দাম্পত্য-রস নিঃশেষ হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। অভ্যাস-বশতঃই যে এরূপ হয়, তাহা নহে। যেখানে নরদম্পতির মধ্যে কেবল যৌন-সম্বন্ধ বা sex-relation মাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু সত্য রসের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে না, সেখানে দীর্ঘকাল পরস্পরের সহবাস করিয়া, বহু সন্তানোৎপাদন করিলেও, সম্ভান-সম্ভাবনা নষ্ট হইলেই দাম্পত্য আকর্ষণও নিঃশেষ হইয়া যায়। ইহারা যে পরস্পরের নিকটে কখনও আশ্রয়দান ও পরস্পরকে একান্তভাবে, সর্বেজ্জিয় দিয়া আশ্রয়সাৎ করিতে চাহে নাই। ইহাদের যৌন-সম্বন্ধ বা দাম্পত্য-সম্বন্ধ পশুত্বের বা সাধারণ জীবত্বের ভূমিকে ছাড়াইয়া, রসত্বের সীমান্তে কখনও পৌছে নাই। এই জন্য প্রজাসৃষ্টিতেই ইহাদের যৌন-সম্বন্ধ আপনার পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু যেখানে যৌন-আকর্ষণ বা sex attractionকে অবলম্বন করিয়া জীবের নিত্য, নিগূঢ়, আশ্রয়দান ও আশ্রয়সাৎ করিবার বাসনা জাগিয়া উঠে, যৌন-সম্বন্ধের মূলে সেখানে কেবল দেহ-ভোগের লিপ্সাই জাগিয়া নাই, কিন্তু—

যথা —

নীরবিন্দুঘর, পুষ্পদলে এক হয়,—

সেইরূপ দুটি জীবের সম্পূর্ণ সমগ্রতা—তাহাদের দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং আত্মা সকলে—একে অন্তর্কে পাইয়া, একে অন্তের মধ্যে ডুবিয়া, মিশিয়া মিলিয়া যাইবার জন্য ছটফট করে। কিন্তু দেহাদির একটা স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া, কিছুতেই পরস্পরের দেহাদির মধ্যে একেবারে নিঃশেষে, নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলিয়া মিশিয়া যাইতে পারে না। যত নিকটে যায়, ততই আরও নিকটে যাইতে চাহে; যতই প্রাণপণ করিয়া পরস্পরের মধ্যে শরীর-মনের ব্যবধান কমাইতে চেষ্টা করে, প্রাণের আগ্রহাতিশয় নিবন্ধন ইহার উল্টা উৎপত্তি হইয়া, এই অলক্ষ্য ব্যবধান যেন অন্তরের মধ্যে আরও বেশী বাড়িয়া উঠে,—এ অবস্থা ও অভিজ্ঞতা যে যৌন-সম্বন্ধের মধ্যে প্রকাশিত হইতে থাকে, সেখানে সম্ভানের মধ্যে দাম্পত্য-

সম্বন্ধের আংশিক সাক্ষ্য মাত্র লাভ হয়, পরিপূর্ণ সফলতা কিছুতেই লাভ হয় না, কখনই লাভ হইতেও পারে না।

আর এই যে আত্মদান ও আত্মসাৎ করিবার ছরস্তু, জ্বলস্তু, অনন্ত পিপাসা, তাহাই মাধুর্য্য-রসের প্রাণ। আর এই জন্তই পতি-পত্নী, কিংবা স্বামি-স্ত্রী, কিংবা কেবল নর-নারী না বলিয়া, নায়ক-নারিকাকে এই মাধুর্য্য-রসের আশ্রয় বলা হয়।

নরনারীর সম্বন্ধ কেবল বা মুখ্যতঃ শারীরিক। পতি-পত্নী বা স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ সামাজিক। নর-নারীর সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা জীবতত্ত্বের বা বায়লজির উপরে। পতি-পত্নী বা স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা সমাজ-শৃঙ্খলা ও সমাজতত্ত্বের বা Sociology'র উপরে। নায়ক-নারিকার সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে রসতত্ত্বের বা Art'এর উপরে।

নায়ক-নারিকা, নর ও নারী বলিয়া, সাধারণ জীবধর্মের অধীন। সমাজে বাস করেন ও পুত্র-কন্যা, ভ্রাতা-ভগিনী, সখা-সখী প্রভৃতি বিবিধ সামাজিক সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া নায়ক-নারিকা সাধারণ সমাজ-ধর্মেরও অধীন। কিন্তু সমাজ-ধর্ম যেমন জীবধর্মকে আশ্রয় করিয়াই আবার তাহাকে অতিক্রম করিয়া যায়, জীবপ্রবৃত্তিকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করে; আপনার সার্থকতালাভের জন্ত কখনও বা সাধারণ জীবধর্মকে অঙ্গীকার, কখনও বা অতিক্রম করিয়া যায়; সেইরূপ রস-ধর্ম বা রোমান্সের (romance এর) বিধিবাধনও, আত্মপ্রয়োজন অনুযায়ী, এক দিকে সাধারণ জীবধর্ম ও দেশকালানুগত সমাজধর্মকে কখনও বা অঙ্গীকার এবং অন্য দিকে কখনও বা অঙ্গীকার ও অগ্রাহ্য করিয়া চলে। এইটাই নায়ক-নারিকা সম্বন্ধের বিশেষত্ব। ইহারা সাধারণ নরনারীর শারীর ধর্মের বিধানের ও সাধারণ পতি-পত্নীর সমাজ-ধর্মের বিধানেরও অতীত। এই জন্তই সাধারণ নর-নারী কিংবা পতি-পত্নী মাধুর্য্য-রসের নিত্য আশ্রয় হইতে পারেন না। নায়ক নারিকাই ইহার একমাত্র সত্য, বিশিষ্ট ও নিত্য অবলম্বন।

বহু ভাগ্যবলে যেখানে সংসারের পতি-পত্নী-সম্বন্ধের মধ্যে সত্য মধুর রস ছুটিয়া উঠে, সেখানে তাঁহাদের পতিত্ব-ও পত্নীত্ব-ধর্ম নায়ক-নারিকা-ধর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত ও আচ্ছন্ন হয়। তখন তাঁহারা বেহে থাকিয়াই বিদেহী, সমাজাতীত, থাকিয়াও সমাজান্তর্ভুক্ত আশ্রমধর্মী হইয়াও অত্যাশ্রমী এবং বাহিরের শত বন্ধনের মধ্যেই অন্তরে সর্ববন্ধন-মুক্ত হইয়া রহেন। এইরূপ বিরল দম্পতির মাধুর্য্য সম্বন্ধকেও নায়ক-নারিকা-সম্বন্ধই কহিতে হয়; সামান্য পতিপত্নী-সম্বন্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলে ইহার সত্য ও মর্যাদা রক্ষা পায় না।

নী ধাতু হইতে নায়ক শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে। এই নী ধাতুর অর্থ পাইয়ে দেওয়া—নী প্রাপণে। নায়ক নারিকাকে কিছু পাইয়ে দেন, নতুবা সত্য নায়ক-

ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয় না। এই জন্ত ইতর লোকের হীন কল্পনা যাহাই ভাবুক না কেন, নারিক আর 'নাগরিক' এক কথা নহে। নারিকাও নারিককে কিছু পাইয়ে দেন, নতুবা নারিকা-ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয় না। এই জন্ত, এই কথা জানে না বা বুঝে না বলিয়া, ইতর লোকে নারিকা কথা শুনিতেই 'নাগরিক' ভাবিয়া বসে।

কিন্তু নারিক-ধর্মের বিশেষত্ব দেওয়াতে নয়, পাইয়ে দেওয়াতে; দানে নয়, প্রাপণে। যে বাণ দেয়, তাহা তার নিজের বস্তু; যাহা দেয় না বা দিতে পারে না, কিছু পাইয়ে দেয়, তাহা তার নিজের নয়। নারিক-নারিকা পরস্পরকে আপনাপন অঙ্গদান করেন, কিন্তু এই দানের দ্বারা তাঁহাদের নারিক-নারিকা-ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় না। নারিক-নারিকা-ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্ত এই দান ছাড়া আরও কিছু পাইয়ে দেওয়া প্রয়োজন। পরস্পরের সম্মুখে যত ক্ষণ ইহারা এই বস্তুটি না পাইয়াছেন, তত ক্ষণ প্রকৃত নারিক-নারিকা-ধর্মের প্রকাশ ও নারিক-নারিকা-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয় না।

এই বস্তুটি তাঁহাদের অঙ্গ নহে, কারণ, অঙ্গদানে এ বস্তু দেওয়া যায় না। এই বস্তুটি তাঁহাদের মন নহে, কারণ, প্রাপণে একে অত্রের মন যুগাইয়াও এ বস্তু দেওয়া যায় না। এই বস্তুটি, তাঁহাদের আত্মস্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি বা অহংকার বা *empirical ego*'ও নহে, কারণ, নিতান্ত অল্পগত জ্ঞী কিংবা দ্বৈগ পুরুষ এই স্বাতন্ত্র্যবলিদান করিয়াও আপনাত পতি বা পত্নীকে এই বস্তুটি দিতে পারেন না।

এ দেশে বহুতর জ্ঞীলোক পুরুষের অল্পগত দাসী হইয়া থাকেন, ইহাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি আদৌ জাগিবার অবকাশ পর্য্যন্ত পায় না, অথবা জাগিয়া উঠিলেও সমাজধর্মের ও গার্হস্থ্য-আদর্শের চাপে একেবারে নিষ্পিষ্ট হইয়া যায়। সকল দেশেই এমন মেকদওহীন পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা আপনাপন পত্নীর অস্তিত্বের মধ্যে নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিকে বা *individuality*'কে একেবারে ডুবাইয়া দেন। কিন্তু এই সকল জ্ঞীপুরুষ আপনাপন পতি বা পত্নীকে এই বস্তুটি পাইয়ে দিতে পারেন না। এই কারণে ইহাদের মধ্যে প্রকৃত নারিক-নারিকা-ধর্মের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয় না।

এই জন্ত, যে বস্তু নারিক নারিকাকে বা নারিকা নারিককে 'পাইয়ে দেন', তাহা ইচ্ছিন্ন-সেবার স্তব নহে। এই বস্তুটি ব্যবহারিক আল্পগত্যও নহে। এই বস্তুটিকে আত্ম-চরিতার্থতা কহিতে পারি। পুরুষের সাকুল্য পুরুষের ও নারীর সমগ্র নারীত্বের চরিতার্থতালভ যাহার দ্বারা হয়, তাহাই এই বস্তু।

নারীর নারীত্ব নারীর নিজস্ব সম্পত্তি, পুরুষের নহে। পুরুষের পুরুষত্ব পুরুষেরই নিজের বস্তু, নারীর নহে। পুরুষ যাহা দিতে পারেন, তাহা তাঁর এই পুরুষত্বেরই অন্তর্ভুক্ত, তাঁর যাহা কিছু সকলই যে এই পুরুষত্বাধীন। নারীও

যাহা দিতে পারেন, তাহা তাঁর নারীষেরই অস্ত্রভূক্ত, তৎসমুদায়ই তাঁর নারী-ধর্ম্মাধীন। পুরুষ নারীকে তাঁর নারীত্ব দান করিতে পারেন না, নারীও পুরুষকে তাঁর পুরুষত্ব দান করিতে পারেন না। পুরুষের বিকাশেই পুরুষের সার্থকতা। নারীষের বিকাশেই নারীর সার্থকতা। এই ক্ষুদ্র পুরুষ নারীকে বা নারী পুরুষকে সার্থকতা দিতে পারেন না,—পাইয়ে দিতে পারেন মাত্র। এই সার্থকতা-প্রাপণেই নায়ক-নায়িকা-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়।

অতএব যে পুরুষ আপনার রূপগুণাদির দ্বারা কোনও রমণীর সাকুল্য ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও আত্মজ্ঞানকে জাগাইয়া, নিজের দিকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হন, এবং সেই আকর্ষণের যোগেই তাঁহার সমগ্র নারী-প্রকৃতিকে চরম সার্থকতালাভের পথে প্রেরণ করেন, কেবল তাঁহাকেই নায়ক কহিতে পারা যায়। সেইরূপ যে রমণী আপনার রূপগুণাদির দ্বারা কোনও পুরুষের সাকুল্য ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও আত্মজ্ঞানকে জাগাইয়া আপনার দিকে আকর্ষণ করেন, এবং এই আকর্ষণযোগেই তাঁহার সমগ্র পুরুষকে চরম সার্থকতার পথে প্রেরণ করেন, তাঁহাকেই কেবল নায়িকা কহিতে পারা যায়।

ত্রিবিপিনচন্দ্র পাল।

উত্তরাধিকারী

(১)

ময়রার মেয়ে কাদী মুড়ি-মুড়কি বেচিয়া যখন হাতে ছ'পয়সার সংস্থান করিল, তখন সে এই ছ'পয়সার উত্তরাধিকারীর জন্ত বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

ভরা ঘোবনে স্বামীর মুখাণ্ডি করিয়া কাদী যে দিন কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিল, সে দিন সে একবারও মনে করে নাই যে, তাহাকে আবার সংসারে থাকিতে হইবে এবং মুড়ি-মুড়কি বেচিয়া দিন গুজরান করিতে হইবে। কিন্তু সে বাহা মনে করে নাই, কিছু দিন পরে কাজে তাহাই করিতে হইল। শূন্য সংসারে তাহাকে একাই থাকিতে হইল এবং মুড়ি-মুড়কির দোকান করিয়া সেখানে থাকিবার উপায় করিতে হইল।

গাঁয়ের বাজার-পাড়ায় হরিদাস বেজের মেঠায়ের দোকান ছিল। দোকানখানা বেশ চলতি ছিল, কিন্তু হরিদাসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহা অচল হইয়া পড়িল। মহাজন পাঁচ বৎসরের খাতার দের টানিয়া ছই শত তেত্রিশ টাকা সাত আনা তিন পাই বাকী করিল। কাদিনী দোকানের মজুত মালপত্র, হাড়ি-কলসী পর্যন্ত বেচিয়া স্বামীকে ঋণমুক্ত করিয়া দিল। জ্ঞাতী সম্পর্কে ভাসুর মদন বেজ আসিয়া বলিল, “তুমি কি ক্ষেপেছ বোমা, ও সব মহাজনের চাতুরী। আমার হাতে দোকানটা দাও, দেখি কোন্ বেটা একটি পয়সা আদায় করে।”

কাদিনী কিন্তু সে কথা কাণে তুলিল না। দোকান বেচিয়া স্বামীকে ঋণমুক্ত করিল, তার পর গলার মুড়কি-মাছলী বেচিয়া তিল-কাঞ্চনে স্বামীর পার-লৌকিক কার্য সম্পন্ন করিল। মদনের মনঃকোভের সীমা রহিল না, কিন্তু এই কোভ-নিবারণের কোন উপায়ই সে খুঁজিয়া পাইল না। কেবল ছই বেলা মালা-জপের সময় শ্রীহরির চরণে আত্মহুঃখ নিবেদন করিয়া এই অধর্মের প্রতীকার প্রার্থনা করিতে লাগিল।

স্বামীর শ্রাদ্ধাদি কার্য শেষ করিয়া কাদিনী যখন আপনাকে নিতান্ত অসহায় জ্ঞান করিল এবং জীবনযাত্রা-নির্কাহের কোন উপায়ই দেখিতে পাইল না, তখন সে ভাসুর মদন বেজের শরণাপন্ন হইল। মদন কিন্তু তাহাকে আমল দিল না; সে বারংবার দীনবন্ধু শ্রীহরিকে শরণ করিতে করিতে অপরের প্রতি-

পালনে আপনার সম্পূর্ণ অক্ষমতা জানাইয়া দিল। কাদম্বিনী চলিয়া গেলে মদন গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বৃহৎ হস্তসহকারে বলিল, “দেখলে মাগীর আক্কেলটা। এখন হয়েছে কি? আগে না শুনিলে বঁধু যৌবনের ভরে, এখন কাঁদিতে হবে অজ্ঞের ঝরে।” মধুসূদন আছেন।”

এ দিকে কাদম্বিনী আরও দুই এক জন স্বজাতির দ্বারস্থ হইয়া যখন প্রত্যা-
খ্যাত হইল, তখন সে ভজা চাঁড়ালের মার পরামর্শে আপনার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইবার
সকল করিল। সে মল ও রূপার পৈছে বেচিয়া মুড়ি-মুড়কির দোকান করিল।
বাড়ীর পাঁচীলের গায়েই একটু চালা বাড়াইয়া লইয়া দোকান গুলিল। ভজার মা
বাজার হইতে চাল, ধান, গুড় প্রভৃতি মালপত্র আনিয়া দিত; কাদী ঘরে বসিয়া
মুড়ি-মুড়কি তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করিত।

দোকান বেশ চলিল, কাদম্বিনীর জীবিকা নির্বাহের উপায় হইল। কিন্তু
সে আর এক দিকে বড়ই অসুবিধা বোধ করিল।

কাদম্বিনী ভরা যৌবনেই বিধবা হইয়াছিল। দেখিতেও সে মন্দ ছিল না।
সুতরাং পাড়ার অনেক নিকর্যা ছোঁড়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার দোকানে
আড্ডা জমাইয়া থাকিত। সে আড্ডায় গান-গল্প, হাসি-তামাসা, সব রকমই
চলিত। কাদম্বিনী ভয় পাইত, কিন্তু সাহস করিয়া মুখের উপর কাহাকেও
কিছু বলিতে পারিত না।

শেষে ব্যাপার এমন গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল যে, কাদম্বিনী ভজার মাঝে
আপনার অসুবিধার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। ভজার মা চাঁড়ালের
মেয়ে, একরোখা, কাহাকেও ভয় করিয়া চলে না। সে এক দিন ছোঁড়ার
দলকে এমন কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিল যে, তাহারা আর দোকানের
ত্রিসীমানায় আসিতে সাহস করিল না। কাদম্বিনী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ছোঁড়ার দল কিন্তু সহজে ছাড়িল না। সেই দিন হইতে প্রতি রাত্রিতে
কাদম্বিনীর বাড়ীতে ইট-পাটকেন পড়িত, দরজার শিকল নড়িত, জানালার
বাহিরে নীষের শব্দ শুনা যাইত। কাদী ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকিত,
বিপদে মধুসূদনকে স্মরণ করিবার শক্তিও তাহার থাকিত না। লোকে শুনিয়া
বলিত, “এ সব উপদেবতার কাজ। হরিদাস যে বারদোষ পেয়েছিল।”

কাদম্বিনী পুরোহিতকে আনাইয়া বারদোষের শাস্তি স্বস্ত্যয়ন করাইল, কিন্তু
ভূতের উপদ্রব থামিল না। ভজার মা বলিল, “মবু ছুঁড়ি, এ সব ভূত কি কুল-
কুলসীতে যায়? এ ভূতের আলাদা ওষুদ।”

ভজার মা স্বতন্ত্র ঔষধের ব্যবস্থা করিল। সে নিজে ঘর-দোর, ছেলে-পিলে

ফেলিয়া শুইতে আসিতে পারিল না, ভজাকে পাঠাইয়া দিল। যে দিন হইতে ভজা কাদম্বিনীর ঘরের দাবার চাটাই পাতিয়া, পাকা বাঁশের লাঠি পাশে রাখিয়া শুইতে আরম্ভ করিল, সেই দিন হইতে ভূতের উপদ্রব থামিয়া গেল।

(২)

ভূতের উপদ্রব কমিল, কিন্তু মানুষের জিহ্বার উপদ্রব বাড়িয়া গেল। প্রবীণারা নাক সিটকাইয়া ছি ছি করিতে লাগিল, নবীনারা মুখ মুচুকাইয়া মুহু হাসিল; মদন বেজ হাতের মালা দ্রুত ঘুরাইতে ঘুরাইতে গৃহিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “দেখলে গিন্নি, ভাগ্যে জায়গা দিই নাই। ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করেন।”

গৃহিনী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, “অমন সোমন্ত ছুঁড়ীকে কি ঘরে ঠাই দিতে আছে? ছি ছি, আবাগী কি লোকটাই হাসালে?”

কাদম্বিনীর কাণেও অনেক কথা গেল, কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য করিল না। ভাবিল, “লোকে বা বলে বলুক না, আমি তো ঠিক আছি।” কাদম্বিনী জানিত না যে, লৌকিক তুলাদণ্ডে ঠিক-বেঠিকের ওজন সব সময়ে সমানভাবে হয় না।

এ কথাটা কাদম্বিনী সেই দিন কতকটা বুঝিতে পারিল—যে দিন পুরোহিত তাহার ঘরে লক্ষ্মীপূজা করিবে না বলিয়া জবাব দিয়া গেল। কাদম্বিনী পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমার অপরাধ?”

পুরোহিত উত্তর করিলেন, “তোমার অপরাধ গুরুতর; তুমি চাঁড়ালের ছেলের সঙ্গে মন্বন্ধ পাতিয়েছ।”

কাদ। চাঁড়ালের ছেলের সঙ্গে আমার কোন মন্বন্ধ মন্বন্ধ নাই; সে আমাকে মায়ের মত দেখে, আমি তাকে ছেলের মত দেখি।

পুরো। কে কাকে কি ভাবে দেখে, কেমন ক’রে জানুব বল? আমরা তো অন্তর্দ্বারী নই?

কাদ। তবে মন্বন্ধ দিকটা কি রকমে জানলেন?

পুরো। অল্পমানে। ধোঁরা দেখলেই বুঝা যায় যে, আশুনও আছে।

কাদম্বিনী একটু রাগত ভাবে বলিল, “তা হ’লে আমার ধর্ম রক্ষা করাও দোষ হয়েছে বলুন?”

পুরোহিত মন্তক সঞ্চালনে দীর্ঘ শিখা কম্পিত করিয়া অবিচলিতভাবে উত্তর করিলেন, “এ ভাবে ধর্ম রক্ষা করার চেয়ে অধর্ম করাও ছিল ভাল।”

কাদম্বিনী রাগে পূজার উপকরণ ছড়াইয়া ফেলিয়া বলিল, “যান আপনি, আমার আর পূজার দরকার নাই।”

পুরোহিত চলিয়া গেলেন; কাদম্বিনী পূজার জিনিষপত্র সব কুড়াইয়া লইয়া জলে ফেলিয়া দিয়া আসিল।

ভজার মা আসিয়া বলিল, “ই! লা ময়রা-বো, রায় ঠাকুর না কি তোরা পূজো বন্ধ করেছে?”

ঔদাস্তের সহিত কাদম্বিনী বলিল, “করুক বোন, আমার তো সাত দিকে সাতটা ছেলে-মেয়ে জন্-জন্ করছে যে, পূজো না হ’লে তাদের অকল্যাণ হবে।”

ভজার মা রাগিয়া বলিল, “তা হোক আর নাই হোক, ও বামুন তোরা পূজো বন্ধ করে কোন্ লজ্জায়? ভগ্নী তাঁতিনীর কথা কি কেউ জানে না?”

কাদম্বিনী বলিল, “মরুক গে, আমরা গরীব-দুঃখী লোক, আমাদের অত কথার দরকার কি? যে কাঠ খাবে, সে আগুনা হাগবে।”

ভজার মা মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, “ই: লো, ‘চালুনী বলে ছুঁচ তোরা’—তাই আর কি। বামুনের একবার দেখা পেলে হয়, এমন তো শুনিয়ে দেব নি।”

পরদিন বাজারে যাইবার পথে ভজার মা রায় ঠাকুরের সাক্ষাৎ পাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, “ই! গা রায় ঠাকুর, ভগ্নী না কি বিন্দাবনে যাবে?”

মস্তক কণ্ঠরন করিতে করিতে রায় ঠাকুর বিচলিত-স্বরে বলিলেন, “ভজার মা, ভজার জন্তে একথানা ভাল গামছা বেছে রেখেছি, নিয়ে যাস।”

ভজার মা মাথা নাড়িতে নাড়িতে সহাস্তে বলিল, “তা আনবো বৈকি বাবা-ঠাকুর, আমরা তো তোমাদের খেয়েই মাহুষ। তবে কি না, ময়রা-বো বলছিল যদি যায়—”

ব্যস্তভাবে রায় ঠাকুর বলিলেন, “আর কিছু বলতে হবে না ভজার মা, কি করবো, ওর জ্ঞাতি শত্রু। তা এবার দেখা যাবে।”

রায় মহাশয় তাড়াতাড়ি ভজার মার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন। ভজার মা মুহূ হাসিয়া বাজারের পথ ধরিল।

ইহার পর হইতে কাদম্বিনীর লক্ষ্মীপূজা মনসাপূজা কিছুই বাদ গেল না।

তার পর চার পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। কাদম্বিনীর হাতে কিছু জমিল। সে বন্ধক জিনিষপত্র রাখিয়া লোককে কিছু কিছু টাকা ধার দিত, স্ত্রী আসলে টাকা বাড়িয়া উঠিত। এইরূপে বছরে বছরে একশত টাকা ছইশতে, ছইশত চারিশতে বাড়িয়া উঠিল। টাকা ধার দিবার বা আদায়ী টাকা তুলিবার সময় কাঠের সিঁদুক খুলিলে, যখন চক্চকে টাকাগুলি সম্মুখে হাসিতে থাকিত, তখন আনন্দে গর্কে কাদম্বিনীর বুকটা ফুলিয়া উঠিত। কিন্তু সিঁদুক বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিলেই তাহার এ আনন্দটুকু নিরানন্দে পরিণত হইত। টাকা তো জমিতেছে, কিন্তু এ

টাকা ভোগ করিবে কে ? যদি স্বামী থাকিত ! স্বামী না থাকে, যদি সেই এক বছরের ছেলেটাও বাচিত ! যদি একটা কাণা-খোঁড়া মেয়েও থাকিত ! একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাদম্বিনী ভাবিত, “দূর হোক, একা একা আর ভাল লাগে না। যদি একটা পরের ছেলেও পাই, মানুষ-মুহুর ক’রে মনের সাধ মিটাই।”

• রায় ঠাকুর মাঝে মাঝে আসিয়া উপদেশ দিতেন, “কাছ, গাছপ্রতিষ্ঠা কর। পরকালে সন্তানের কাজ করবে।”

রায় মহাশয় দোকানে দেবদারু কাঠের বাস্তের উপর বসিয়া বসিয়া বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার অপূর্ণ কলঙ্কনকহ বিষয়ে কত পৌরাণিক কাহিনী কীর্তন করিতেন; কোন বৃক্ষপ্রতিষ্ঠাতা যমালয়ে ডোমের মেয়ের কাছে কুলার দাম না দেওয়ার ঋণপাশে জড়িত হইয়া পড়িলে অশ্বখরূপী নারায়ণ কিরূপে আপনার বক্ষচর্চ কাটিয়া দিয়া প্রতিষ্ঠাতাকে ঋণমুক্ত করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতেন। শুনিতে শুনিতে কাদম্বিনী মুগ্ধ হইয়া পড়িত। কিন্তু পরক্ষণেই যখন শূন্তগৃহের উপহাসপূর্ণ অটহাসি শুনিতে পাইত, তখন পরলোকের স্বপ্নের আশ্বাসে তাহার শূন্ত হৃদয়টা কিছুতেই শান্ত হইত না, তাহার আগে ইহলোকেই হৃদয়ের এই শূন্ততা পূর্ণ করিবার জন্য প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিত। সে আকুলতার নিকট রায় মহাশয়ের ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণের মধুর উপদেশাবলী কঠোর বিক্রপের মতই প্রতীকমান হইত।

মদন দাসও নিশ্চিন্ত ছিল না; সে মালা হাতে মধ্যে মধ্যে আসিয়া কাদীর দোকানে বসিত এবং পারলৌকিক পুণ্যসঞ্চয়ের প্রতিবাদ করিয়া বলিত, “পরকালের কথা পরে, ম’লে জলপিণ্ড দেবার লোক আগে চাই। আর গাছপ্রতিষ্ঠা, দান-ধান না করলেই কি পুণ্য হয় না ? তার সোজা পথ প’ড়ে রয়েছে। শাস্ত্রে আছে, এক রাম নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা করে। হরিনাম কর। হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্, নাস্ত্যেব গতিরনুধা। শুধু নাম, নাম ছাড়া কলিতে আর উপায় নাই।”

এইরূপে গলদশ্লোচনে নাম-মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া পরম বৈষ্ণব মদন দাস স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্রটিকে পালকপুত্ররূপে বাহাতে কাদম্বিনী গ্রহণ করে, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিত। কাদম্বিনী কিন্তু কোন উত্তর দিত না। মদন দাস ক্ষুণ্ণচিত্তে গোবিন্দ মধুসূদনকে স্মরণ করিয়া ক্ষিপ্ত অঙ্গুলীসঞ্চালনে মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রস্থান করিত। কাদম্বিনী কি করিবে, তাহাই ভাবিতে থাকিত।

শেষে কাদম্বিনী যখন আপনার মাসভূত ভাই গিরিশ নাগের জীবিয়োগের সংবাদ পাইল, তখন সে ভজার মাকে সঙ্গে করিয়া ভায়ের বাড়ীতে গিয়া, গিরিশের আট

বছরের ছেলে নবীনকে লইয়া আসিল। মদন দাসের ক্রোধ ও আক্ষেপের সীমা রহিল না, সে হই বেলা এই স্বার্থপরায়ণা রমণীকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য হরির চরণে অভিযোগ করিতে লাগিল।

(৩)

“পিসী মা !”

“কেন রে, নবু ?”

নবীন কাদম্বিনীকে পিসী মা বলিয়াই ডাকিত। কাদম্বিনীর ইচ্ছা ছিল, শুধু মা বলিয়াই ডাকে। ভক্তার মাও তাহাকে প্রথম প্রথম মা বলিয়া ডাকিবার জন্য অমুরোধ করিয়াছিল, নবীন কিন্তু সে অমুরোধ রাখিল না; উত্তরে বলিত, “দূর, এ যে পিসি মা। আমার মা তো ম’রে গেছে।”

বুদ্ধিমান নবীন পিসীমাকে মা বলিয়া ডাকিতে পারিল না, পিসী-মা বলিয়াই ডাকিতে লাগিল। কাদম্বিনীকে অগত্যা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে হইল। তবু তো সম্বোধনের শেষে মা কথাটা আছে।

নবীন ডাকিল, “পিসী মা !”

কাদম্বিনী বলিল, “কেন রে, নবু ?”

নবীন। আমি আর পাঠশালে যাব না।

কাদ। কেন ?

নবীন। গুরুমশায় যে মারে।

মুহু হাসিয়া কাদম্বিনী বলিল, “গুরু মশায়ের মার না খেলে কি লেখাপড়া হয় বাবা ?”

জোরে মাথা নাড়িয়া নবীন বলিল, “নাই বা হ’লো। লেখাপড়া শিখে কি হবে ?”

কাদ। পরসে আনতে পারবি।

নবীন। আমার পরসে আনবার দরকার কি ? তোমার তো পরসে আছে।

কাদ। সে আর কত ?

নবীন। পাঁচ সাতশো হবে তো ?

কাদ। তা হ’তে পারে, কিন্তু তাতে কি হবে ?

নবীন। তাতেই খুব হবে। ঐ পরসায় আমি একটা দোকান করবো পিসী মা, খুব মস্ত দোকান হবে, তিন চার জন হানুইকর রেখে দেব। রোজ আট দশ টাকা বিক্রী হবে।

কাদম্বিনী হাসিয়া উঠিল; বলিল, “তা তো করবি, কিন্তু লেখাপড়া না শিখলে দোকান চালাতে পারবি কেন ?”

মস্তক সঞ্চালন করিয়া নবীন বলিল, “খুব পারবো।”

কাদম্বিনী বলিল, “তা পারিস্ পারবি। এখন পাঠশালে যা।”

নবীন মুখ ভার করিয়া সরোদনে বলিল, “না, পাঠশালে গেলে আমি মরে যাব।”

কাদম্বিনী তাহার মাথায় হাত দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “ঘাট্ ঘাট্, অমন কথা কি বলতে আছে?”

হাত দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে নবীন বলিল, “না, বলতে নেই। গুরু-নশায় এত মারে, তবু তুমি বল পাঠশালে যাও। তুমি পিসী কি না, মা হ’লে কি আমায় যেতে দিত?”

কাদম্বিনীর বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইয়া স্তম্ভিত দৃষ্টিতে নবীনের মুখের দিকে চাহিল। নবীন পাতা দোয়াত ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইল।

হার অবোধ শিশু, কি বুঝিবি তুই, কতখানি বুকভরা স্নেহ, প্রাণভরা আশা, হৃদয়ভরা আনন্দ লইয়া তাকে প্রতিপালন করিতেছে। তোর জন্ত সে যে কত লোকের বিরাগভঞ্জন হইয়াছে, কত পারলৌকিক সুখের আশা ত্যাগ করিয়াছে, আপনায় নিশ্চিন্ত নিরুদ্ভিগ্ন জীবনে কত চিন্তা, কত উদ্বেগ ডাকিয়া আনিয়াছে; তোর মুখের দিকে চাহিয়া সে শূন্য সংসারে কতখানি পূর্ণতা দেখিতে পাইয়াছে।

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাদম্বিনী ভাবিল, “ছেলে মানুষ।”

আর একদিন নবীন বলিল, “ও চাড়ালটা কেন আসে পিসী মা?”

“কে?”

“ঐ ভজা বেটা?”

“এলেই বা।”

সক্রোধে নবীন বলিল, “কেন আসবে? ও ছোট লোক, চাড়াল।”

কাদম্বিনী বলিল, “ছি বাবা, ওরা অসময়ে আমার কত উপকার করেছে।”

রাগে চাঁৎকার করিয়া নবীন বলিল, “করেছে করেছে, এখন আসতে পারে না।”

বিস্মিতভাবে কাদম্বিনী বলিল, “কেন বল দেখি।”

নবীন। কেন? ওর জন্ত কত লোকে কত কথা বলে।

কাদম্বিনীর মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল; ধীরে ধীরে বলিল, “লোকের কথায় কাণ দিতে নাই।”

উত্তেজিত কণ্ঠে নবীন বলিল, “কাণ দিতে নাই তুমি দেবে না, আমি ও সব সহিতে পারব না। তা হর তো আমি বাবার কাছে চ’লে যাব।”

কাদম্বিনী নির্ঝাক্ নিশ্চল। হায়, এ যে পরের ছেলে। এই ছেলেকে লইয়া সে আপনার পুত্রস্নেহের প্রবল তৃষ্ণা নিবারণ করিতে চায়? ইহারই ক্ষণে সে অশ্রু-রূপী নারায়ণকেও পুত্রস্নেহে বরণ করিতে সম্মত হয় নাই? শুধু স্নেহের শিকলে—ভাল-বাসার প্রলোভনে সে কতক্ষণ এই বনের পাখীকে ধরিয়া রাখিবে? সে যে কথার কথার শিকলী কাটিতে চায়! নিজের ছেলে আর পরের ছেলের এত প্রভেদ!

তা হউক পরের ছেলে, সে যত পারে আঘাত করুক, তথাপি কাদম্বিনী তাহাকে ছাড়িতে পারিবে না। সে যে তাহার শূন্য বুকের অনেকখানি জুড়িয়া বসিয়াছে। কাদম্বিনী আপন মনে একটু হাসিল।

(৪)

মদন দাস রায় ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “কি গো, রায় ঠাকুর, তোমার মাতব্বর যজ্ঞমানের ছেলের বিষে যে।”

রায় ঠাকুর মুখ-বিকৃতি করিয়া বলিলেন, “রেখে দাও মাতব্বর যজ্ঞমান। বেটা আগে ছ’পরসাদি দিচ্ছেল খুচ্ছেল বটে, কিন্তু ঐ ছেলেটাকে নিয়ে অবধি আর কড়া ধুয়ে কড়ার জলটুকুর পর্য্যন্ত প্রত্যাশা নাই। ছেলেটা ওকে স্বর্গে দেবে। পঞ্চমীর ব্রত নিলে, তা আজ পর্য্যন্ত উজ্জাপন করলে না। বলে সময়টা বড় খারাপ। আরে বেটা, তোর সময় কি আর ভাল হবে? ছেলেটাও জুটেছে তেমনি।”

মাথা নাড়িয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে মদন দাস বলিল, “সকলই ত্রীহরির ইচ্ছা। আমি ব’লেছিলাম, আমার ছোট ছেলে কেউখনকে নাও। তা পছন্দ হ’লো না। গোবিন্দ, গোবিন্দ!”

একটু থামিয়া মদন দাস পুনরায় বলিল, “তা বাবাঠাকুর, আমার তাতে কোনই ক্ষতি নাই, আমার সোণার চাঁদ সব বেঁচে থাকুক, কিন্তু তোমার জাতও গেল, পেটও ভরল না।”

ক্রকুটী করিয়া রায় ঠাকুর বলিলেন, “আমার জাত গেল কিসে? তোমরা কি ওকে রহিত করতে পেরেছ? তোমাদের সে কুমত্তা আছে কি? থাকতো যদি জগন্নাথ দাদা বেঁচে।”—

বিরলকেশ মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে মদন সহাস্তে বলিল, “তিনি নাই, দর্পহারী মধুসূদন আছেন, তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন। তা তোমরা যাও যাবে বাবা-ঠাকুর, আমি আর এ বয়সে চণ্ডালের অন্ন খেয়ে দেহটা অপবিত্র করতে পারব না।”

রায় ঠাকুর মুখটা একটু বাড়াইয়া দিয়া নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিছু গোলযোগ উঠেছে নাকি?”

অপাঙ্গে রায় ঠাকুরের দিকে চাহিয়া মদন দাস বলিল, “পাপ কখন আশুন চাপা থাকে না বাবাজী, তবে এখন চেপে যাও, বেশ, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। ‘তায়োরে সাত ভাল বয়’ বুঝলে?”

যেন বুঝিয়াছে, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া রায় ঠাকুর মন্তক সঞ্চালন করিলেন।
• মদন দাস বারকতক পাপতাপহারী মধুসূদনকে ডাকিয়া লইল।

(৫)

নবীন ষোল বছরে পড়িতেই কাদম্বিনী তাহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। একটি ছোট্ট বো ঘরে আসিবে, কাদম্বিনী মনের সাধ-আহ্লাদ মিটাইয়া তাহাকে খাওয়াইবে পরাইবে, ছেলে বো লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিবে, নবীনেরও উচ্ছ্বলতা প্রশমিত হইয়া আসিবে। কাদম্বিনী মেয়ে খুঁজিতে লাগিল।

অনেক খোঁজাখুঁজি, অনেক পছন্দ-অপছন্দের পর পৌনে তিন শত টাকা পণে একটি মেয়ে পাওয়া গেল। কাদম্বিনী বিবাহের উত্তোগে প্রবৃত্ত হইল। বিবাহের সময় নবীনের বাপ গিরিশ নাগ আসিল, আরও দুই চারি জন আত্মীয় কুটুম্বকে আনা হইল। কাদম্বিনীর সুখ কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া আসিল। হার, কে জানিত যে, সব হারাইয়া আবার এমন করিয়া সবল সুখই পাওয়া যাইবে? আনন্দে আত্মহারা হইয়া কাদম্বিনী দিন গণিতে লাগিল।

বিবাহের দিন নিকট হইল। গারে হলুদ হইয়া গেল। হলুদমাখা কাপড় পরিয়া জাঁতি হাতে হাসিমুখে নবীনকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া কাদম্বিনী আনন্দে চোখের জল চাপিতে পারিল না।

গাত্রহরিদ্রার আগে গিরিশ নাগ আসিয়া একটু গোল বাধাইয়াছিল। সে বলিল, “কাছ, তোমার যা কিছু, সবই নবীনের। তা হ’লেও তোমার জাঁতির তোমার ওয়ারিশ। বিয়ের আগে নবীনের নামে একটা কারেমী লেখাপড়া ক’রে দাও। শরীরের ভালমন্দের কথা তো বলা যায় না।”

ভাবিয়া চিন্তিয়া কাদম্বিনী ইহাতে সন্তুষ্ট হইল। দানপত্র দ্বারা কাদম্বিনী আপনার ঘরবাড়ী, টাকা-কড়ি, বন্ধকী গহনা প্রভৃতি সব নবীনের নামে লেখাপড়া করিয়া দিল। কোবালা রেজেষ্টারী হইয়া গেলে গাত্রহরিদ্রা হইল।

বিবাহের দিন সকালে কাদম্বিনী যখন নান্দীমুখের যোগাড় করিতেছিল, তখন মেয়ের বাড়ী হইতে একটি লোক আসিয়া জানাইল যে, মেয়ের বাপ সংবাদ পাইয়াছে, বরের প্রতিপালিকা পিসীর গ্রামে একটা অপবাদ আছে। পরগণার কাছে তাহার মীমাংসা না হইলে এ বাড়ীতে মেয়ে দেওয়া যায় না। নবীনকে মেয়ে দিতে আপত্তি নাই, কিন্তু কাদম্বিনী বাড়ীতে থাকিলে বিবাহ হইবে না।

সংবাদ শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। গিরিশ নাগ মাধব হাত দিয়া বসিল। মদন দাস আসিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। নবীন বলিল, “যদি বিয়ে না হয়, গলায় দড়ি দেব।”

অনেক আন্দোলন তর্কবিতর্ক হইল। শেষে স্থির হইল, বিবাহ বন্ধ হইতে পারে না; কাদম্বিনী দিন কতকের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া যাক। নবীনের শুষ্ক মুখ প্রফুল্ল হইয়া আসিল। সে কাদম্বিনীকে বলিল, “তাই ভাল পিসীমা, তুমি দিন কতক কোথাও গিয়ে থাক।”

রুদ্ধাশ্রাসে কাদম্বিনী জিজ্ঞাসা করিল, “আমি কোথায় থাকুব?”

গিরিশ বলিল, “থাকবার ভাবনা কি? আমার বাড়ীতে না হয়, ঘোষপুরে আমার ভাগ্নে জামায়ের বাড়ীতে গিয়ে থাক।”

নবীন সোৎসাহে বলিল, “তাই যাও পিসীমা, সিন্দূকের চাবীটা দিয়ে যাও।”

কাদম্বিনী নবীনের প্রফুল্ল মুখপানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আঁচল হইতে চাবীটা খুলিয়া দিল। উঠানে ভজার মা গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়াছিল; কাদম্বিনী গিয়া তাহার হাত ধরিল; বলিল, “আয় ভজার মা।”

কাদম্বিনী ভজার মাকে টানিয়া বাহিরে আনিল। বাহিরে আসিয়া ভজার মা জিজ্ঞাসা করিল, “যাবি কোথায়?” কাদম্বিনী থমকিয়া দাঁড়াইল; উদ্ভিগ্নস্বরে বলিল, “তাই তো, কোথায় যাব বল দেখি।”

ভজার মা একটু হাসিয়া বলিল, “বিন্দাবনে চন্।”

কাদম্বিনী বলিল, “সেই ভাল, আয়।”

ভজার মাকে টানিয়া লইয়া কাদম্বিনী চলিয়া গেল।

*

*

*

মদন দাস বলিল, “ছিঃ বোমা, চাঁড়ালের ঘরে থাকা কি ভাল দেখায়?”

ভজার কুঁড়ের দাবায় কাদম্বিনী বসিয়াছিল। ভাস্করকে দেখিয়া সে একটুও সঙ্কুচিত হইল না, মুখে ঘোমটা দিল না। সে দুই চোখ কপালে তুলিয়া ক্রকুটী করিয়া বলিল, “খুব ভাল দেখায়। এ চাঁড়ালের ঘর তোমাদের ঘরের চেয়ে পবিত্র।”

রায় ঠাকুরও মদনের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি আক্ষেপের স্বরে বলিলেন, “মাথা খারাপ হ'য়েছে। নইলে বলে চাঁড়ালের ঘর পবিত্র।”

ক্রোধে চীৎকার করিয়া কাদম্বিনী বলিল, “হাঁ, পবিত্র। আবার তোমাদের চেয়ে ভজা, ভজার মা পবিত্র। আমি ময়রা হ'তে চাই না, তোমাদের মত বামুন হ'তে চাই না, অন্য অন্য যেন ভজার মার মত চাঁড়ালের ঘরে হই।”

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পুথিখানি পাঁচ পাতায় বা দশ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। দোভাঁজ-করা কাগজের দুই পৃষ্ঠে লিখিত; এক পৃষ্ঠায় ১৩, অপর দুই পৃষ্ঠায় ২ ও ১০ এবং অন্ত সকল পৃষ্ঠায় ১২ পংক্তি করিয়া লিখিত। গ্রন্থের অক্ষর সমস্তই আধুনিক আকারের, মাত্র ক-কার প্রাচীন কালের নিদর্শন প্রকাশ করিতেছে। এই আকারের ক চণ্ডিদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতে দেখিতে পাওয়া যায়। * পুথির বানান অশুদ্ধ হইলেও ভাষা মন্দ নহে।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়

আলোচ্য পুথিখানির প্রতিপাদ্য বিষয় সহজিয়া-ধর্ম, কিন্তু পুথির আরম্ভেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, অবৈত ও ভক্তবৃন্দের বন্দনা আছে। যথা—

“জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
প্রথমে বন্দিব প্রভু গৌরচন্দ্র রায়।
জাহার কৃপাতে ভক্তের চক্ষুদান পায় ॥
রসরাজ মহাভাবে দুইএ এক হয়।
প্রেমরস পিয়াইল বন্ধন ঘুচাইয়া ॥”

পুথির আরম্ভে এইরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভূতির বন্দনা দেখিয়া ইহাকে সাধারণতঃ গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের গ্রন্থ বলিয়াই ধারণা হয়। কিন্তু আর একটু অগ্রসর হইলেই পাঠকের এই ভ্রম দূর হইবে, ইহার পরেই গ্রন্থকার বলিতেছেন,—প্রভুর মনের কথা কেহই জানে না, কেবল অরসজ্ঞ মূর্থ লোকেরা প্রভুর কথা হইতে ধর্ম + ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। যথা—

“প্রভুর অন্তরকথা কোন্ লোক জানে।
অরসজ্ঞ মূর্থ জন ধরম বাখানে ॥”

এইখান হইতেই সহজিয়া ভাবের আরম্ভ। ইহার পরেই ত্যাগিকুলের জলন্ত আদর্শ মহাপ্রভু, তাঁহার সহচর, মূর্তিমান বৈরাগ্যের অবতার রঘুনাথ, শ্রীকৃষ্ণ, স্বরূপ প্রভৃতির নিকট “মনের কথা” প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহারা সেই “বারতা” প্রচার করিয়া দিলেন। এই “বারতা” চণ্ডিদাস, বিষ্ণুপতি, রায় মহাশয় ও জয়দেব গোস্বামীও কিছু কিছু জানিতেন। যথা—

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২২শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, কৃষ্ণকীর্তনের লিপিকালবিবরণ প্রবন্ধ ১৮৩পৃ: দ্রষ্টব্য।

† এখানে বোধ হয়, ধর্ম শব্দে মহাপ্রভু-প্রবর্তিত বিত্তম গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে।

“এই তিন জন ভক্ত কহিল বারতা ॥
 শ্রীচণ্ডীদাস বিজ্ঞাপতি রায় মহাশয় ।
 শ্রীজয়দেব কর্ণামৃত এ সব জানয় ॥”

ইহার পরেই পাঠক শুন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কিরূপ “মনের কথা” প্রচার
 করিতেছেন,—

“তাঁহার অন্তরকথা এবে কহ শুনি ॥
 শুন শুন আরে ভাই মানুষ লক্ষণ ।
 মানুষ সভার পর মানুষ ভজন ॥
 মানুষ সভার বড় বেদবিধি পার ॥
 অবিকৃত হইয়া জেই করএ আশ্রয় ।
 সেই তো মানুষ হয় কহি সুনিশ্চয় ॥
 শরীর ভিতরে হৈয়াছে মানুষ আকার ।
 অবিকৃত বস্তু সেই জানিহ সত্ত্বয় ॥
 • • • • •
 রসিক ভক্ত সঙ্গ যদি ভাগ্য হয় ।
 মানুষ ভজন কথা সেই সে বুঝয় ॥”

ইহার পর মহাপ্রভুর মুখে প্রত্যকার বলাইতেছেন,—কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণবীজ ও কৃষ্ণমন্ত্র
 যে আমি শ্রবণ করি, তাহা সকলই বাহ । যথা—

“কৃষ্ণবীজ নাম মন্ত্র করি (যে) শ্রবণ ।
 সেই সব বাহ্য হয় জানিহ কারণ ॥”

বস্তুতঃ ইহাই সার পদার্থ ;—

“ব্রহ্মাণ্ড বেড়িয়া এক আছে জলনিধি ।
 তাহার উপরে রজ সত্ত্বগুণ বধি ॥
 তাহার উপরে প্রেম সাগর পাথার ।
 তাহাতে জন্মিল পদ্ম পিরিতি আকার ॥
 পিরিতির নাম হয় জান বৃন্দাবন ।
 সেইখানে বিহরে রতি নবীন মদন ॥
 মনরূপ ভৃগু তাহে করে গতাগতি ।
 সদা সেবা করে তার সেইখানে বসতি ॥”

যে এই সার পদার্থ অবগত নহে, তাহার প্রতি আক্ষেপ করিয়া কবি বলিতেছেন,—

“মানুষের দেহ পাইয়া যদি মানুষ না হইল।
নিশ্চয় জানিলু তারে বিধি বিড়ম্বিল ॥”

এই মানুষ কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছেন,—

“প্রেমের পিরিতি রতি হৃদয়ে জার হয়।
নিশ্চয় জানিহ তারে মানুষ সত্তে কর ॥”

এই মানুষ হইলে তাহার কিরূপ অবস্থা হয়, কবি তাহাও বলিতেছেন,—

“মানুষ হৈল সেই সভাকার পর।
বেদবিধি নাহি জানে না মানে আচার ॥
কুল শীল লোকধর্ম সব তেরাগিল।
আসক করিয়া তার সঙ্গে চলি গেল ॥”

ইহার পর যে কি হইল, তাহা রসজ্ঞ পাঠক আপনারা অনুমান করুন, আমি আর তাহা বিশ্লেষণ করিব না। এই রসের এতই আকর্ষণ যে, স্বয়ং ভগবান্ তাহার হাত এড়াইতে পারেন নাই, তিনিও ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা,—

“সেই রসে আশ্রিত হইল স্বয়ং ভগবান্।
রস হইল শ্রীরাধিকা যার নাম ॥
রসিক সকলে জানে তাহার মরম।
অরসিক জানী নাহি জানে এ সব কারণ ॥”

এই রস যে জানে না, তাহার অবস্থা কবি বর্ণন করিতেছেন,—

“রসভাব না জানিল হুঃখ মাত্র সার।
এহো লোকে পরলোকে নাহি পায় পার ॥”

ইহার পর চণ্ডিদাসের সেই পরিচিত সুরের অনুকরণে কবি রসের ব্যাখ্যা করিতেছেন,—

“রসিক সকলে কর কেহ তো রসিক নয়।
বিচার করিয়া দেখ কোটিকে গুটিক হয় ॥”

“রস রস কহে সতে রস বলি কারে ।
 তাহার বিচার এবে শুনহ প্রচারে ॥
 মধুর রস আশ্বাদরে জেই সেই ভাগ্যবান্ ।
 মধুর রস আশ্বাদরে আপনি ভগবান্ ॥
 সেই তো মধুর রস শুন তার কথা ।
 ব্রহ্মলোকে দীপ্তিমান্ আছে সদা খ্যাতা ॥
 পরকীয়া রস হয় নাম তার মেওয়া ।
 কোথায় জনম তার শুন মন দিয়া ॥
 প্রেম-সাগরমধ্যে পিরিতি-কমল ।
 তাহার মধ্যেতে রস করে টলমল ॥
 এমন পিরিতি জেই নাহি জানে ।
 মনুষ্য আকার সেই ধরে অকারণে ॥”

পরকীয়া রস আশ্বাদন করিতে ভগবানের অভিলাষ হইল, কিন্তু তাঁহার
 গোলোকে এ রসের নাম-গন্ধও নাই ; তাই তিনি মনুষ্য-দেহ ধারণ করিলেন । যথা,—

“পরকীয়া রস নাই গোলোক-ভিতরে ।
 তেজারণে ভগবান্ মনুষ্য-দেহ ধরে ॥
 মনুষ্য আকার ধরি মনুষ্যী ক্রিয়া ।
 পরকীয়া আশ্বাদন আনন্দিত হৈয়া ॥”

কিন্তু এ অবতारेও তাঁহার পূর্ণ রসআশ্বাদন হইল না । তাই তিনি নবদ্বীপে
 অবতার গ্রহণ করিলেন,—

“সম্যক্ প্রকার রস আশ্বাদন না হৈল ।
 তে কারণে নবদ্বীপে অবতার কৈল ॥”

হে মানব, ভগবানের দেশেও যে জিনিস নাই, যে জিনিসের জন্ত ভগবান্
 ব্যাকুল, শুধু ব্যাকুল নহে, তিনি ছুই ছুইবার যাহার জন্ত অবতীর্ণ হইলেন,
 মহাদেব যাহার জন্ত পাগল, তোমার কাছে সেই জিনিস থাকিতেও তুমি তাহাকে
 উপেক্ষা করিতেছ, ইহা কি কম দুঃখের কথা ! তাই এখন বলি,—

“অতএব শুন তাই পরকীয়া যজ ।
 রসিক হইয়া সতে পরকীয়া ভজ ॥”

“গুন হে রসিক ভাই ভুলিয়া কেনে গেলা ।
চিন্তামনি বস্তু পাইয়া হেলে হারাইলা ॥
জার লাগি ভগবান্ হইলা আকুল ।
জার লাগি মহাদেব হইলা পাগল ॥
সেই পরকীয়া হয় ব্রজলোকসার ।
বেদবিধির অগোচর তিন লোকের পর ॥”

ইহার পর পরকীয়া রস কাহাকে বলে, তাহার কত রকম প্রকার, প্রকার-ভেদে কি কি নাম, কিরূপ অবস্থায় ইহা বাস্তবিক প্রদান করে, বহু প্রকৃতিতে রস আন্বাদনই উৎকৃষ্ট এবং ইহারই শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা করিয়া গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করা হইয়াছে। এই সকল বিষয় আপনাদের বিস্তৃতভাবে শুনিয়া কাজ নাই এবং আমিও তাহা আপনাদের নিকট বর্ণন করিতে অক্ষম। মাত্র গ্রন্থের শেষ হইতে কবির ভণিতা উদ্ধৃত করিয়া ইহার বিবরণ শেষ করিতেছি।—

“মাধুষ ভঞ্জন আর কত বা কহিব ।
অল্লাহুরে কহি কিছু নাহি অনুভব ॥
রসিক নাগর আর রসিক নাগরী ।
দৌহার নিছনি লইয়া আমি জাই বলিহারি ॥
সংক্ষেপে কহিলাম এই শ্রীসমঙ্গল ।
এই রসতত্ত্ব জানিলে সকল কুশল ॥
বেদশুপ্ত কথা এই শ্রীরাধা বিহু মরি ।
রসতত্ত্বকথা সব কহিব বিবরি ॥
অন্তরের কথা এই নহে প্রকটন ।
শ্রীরূপ গোস্বামীর চরণ জাহার ভাবন ॥
শ্রীরূপ গোস্বামীর পাদপদ্ম করি আশ ।
শ্রীমঙ্গলরসকারি [কা] কহএ কৃষ্ণদাস ॥”

উপরে যে সহজিয়া ধর্ম-সম্বন্ধীয় পুথির পরিচয় দেওয়া হইল, এই ধর্ম প্রথম কে, কোন্ সময়ে প্রবর্তিত করেন, তাহা নির্দিষ্টরূপে অজ্ঞাপি জানা যায় নাই। তবে এ সম্বন্ধে যে সকল পুথি-পঞ্জি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে অনুমান হয়, খৃষ্টীয় অষ্টম অন্ধের কোন’ এক সময়ে বৌদ্ধ মহাযান-সম্প্রদায় হইতে এই সহজযানের উদ্ভব। সহজিয়া ধর্ম আজকাল আমরা যে আকারে দেখিতে পাইতেছি, ইহার প্রথম প্রবর্তনিতা যে ঠিক এই ভাবেই ইহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা বলা ঠিক নহে। আমরা দেখিতে পাই, যে কোন মহাপুরুষ নূতন ধর্মের প্রবর্তন করেন, তাহা

প্রথমে নির্মল ও বিশুদ্ধই থাকে। মহাপুরুষ তাঁহার সারা জীবনের কঠোর সাধনায় যে সত্য আবিষ্কার করেন, তাহা তিনি লুকাইয়া রাখিতে চাহেন না,—সংসার-পাশে আবদ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্ত তিনি তাহা প্রচার করিয়া থাকেন।—কেননা, মহাপুরুষ করুণাময়। কিন্তু সাধারণে মহাপুরুষের এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়া অনেক অনধিকারী লোক ইহাতে প্রবেশ করে এবং তদ্বারা ক্রমশঃ নির্মল ধর্মে আবর্জনা প্রবেশ করিয়া থাকে; ভারতের তথা পৃথিবীর যে কোন প্রাচীন ধর্ম এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে সমর্থ। বর্তমান সহজিয়া ধর্ম সম্বন্ধেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। বৌদ্ধ মহাবান-সম্প্রদায়ের ধর্মমত যেক্রপ পরিবর্তিত হইয়াছে, হীনযানের ধর্মমত সেক্রপ পরিবর্তিত হয় নাই। সহজিয়া ধর্ম মহাবানসম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহাও যে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান আকারে আসিয়া পৌছিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানে এবং মুসলমান আক্রমণে যখন বৌদ্ধধর্ম লুপ্তপ্রায়, তখনই ইহা হিন্দুত্বের আধরণে নিজ অঙ্গ ঢাকিয়া হিন্দুধর্মে প্রবেশ করিয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। জগদল, বিক্রমশীল, নালন্দ প্রভৃতি বিহারের বৌদ্ধ আচার্য্য ও পুরোহিতগণ যখন মুসলমান আক্রমণে নিহত হইলেন ও হতাবশিষ্টেরা তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি দেশে পলায়ন করিলেন, তখন তাঁহাদের গৃহী শিষ্যগণ অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছিলেন। এই সময়ে বাঙ্গালার ভাস্করগণ ইহাদিগকে আশ্রয় দিলেন—হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করিলেন। মুসলমানেরাও অনেক বৌদ্ধকে মুসলমান করিয়া ফেলিলেন। অনুমান হয়, এই সময়েই সহজিয়া ধর্ম হিন্দুধর্মে প্রবেশ করিয়া থাকিবে; সহজিয়াগণ এই সময়েই বুদ্ধকে ছাড়িয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অনুকরণে নিজেদের মধ্যে পরকীয়া-সাধনা প্রবর্তিত করিয়া থাকিবেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই যে সহজিয়া মত হিন্দুধর্মে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ চণ্ডিদাস। চণ্ডিদাস যে সহজিয়াধর্মাবলম্বী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু চণ্ডিদাস যখন রজক-কন্ডাকে নারিকারূপে গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার সামাজিক লাজনার কথা দেখিয়া মনে হয়, হিন্দু-সমাজে এই ধর্ম তখনও সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয় নাই। মহাপ্রভু চণ্ডিদাসের পদাবলীর আলোচনা করিতে, তাহার প্রশংসা করিতে, খুব সম্ভব এই সূত্র অবলম্বন করিয়া এবং নিজেদের ধর্মমতের প্রবর্তক একজন হিন্দু মহাপুরুষ হইলে, তাহা হিন্দু-সমাজের শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইবে এবং মহাপ্রভুই তাহার উপযুক্ত পাত্র, এই সকল কারণে পরবর্তী কালের সহজিয়া ধর্মের লোকেরা মহাপ্রভুকেই তাঁহাদের ধর্মের প্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকিবেন। বস্তুতঃ মহাপ্রভু-প্রবর্তিত বিশুদ্ধ গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধই নাই।

ত্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

মানস-বৃন্দাবন

কে বলে রে বৃন্দাবন দূর-দূরান্তরে
সে যে রাজ্যে আমাদের আপন অন্তরে ।
ভক্তির যমুনা হেথা কুলু কুলু ধায়,
কল্পনার কুঞ্জবনে প্রেম-নীপ ছায় ।
রসরূপী কৃষ্ণ হেথা বাজায় বাঁশরী
ভাবময়ী রাধা সনে সকল পাসরি ।
বাৎসল্যের যশোমতী হেথায় বিরাজে,
ব্রজের দুলাল নাচে স্নেহ-গৃহ-মাঝে ।
প্রীতি-শান্তি-রূপে হেথা শ্যামলী-ধবলী,
চরে সদা চরণেতে স্বার্থ-ভৃগু দলি' ।
হেথা করে কত রঙ্গ লয়ে প্রাণসখা
মান-অভিমানরূপী ললিতা বিশাখা ।
জটিল কুটিল সম সঙ্কোচ সংশয়
ঘটাতে বিচ্ছেদ হেথা পাছে পাছে রয় ।
যৌবন-বসন্তে হেথা নব অনুরাগে,
হয় সে হোলির খেলা প্রণয়ের ফাগে ।
হেথা সেই রাসলীলা হয় অভিনয়
মিলন পুলক মাখা শুভ জোছনায় ।
হেথা সে কুলন-দোলা দোলে ওগো দোলে
বাঞ্ছিতের পরশেতে ছুরু ছুরু তালে ।
যায় যবে প্রিয়তম এ গোকুল ছাড়ি'
নিশি-দিন করে হেথা বিরহের বারি ।

শ্রীজ্ঞানানন্দ চট্টোপাধ্যায় ।

কমলের দুঃখ

(মারা—কমল)

প্রাণের সখা !

আজ বর্ষার ধারা আমার আকুল ক'রে দিলে—মনে পড়ে, সেই একদিন—ঝঝর
অবিরাম বারিবর্ষণ—আর আজ এই দিন । সে দিন—সে দিন মেঘে মেঘে, জলের ধারায়
বিছাতের চুসনে, দাহরীর প্রমত্ত ডাকে, শিখিনীর পাকে পাকে নাচের সঙ্গে কেকা-
রবে, কদম ফুলের শিহরিত কেশরের জাগরণের মাঝে তোমার মিলনের মধুর
সুর,—আর আজ এই দিন ; আজ আকাশ, সাগর, নিখিল ভুবনে তেমনি মেঘের
কলরোল, পাতায় পাতায় সে টপ্ টপ্ ক'রে জলের ধারা, মেঘ মেঘের পানে চেয়ে
সেই একই সুরে তান-তরঙ্গ তুলেছে, প্রতি পবনের মর্ম্মরে—ধ্বনি নুটিয়ে কাঁদছে,
সবই তোমার বিরহের সুর—সবই যেন তোমার জন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে । সারা
জগৎ আজ তোমাকে পাবার জন্তে ধেরে চলেছে । মেঘ তার দাহনে জলে উঠেছে ;
ওই গুরু গুরু ডাকছে, সে শুধু তোমারেই বুঝি চায়—তোমার বিরহে যেমন
আমার বুকের মাঝে গুরু গুরু করছে, তেমনি গগনে বুঝি জলদণ্ড আজ বিরহের
বেদনা তার ওই বিপুল আকাশভরা সুরে জগতের কাছে তোমার বিরহ
গাইছে,—তরলতা সে গানে বুকের ভারে চোখের জল ফেলছে, অবিরাম ঝিঝিঁর
যে ঝঝর ঝঝকে উঠছে, সে ঝঝনার আমার সমস্ত পীড়রা যেন ঝন্ঝন্ ক'রে
উঠছে,—এ বর্ষার রোলে এ বিরহ আরও ঘনিষে আসে, পাতা কাঁদে, ফুলের
উপর অশ্রু ঝ'রে পড়ে—সমস্ত তরলতা—বিহগেরা—মর্ম্মর নিশ্বাসের সঙ্গে প্রাণ
খুলে আকুল হয়ে উঠছে, তবুও তুমি আসবে না ! তুমি যদি এখানে থাকতে,
না—না, সেখানে থেকে—যেখানে আছ, সেখান থেকেও ত এ মেঘের ডাক
শুনতে পাচ্ছ, সেখানেও এমনি বরিষার ঘোর ঘনঘটা গর্জ্জন ক'রছে, সেখানেও
ওমনি ওই বকুলগাছের কোপের মধ্যে নীড়ের মাঝে ব'সে মেঘের ডাকে ভরে
জন্তে ডাহকী তার ডাহকের বুকের মধ্যে মিশিয়ে যাচ্ছে, এ দেখলে কে থাকতে
পারে নাথ—এ বিরহ যে অসহ—আর সহনে না যায়, আমি এত ক'রে মেঘকে
বলছি, ওগো পুঁফর, তুমি একটবার তার কাছে যাও গো—আমার হৃদয়ের নিভৃত
কুজনধ্বনি যেন সে তোমার কাছে বয়ে নিয়ে যায় । সাধ হয়, ঐ ডাহকীর মত

তোমার বুকের মাঝে এ গর্জন-বর্ষণের ধারা হ'তে নিজে একবার রক্ষা করি।
দিকে দিকে তিমির ভ'রে উঠছে, তার মাঝে বিজলীর ঝলক, সম্রাসে প্রাণ
কাঁপছে নাথ—আমি কত ক'রে আমার এ বিরহখানিকে লুকোতে চাই—
এরা আমার সব কথাই কেঁদে জগতের কাছে ব'লে দেয়, আমিও আত্মহারা—
আর যে লুকোতে পারি না যে,—তুমি আমি মানুষ না হয়ে যদি ওই ডাহক-ডাহকী
হ'তাম। আমার কঠিন প্রাণ—তার উপরে এই বর্ষণের ঘোর ধারা, আমি যে
আত্মহারা, প্রাণ জলে যাচ্ছে—তবু ত এ বের হয় না। একে এই মেঘের রোল—
তার বর্ষণের দাপটে—প্রাণ থাকে কি বাহিরায়। হায়, তাই নিখিল বিশ্ব যেন আজ
এ বিরহে এক হয়ে গেছে।

আমার কমল, আমি এত দিনেও তোমার রূপের সীমা ঠিক করতে পারলাম
না—জগতের সকল সৌন্দর্য থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এই প্রাণের মধ্যে
লুকিয়ে রাখতে চাই—দেখি অন্তরে বাহিরে তুমি! যে দিকে কিরে দেখি, সেই
দিকে তুমি—যত তিমির ভ'রে ওঠে, তত সেই আঁধারে তোমার রূপ উজ্জ্বল হয়ে
দেখা দেয়—তিমির যেন কোথায় চ'লে যায়—মনে যদি এ হয়, বাহিরে তবে এ হয়
না কেন? তুমি এসে, কেন এ তিমির আমার দূর কর না নাথ? ওই
প্রাণের ঘনঘোর মেঘে অবিরাম ঝর্ঝর ধারা,—তার উপরে ভিজে হাওয়ায়—ভেজা
মেঘ ভাসিয়ে হাওয়ার জোর,—প্রাণ যেন মেঘের মতই ধারা বর্ষাতে চায়—বৃষ্টিধারা
যেমন সবাইকে চুষন করছে, তেমনি জলের ধারার মত চুষনে আকুল ক'রে দিতে ইচ্ছা
হচ্ছে। মেঘ যেমন বিছাৎকে—বুকের মাঝে লুকিয়ে রেখেছে, তেমনি তোমাকে
লুকিয়ে রাখতে সাধ হয়। পিয়া! পিয়া! এ দারুণ বরিষায় তুমি দূরে, নারীর
সোরাধি কোথায় পিয়া? আমার এ দেহ-মঞ্জরী অজানিত আবেগে ফুটে
উঠতে চায়, নিঃসঙ্গ একাকিনী শুধু ওই মেঘপানে চেয়ে চেয়ে চোখেও ধারা
পড়ে, তার নিদারুণ পাপিয়া কেবলই 'পিউ' 'পিউ' রবে সারা বরষার ধারা
ছাপিয়ে ডাকছে—কত আর সহিতে পারি নাথ! প্রাণের সমস্ত আবেগ, মনের
সকল কথা, হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য এক চুষনে নিঃশেষ হয়ে যায়—সকল
স্বপ্নের আবেশের পারে—ভাষা তাকে প্রকাশ করতে পারে না—তাই চুষনে
সব শেষ ক'রে—মিলন ক'রে, ব'লে দেয় তুমি, তুমি! এ বর্ষাও ধরণীকে
তাই ব'লে শেষ করছে, মেঘ মেঘকে তাই ব'লে মিশিয়ে যাচ্ছে—বাতাস
পাতার কানে—পুষ্পের প্রাণপুটে সেই চুষনে তার সকল হৃদয়ের আবেগ
নিঃশেষ করছে। বলছে—তুমি, তুমি! আমিও বলছি—তুমি, তুমি! তাই
মেঘকে ডেকে বলছি, হে নীলাঙ্গনমাথা পিঙ্গলবরণ সজল জলদ, আমার কথা তাকে

বল, তারে বল, ওগো বল, তুমি ত দেশে দেশে সকলের সুখ-দুঃখের কথা ব'য়ে
নিরে যাও, তুমি ত সকল নদীকে, সকল তৃণশ্রাম শম্পক্ষেত্রকে, সকল শুষ্ক কঠিন
বিরলতৃণ প্রান্তরকে ভরণ কর; যে নীরস, তাকে সরস কর, যে শুষ্ক, তাকে নূতন
ফুলে মুঞ্জরিত কর, যে কঠিন—তাকে শ্রামল কর, তবে সেই দেশের, যেখানে আমার
প্রাণের পিরা আছে গো, তার কাছে ঝরঝর হবে আমারি কথা বল, হে প্রিয়! হে সখা,
/ হে বন্ধু, হে ভাই! তার কাছে একবার আমার এ দুঃখের কথা বল। বল ভাই! ভাই
বল, তুমি ত বিদ্যাকে কখন ভুলে যাও না, তুমি ত চিরদিন অক্ষুণ্ণ তাকে বুকের
হিয়ার মাঝে লুকিয়ে রেখেছ—সে কেন তবে আমার ফেলে গেল, বল, শুধু তারে এই
কথাটি শুধু বল। একবার বল। ইচ্ছা ক'রে কে কবে প্রাণের প্রিয়কে ফেলে চ'লে
যায়—শুধু এটুকু তারে বল। বল, আমার এই চোখের জলে-ভেজা কথা তারে বল,—

মম, দুঃখ-রাতি ঘন ঘোরা

ধির বিজুরী পাতি চমকই, বরখত

ধারা শ্রাবণ ঝরঝোরা,

নিঠুর নিপট হা হা বঁধুয়া

নাহি তোয়ে কিছু দয়া—

আজু শমন দিন, তুয়া বিন তুয়া বিন

জীবন মরণ একই ধারা।

(ইন্দু—সুধীর)

প্রাণের ওগো!

বলি, না বলে একেবারে যশোরে। তোমার কি রকম আক্কেল বল—মকেল
পেলেই অমনি ছুট। খাবার নিয়ে ব'সে আছি, ও মা, কোথায় কি—একেবারে
যশোরে; সহিসটা এসে বললে—বাবু যশোরে গেলেন, কি মামলা আছে—বলেন
বাড়ীতে বলিষ্। বেশ যা হোক। দেখ, তুমি এলে না, আমার এমন কষ্ট হ'ল—এত
ক'রে সমস্ত ছপুর বেলাটা ব'সে ব'সে খাবারগুলো তৈরী করলুম—আর তোমার
ধবরই নেই। কি করি, মনটা ভারি ধরাপ হয়ে গেল—খাবারগুলো হাপুস্ হাপুস্ ক'রে
নিজেই খেয়ে ফেললুম—কি করি বল।

হ্যাঁ গা, যশোরে যে মাছ—তোমার হর ত খাওয়াই হবে না। যাবার সময় কোন্
কিছু নিয়ে গেলেন—তোমার যে কি বুদ্ধি, তা আমি জানি নি। কবে আসবে?
খোকা ভাল আছে। ইতি

তোমার

গিন্নী।

(সুধীর—ইন্দু)

প্রাণের ই্যাগো !

আমার ফিরতে এখন' চার পাঁচ দিন দেরী হবে। তোমরা সব ভাল আছ ত ?
দিদির খবরটা নিশ্চয়। হ্যাঁ, আর ওই নূতন বোড়া, কোথাও যাবার যদি দরকার
নাও হয়, তা হ'লেও সকালে একবার গাড়ী ছুততে ব'লো—বসিয়ে রাখে না যেন।
আর তোমরাও ত একটু বেড়িয়ে আসতে পার। নইলে বড়মানষী রোগ
ধ'রে যাবে।

সকালবেলা মামলা—আমি ট্রেন ফেলে—তোমার মাছ যোগাড় করতে যাব—
খুব যা হোক। লোকে ত 'বস্তুরে কই' বলে—কিন্তু এখানে দেখি, খুব বড় কই
মাছত' মেলে।

এখানে বাদেই হ'রে মক'দমা করতে এসেছি, এরা সব কি যোগ—বাগ করে—
আর তারা ম'রে গেলে কি ক'রে ফিরে আসতে হয়, তার এরা খুব বক্তৃতা করে—
আগে জান্তুম না। এরাই ঠিক মামলা চালাতে পারবে—সব ভূতগুলো এখন
এদের মূর্তির মধ্যে। আমি বেশ ভাল' আছি। তবে খুনী মকদমা—ভূতে না
আবার সাক্ষী দেয়। ইতি

তোমারই

সু—

(হেনা—গোলাপ)

একটা ঝড় উঠেছে লো—একটা ঝড় উঠেছে ; আমার ভেতরকার সব যেন
তোলপাড় ক'রে দিচ্ছে—সব বুঝি উল্টে পাল্টে যায়। কি কর্নুম—কি হ'ল—কে
এ ঝড় ভুললে—সব যেন এক ক'রে দিচ্ছে। ওই বাইরে ঝড়ে যেমন সব গাছগুলোকে
ছলিয়ে ডাল ভেঙে এক করে দিচ্ছে, কোনটা কি গাছ চেনা যাচ্ছে না। তেমনি
আমার সব' তোলপাড় ক'রে দিলে...সব ভাবগুলো যেন জড়িয়ে ভাল পাকিয়ে
ধেব্‌ড়ান তুলির কালির মত এক হয়ে গেছে। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ নিয়ে ছুটে-
ছিলুম—খবর পেলুম, মাষ্টারের কাছে, সুধীর বাবু এখানে নেই—ভাবলুম, এই ঠিক,
যেমন ক'রে হোক, মাগীর ঝাঁটার শোধ নিয়ে নগেনকে বলতে হবে। নইলে প্রাণ
ঠাণ্ডা হয় না। ভাবলুম, যাই বা কেমন ক'রে—ছ'পুর বেলা টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি
পড়ছে—কেন যে হঠাৎ এমন ঝেঁয়াল হ'ল, রাগে যেন সর্কশরীর নিস্পিস্ করতে
লাগল—ইচ্ছে হ'ল, এখুন্নি ছুটে গিয়ে তাকে ঝাঁটার শোধ দিয়ে আসি, শেষ কি

খেয়াল চাপ্ল—বঠুমী সেজে বেরুনুম—মাঠার আমার বঠুমী সাজা দেখে বলে, “বঠোম দিদি, ও বঠোম দিদি, এমন রসকলি কাটতে কোথায় শিখলি ভাই—পথে যে সবাই আছাড় খাষে লো, মাইরি!” ভেবেছিলুম কি জানিস্, গিয়ে খারাপ গান গাইব, যেই তাড়া করবে—খুব হু’কথা শুনিবে দেব’—তার ওপর পারি ত বা দিবে আসব—একলা সাহস ক’রে—যা থাকে কপালে যাই। গেলুম—দেখি, কেউ আমার কোন রকম বাধা দিলে না, তখনও একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে—বরাবর অন্তরমহলের দরজার গোড়ায় গিয়ে—‘জয় রাধে কৃষ্ণ—ভিক্ষে দেবে গা’—এই কথা ব’লে গান ধরলাম—(‘ভিক্ষে দেবে গা’ কথাটা বলতে যেন গলাটা কে চেপে ধরছিল)—শেষ রঙের সুরে গান ধরলাম—

আমার ভিক্ষে দিবে যাও।

আমি প্রেমের দায়ে ভেঁকু নিয়েছি প্রেম বিলায়ে যাও।

চাই নাক’ হীরে মানিক

শুধু তোমার দেখব’ খানিক

এসেছি ভাসব’ ব’লে প্রেমের জলে, শেষ উধাও,—

ঘুরে ফিরে রূপের হাটে

এসেছি লো তোমার ঘাটে—

বটে ভূমি—সেই ত বটে, দেখি ও মুখ তুলে চাও।

গান গাইতে গাইতে দেখলাম, বারাণ্ডার ওপর থেকে দাঁড়িয়ে একজন শ্রামবর্ণ মেয়েমানুষ—“বাঃ, তোমার ত বেশ গলা বাছা, তা গেরস্তর বাড়ী অল্প গান গাও না—এমনা—এস, এদিক দিবে ওপরে এস ত”—আমি ত তাই চাই—তাড়াতাড়ি ওপরে উঠলুম,—আমাকে দেখেই একটু যেন থমকে গেল; বোধ হয়, রূপ দেখে বললে—“তোমার এমন রূপ, এই বয়েস, তুমি ভিক্ষে করতে বেরিয়েছ”—আমি বললাম, “কি করব—পেটের দায়ে”—এই ব’লে যেমন এগিয়ে যাব—ঘরের দরজার ভেতর দিবে যা দেখলাম গোলাপ—আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চ হয়ে উঠল—সেই দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে বইলুম—সমস্ত শরীর ঘেমে মাথাটা যেন বোঁ ক’রে ঘুরে গেল—সেইখানে ব’সে পড়লুম—দেখলাম নগেনের স্ত্রী এক রাশ ফুল নিয়ে ব’সে রয়েছে। আমার প্রতিশোধ লোপ হয়ে গেল—‘এও তাই—ওঃ, কি জালা—সব ছেড়ে তাই এ হুঁশা!’ সে মেয়েমানুষটা আমার অবস্থা দেখে—ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বললে—“ও কি গো, তুমি এমন করছ কেন বাছা?” আমি বললাম—“আমার বুকে একটা হঠাৎ ব্যথা ধ’রে ওই রকম হয়েছিল—কেনে গেছে—এখন যাই”—ব’লে যেমন আমি নীচের দিকে নাম্ব ব’লে

ফিরেছি, অমনি তার চমক ভেঙে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একেবারে লাফিয়ে উঠেছে—চোঁচিয়ে বললে—“দিদি! দিদি! সেই মাগী”—তখন আর পালানুম না। সামনে দাঁড়িয়ে রইলুম—খানিক পরে—বললুম—“হ্যাঁ, আমি সেই মাগী, রাগের জ্বালায় তোমার ঝাঁটার শোধ দেব মনে ক’রে একলা এই হুঃসাহসের কাজ করেছি—কিন্তু এসে থাকে গাল দেব মনে করেছিলুম, তার পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছে হ’চ্ছে—কিন্তু তা ত পারব না—বড় হুঃখ গো বড় হুঃখ—তোমাদের ছায়া মাড়াবার, তাতে লোঁচিবার অধিকার আমাদের দেয় নি”—অবাক হয়ে দুজনে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল—বললুম “ভিখিরী হয়ে ‘জ্বর রাখে কৃষ্ণ’ ব’লে ভিক্ষে চাইতে এসেছি—ভিক্ষে দাও, ক্ষমা ভিক্ষে দাও—পুণ্যবতী তোমরা—সুখে থাক—আর কি বলব” এই ব’লে তাড়াতাড়ি ছুটে পালিয়ে এলুম,—রাস্তার তখন জোর হাওয়া উঠেছে। গাছগুলো হুলে হুলে উঠছে, মনে হ’তে লাগল—পায়ের তলা থেকে মাটি স’রে টলে যাচ্ছে—মাথা দিয়ে মাগুন ছুটছে। তখন বাড়ীতে এসেছি, খুব ঝড় আরম্ভ হয়েছে। মেঘগুলো যেন এক একটা প্রকাণ্ড কাল পাহাড়ের মত উড়ে যাচ্ছে। ঝড় উঠেছে—সত্যি ভেতরে বাইরে ঝড়। তোলপাড় ক’রে দিলে। কি হ’ল যুইকুল! আমি বুঝেছি, এইবার আমার ভাঙনে ধরেছে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দরজা বন্ধ ক’রে অন্ধকার ঘরে চুপ ক’রে বসে আছি—আর কিছু বাইরের দেখতে ভাল লাগছে না—যতক্ষণ না তাকে পাই, ততক্ষণই যেন আমার এই আঁধারই ভাল—ওঃ! এ তিমিরে যদি তাকে পাই, হনিয়ার আমার কিছুই ভয় নেই—তোরা হয় ত মনে করছিস—আমি মরিছি; মরিনি লো—তবে তাকে যদি পাই ত’ মরি। সন্ধ্যার পর নগেন এল—বললে “এ কি, তুমি এমন বষ্টমী সেজে? এক পা ধূলো—ময়লা একখানা কাপড়—এ কি, তোমার কি হয়েছে?” মনটা তখন কোন্ রাস্তা—কথাগুলো যেন ছুঁচের মত বিধল; পেছনে ছিল হারু মাষ্টার—সে আবার ঠোকর কাটলে—“বন্ধু, বুঝতে পারলে না, দশা লেগেছে—চুবন খেয়ে ভুবন ডুবেছে—বুঝি নদে ভেসে যায়! মেঘের রকম দেখে বিরহিনীদের মত অভিসারে—মুখরম্ অধীরম্ তাজ মঞ্জীরম্—কি বল”—এমনি বিরক্ত হতে লাগলুম—তার পর মুখে কিছু না ব’লে নিজেকে সামলে নিলুম; কিন্তু থাকতে পারলুম না—মাথাটা তখন কেমন করছিল, বল্লুম,—“দেখ আমার শরীর মন ভাল নেই—আমার বিরক্ত কর’ না—আমার ভাল লাগে না—আর এস না—যাও।” শুনে নগেন ত তখন রেগে চলে গেল—মাষ্টার বললে, “বন্ধু—কাজটা কি ভাল হ’ল মুখোমুখি”—আমার এমন রাগ হ’ল, ঝড়ার দিকে উঠলাম—বললাম—“শীগগির এখান থেকে বেরো—নইলে অপমান হবে!” আমার সে রকম দেখে, তাড়াতাড়ি সেও চলে গেল—যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

আর এদের সঙ্গ—আর এদের কথা—এদের কিছুই আমার ভাল লাগছে না—
এখন কেবলই অস্ত্র দিকে ছুটেছি। কতক্ষণ এমন চূপ ক’রে বসেছিলুম,—আর
নিজের মনে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল—সে যে কি ভাবনা, তা আমি বুঝতে
পারিনি—কেবল কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল—অনেক ক্ষণ মাটিতে পড়ে কাঁদলুম,—সে
কোঁপানি আর কিছুতে যায় না—কিন্তু সে কারা মুছাবার জন্তে ত কেউ এল না।
যাকে ডাকি, সে শু শুন্তে পার না।

তোমাই হেনা।*

(নগেন—কমল)

কমল দাদা !

বড় মুন্সিলে পড়ে’ তোমার এই চিঠি লিখছি। আমার, মধ্যে অনেক টাকা
খরচ হয়েছে—হাতে কিছুই নেই—একটা ধার ছিল, তারা বড়ই গোলযোগ করছে।
তুমি বোধ হয় জান যে, আমার সমস্ত জমিদারী, এমন কি, এই বাড়ীখানা শুদ্ধ
বাঁধা পড়েছে—নতুন ধার করবার উপায় নেই। লজ্জার মাথা খেয়ে বৌদির
কাছে ব’লে পাঠিয়েছিলাম—তিনি তোমার বলতে বলেছেন। তোমার কাছে
বলতে আমার কুণ্ঠিত হ’তে হলো, আমি বললাম—কুড়ি হাজার টাকার আমার
দরকার—তুমি কি আমার এই টাকা বোগাড় ক’রে পাঠাবে, নইলে আমার হয় ত কাল
জেলে দেবে—কি করব, ঠিক করতে না পেরে তোমার কাছে এসে পড়লাম। ইতি।

তোমার স্নেহের

ভাই।

(কমল—নগেন)

প্রাণভূগোষ

তোমার কুড়ি হাজার টাকার যে কারণেই দরকার হ’ক—আমি আজ স্নাত্রেই
দাওয়ানজীকে তার করেছি, তোমার নগদ বিশ হাজার টাকা দেবার জন্ত। আশা করি,
তোমার এতে দরকার মিটবে। জমিদারি কত টাকার বাঁধা আছে, তা জানতেও
দেওয়ানজীকে ব’লে দিয়েছি—যাতে তার সুব্যবস্থা হয়, তার চেষ্টা করব। আমার
কাছে তোমার কোন বিষয়ে লজ্জা বা কুণ্ঠিত হবার কারণই নেই—তুমি আমার ভাই—
তারের কাছে যদি লজ্জা কর—তবে জগতের কাছে কথা কইবে কি ক’রে? জেন’
ভাই, তোমার বিপদে আমার বিপদ, তোমার দুঃখে আমারই দুঃখ, তোমার সম্পদে
আমারই সম্পদ।

এক মার পেটে ছুঁতে না জন্মালেও তবু আমরা ভাই—আমার বড় আপনার—এ
অগতে তোমার চেয়ে প্রাণের আপনার আর কে আছে ভাই! সব কলে দিয়ে আর
ভাই—আমার বৃকে আর—তোমার কিসের ভয়, কিসের ভাবনা, আমি যখন তোমার পাশে
রয়েছি—এ অগতে শুধু ভাই-ই শক্তিশেল বৃকে নিতে পারে, আর কেউ পারে না।
আমার স্নেহাণীষ নিয়ো। মনে হৃৎক রেখ না—অকপটে আমার কাছে যখন কা
দরকার হবে, ভাই চেয়ো—আমি তাতে নিজেই আরও সুখী মনে করব। ইতি।

তোমার স্নেহের
কমল দাদা।

(ইন্দু—শৈল)

ঠাকুরনি,

ভাই, তোমার চিঠি পেয়েছি—পেয়ে অবধি মনটা যেন কি রকম হয়ে রয়েছে,
কাল রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে মন আমার এত খারাপ হয়ে গেছে, আর
থেকে থেকে এমন ভয় করছে, কিছু যেন ঠিক ধরতে পাচ্ছি নি। দেখলাম,
আকাশে তারা নেই—নক্ষত্র নেই—সব অন্ধকার মেঘে ঢাকা; যত সেই অন্ধকার-
টার পানে চাই, মনে হয়, যেন আকাশের মত সব খালি। তল-অতল নেই,
কেবলই অন্ধকার। ছুঁ ক’রে বাতাস বইছে, অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না—
তবু যেন মনে হ’তে লাগল, বাতাসে সেই ভয়ানক আঁধার ছলে ছলে উঠছে—
আমি যেন একটা প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপের আটচালার ছোটো খোটো ধ’রে দাঁড়িয়ে
আছি। আটচালাটা সব খোলা দিয়ে ছাওয়া—মাঝে মাঝে অন্ধকার মেঘে
বিছাতির আলো, চিরে চিরে উঠতে লাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক ঝড় উঠল।
সে ঝড়ের আর দিশপাশ নেই, বড় বড় গাছপালা যেন মড়্ মড়্ শব্দে ভেঙ্গে
কোথায় উড়ে গেল; মনে হ’ল—যেন কতকগুলো পিঁপড়া বৃদ্ধ করছে, সমস্ত আট-
চালা যেন ছলতে লাগল। আমি হুহাত দিয়ে তার খুঁটি আঁকড়ে রইলাম; যত
জোরে জোরে দোলে, তত আমি চেপে চেপে ধরি; ঝর ঝর ক’রে খোলা ভেঙ্গে
গুঁড়ো পড়তে লাগল, তার পর একটা দম্কা ছাওয়া এল, ভয়ানক শব্দে আটচালা-
খানা উপড়ে পড়ে গেল। আমি চীৎকার ক’রে উঠলাম, মাথার কাছে জানালা
খোলা ছিল—আমার গায়ে বৃষ্টির ঝাপট লাগল—মিহির ঘুমুচ্ছিল বুঝি, সেও কেঁদে
উঠল; মায়া আমার কাছেই থাকে, সেও কেমন করে উঠল। বৃকের ভেতর
যেন টিপ্ টিপ্ করতে লাগল—বাবা! সে কি ভয়ানক স্বপ্ন! মিহিরের কাল রাত
থেকেই খুব অর, আমার বড় ভয় করছে ঠাকুরনি! মায়া ত দিন-রাত ছেলটাকে

বুকে ক'রে রয়েছে, আর ছেলেরাও একবার আমার কাছে আসতে চায় না— নামাশ্রমেই কেবল মাসি, মাসি। সে এসে অবধি আর আমার কাছে বেস দিতে চায় না। তার ত আহা-নিদ্রা বন্ধ, এক দণ্ড কাছ থেকে নড়বার যো নেই—উঠলেই চোঁচিয়ে ওঠে। এমন ত দেখিনি, আমার ত হাত-পা আসছে না— কি করি ভাই! উনি গেছেন যশোরে, আসতে পাঁচ সাত দিন দেরী হবে, আমার যেন আর কি রকম করছে! অমর এসেছিল, তার আবার একজামিন্। এ সময় যদি কমল থাকত। কি করব, বুঝতে পারছি না, বেলা একটা বেজে গেল, ছুঁড়ীটা রাত থেকে কোলে ক'রে বসে আছে,—সেটাকে ছুটো খাওয়াইগে। টেনে নিয়ে না গেলে ত কোন দিন যেতে চায় না। খাওয়া-দাওয়া সব ত্যাগ করেছে। ছেলেরা থেকে থেকে কেবল 'কমল মামা, কমল মামা' করছে। ভাবছি, তাঁকে তার করব। তাঁকে খবর দিতে সাহস হয় না—পাছে তাঁর মন খারাপ হয়। শুনেছি, খুনি মকদ্দমায় গেছেন। কি যে করব, ভেবে ঠিক করতে পারছি নি। আমার প্রণাম নিয়ো। ইতি।

তোমার স্নেহের

সু-বউ।

(নগেন—কমল)

কমল দাদা,

দাওয়ানজী তোমার তারের মর্মে টাকা দেওয়া প্রথম যুক্তিবদ্ধ মনে করেনি, তার পর বৌদিকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রে তবে দেয়। তোমার ঋণ আমি কি ক'রে শোধ দেব। উপস্থিত বিপদ থেকে তোমার দয়ার উদ্ধার হলাম।

আশ্চর্য! আমার হার মার্টার বুঝিয়েছিল যে, বিষয় ভাগ না ক'রে নিলে সবই তুমি হাতের মধ্যে নিয়ে নেবে, এখন দেখছি, তা নয়, কি ভুলই বুঝেছিলাম।

জমিদারী ইত্যাদি সবই বাঁধা—সে অনেক টাকা—সুদে আসলে সাত লক্ষ টাকা হয়েছে—এ টাকা আর তিন মাসের মধ্যেই প্রায় বেশীর ভাগ শোধ করতে হবে, নইলে জমিদারী নীলামে উঠবে। কি যে সব করেছি—কি যে শেষে দাঁড়াল, এখন তা ভেবে কুল-কিনারা ঠিক করতে পারি নি।

বৌদি সে দিন ডেকেছিলেন, লজ্জায় তাঁর কাছে মুখ দেখাতে পারছি নি। মনে হচ্ছে, কেনই সব এমন করলুম—সব গেল, শেষ কি হ'ল, কি হবে, তাই এখন ভাবনা হয়েছে।

দাওয়ানজী আমার সঙ্গে সে দিন আর অন্য কথা কইলে না, শুধু টাকাগুলো আমার সামনে রেখে শুণে নিতে বললে। সবাই এখন আমার ঘৃণা করে। এমন সব উল্টে গেল। ইতি।

তোমার ভাই।

(শৈল—ইন্দু)

চিরায়ুতীব্র,

সু-বউ, তোদের হ'ল কি—আমি বড় আশ্চর্য্য হয়ে গেছি, সেই চিঠি লিখলি—তার পর ওন্‌লাম, একটু ভাল আছে। আমি এ দিকে হাঁপিয়ে মরি, ঠাকুর করুক—আহা, বাছা আমার নীরোগ হোক, কিন্তু মনটা বড় ধড়ফড় করছে, কি করব, কুশীকে পাঠানুম, ব'লে গেল ভাল আছে। কমল এসেছে, তাকে জিজ্ঞাসা করি, সে বলে ভাল আছে। কিন্তু মন যে কেমন করে ভাই! ভাই ছটফট ক'রে উঠি। এদের মুখের ভাব কেন এমন? বেশী কথা কর না—বলে না কেন?

কাল রাতে স্বপ্ন দেখে আরও আমার মন যেন কি হয়ে গেছে। এমন আশ্চর্য্য স্বপ্ন কখন দেখিনি। দেখলাম, খুব আশ্চর্য্য সুন্দরী, ঠিক যেন তোমার মত—তার কপালে, যেমন সকাল হবার আগে শুকতারাটা জ্বলজ্বল করে, এমনি একটা তারা তার কপালে জ্বলজ্বল করছে। মেঘের উপরে ব'সে—সে মেঘে যেন আলোর ঢেউ মেঘের মাথার মাথার খেলছে—নীল আভার কাপড় হাওয়ার উড়ে লুটিয়ে যাচ্ছে আর ছোট ছোট তারাগুলো সেই আঁচলে যেন ফুটে ফুটে খেলা করছে—তার কোলে মিহির ব'সে আছে আর হাসছে। সে কি মধুর হাসি, আমার যেন বললে, 'পিসীমা, কই ধর দিখি।' আমি যেমনি তাকে কোলে ক'রে নিতে গেলাম—মিহির হেসে ফেললে আর সেই সুন্দরী মেয়েটা তার মুখে চুমু খেলে—আর অমনি মিহির কোথায় মিলিয়ে গেল। আর সেই মেয়েটার একরাশ অন্ধকারের মত কাল চুলের ঢেউয়ের ওপর একটি ছোট তারা ফুটে উঠল। শুন্তে পেলাম, মিহির যেন বলছে, 'পিসীমা, এই দেখ, আমি কেমন তারা হয়ে ফুটেছি।' অমনি ছাঁৎ ক'রে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। কি জানি, তার পর থেকে প্রাণটা কেমন করছে, আমার মনে হচ্ছে, কার যেন কি হয়েছে, কিন্তু সবাই এরা আমার কাছে লুকোচ্ছে।

খোকা কেমন আছে, তোরা সব কেমন আছিস, ভাল ক'রে থবর দিস্ বাপু, আমার ত বাবার সমর হয় না, তা না হ'লে যেতাম। ঠাকুরের সব সান্ত্বে, নিজের পুজো-আহিক শেষ করতে করতে বেলা পড়ে আসে, তার পর ঠাকুরের শেতলের সব ব্যবস্থা

করা—দেখতে দেখতে রাত এসে পড়ে, কখন যাই ? জানিস্ ত আমার রকম । আমার আশীর্বাদ নিস্—আর সু-ভাইকে বলিস্, একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে—আমার একটা কথা আছে । সে এসেছে ত ? আর দেখ্, ছোট বউকে জিজ্ঞাসা করিস্, গমনার বাস্কের চাবী কি সে নিয়ে গেছে—আমার এত দিন পরে মনে হ'ল । গমনা ত সে প'রে যায়নি ।—তাকে বলিস্ যে, বাস্ক কি তার কাছে পাঠিয়ে দেব ? সে যখন এখানে আর আসবেই না, তবে আমি ও রেখে কি করব ? আর আমার বয়স হ'ল, কবে আছি কবে নেই, এত আর সামলাতে পারি নি । আর কদিনই বা থাকব । পাথরের কাছে এত বলি, সে কেবল হাসে ; যখন কথা না ব'লে হাসে, তখন আর কদিন, দিন হয়ে আসছে । যে কদিন আছি, মাঝে মাঝে খবর দিস্ ।

সব দিক্ তাকাতে আর পারি না । তবে মনটা মাঝে মাঝে কেমন ক'রে ওঠে, তাই আবার ভাবতে বসি ; নইলে আমি ত দেখে শুনে পাথর হয়েই রয়েছি । নগেন এই কটা দিনের মধ্যে সমস্ত নষ্ট করলে—সবই তার গেছে, সে ভাবনাও আমার ত—কেলে দিয়েও কেলতে পারি নে । সে দিন সুখ শুকিয়ে এসে দাঁড়াল, প্রাণটা কেমন ক'রে উঠল । ঠাকুরের ইচ্ছা—কমল সব বিষয়েই ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে । তাতে নিবৃত্তি ত হবে না । সে আবার সমান ভাবেই চলেছে । যাক্ গে, তোদের ভাল খবর আমার দিস্ । ইতি ।

তোমার স্নেহের ঠাকুরঝি ।

(নগেন—হেনা)

বাঃ বাঃ বিবি সাহেব, খুব জ্বর সওদা করালে বাবা ! বাঃ বাঃ ! মাত লাক বেন খোলামকুচির মত ছিনিমিনি খেলা গেল, এমন অধৈর্য জল—সে আর ঢেউ তুলতেই দিলে না । এ কি কম কেরামতি ! পারের নুপুরে ঝুঝুঝু—আর পারের পাতায় ধিন্ ধিনিতা—আর অমনি ছিনি মিনি—আঃ—কেরাবাৎ তারিফ !!!

দেখ, আমরা বাবা স্নেহের পাররা, যেখানে সুখ পাব, সেখানে স্নেহের খেলা খেলব । এমনই বা কি চাঁদ—যে, তোমার ফাঁদেই হাঁ ক'রে প'ড়ে থাকব ? মাষ্টার ঠিক বলে “এ গালে ঠোনা, ও গালে ঠোনা, তবে যদি বলে সোনা—বাবু সে হেনা ।” সোনার বদলে—ঠোনাই মেলে । তার পর দিনছপুরে—কার কুঞ্জে নববৃন্দাবনের রাস খেলাতে গিয়েছিলে চাঁদ ? আমি কিছু খবর রাখি নি ? মাষ্টার সব জেনে এসেছে । একেই বলে “পিরীত কি রীত—দারুণ গ্রীষ্মে বিষম শীত ।” তা ভাল—পিরীত গছাতে পারলে ভাল । দেখ, জান্তুম, তুমি ভদ্র, তা নয়, তুমি সেই কি বলে—তাই । কি বাবা, এমন

পাঁজচচ্ছড়ি আর কাঁচা লকা খেয়েছিলে যে, এত ঝাঁঝ ! বললে কি না, এস না—না হয় নাই বাব । বলি—কারণটা ত টাকা—পাঁচ হাজার এই সে দিন দিয়েছি, কেবল কাপড়-ওয়ালার বারশ টাকা বাকী । ওঃ, টাকার অমন ঢের মিলবে—ঢের মিলবে ! কত রতন অমন পায়রা-লোটন লুটবে—ধিনি কেটে—তিনি তা করলে—অমন সবাই পায়ের ওপর দে না পা করে, বুঝলে মাণিক ! রস থাকলে স্নেহের চারার অনেকে রস যোগাবে । তুমি একা নও ।—তাই বলতে ভালবাসি, তাই বলতে তোমার পীরিতে উঠে পড়ি, তবু পীরিত ছাড়ি নি—খুব খেলটা খেললে যা হোক—বেশ বাহবা ! কিন্তু আমি সহজে ছাড়ছি নি জেন ! কে কত পীরিতবাজ আছে দেখ, আমার এমন পোষা পায়রা ছেঁা মেয়ে নিয়ে যায় !

দেখ, রঙ্গ-রস রেখে তোমার জিজ্ঞাসা করছি—তুমি ওদের বাড়ী ছপুর বেলা কেন গিছলে অমন বোষ্টুমী সেজে ? ভেবেছিলে বুঝি স্নেহীচন্দ্রের নতুন জুড়ি—একবার সর্পাচ সিকের কণ্ঠী বদল ক’রে দেখি না । এততেও ওঠে না মন—তোমার আর কি বলব হীরেমন্ । মনে ক’র না—“সেয়ানা ব্যাটাছেলে হুদিন চেপে রেগে ব’সে রয়েছে ।” তা নয় মনি, আমি এবার হীরের কুঞ্জে বাসর জাগাচ্ছি । তুমি তাকিয়ে তাকিয়ে বাসর সাজিয়ে । অমন মুখ-ঝামুটার ধার ধারি নি । তুমি চাঁদ—রসকলি কেটে, কেলিকুজবনে কার অভিসারে বাবে, আর আমি তোমার নূপুরের মনি যোগাব—তা হয় না মনি, তা হয় না । মাষ্টার ঠিক বলে—ও

সখের তরি বাইব বাচে, টলতে দেব না—

আলগোছে প্রাণ রাখব ধ’রে মচকে যাবে না ।

বুঝলে তো মনি—নূপুরের রুণে রুণে ঢেউ এসে পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে ।

কিন্তু থাক, একটা আমার কেমন খটকা ঠেকছে, তুমি হেনা বিবি যে অভিসারে গিছলে, এটা আমার ঠিক মনে নিচ্ছে না, এর মধ্যে কিছু তাৎপর্য আছে—তুমি যে স্নেহীচন্দ্রের জন্তে বোষ্টুমী সাজবে, এ ত আমার মনে কিছুতেই নেয় না ; ও মাষ্টার বাই বলুক—এ সেই—

কার বাঁকা নয়ন, কবে কখন হেনে গেছে বাণ,

তাই মন-মজানি হুঁহুনা—অলে গেল প্রাণ,

এ প্রাণের জালা—নিশ্চয় - দেখব বাবা—আমিও এ মর্মান্তিক করবই করব । কণ্ঠীবদলে
“ন”
নিলেই হ’ল বটে ।

শ্রীমতীজয়কৃষ্ণ গুপ্ত ।

খুলে দে গো মোর স্বর্ণ-বলয়
কাঞ্চী, মোতিম-হার ;
(ওরা) দারুণ আমার ব্যথায় বিঁধিছে
কঠোর ছুরিকা-ধার ।

কুঙ্কুম-রাগ চন্দন-লেখা
ফেলে দে লো সব মুছে ;
মান অভিমান, রাগ অনুরাগ
যাক সব আজি ঘুচে ।

খুলে দেগো তোর যতনে রচিত
কেশের বাঁধন মোর ;
গুরু গিরিভার বহিব কেমনে
এ কি লো আদর তোর ।

রেখে দে রে তোর বচনের রাশি
স্বধাম না কিছু মোরে ;
কথা শুনে তোর বাহিরিয়া এসে
ভাসিযু নয়ন-লোরে ।

শ্রীন—

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮১৭-১৯০৫)

“বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট কি না ?”

দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম-সংস্কারে ত্রুতী হইয়া, হিন্দুর আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ সম্বন্ধে কিরূপ সংস্কারে প্রয়াসী হইয়াছিলেন,—আমরা এক্ষণে তাহাই আলোচনা করিব।

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিরই এমন এক একখানি ধর্মগ্রন্থ আছে—যাহার সহিত ইতিহাসের নানা যুগ-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়াও ঐ সমস্ত জাতির একটা নিত্যসম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ ও অটুট থাকিয়া বাইতেছে। বেদের সহিত হিন্দু-জাতির সম্পর্কও ঐরূপ একটি নিত্যসম্বন্ধ। শুধু আধুনিক কালের ছ’একটি শতাব্দীর মধ্যে দৃষ্টিকে আবদ্ধ করিয়া, যাহারা এরূপ একটি গুরুতর বিষয়ের বিচার ও মীমাংসায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের অদূরদর্শিতার নিকট আমরা এতাবৎ বিশেষ কিছু পাইও নাই, এবং আশাও করি না।

কবে কোন দিন ইতিহাসের প্রথম প্রত্যুষে এই জাতি স্রষ্টার চতুর্মুখ-নিঃসৃত এই চতুর্ভুজী বাণীকে মস্তকে ধারণ করিয়া পৃথিবীর কোন্ প্রান্ত হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া আজ কোন্ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কত অসংখ্য অগণ্য মনুষ্যসম্ম, এই জাতীয় ধারায় অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া মহাকালের গ্রাসে লীন হইয়াছে—এই গ্রন্থ-চতুর্ভুজ প্রথম হইতে অস্তাবধি সেই জাতীয় ধারারই সূত্র যোগাইয়া আসিতেছে। মনুষ্যস্রষ্টা যাহার ইচ্ছায়, মনুষ্য-সৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ জাতির উদ্ভব ও অবিচ্ছিন্ন ধারা যাহার ইচ্ছায়, সেই সমস্ত জাতীয় ধারার সূত্রস্বরূপ এই সমস্ত আদি ধর্মগ্রন্থ তাঁহারি ইচ্ছায়,—তাঁহারি অভিপ্রায়ে, তাঁহারি প্রত্যাদেশে নব ভাবিবার যথেষ্ট কারণ কোথায় ? মানবের ইতিহাসে ঈশ্বরের লীলা অথবা অভিপ্রায় খুঁজিয়া পাওয়া গেলে, এই শ্রেণীর গ্রন্থে ঈশ্বরের অনিচ্ছা বা অনভিপ্রায় প্রমাণ করা বড়ই শক্ত, একরূপ অসম্ভব। এই সমস্ত গ্রন্থের পূর্বে মনুষ্য-জাতির ইতিহাস নাই,—আছে ইতিহাসের নীহারিকা। এই সমস্ত গ্রন্থই মানবের ইতিহাসের জন্মদাতা। মনুষ্য-জাতিকে বড় বড় সঙ্কে আবদ্ধ করিয়া, বড় বড় কাল ও অ-কালের মধ্য দিয়া চালনা করিয়াছে—এই সমস্ত গ্রন্থ। ইতিহাসের যিনি নিরামক, বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রেরও তিনিই প্রেরক। ইতিহাসের যিনি ঈশ্বর, তিনি নিশ্চিতই ইতিহাসের মেরুদণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন।

সুতরাং যাহারা মানবেতিহাসে ঈশ্বরের লীলা দর্শন করেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন, তাঁহারা এই সমস্ত ধর্মগ্রন্থে যে ঈশ্বরের একটি বিশেষ অভিপ্রায় বা প্রত্যাদেশ উপলব্ধি করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

কাজেই এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে ব্রহ্মা, তাঁহারই চতুর্মুখ হইতে নিঃসৃত চতুর্কোণকে হিন্দু-জাতি তাহার ইতিহাসের নিয়ামক বলিয়া, সেই বেদের শাসন মানিয়া অজাবধি পরিচালিত হইতেছে। হিন্দুর বিশ্বাস এই যে, এই জাতি অর্থাৎ এই হিন্দু জাতির বিশিষ্টতা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে যে শাস্ত্রাদির অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হইয়া—এই জাতির বিশিষ্টতা জন্মলাভ করিয়াছে, এবং পরিপুষ্ট হইয়াছে,—সেই সমস্ত শাস্ত্রাদিও ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত। বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র, সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরেরই প্রত্যাদেশে।

এইরূপে শাস্ত্রের সহিত জাতীয় বিশিষ্টতাকে এবং জাতীয় বিশিষ্টতার সহিত বিধাতার সৃষ্টি-বৈচিত্র্যকে, মিলাইয়া দেখিতে ও দেখাইতে না পারিলে, কিছুই দেখা যাইবে না, কাজেই কিছুই দেখানও যাইবে না। আবার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎব্যাপী একটি বড় কালের মধ্যে এই সৃষ্টির বৈচিত্র্যের, মানবেতিহাসের এই জাতীয় বিশিষ্টতার, এবং প্রত্যেক জাতীয় বিশিষ্টতার তদীয় শাস্ত্রাদি গ্রন্থের অপূর্ণ প্রভাব ও পরিণতি সম্যক্ দর্শন করিতে না পারিলে,—শাস্ত্রের সহিত জাতির সম্বন্ধ কি, তাহা নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মধ্যে, শাস্ত্রের সহিত জাতির যে নিত্য সম্বন্ধ, যে অঙ্গানু যোগ, তাহা দৃষ্টিপথে প্রত্যক্ষ হয় তাঁহাদের—যাহারা ঋষি। প্রলয়ের মহাপ্রাবনে যেমন সমস্তই ডুবিয়া, ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন শাস্ত্রের সহিত জাতির এই নিত্য সম্বন্ধকে উদ্ধার করিয়া যুগে যুগে রক্ষা করেন তাঁহারা—যাহারা অবতার।

বঙ্গদেশে ঊনবিংশ শতাব্দী, যত ক্ষুদ্র ভাবেই হউক, সত্যই এক প্রলয় ও সৃষ্টির সন্ধিক্ষণ। এই যুগসন্ধিক্ষণে প্রলয়ের প্রাবন হইতে শাস্ত্রকে রক্ষা করিয়াছেন কে ? শাস্ত্রের সহিত জাতির নিত্য সম্বন্ধ দৃষ্টিপথে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল কোন্ ঋষির ?

রাজা রামমোহনই আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেন। ইংরাজের রাজ্য অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতার অধিকারও হারাইতে বসিয়াছিলাম। ইংরাজ আমাদিগকে খৃষ্টান করিতে চাহিয়াছিল। আমরাও নাস্তিক হইবার উপক্রম করিতেছিলাম। ত্রীরামপুরের মিশনারী প্রাবন এবং ডিরোজীও তদীয় শিষ্যশিষ্যদের প্রাবন,—স্বদেশীয় শাস্ত্র-ব্যবসারীদের ভীষণতর অজ্ঞানের প্রাবন ; প্রলয়-ধারার এই জীবেন্দ্র-সঙ্গমের কেন্দ্রভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের শাস্ত্রকে উদ্ধার করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন রাজা রামমোহন। বাদালীর সেই ধূম্র-

মান প্রেম-সন্ধ্যার বধন স্বর্গ্য অন্তগত, তখন করাসীর অতীত শতাব্দীর নির্ধাপিত চিত্তভূমি হইতে ছ'একটি নিফল ফুলিঙ্গের সহিত রাশি রাশি ধূম্র আসিরা বাজালার গাঢ় নীলিমাকে কালিমায় আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছিল। তথাপি সেই আসন্ন প্রলয়ের মুখে, সংসার-তিমির-রাশির পরপারে বিছাতির মত বক্ররেখার মণ্ডিত উজ্জল ও চঞ্চল এক নূতন সৃষ্টি রাজা রামমোহনের দৃষ্টিপথে আবিস্কৃত হইয়াছিল। স্বদেশের শতাব্দীব্যাপী অজ্ঞানে আর বিদেশের নূতন কুহকে পড়িয়া বাহা প্রলয়ের মুখে ভাসিয়া বাইতেছিল, অষ্টার শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই বাণীর সহিত আমাদের জাতির বে নিত্য সম্বন্ধ, তাহা সেই দিন রাজা রামমোহনের দৃষ্টিপথে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল।

বেদের সহিত আমাদের জাতির নিত্য সম্বন্ধের এ যুগে তিনিই প্রথম দ্রষ্টা— তাঁহার এই দর্শন,—সম্যক দর্শন। রামমোহন জ্ঞানী, ইহা প্রধানতঃ তাঁহার জ্ঞানের দর্শন—বেদকে এ যুগে রামমোহন প্রলয়ের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এ ক্ষণে এ যুগের তিনিই প্রথম যুগ-প্রবর্তক।

পৃথিবীর জাতি-সমূহের সহিত তদীয় স্ব স্ব ধর্মশাস্ত্রের যে সম্পর্ক, তৎসম্বন্ধে রাজা রামমোহনের যে মীমাংসা আমরা পাই, তাহা এ যুগের উপযোগী এক অতি উন্নত জ্ঞানের পরিচায়ক। এই উন্নত জ্ঞান ও সম্যক বুদ্ধিবিচার দ্বারা তিনি হিন্দু-জাতির সহিত বেদের সম্পর্ক নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রের সহিত জাতির এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের জ্ঞান তাঁহার মধ্যে একদিনেই পরিপূষ্টি লাভ করে নাই। রাজা রামমোহন বখন “তুহকাভুল সোওয়াহেদীন” গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তখন শাস্ত্রের সহিত জাতির এই অঙ্গাঙ্গী বা নিত্য সম্বন্ধের দিকটা বিকাশলাভ করে নাই। তখন রাজা শুধু জ্ঞানবাদী বা বুদ্ধিবাদী ছিলেন। শাস্ত্রের অপেক্ষা না রাখিয়া শুধু জ্ঞান বা বুদ্ধির সাহায্যেই জাতীয় সংস্কার সম্ভব, এইরূপ ধারণা তখন তিনি পোষণ করিতেন। ইহা তাঁহার প্রথম বয়সের ধারণা। ক্রমে পরিণত বয়সে তাঁহার জ্ঞানের পরিপূষ্টি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুদ্ধিতে পারিয়াছিলেন যে, শুধু শাস্ত্রহীন বুদ্ধি দ্বারা জাতীয় সংস্কার বা উন্নতি সম্ভবপর নয়। বুদ্ধির সহিত শাস্ত্রের সামঞ্জস্য না করিতে পারিলে কোন সংস্কারই জাতীয় ভাবে হইবে না এবং সংস্কার জাতীয় ভাবে না হইতে পারিলে তাহা দ্বারা কোন ফলই পাওয়া যাইবে না। শুধু বুদ্ধি-বাদের সংস্কার নিফল হইবে। জাতীয় বিশিষ্টতা-রক্ষার জন্য প্রত্যেক জাতিই তাঁহার শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিবে। অথচ এমন ভাবে মানিয়া চলিবে— বাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা অব্যাহত থাকে।

রাজা রামমোহনের এই মীমাংসা, শাস্ত্র ও বুদ্ধির সমন্বয়,—জ্ঞানের দিক হইতে খুব বড় মীমাংসা, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি ইহা একটা প্রথম বুদ্ধির বুদ্ধি ও

বিচারের সিদ্ধান্ত মাত্র। প্রকৃত বর্ষদ্বয়ে অবতীর্ণ হইয়া কোন মত্বিকার সংস্কারের ব্যাপারে এই শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত অমুসরণ করিতে গিয়া, কখন, কোথায় কতটা যুক্তি এবং কতটা শাস্ত্রকে মানিয়া চলিতে হইবে, তাহার পরিমাণ নির্দেশের জন্ত এই সিদ্ধান্তের উপর শুধু নির্ভর করিলে চলিবে না। যুক্তি ও শাস্ত্রের পরিমাণ নির্দেশ করিয়া দিবে—প্রত্যেক সংস্কারকের স্বভাব বা প্রকৃতি এবং তাহার সংস্করণীয় ব্যাপারটির পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনা-সমূহ।

রাজা রামমোহন বেদাদি শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এ যুগের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও যুক্তির প্রথম বিদ্যাতের আলোকে সমস্ত শাস্ত্রকে তিনি আলোক-মালায় বিভূষিত করিয়াছেন। শাস্ত্র ও জ্ঞানের মণিকাঞ্চনসংযোগ আমরা দেখিয়াছি। রাজা রামমোহনের শাস্ত্র অজ্ঞানের বা অজ্ঞানীর শাস্ত্র নহে। কিন্তু তথাপি জাতীয় বিশিষ্টতা রক্ষার জন্ত এবং লোকহিত ও ধর্ম-হিতের জন্ত তিনি শাস্ত্রকে যথেষ্ট মাণ্ড করিয়াছেন, শাস্ত্রের প্রমাণ সংস্কারের প্রত্যেক কার্যে—এবং প্রতিপদবিক্ষেপে স্বীকার করিয়া তবে অগ্রসর হইয়াছেন। অত বড় জ্ঞানী, পৃথিবীতে যাহার সমকালীন তুল্য জ্ঞানী খুব বেশী ছিল না, তিনি শাস্ত্র ছাড়া এক পদ অগ্রসর হইতেন না। রাজার শাস্ত্র ও যুক্তি সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত, তিনি তাহার সংস্কারকার্যে প্রয়োগ করিয়া স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন।

রাজা রামমোহনের পরে ব্রহ্মসভাকে প্রায় ষাট বৎসর প্রাণ দিয়া ব্রহ্মা করিয়া আসিয়াছেন—রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তিনি ব্রহ্মসভার কার্যে রামমোহনের যুক্তির প্রমাণ অপেক্ষা শাস্ত্রের প্রমাণকেই বেশী প্রাধান্য দিয়াছিলেন। শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়-সিদ্ধান্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রকৃতিকে অমুসরণ করিয়া যুক্তির ভাগ কমা-ইয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণের ভাগকেই বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের হস্তে রামমোহনের ব্রহ্মসভা, বেদকে আশ্রয়াক্য বলিয়াই অনেকটা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের হস্ত হইতে বেদের অপৌরুষেয়তার বিশ্বাসী এবংবিধ ব্রহ্মসভাকে দেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ এই ব্রহ্মসভাকে কালে ব্রাহ্ম-সমাজে পরিবর্তিত করেন। কিন্তু রামমোহন ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরে, দেবেন্দ্রনাথ বেদাদি শাস্ত্র-সম্বন্ধে ক্রিয়াকর্ম সংস্কারে প্রয়াসী হইয়াছিলেন এবং কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাই আলোচনার বিষয়।

ব্রহ্মসভার সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার যোগস্থাপন হইবার দুই বৎসর পরে— ১৮৪০ খৃঃ আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকটে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের নীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই বৎসরেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাহির হইল। অক্ষয়কুমার

দত্ত ইহার সম্পাদক হইলেন। ১৮৪০-৮৫, এই ১২ বৎসর অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকের কার্য্য হস্তে লইয়াই দেবেজ্ঞনাথের সহিত, ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষ হইতে বেদকে ক্রিয়াক্রপ ভাবে গ্রহণ করা যাইবে,—এই বিষয়ে আলোচনা ও তর্ক প্রবৃত্ত হ'ন এবং সর্ব্বশেষ ১৮৫১ খৃঃ অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম-সমাজের বাৎসরিক উৎসবে ঘোষণা করেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলভূমি কোন পুস্তক হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বেদের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত। কিন্তুগ্রহই ব্রাহ্মধর্ম্মের বেদ।

এখন প্রশ্ন এই—অক্ষয়কুমার দত্তের সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে বেদ সম্বন্ধে দেবেজ্ঞনাথের কি ধারণা ছিল? এবং পরেই বা তাহা কখন ক্রিয়াক্রপ ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমাদের এই যে, অক্ষয়কুমারের সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে দেবেজ্ঞনাথের বেদ-সম্বন্ধে ধারণা নিতান্তই গতানুগতিক ছিল। দেবেজ্ঞনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মে লিপ্ত হইবার ৪ বৎসর পূর্বে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা হয়। এই তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে রামচন্দ্র বিজ্ঞাবাগীশের প্রভাব দেবেজ্ঞনাথ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই ১৮৪৩ খৃঃ পূর্বে কি ব্রহ্মসভা, কি তত্ত্ববোধিনী সভা, এই উভয় প্রতিষ্ঠানই বেদ-সম্বন্ধে আচার্য্য বিজ্ঞাবাগীশ মহাশয়ের মত দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে, এবং আচার্য্য বিজ্ঞাবাগীশ মহাশয়, রামমোহনের যুক্তি ও শাস্ত্রের সমন্বয়সিদ্ধান্তের যুক্তির ভাগটাকে নিশ্চয় করিয়া শাস্ত্রের উপরেই বেদ নির্ভর করিয়াছিলেন। বেদ তখন অপৌরুষেয় বাণী ও আপ্তবাক্য বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে।

ব্রহ্মসভা ও তত্ত্ববোধিনী সভা মিলিত হইয়া যাইবার পরেও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। বেদ-সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিল না। তার পর অক্ষয়কুমার আসিলেন, বেদ লইয়া প্রশ্ন উঠিল,—তর্ক চলিতে লাগিল। সুতরাং অক্ষয়কুমার আসিয়া যোগদান করিবার পূর্বে, বেদ-সম্বন্ধে দেবেজ্ঞনাথ কোনরূপ উদ্বিগ্ন অনুভব করেন নাই বা আচার্য্য বিজ্ঞাবাগীশের নিকট উক্ত বিষয়ে কোনরূপ প্রশ্নও করেন নাই। যেমন চলিয়া আসিতেছিল, তেমনি চলিতেছিল। দেবেজ্ঞনাথের দৃষ্টিপথে বেদসমস্তা তখন প্রত্যক্ষই হয় নাই। রামচন্দ্র বিজ্ঞাবাগীশের মতানুযায়ী যেমন ব্রহ্ম-সভার আর দশজনে মনিয়া আসিতেছিলেন, দেবেজ্ঞনাথও সেইরূপ গতানুগতিকভাবে বেদকে মানিয়া আসিতেছিলেন। আচার্য্য বিজ্ঞাবাগীশ বা ব্রহ্ম-সভার সাধারণ মত হইতে, বেদ-সম্বন্ধে কোন স্বতন্ত্র মত দেবেজ্ঞনাথের তখন কিছুই ছিল না। ইহা অক্ষয়কুমার দত্তের যোগদান করিবার পূর্বে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আমাদের এই যে, অক্ষয়কুমারের সংস্পর্শে আসিয়াই দেবেন্দ্রনাথ বেদ-সমস্তা দ্বারা বিব্রত হইয়া পড়েন এবং অনেক বৎসর ধরিয়া অনেক রকম তর্ক ও আলোচনার পরেও তিনি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে বেদ-সমস্তার কোনরূপ সমীচীন দীর্ঘাঙ্গ দিয়া যাইতে পারেন নাই, এবং তিনি নিজের মনের মধ্যেও এই সমস্তার কোন সমাধান করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অথচ এই সমস্তা-সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তের যে এক অস্থির ও দোলায়মান অবস্থা আমরা দেখিতে পাই, তাহা প্রথমতঃ তাঁহার নিজের দিক হইতে এবং দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্ম-সংস্কারের ইতিহাসের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য।

১৮৪১-১৮৫১ খৃঃ পর্য্যন্ত অক্ষয়কুমার বেদ-সমস্তা লইয়া দেবেন্দ্রনাথের সহিত তর্ক করিয়াছেন, এবং ১৮৫১ খৃঃ ব্রাহ্ম-ধর্ম বেদশৃঙ্খল হইতে মুক্ত, ইহা তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের সাংসদগণের উৎসবের মধ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন। এই দীর্ঘ-কালের মধ্যে অক্ষয়কুমার তাঁহার স্বীয় মতকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত ধারণ করিয়াছেন ও প্রচার করিয়াছেন। কোন দিন কোন সংশয় বা চাঞ্চল্য তিনি প্রকাশ করেন নাই। মানব-সভ্যতার কোন এক আদিযুগের কতকগুলি বিশেষ ধর্মীয়ভূতির কোন এক বিশেষ গ্রন্থ—কিছুতেই এই বিজ্ঞানের যুগের উন্নত ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি হইতে পারে না,—ইহাই ছিল তাঁহার মত। কোন পুস্তককে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি হইতে দিতে তিনি কোন মতেই রাজী ছিলেন না। নিখিল বিশ্বই ব্রাহ্মধর্মের বেদ, ইহাই ছিল—তাঁহার মত ও বিশ্বাস।

প্রকৃতপক্ষে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের শাস্ত্রপন্থী মতবাদের সহিত উত্তরকালে যুক্তিপন্থী অক্ষয়কুমারের মতবাদেরই সংঘর্ষ হয়। কেন না, আচার্য্য বিদ্যাবাগীশের যেমন শাস্ত্রের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, অক্ষয়কুমারেরও তেমনি বিজ্ঞান জ্ঞানের উপর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নির্ভর ছিল। পরন্তু দেবেন্দ্রনাথের প্রথমে কি শাস্ত্র, কি যুক্তি, কোন দিকেই কোন স্পষ্ট বিশ্বাস বা দৃঢ় মত ছিল না। কাজেই অক্ষয়কুমার বেদ-সমস্তা লইয়া ব্রাহ্মসমাজে যে ঝড় উঠাইয়াছিলেন, সেই ঝড়ে দেবেন্দ্রনাথ একবার এদিক একবার ওদিক তাড়িত ও চালিত হইয়াছেন মাত্র। প্রথম হইতে বেদ-সম্বন্ধে সচেতন না থাকার দরুনই দেবেন্দ্রনাথ একবার বিদ্যাবাগীশের মতবাদের দিকে, আবার অক্ষয়কুমারের মতবাদের দিকে তাড়িত হইয়া অতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অথচ অন্তরিরপেক্ষ হইয়া নিজের একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মতবাদ উদ্ভাবন করিবার মত প্রতিভাও তাঁহার দেখা যায় নাই। কালী হইতে চারি জন ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিবার পূর্ব পর্য্যন্ত সমগ্র বেদ-সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের জ্ঞানও অত্যন্ত সামান্য ছিল। বলা বাহুল্য, শাস্ত্র ও যুক্তি, বিজ্ঞা-

বাগীশ ও অক্ষয়কুমার, এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে নিপতিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ একটু মাথা উঠাইয়া রামমোহনকেও দেখিতে পারেন নাই। দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ইহা একটা বড়ই নিঃসহায় ও সঙ্কটের অবস্থা বলিয়া আমাদের মনে হয়। নিজের স্বাধীনভাবে কিছু উদ্ভাবন করিয়া লইবার ক্ষমতা দেবেন্দ্রনাথের খুব অল্পই ছিল। কি চিন্তার জগতে, কি কর্মের জগতে কোন সমস্তা উপস্থিত হইলে কোন দিনই তিনি তাহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। কেবল একবার এদিক, একবার ওদিক, করিয়া সমস্তাটি এড়াইতে চাহিয়াছেন মাত্র। এ ক্ষেত্রেও বিজ্ঞা-বাগীশের নিকট হইতে শাস্ত্র-সম্বন্ধে যে মতবাদ তিনি পাইলেন,—তাহা একরূপ অচেতন ও অন্ধভাবেই গ্রহণ করিলেন। পরে যখন অক্ষয়কুমার যুক্তির প্রথম আলোক আনিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিলেন, তখন বস্তুতঃই দেবেন্দ্রনাথ এক মহা ফাঁপরে পড়িয়া হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিলেন। কি চিন্তা, কি সংস্কার-ক্ষেত্রে, কি নৈতিক সংগ্রামে সর্বত্রই দেবেন্দ্রনাথ অসহায়—পরমুখাপেক্ষী। সর্বত্রই তাঁহার মীমাংসা এদিক ওদিক তাকাইয়া ছুই নোকার পা দিয়া চলার মত নিবুদ্ধিতার ও সংসাহসের অভাবের পরিচায়ক; এবং ব্রাহ্ম-সংস্কারের ইতিহাসে ইহার পরি-গাম ও অতিশয় শোচনীয় দেখা গিয়াছে।

অক্ষয়কুমারের সহিত মিলিত হইবার পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ যে রামচন্দ্র বিজ্ঞাবাগী-শের ও তাঁহার ব্রহ্মসভার মতগুলিকে অন্ধভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, বেদ-সমস্তা ছাড়িয়া দিয়া আরও অন্ত্যান্ত ঘটনার দ্বারা তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। আচার্য্য বিজ্ঞাবাগীশ মহাশয় অদ্বৈতবাদী ছিলেন। হয় ত ইহাও রামমোহনকেই অনুসরণ করিতে গিয়া, এবং নিজের প্রকৃতির সহিত মিলাইয়া তিনি এই মতবাদে বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। বিজ্ঞাবাগীশ-শিষ্য দেবেন্দ্রনাথও এই অদ্বৈতবাদকে তাঁহার গুরু হস্ত হইতে অন্ধভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং অক্ষয়কুমারই এই মতবাদের বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথকে সচেতন করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, দেবেন্দ্রনাথের বুদ্ধির মধ্যে এমন একটা জড়তাব, অন্ধতাব ছিল—যাহা দ্বারা তিনি প্রথম দৃষ্টিতে কোন বিষয় কিছু ভালরূপ বুঝিতেই পারি-তেন না। অক্ষয়কুমারের প্রতিভা ও জ্ঞান এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা যথেষ্ট প্রথম ও তীক্ষ্ণ ছিল।

কাঁচড়াপাড়ার জগচ্চন্দ্র ও লোকনাথ রায়ের পরিবারে শ্রীধর ভায়রব দ্বারা তদ্ব্যক্ত মন্ত্রে যে উপদেশ দেওয়া হইত, এবং শ্রীলোকদের পুষ্প, চন্দন ও নৈবেদ্য দ্বারা যে ব্রহ্মোপাসনার বিধি ছিল,—ইহাও দেবেন্দ্রনাথ অন্ধভাবেই অনুমোদন করিয়াছিলেন। পরে অক্ষয়কুমার দ্বারাই ইহার প্রতিবাদ হয়।

এই সমস্ত ঘটনা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অব্যবহিত পরে যে সমস্ত সংস্কার ব্রাহ্ম-সমাজে দৃষ্ট হয়, তাহার মূলে জ্ঞানপন্থী অক্ষয়কুমারের প্রেরণাই খুব প্রবলভাবে কার্য্য করিয়াছে। অগতঃ সংস্কার-যুগের ফরমানি ইতিহাস এই সত্যটাকে গোপন করিবার জন্য বরাবর এমন একটা প্রয়াস করিতেছে যে, রাজনারায়ণ বসু হইতে আজও পর্য্যন্ত তাহার জের মিটিতেছে না। এমন কি, রাজনারায়ণ বাবুকেও ছাড়াইয়া যাইবার উপক্রম দেখিতেছি।

রাজনারায়ণ বাবু বলিতেছেন যে, দেবেন্দ্র বাবু ও অক্ষয় বাবু—ব্রাহ্ম-সমাজের এই দুই নামকের মধ্যে তর্ক হইয়া দ্বিধা হইল যে, বেদকে আর ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য নহে, এবং বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত, এই মত অক্ষয় বাবু ১৮৫১ খৃঃ উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষণা করিলেন। রাজনারায়ণ বাবুর আক্ষেপ এই যে, বেদবর্জন-ব্যাপারের গৌরব শুধু অক্ষয় বাবু একা পাইবেন কেন? দেবেন্দ্রনাথও তাঁহার ভাগী বটেন। কেন না, তাঁহার সম্মতি ব্যতীত ব্রাহ্ম-সমাজে এই পরিবর্তন সাধিত হইতে পারিত না, যেহেতু, তিনিই ছিলেন সর্ব-প্রধান।

প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকগণই এ বিষয়ে একমত হইয়া বলিতেছেন যে, অক্ষয়-কুমারই দেবেন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে মত-পরিবর্তন করান। দেবেন্দ্রনাথ পূর্বে বেদ-সম্বন্ধে যে মত পোষণ করিতেন, অক্ষয়কুমারের যুক্তি দ্বারা চালিত হইয়া সেই মতবাদ তিনি পরিবর্তন করেন। এই ঐতিহাসিক সত্য হইতে গৌরব, ভাগাভাগি লইয়া যে বাগযুদ্ধ ও মসীযুদ্ধ চলিতে পারে, ইহাই আশ্চর্য্য।

যাহা হউক, রাজনারায়ণ বাবু ত দুই নামকের মধ্যে ‘গৌরব’ ভাগাভাগি করিয়া দিবার চেষ্টা ছিলেন, কিন্তু আধুনিক চেষ্টা ইহাকে ডিঙ্গাইয়া প্রায় সমস্ত গৌরব-টাকেই দেবেন্দ্রনাথের হস্তে তুলিয়া দিবার জন্য বক্রপরিকর।

এই আধুনিক চেষ্টার যুক্তির ক্রম দেখাইতেছি।

১৮৫১ খৃঃ অক্ষয়কুমার দত্তের ঘোষণা যে, বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নহে। কিন্তু ইহাকে যে প্রথম ঘোষণা বলা হইয়াছে, তাহা ভুল। এই ঘোষণার অনেক পূর্বেকার ব্যাপার হইতেছে ১৮৪৭ খৃঃ ঘোষণা। কি সে ঘোষণা? “বেদান্ত-প্রতিপত্তি সত্যধর্ম্ম”—ইহার পরিবর্তে “ব্রাহ্মধর্ম্ম” এই শব্দ ব্যবহার করা হয়, এবং যখন হইতে ‘ব্রাহ্মধর্ম্ম’ শব্দ ব্যবহার করা হয়, তখন হইতেই বেদ যে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নয়, তাহা স্বীকার করা হয়। সুতরাং ১৮৫১ খৃঃ অক্ষয়কুমারের ঘোষণার পূর্বেই ১৮৪৭ খৃঃ এই ঘোষণার অন্তরালে বেদকে বর্জন করা হয়। আমাদের স্মিত্য এই যে, ১৮৪৭ খৃঃ ঘোষণা কাহার ঘোষণা? দেবেন্দ্রনাথ, না অক্ষয়কুমারের? ১৮৪৩ খৃঃ হইতেই ত

বেদবর্জনের জন্ত অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের সহিত তর্ক করিতেছেন। তত্ত্ববোধিনীর সভাদের মধ্যেও এই আন্দোলন চলিতেছে। ১৮৪৭ খৃঃ এই ‘ব্রাহ্মধর্ম’ শব্দ ব্যবহারে আমরা অক্ষয়কুমারের প্রেরণা ও প্রভাব ছাড়িয়া দিয়া দেবেন্দ্রনাথের হস্ত দেখিব কোন্ প্রমাণে ?

এই আধুনিক চেষ্টা ঐতিহাসিক সমস্ত ঘটনা উদ্ধার করিয়া দেখান না। কোন একটা বিশেষ মতকে দাঁড় করাইবার জন্ত প্রয়োজনমত ঘটনার অবতারণা করেন। ফর-মাসী সাহিত্যের দাসত্বে হাত পাকাইরা এবং বিধ সত্যগোপন এমন অভ্যাস চইয়া যায় যে, তৎসম্বন্ধে অল্পে কি ভাবিতে পারে বা বলিতে পারে, তাহার কোন খেয়ালই থাকে না। সাহিত্যে যে ইহাতে কি পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে দায়িত্ববোধ ইহাদের কিছু-নাড় আছে বলিয়া মনে হয় না।

কাহ্নেই আমরা বাধ্য হইয়া ১৮৪৬ খৃঃ একটি ঘটনার খোঁজে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। ঐ বৎসরে ‘জগদ্রূ’ পত্রিকায় “বেদ ঈশ্বরপ্রণীত শাস্ত্র নহে” বলিয়া একটা প্রবন্ধ বাহির হয়। দেবেন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া তত্ত্ববোধিনীতে লিখিবার জন্ত অক্ষয় বাবুকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন ; কিন্তু অক্ষয় বাবু স্পষ্ট বলেন যে, তাঁহার লেখনী হইতে ঐরূপ লেখা বাহির হওয়া অসম্ভব। তার পর বেদ ঈশ্বর-প্রণীত ও অভ্রান্ত, এইরূপ মন্তব্যচক এক প্রতিবাদ-প্রবন্ধ ঐ বৎসরের মাঘ ও চৈত্রের তত্ত্ববোধিনীতে রাজনারায়ণ বাবুকে দিয়া দেবেন্দ্রনাথ বাহির করান।

ইহার কয়েক মাস মাত্র পরেই আধুনিক চেষ্টার ১৮৪৭ খৃঃ ঘোষণা। এখন এই ঘোষণায় দেবেন্দ্রনাথের হস্তই আমরা দেখিব, না অক্ষয়কুমারের হস্ত দেখিব ? বুদ্ধিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভা এই ঘোষণার সায় দিয়াছিলেন।

১৮৪৭ খৃঃ ‘ব্রাহ্মধর্ম’ শব্দ-ব্যবহারের ঘোষণায় অক্ষয়কুমারকে বাদ দিয়া দেবেন্দ্রনাথের হস্ত দেখাইবার চেষ্টার মত মিথ্যা চেষ্টা আর নাই। কিন্তু হইলে কি হয়, রাজনারায়ণ বাবুকে ছাড়াইয়া বাওয়া ত চাই ?

১৮৪৭ খৃঃ ‘ব্রাহ্মধর্ম’ শব্দ ব্যবহারের ঘোষণার ইঙ্গিত ছই দিকে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, অক্ষয়কুমার দত্ত যে ১৮৫১ খৃঃ বেদান্ত-বর্জনের প্রথম ঘোষণা করেন, তাহার গৌরব হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা। আর অক্ষয়কুমারের পূর্বেই এই ঘোষণা দেবেন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন।

আমরা বলি, দেবেন্দ্রনাথ এই ঘোষণা করেন নাই। তিনি মাত্র কয়েক মাস পূর্বে বেদ ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া অক্ষয়কুমার দ্বারা তত্ত্ববোধিনীতে প্রবন্ধ লেখাইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিয়া, নিফল হইয়া শেষে রাজনারায়ণ বাবুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

আর ইহাও সত্য, ১৮৪৭ খৃঃ ‘ব্রাহ্মধর্ম’ শব্দ-ব্যবহারেই বেদান্তবর্জনের পালা সম্পূর্ণ

হয় নাই। তখনও তর্ক ও আলোচনাই চলিতেছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৪৮-৫০ এই তিন বৎসরই বেদ-সমস্তার আলোচনা খুব বেশী করিয়া হইয়াছিল। কেন না, তৎ-পূর্বে কানীতে প্রেরিত চারিজন ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহাদের ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৭ খৃঃ বেদান্তবর্জকন করিয়া বসিলেন,— কেন না, তাহা না করিলে ‘গোরবের’ ভাগ অক্ষয়কুমারের দিকে যে যায়? অতঃ রাজনারায়ণ বাবু বলিতেছেন যে, কানী প্রেরিত ব্রাহ্মণেরা ফিরিয়া আসিলে “১৮৪৮-৫০ এই তিন বৎসর বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট কি না, ইহা সর্বনা আমাদের মধ্যে বিচারিত হইত।” কিন্তু আধুনিক চেষ্টা এ সমস্ত কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ১৮৪৭ খৃঃ বেদবর্জকন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম নাম হইল। কেন না—অর্থাৎ—অক্ষয়কুমারের ঘোষণার পূর্বে হওয়া চাই যে?

সাহিত্যে এরূপ চেষ্টাকে কি বলিয়া সম্ভাষণ করিব? এরূপ চেষ্টা তাহাদের সাহিত্য-ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের চিন্তা ও জীবনকে তাহাদের রচিত সাহিত্য হইতে কি প্রকারে পৃথক করিয়া দেখিব? নোটের উপর কথা এই যে, সাহিত্য ও ইতিহাসকে আমরা মিথ্যার হস্ত হইতে রক্ষা করিব। তজ্জন্তু বাহা আবশ্যক, তাহাও করিব। তথাকথিত ‘ভদ্রতার’ খাতিরে নত্যাৎকে খর্ব করিতে পারিব না।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ দ্বারা বেদ বেক্রপ আশ্রয়বাক্য বলিয়া ব্রহ্ম-সভায় গৃহীত হইয়াছিল এবং দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে তাহা বেক্রপ অন্ধভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অক্ষয়কুমার প্রথম হইতেই বেক্রপ শাস্ত্রনিরপেক্ষ বিত্ত জ্ঞানকে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি করিবার জন্ত বক্রপরিবর্তন হইয়াছিলেন এবং বহু তর্ক-আলোচনার পরে ১৮৫১ খৃঃ উৎসবের বক্তৃতায় ব্রাহ্মধর্ম বেদের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্রাহ্মধর্মকে অক্ষয়কুমারই সে যুগে দেবেন্দ্রনাথের কতকটা বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াই বেদের আধিপত্য হইতে মুক্ত করেন।

ইহা মহেন্দ্রনাথ রায়ের জন্ম-কল্পনা নহে। রাজনারায়ণ বসু তত্ত্ববোধিনীতে ইহার প্রতিবাদ করেন। এই প্রতিবাদে দেবেন্দ্রনাথের গোপন হস্ত কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু রাজনারায়ণ বসুর প্রতিবাদ অক্ষয়কুমারকে তাঁহার সত্য-গোরব হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। এবং এই প্রতিবাদ স্ববিরোধিতা-দোষে ছষ্ট। কেন না, রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার আশ্রয়িত্যে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, বেদ-বর্জকন-ব্যাপারে অক্ষয় বাবুই ‘অগ্রসর’ ছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ‘রক্ষণশীল’ ছিলেন, এবং উভয়ে তর্ক করার পরে যদি উভয়েই অগ্রসর হ’ন, অর্থাৎ বেদ-বর্জকন করেন, তবে অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের মতপরিবর্তন করাইয়াছিলেন, ইহা ‘একেবারেই ভুল’ হইবে কেন?

কালীতে যে চারি জন ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করা হইয়াছিল,—তাহাও কি অক্ষয়কুমারের সহিত তর্ক করার পরে নয়? তাঁহারা কালী হইতে ফিরিয়া আসিলে যে তর্ক ও আলোচনা হয়, তাহার মধ্যে কি অক্ষয়কুমারের প্রভাব কার্য্য করে নাই? আধুনিক চেষ্টা বুঝা!

কিন্তু ইহা সত্য যে, বেদ-সমস্তা-সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার একমত হইতে পারেন নাই। তাহার কারণ, অক্ষয়কুমারের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটা সুসঙ্গত ধারণা ছিল, যাহা দেবেন্দ্রনাথের কোন কালেই ছিল না।

কিন্তু এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ যে রামমোহন-প্রদর্শিত শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়-সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতে পারিয়াছিলেন,—তাহাও নয়। দেবেন্দ্রনাথ ইহার বহুকাল পরেও এ বিষয়ে লিখিতেছেন যে—“রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন যে যাহারা বেদ মানে তাহাদের মধ্যে বেদ রক্ষা করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচলিত করা বিস্তৃত যাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হইয়া বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া না মানিবে, তাহাদের মধ্যে কি করা, ইহা তাঁহার তখন বিবেচনার আইসে নাই!”—আশ্চর্য্য!

অথচ ইহা যে তাঁহার (রামমোহনের) তখন খুব বিবেচনার মধ্যেই আনিয়া ছিল, তাহা রাজার সম্বন্ধে যাহারা কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ই জানেন। শাস্ত্র ও যুক্তির অপূর্ণ সমন্বয়-সাধনের জন্তই স্বদেশ ও বিদেশের বহু পণ্ডিত-গণ রাজাকে একদাকৈ নবযুগের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রব্যাক্যাকার বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথ রাজার এই সমন্বয় পদ্ধতি বুঝিতে না পারিয়া,—‘ইহা তাঁহার তখন বিবেচনার আইসে নাই’—বলিয়া রাজার প্রতিভাকে অনর্থ্যাঙ্গীকার করিয়াছেন। তাহাতে কিছু আসে যায় না। রামমোহনের প্রতিভা দেবেন্দ্রনাথের সমালোচনার উপর নির্ভর করে না। তথাপি হুঃখের বিষয় যে, শাস্ত্র ও যুক্তিবাদের মধ্যে ক্রমাগত ৮ বৎসর কাল দোল খাইয়াও তিনি এ বিষয়ে রামমোহনকে বুঝিতে ত পারিলেনই না, বরং উল্টা বুঝিয়া বসিলেন।

আধুনিক চেষ্টা প্রতিপন্ন করিতে চান যে, শাস্ত্রমীমাংসার দেবেন্দ্রনাথ নাকি রামমোহনেরই অনুসরণ করিয়াছেন। আমরা দেখাইতেছি ও দেখিতেছি যে, শাস্ত্রমীমাংসার দেবেন্দ্রনাথের নিজের স্বীকার-উক্তি দ্বারা ই প্রমাণ হইতেছে যে, রামমোহনকে দেবেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারেন নাই, এবং যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা তিনি ভুল বুঝিয়াছেন।

রামমোহনের শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়ে বিজ্ঞাবাগীশ মহাশয় শাস্ত্রকে প্রাধান্য

দিয়া যুক্তিকে নিম্প্রভ করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রতিক্রিয়ার কলে, নিজের শিক্ষা ও প্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়া অক্ষয়কুমার শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিকে উজ্জল করিয়া ধরিয়াছিলেন। বিজ্ঞাবাগীশ ও অক্ষয়কুমার, ইহারা উভয়েই একদেশদর্শিতার দোষে ছুটে হইলেও,—ইহারা সংস্কারের ইতিহাসে স্বাভাবিক বিবর্তনের কলে প্রত্যেকেই এক একটি ক্রম বা অবস্থার পরিচয় দেন।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ইহাদের মাঝখানে পড়িয়া কেবলই দোল খাইয়াছেন, নিজেও কোনরূপ মীমাংসায় আসিতে পারেন নাই এবং ব্রহ্মসমাজকেও কোন মীমাংসা সুতরাং দিয়া বাইতে পারেন নাই। তাঁহার দর্শন এ ক্ষেত্রে সম্যক দর্শন নহে। জ্ঞানেরও নহে,—উপলব্ধিরও নহে। তাঁহার ঋষি-দৃষ্টি অন্ততঃ এ ক্ষেত্রে তাঁহাকে কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারে নাই।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

অচেনা দূতী

অচেনা পাখী কোথায় থাকি'
গাহিছে এই গান ?
বুঝি না ভাষা, শুধু রে আশা
আকুল করে প্রাণ !
অযুত যুগ যাঁহার তরে
কত না কোটি জনম ধরে'
চলেছি আমি দিবস-যামি'
করিতে সন্ধান,
—এ কি রে এ কি তাঁহারই আহ্বান ?
(২)

কোথায় পাখী ? বারেক অঁখি
হেরিতে তোমারে চায়।
চরণে ধরি ;— করুণা করি'
আয় রে কাছে আয় !

যদি রে আজো লুকায়ে রবি,
অজানা ভাষে কি-যে-কি ক'বি,
ক্যান রে তবে ভাস্মায়ে ঘুম
জাগালি চেতনায় ?
—হিয়া যে মোর কাঁদিয়ে উভরায় !

(৩)

জ্বালালি চিতা ! অশ্রু কি তা'
নেবা'তে পারে হায় !
দহে যে হিয়া ! বাসনা দিয়া
কেমনে ভুলি তা'য় ?
ভোগের স্মৃথে হৃদয় ভরি'
যত এ চিতা চাপিয়া ধরি,
—নিমেষ পরেই সবি যে শেষ !
বিরহ-বেদনায়
পরাণে মরি । আরো কি সহ্য যায় !

(৪)

মিনতি করে' জিগাই ভোরে
রে দূতী, বারে বার,—
এখনও বাকি রহিল না কি
এ মোর অভিসার ?
কোথায় গেলে কবে রে কবে
এ সাধ মোর মিটিবে তবে ?
অলস অঁধি আসে যে ঢুলি'
স্মৃখে অঁধিয়ার !
এবারো তবে হ'ল না বুঝি আর !

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী ।

কোমলে কঠোর

কালিদাসের নাটকগুলি সবই খুব চক্চকে। খুব উজ্জ্বল। আপাততঃ দেখিতে গেলে যেন আদিরসেরই বই। নায়ক-নারিকা ত প্রেমে একেবারে ডগমগ। পাঠক-পাঠিকা, প্রেমক-প্রেমিকাও প্রায় তাই হইয়াই উঠেন। মালবিকার প্রতি রাজার টান, মালবিকারও সে টানের “প্রতিটান”, উর্ষশীর প্রতি পুরুষবার অনুরাগ, উর্ষশীরও রাজার প্রতি পূর অনুরাগ; রাজা হৃদয়ন্তর শকুন্তলার তনয় হওয়া, আবার শকু-ন্তলারও হৃদয়ন্তে তনয় হওয়া, প্রেম নয় ত কি? এত প্রেম কোথায় পাওয়া যায়? মালবিকাগ্রিমিত্রে যৌবনের চঞ্চলতা; বিক্রমোর্ষনীতে বীরের গভীরতা; শকুন্তলার একেবারে তনয়তা। এক হাতে তিন রকমের প্রেম তিন ধারার বাহির হইয়াছে। সকল ধারায়ই অমৃত বহিয়া গিয়াছে। সুতরাং কালিদাসকে লোকে আদি-রসের কবি বলিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কালিদাসেরও হাত বেশ পাকা, তিনি প্রণয়কেই আগাইয়া দেন। বইখানির যেখানটা খোল, কেবল প্রেম। নায়ক-নারিকা কখন প্রেমের স্বখে নয়, কখন ‘পাইতেছি না, বলিয়া উৎকর্ষার কাতর, কখনও ‘পাইবার নহে’ বলিয়া হতাশার স্রিয়মাণ, কখন পাইবার আশায় অত্যন্ত চঞ্চল। কখনও বিরহে মৃতপ্রায়। বিরহ আবার কখন আপনার দোষে, কখন দৈবের দোষে। প্রেমে কখন আছেন মান, কখন আছেন কলহ, কখন আছেন ভয়, কখন আছেন চিন্তা; কত অনন্ত উপায়ে যে কালিদাস প্রেম-রস ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অল্পে বলিয়া উঠা ভার।

কিন্তু এই প্রেম-তরঙ্গের ভিতরে একটা উপদেশ, একটা সমাজের শিক্ষা, একটা সাধু উদ্দেশ্য, দেখা যায় না, অথচ বহিতেছে। সেইটাই আসল কথা, প্রেমটা বাহিরের চাক্চিক্য-মাত্র। প্রেমে মনকে নরম করে, জমী-তৈয়ার করে, কালিদাস সেই জমীতে উপদেশের বীজ ছড়াইয়া দেন। একজন কবি বলিয়াছেন, আমি অনেক দর্শন-শাস্ত্রের বই লিখিয়াছি, কিন্তু তাহাতে আপামর সাধারণের মন আকর্ষণ করিতে পারি নাই, তাই কাব্যচ্ছলে এই গ্রন্থ লিখিলাম। লোকে ত তিস্ত ঔষধ খাইতে চায় না, তাই তাহাতে মধু মিশাইয়া দিলাম। কালিদাসও প্রেমের মধুতে ডুবাইয়া কঠিন উপদেশ লোকের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তবে কালিদাস ও অন্বঘোষে তফাৎ এই যে, অন্বঘোষ যে উপদেশ দিয়াছেন, সেটি ও তাঁর মধুটুকু ছইই দেখা যাইতেছে। কিন্তু কালিদাস যে উপদেশ দিতেছেন, এটা বিশেষ করিয়া তলাইয়া না দেখিলে,

তারাইয়া না পড়িলে কিছুতেই বুঝা যায় না। তাঁহার উদ্দেশ্য যেন শুদ্ধ মধু, কেবল প্রেম, কেবল আমোদ, কেবল “রথ দেখা”। তিনি যে উহার মধ্যে একটু “কলাবেচা” রাখিয়াছেন, তাহা সহজে বুঝা যায় না। যায় না বলিয়াই কালিদাসের এত আদর। লোকে বলে, “যাই, কালিদাসের শরণ নাই। ছবন্টা বিগুঢ় আমোদে কাটিবে, এ আমোদে ‘বুড়ুটেগিরি’ একেবারে নাই, “কটুকটে” কথার ভাঁজ নাই, জ্যাঠামির “জ্যা”টি পর্য্যন্ত নাই অর্থাৎ উপদেশ দিবার ইচ্ছা নাই, চেষ্টা নাই, প্রয়াস নাই। অমূল্য কিছুই নাই। সবই সুন্দর, সবই মধুর, সবই আশ্চর্য্য।” কিন্তু তলার তলার মন বদলাইয়া যায়, এমন কি, সমস্ত মানুষটা আর এক রকম হইয়া যায়। যা ছিল, তা হ’তে অনেক ভাল হইয়া যায়।

দেখ, মালবিকায়মিত্রে কি হইল। পাটরাণী ধারিণী বড় বেশ লোক। রাজার মেয়ে। সহবৎ ভাল। সমস্ত ভদ্রমানা; অভদ্রতার লেশও নাই। কাহাকেও মন্দ কথা বলিতে জানেন না, সবার উপরই তাঁহার সমান দয়া—সমান অনুগ্রহ। ইরাবতীর যখন সব গিয়াছে, তখন ধারিণীই তাহার ভরসা। কিন্তু ধারিণীর অদৃষ্টদোষে স্বামীটি একটু রূপ-পাগলা। রূপ দেখিলে আর রক্ষা নাই। ধারিণীর এক চাকরাণী ছিল—ছোট লোকের মেয়ে। নাম ইরাবতী। সুন্দরী বটে। তার উপর নাচতে জানে ভাল, গাইতে জানে ভাল। তাহার উপর আবার একটু একটু নেশাও করে। রাজার কোঁক পড়িল তাহার উপর। সে প্রথম রাজার প্রণয়পাত্রী, পরে রানীও হইল। ধারিণীর সহিল না। তিনি গোপনে গোপনে তাহার সর্বনাশের চিন্তা করিতে লাগিলেন। আর একটি চাকরাণী পাইলেন, সেটি দেখতে আরও ভাল। ধারিণী ভাবিলেন, বেশ হইল—“কণ্টকেটেনর কণ্টকম্”। নূতন দাসীকে ভাল করিয়া নাচগান শিখাইতে লাগিলেন। মনে করিলেন, এক দিন মাহেন্দ্রক্ষণে তাহাকে রাজার কাছে পহুছিয়া দিয়া ইরাবতীকে রাজার মন থেকে তফাৎ করিয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহার সে মাহেন্দ্রক্ষণ আসিল না। তাহার উদ্যোগ-পর্য্য শেষ হইবার পূর্বেই মালবিকার কথা রাজার কানে উঠিল। আর পাশ কে ? পাগল ফেপিল; মালবিকার সঙ্গে রাজার মিলন হইল। ইরাবতী তফাৎ হইল। কিন্তু সেই সঙ্গে ধারিণী রানীর কি হইল ? তাঁহার যে দেবী শক্তি ছিল, তাহাও গেল। পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। রানী ধারিণীর তাহাই হইল। মালবিকার সহিত রাজার বিবাহের পর ইরাবতীর দূতী আসিয়া যখন রাজার নিকট ইরাবতীর হইয়া মাপ চাহিল, রাজা কিছুই বলিলেন না। যেন সে কথা তাঁহার কানেই গেল না। ধারিণী গিন্নীপণা করিয়া রাজার হইয়া সে মাপ চাওয়ার জবাব দিলেন। তখনও জান—তিনি যা ছিলেন, অন্ততঃ তাই থাকিবেন। শেষ যখন মালবিকাকে দেবী কল্পার কথা

হইল, তখনও রাণী গিন্নীপণা করিতেছেন ; কিন্তু যখন দেখিলেন, সব লোক ‘দেবী দেবী’ বলিয়া নূতন রাণীকে খুসী করিতেছেন, তখন ধারিণীর দশাটা কি হইল? তিনি ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া সকলের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কালিদাস “দেবী পরিজনমবেক্ষতে” এই কয়টি কথার যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা একখান বই লিখিয়াও শেষ করা যায় না। এ সমস্তের মধ্যে সার কথা—“পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়।”

বিক্রমোর্কশীতেও এই কথা। রাজা প্রকাণ্ড হৃদয় অশুরের হাত থেকে তোমায় উদ্ধার করিয়াছেন। তুমি উর্কশী তাঁহার প্রণয়াকাজিকী হইতে পার। তিনি বীর, রমণী-রত্ন বীরেরই ভোগ্য। সে ত বেশ কথা। তুমি রাজাকে ভালবাস। কিন্তু তুমি অঙ্গরা, স্বর্গের বোকা ; নৃত্য করা, নাটক অভিনয় করাই তোমার কাজ। তুমি আপন কাজে অমনোযোগ করিবে, যে তোমার মনিব, সে তাহা সহিবে কেন? লক্ষ্মীস্বয়ংবর নাটকে তুমি লক্ষ্মী সাজিবে, স্বয়ং ভরত মুনি ষ্টেজ-মানেজর। তোমায় লক্ষ্মীর পার্ট দিয়াছেন আর তুমি কি না রাজার তনয় হইয়া, পুরুষোত্তম বনিতে পুরুষ বা বলিয়া বসিলে। ইহার শাস্তি ত তোমায় পাইতেই হইবে। শাস্তি হইল—মনুষ্যালোকে তোমার বাস। তুমি ত ভাবিলে, আমার শাপে বর হইল ; কিন্তু ভাব দেখি, চিরকাল যদি তোমায় মনুষ্যের মধ্যে বাস করিতে হইত, কত কষ্ট হইত। পুরুষ বা ত মানুষ—এক দিন মরিবেই। তার পর তুমি ত অমর, এই পৃথিবীতে বসিয়া একেলা নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবে। ভাগ্যে ইন্দ্র তোমার সহায় ছিলেন, তাই তোমার শাপের একটা অবসানের কথা বলিয়া দিলেন। রাজা পুত্রমুখ দেখিলেই তোমার আবার স্বর্গে আসা হইবে।

শকুন্তলায়ও ঐ কথা। কিন্তু শকুন্তলা কালিদাসের বেশী বয়সের লেখা। ইহাতে সব কোমল। এত কোমলতা অন্য জায়গায় অল্পই দেখা যায়। রাজা কোমল, শকুন্তলা কোমল, দুটি সখী—অনঙ্গা আর প্রিয়ংবদা, কোমলতার প্রতিমূর্তি। বুড়ী গৌতমীও কোমলতারানি। আর কান্তপ শকুন্তলার পালক পিতা। আহা ! তাঁহার কোমলতার লোকের হৃদয় গলিয়া যায়। যে কেহ মেয়ে খণ্ডরবাড়ী পাঠাইয়াছে, সেই জানে, বহুকাল লালন-পালন করিয়া আপন মেয়েকে পরের হাতে দেওয়া কত কষ্ট। সুতরাং সে যদি কখন মূনির ব্যাপার দেখে, কাঁদিয়া আকুল হয়। যে নাটকে কোমলতার এত ছড়াছড়ি, তাহার মধ্যে উপদেশ আছে, কঠোরতা আছে, কাহারও মনেই হয় না। পড়িবার সময় সে কঠোরতা একেবারেই দেখা যায় না। সব কোমলতার ঢাকিয়া যায়। কিন্তু সে কঠোরতা বড়ই কঠোর ;—অত্যন্ত কঠোর। ভাসা ভাসা দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া আরও কঠোর। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিয়া লইতে হয় বলিয়া আরও কঠোর।

এত কোমলতার মধ্যে কথ মূনি যে শকুন্তলাকে অতিথিসংকারের ভার দিয়া তীর্থ-যাত্রা করিয়াছেন, সে কথাটা কাহারও মনেই থাকে না; থাকিলেও রাজার প্রতি আতিথ্য দেখিয়াই শকুন্তলার কার্য যে খুব কোমল ও ভাল, এইরূপই মনে হয়। প্রিয়ংবদা রাজার সামনে শকুন্তলাকে বলিলেন, “আজি যদি আমি এখানে থাকিতেন?” শকুন্তলা বলিলেন, “তাহা হইলে কি হইত?” উত্তর হইল, আপনার জীবিতসর্বস্ব দিয়াও অতিথির সংকার করিতেন। তবেই রাজার প্রতি শকুন্তলার যে টান, সেটার ভিতর আতিথ্যও একটু আছে। এমন সুন্দর আতিথ্য !! কিন্তু এক জায়গায় আতিথ্য করিয়া যখন শকুন্তলা আত্মচিন্তায়, অতিথি-চিন্তায়, শ্রেম-চিন্তায় মগ্ন, সেই সময় আর এক অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আর কেহ নন, স্বয়ং দুর্কীসা; আর্য্য-সমাজের, ভারত-সমাজের, হিন্দু-সমাজের কঠোরতার প্রতিমূর্তি। তাঁহার কাছে পান হইতে এতটুকু চুপ থসিবার ঘো নাই। তাঁহার ভয়ে সকলেই কম্পবান্। যুধিষ্ঠির কম্পবান্, রাম কম্পবান্, ভারত শুদ্ধ কম্পবান্। কালিদাস সেই কঠোর দুর্কীসাকে কোমলতাময়ী শকুন্তলার সম্মুখে অতিথি ভাবে উপস্থিত করিয়া দিলেন। তিনি আশ্রমদ্বারে আসিয়া বলিলেন, —“অন্নমহং ভো”—“এই আমি গো।” মন্থ বলেন, এই কয়টি কথা বলিয়া কেহ গৃহ-দ্বার দাঁড়াইলেই গৃহস্থকে বুঝিতে হইবে, অতিথি আসিয়াছেন। অতিথি আর দুই বার বলিবে না; দুর্কীসা আর দ্বিতীয় বার “অন্নমহং ভো” বলিলেন না। একটু অপেক্ষা করিয়াই যখন দেখিলেন, শকুন্তলা কোন উত্তর দিলেন না—অন্তর্ধান করিলেন না, তখন একেবারেই কঠোর শাপ দিয়া বসিলেন, আর দাঁড়াইলেন না। কি ভয়ানক শাপ! “তুমি বাহার জন্ত ভাবিতে বসিয়া আমার মত অতিথিকেও দেখিতে পাইলে না, সে বুঝাইয়া মনে করাইয়া দিলেও তোমার কথা স্মরণ করিবে না।” শকুন্তলার সব শ্রেম, সব আশা ফুরাইয়া গেল। এই ত গেল কাজে হেলা করার শাস্তি। শাস্তিটা বড়ই গুরুতর হইল। শকুন্তলা যে নিষ্ঠার বালিকা, সে যে অতিথি-সংকারে নূতন ব্রতী, দুর্কীসা সে সব কথা মনেই আনিলেন না। তিনি অতিথিসংকারের ব্যত্যয় দেখিলেন, অমনি শাপ দিলেন। প্রিয়ংবদা আসিয়া দুর্কীসাকে একটু নরম করিয়া, দুর্কীসার পারে ধরিয়া, একটা শাপের অবসান করিয়া লইলেন। কিন্তু সে কথার এখন আমাদের কাজ নাই।

আর কঠোর কথ মূনি নিজে। তিনি আসিয়া যেমন শুনিলেন, শকুন্তলার সঙ্গে রাজার গাফিলি-বিবাহ, অমনি শকুন্তলাকে আশ্রম হইতে তফাৎ করিয়া দিবার সংকল্প করিলেন। তিনি সন্ধ্যার সময় এই কথা শুনিলেন, তৎক্ষণাৎ শকুন্তলাকে ষড়রবাড়ী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ভোর হইবার পূর্বেই তাঁহার শিষ্য

বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—“বেলা দেড়িবার দ্বিত্য ভগবান্ কাণ্ডে আমায় আদেশ করিয়াছেন।” তাহাতে বোধ করিতে হইবে যে, যেন রাতে কণ্ঠ মূনির ঘুম হয় নাই। তিনি ভোর হইবার পূর্বে শিষ্যদিগকে উঠাইয়া দিয়াছেন। যদি বল, কণ্ঠ যে এত কঠোর, তুমি জানিলে কিরূপে? তিনি ত নিজের কঠোরতার একটিও কথা বলেন নাই। যখন তিনি শকুন্তলার গান্ধার্ব-বিবাহের কথা শুনিলেন, তিনি কতই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মেয়ে বিনায় করিবার সময় তাঁহার গলা ধরিয়া গেল, চক্ষু বাষ্পময় হইয়া উঠিল। তবুও তুমি তাঁহাকে কঠোর বল কেন? বলি তাঁহার কাজ দেখিয়া। তিনি বিদায় দিবার পূর্বে শকুন্তলার সঙ্গে দেখাই করিলেন না। শুনিবামাত্র শিষ্যদিগকে যাত্রা করিবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। এ সকল কি বড় কোমলতার কথা? বলিবে—না, তা কেন? শকুন্তলা রাজার বিরহে কাতর, তাই শকুন্তলাকে রাজার কাছে যত শীঘ্র পাঠান যায়, তাহারই চেষ্টা করিলেন। ইহাতে কঠোরতা না হইয়া কোমলতাই প্রকাশ পায়। এ কথা সত্য বটে, তবে কি না, সন্ধ্যায় শুনিলেন, আর সকালেই মেয়ে পাঠান, একটু তাড়াতাড়ি হয় না? আর এক কথা, তপোবন-বিরুদ্ধ কাজ করিলে, যে করে, তাহাকে শাসিয়া এক মুহূর্তও আশ্রমে রাখেন না। দেখ না, বিক্রমোর্কশীতে আয়ু বধনই শকুনটা বাণ মারিয়া মারিয়া ফেলিল, তখনই চাবন শাসি বলিলেন, এ তপোবন-বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছে, ইহাকে আর এখানে রাখা যায় না। তাই তৎক্ষণাৎ সত্যবতীর সঙ্গে দিয়া তাহাকে উর্কশীর কাছে পাঠাইয়া দিলেন। এও তাই, শকুন্তলাকে পাঠাইতেই হইবে, আর রাখা যায় না। তবে কঠোর কাজ যদি কোমল কথায় করা যায়, দোষ কি? বরং তাহাতে গুণই আছে। কাজটা কঠোর, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

শকুন্তলা দুর্কীসার কাছে অপরাধী, তাই তাহার শাপ। তিনি কণ্ঠের কাছে অপরাধী, তাই আশ্রম হইতে তাঁহার বিতাড়ন। দুটাই বড় কঠোর।

কণ্ঠের এই কঠোরতার আর এক প্রমাণ এই যে, শকুন্তলার যাওয়ার পর কণ্ঠ আর তাঁহার কোনই খোঁজ রাখেন নাই। মারীচের আশ্রমে যখন ছদ্মস্ত ও শকুন্তলার মিলন হইয়া গেল, তখন দেখা গেল, কোমলহৃদয়া মাতা মেনকা সেইখানেই উপস্থিত আছেন। কিন্তু কণ্ঠ! অদিতি বলিলেন, কণ্ঠকে খবর দেওয়া যাউক। তাহাতে মারীচ বলিলেন, তাঁহাকে আর খবর দিবার দরকার কি? তিনি তপঃপ্রভাবেই সব জানেন। রাজার ভয় ছিল—শকুন্তলাকে ত্যাগ করায় কণ্ঠ মূনি তাঁহার উপর চটিয়া আছেন। তাই তিনি বলিলেন, “তবে বোধ হয়, তিনি

আমার উপর বেশী রাগ করেন নাই।” তখন মারীচ বলিলেন, “তথাপি আমাদের তাঁহাকে শ্রদ্ধা-সম্ভাষণ করা চাই।” এই বলিয়া তিনি একজন শিষ্যকে ডাকিয়া কথের নিকট খবর পাঠাইলেন।

ঐ যে একটি “তথাপি” শব্দ আছে, উহাতে বেশী জানা যায় যে, কথ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। আশ্রম হইতে যাওয়ার পর শকুন্তলার কি হইল, তিনি তাহার কোনই খোঁজ লয়েন নাই; তাহা লইবার বড় ইচ্ছাও নাই; তবে তিনি শকুন্তলাকে পালন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে শকুন্তলার মঙ্গলকালে খবর দেওয়া মারীচের উচিত, তাই মারীচ তাঁহাকে খবর পাঠাইলেন।

কালিদাস এই কঠোরতা কেমন লুকাইয়া রাখিয়াছেন। একেবারেই একটিও কঠোর শব্দ ব্যবহার করেন নাই, বরং কঠোরকে কেমন কোমল করিয়াছেন। কাজে কঠোর, কিন্তু মুখে কোমল হইলে সংসারে তাহাকে ভণ্ড বলে—পছন্দ করে না। কিন্তু নাটকে সেটি কেমন সুন্দর হইয়াছে। আর সেইটিকে সাজাইতে কালিদাস কত গুণপনা দেখাইয়াছেন। লোকে একরূপ লোককে ভণ্ড লোক বলে বনুক; কিন্তু যে কাজে ঠিক থাকে, কথায় কাহারও মনে ব্যথা দেয় না, তাহাকেই আমরা প্রকৃত মনুষ্য বলিয়া মনে করি। কালিদাস প্রকৃত মানুষ কাহাকে বলে জানিতেন এবং তাই হইবার জন্য আমাদের উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

একটি মোকদ্দমার রায়

চলতি ভাষা—বনাম সাধুভাষা

একদাস—

শ্রীল শ্রীযুক্ত সার্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

কে, টি ; এল, এল, ডি, সাহিত্য-সম্রাট ।

বাদী-পক্ষে —

মিঃ পিঃ চৌধুরী, বার-এটু-ল

তরফ সবুজপত্র ভারতী এণ্ড কোং ।

প্রতিবাদী-পক্ষে—

মিঃ সি, আর, দাস, বার-এটু-ল

তরফ নারায়ণ ঢাকা রিভিউ এণ্ড কোং ।

বাদী-পক্ষের নালিসের মর্ম এই :—বাঙ্গলা-সাহিত্যে সাধুভাষা নামে যে একটি ভাষা বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে নিতান্তই অসাধু ।

(১) তাহার ভঙ্গটাই অস্বাভাবিকরূপে হইয়াছে, সুতরাং তাহাকে আইনের ভাষায় illegitimate বলা যায় ।

(২) তাহার চাল-চলনও নিতান্ত অস্বাভাবিক অর্থাৎ কৃত্রিম । বাহা মানুষের জীবনে কখনও সত্য নহে, এই সাধু ভাষায় তাহা সত্য বলিয়া চলিতেছে । “করিলাম,” “খাইলাম,” “চলিলাম,” “করিতে পারিব না” ইত্যাকার কথা কোনো দেশের লোকেই জীবনে ব্যবহার করে না । সাধুভাষা অবাধে এই সব মেকি যুজ্জা সাহিত্যে চলাইতেছে ।

(৩) যে সকল শব্দ খাঁটি সংস্কৃত, সেগুলির মধ্যে সামান্ত পরিমাণে বাঙ্গলার খাদ মিশাইয়া এই সাধুভাষা বাজারে চলাইয়া আসিতেছিল । বিদেশী সাহেবদের একপভাবে প্রতারণা করা খুব সহজ ছিল, কিন্তু পরে তাহা ধরা পড়িয়াছে ।

(৪) বাঙ্গলার বাস্তবতাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁট-গাড়ি করিয়া এই সাধুভাষা সীমানা অতিক্রম করার অপরাধ করিয়াছে ।

(৫) বাঙ্গলার রাজধানীতে প্রচলিত স্বাভাবিক ভাষার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সাধুভাষা রাজদ্রোহের অপরাধ করিয়াছে ।

(৬) বর্তমান সাহিত্য-সম্রাট চন্ডি ভাষার যে পথ তৈরি করিয়া দিয়াছেন, সাধু-ভাষা তাহার বিরুদ্ধ পথে চলিয়া অর্থাৎ বাদহাটা মিলাইয়া রাজদ্রোহের অপরাধ করিয়াছে ।

(৭) সাধুভাষা এখন মৃতভাষার সামিল হইয়াও প্রতারণা পূর্বক নিজকে জীবিত ভাষা বলিয়া পরিচয় দিয়া বঙ্গদেশ দখল করিয়া বসিয়া আছে । এই সমস্ত কারণে সাধুভাষার দখল উচ্ছেদ করিয়া চন্ডি ভাষাকে সাহিত্য-ক্ষেত্রের ডিক্রি দেওয়ার প্রার্থনা ।

ইহার উত্তরে প্রতিবাদী-পক্ষের জবাব এই :—১ম,—সাধুভাষা ৬০ বৎসরের অধিক কাল বঙ্গ-সাহিত্য দখল করিয়া আছে, সুতরাং বাদীর দাবী তামাদি দোষে বারিত ।

২য়,—সাধুভাষাকে illegitimate বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহার জন্মদাতা স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানগর ।

৩য়,—“করলাম,” “খাইলাম,” “চললাম” ইত্যাদি মেকি মুদ্রা নহে ; এ সব পূর্বতন রাজাদের ছাপ-মারা খাঁটি মুদ্রা, এবং বাদসাহী মোহরের মত এগুলি বঙ্গ, বেহার, উড়িষ্যা—এমন কি, সমস্ত ভারতবর্ষে অব্যাহত চলিতেছে । এই সব খাঁটি মুদ্রা ভাঙ্গিয়া স্থানভেদে “কলুম,” “খেলুম,” “চলুন” ইত্যাদি যে সব মুদ্রা চালাইবার চেষ্টা করা হইতেছে, এইগুলি মেকি । কারণ, ইহারা সব জায়গায় চলে না, সুতরাং অচল ।

৪র্থ,—বঙ্গভাষা উত্তরাদিকারস্থত্রে তাহার পৈতৃক আমলের সংস্কৃত শব্দরূপ খাঁটি সোনার যে সব অলঙ্কার পাইয়াছে, সেগুলি ত ফেলিয়া দিতে পারে না । সেই সব ভারি ওজনের অলঙ্কার কিছু কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া হাল ফাসন অহুসারে হালকা করিয়া লইয়া পরিত্যক্ত । ইহাতে প্রতারণা হইল কিরূপে ?

৫ম,—বাক্যের বাস্তবিকতা যদি “শব্দ” পতিত থাকে, তবে সংস্কৃত বৈয়াকরণের দল অবশ্যই তাহাকে “দাহ” করিতে আসিবে, এমন কি, বেড়া ভাঙ্গিয়াও আসিবে ; ইহাতে “মনোকষ্ট” করিলে চলিবে না । কারণ, বাক্যের শব্দে বাক্যেরই অধিকার । আর সেই বাস্তবিকতা যদি “মড়া” কিংবা “লাস” পড়িয়া থাকে, তবে তুমি ইচ্ছা করিলে তাহা পোড়াইয়া ফেলিতে পার কিংবা মাটিতে কবর দিতে পার । সুতরাং সংস্কৃত বৈয়াকরণের দলের সীমানা অতিক্রমের অপরাধ হইতে পারে না ।

৬ষ্ঠ,—বাক্যের রাজধানী এখন কলিকাতায় আছে, আবার কখনও দার্জিলিং বাইতেছে, কখনও বা ঢাকায়, চট্টগ্রামে বাইতেছে । অর্ধেক বাক্যের রাজধানীতে এক কলমের খোঁচার পাকাপাকিভাবে একবার ঢাকাতে গিয়াছিল, আর এক কলমের

খোঁচায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। আবার ভারতের রাজধানী ত এক কলমের খোঁচায় কলিকাতা ছাড়িয়া দিল্লীতে চলিয়া গেল। এরূপ অবস্থায় স্থায়ী সাহিত্যের ভাষা কিরূপে রাজধানীর সঙ্গে সঙ্গে চলিষ্ণু হইবে? ✓

৭ম,—সাধুভাষা এখনও মরে নাই; কারণ, এখনও কথা कहিতেছে। সে বৎসর বৎসর বাঙ্গলা ভাষার প্রকাশিত প্রায় সমস্ত পুস্তক, মাসিক পত্রিকা ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার মধ্য দিয়া কথা কহে। যে কথা কহে, তাহাকে তীরস্থ করিতে পার, কিন্তু দাহ করা সম্ভব নহে।

ইস্র।

বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষের উক্তি বিশেষরূপে পর্যালোচনা পূর্বক নিম্নলিখিত ইস্র ধার্য করা হইল :—

(ক) বাদীর দাবী তামাদি দোষে বারিত কি না?

(খ) সাধুভাষা Illegitimate কি না?

(গ) সাধুভাষা চোরামাল চালাইয়া ধরা পড়িয়াছে কি না?

(ঘ) সাধুভাষা বাঙ্গলা বাস্তবিকতার মধ্যে খুঁটগাড়ি করিয়া অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছে কি না?

(ঙ) কলিকাতা রাজধানীর ভাষা সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যে চলিবে কি না?

(চ) সাধুভাষা মরিয়াছে কি না?

(ছ) যদি মরিয়া থাকে, তবে ত কোনই গোল নাই; আর কোন ইস্র বিচার না করিলেও চলিবে। যদি না মরিয়া থাকে, তবে বাদীর দাবী ডিক্রি হওয়ার যোগ্য কি না?

(জ) বাদী আর কি প্রতীকার পাইতে পারে?

রায়।

এই সকল ইস্র বিচারের পূর্বে আমার ব্যক্তিগতভাবে একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। আমি জানিতে পারিলাম, আমার অনুপস্থিতিকালে আমার কোনো কোনো অনুচর এই প্রকার মত প্রচার করিয়াছে :—

“বর্তমান সাহিত্য-রথী যে-পথ তৈরি ক’রে দিচ্ছেন, সে-পথে তোমার আমার মতো সামান্ত কারবারিকে চলতেই হবে।” (ভারতী—আষাঢ়, ১৩২৩)

অনেক সময় দেখা যায়, বাঁশের চেয়ে কক্কী দড়, আবার জমিদার ও রাজার পেয়াদা-বরকন্দাজদিগকে ধরিয়া আনিতে বলিলে তাহারা বাঁধিয়া আনে। বলা বাহুল্য, আমি আমার অনুচরদিগের এরূপ জুলুমবাজিতে নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছি।

আমি কখনও চলতি ভাষার রাজপথ দিয়া কারবারোদিগকে মাল চালাইতে বাধ্য করিবার জন্ত কাহাকেও পাহারাওয়ালার নিষ্কৃত করি নাই। আমি স্বাধীন বাণিজ্যের বরাবরই পরপাঠী, এ জন্ত পশ্চিমদেশ হইতে নূতন নূতন ভাব আমদানি করিয়া আমি আমার অনেক রচনার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছি। আবার এ দেশের বৈষ্ণব কবিদের অনেক ভাষা আমার ‘গীতাঞ্জলি’র মধ্য দিয়া পশ্চিম দেশে চালাইয়াছি। “আমি ছোট বেলা হইতে সাহিত্য-রচনার লাগিয়াছি।” “যে ভাষা পুঁথিতে পড়িয়াছি, সেই সেই ভাষাতেই চিরদিন পুঁথি লিখিয়া হাত পাকাইয়াছি।” “ক্ষণিকায় আমি প্রথম ধারাবাহিকরূপে প্রাকৃত বাঙ্গলা ভাষা ও প্রাকৃত বাঙ্গলার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, ক্ষণিকায় আমি কোনো পাকা মত খাড়া করিয়া লিখি নাই, লেখার পরেও একটা মত যে দৃঢ় করিয়া চলিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। আমার ভাষা রাজাসন এবং রাখালী, মথুরা এবং বৃন্দাবন কোনোটার উপরেই দাবি সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই।” তাহার প্রমাণ, আমি মথুরার রাজাসনে বসিয়া এই যে রায় লিখিতেছি, ইহাতে সাধুভাষাই ব্যবহার করা উচিত মনে করি। আবার যখন আমি বৃন্দাবনে রাখালী করিতে গিয়া “ঘরে বাইরে” করিয়াছিলাম, অর্থাৎ যখন আমার মধুর বংশীরব শুনিয়া গোপললনাগণ ঘরের বাহিরে ছুটিয়া আসিত, তখন আমি প্রাকৃত ভাষারই আশ্রয় লইয়াছিলাম। এতদ্বারা প্রমাণ হইল যে, সাধুভাষা এখনও মরে নাই, সুতরাং (চ) নম্বর ইস্তি প্রতিবাদীর পক্ষে নিষ্পত্তি করা হইল।

এখন বাদীর দাবী তামাদি হইয়াছে কি না, এই ইস্তির বিচার করা যাক। রাজনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে Settled fact বলিয়া কিছু নাই। আর এ বিষয়ে একটা প্রবল নজিরও রহিয়াছে। বাংলা ভাষার পয়ার ছন্দ তিন চারি শত বৎসরেরও অধিক কাল একাধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্ত অবাধে সেই পয়ারকে বে-দখল করিয়া তাঁহার যেষদাদবধ কাব্যে অল্প আর এক নূতন ছন্দ চালাইলেন। এই নজিরের বলে, বাদীর দাবী তামাদি দোষে বারিত নহে। সুতরাং (ক) ইস্তি বাদীর পক্ষে নিষ্পত্তি করা হইল।

(খ) ও (গ) নম্বর ইস্তির বিচার এক সঙ্গে করা যাইতেছে। সাধুভাষার জন্ম কিরূপে হইল, তাহার আলোচনা করিলে দেখা যায়, “বাংলা গল্প সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর করমাসে, এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে বাদীর ভাস্কর-ভাস্কর্যের সম্বন্ধ। যদি স্বভাবের তাগিদে বাংলা গল্প সাহিত্যের সৃষ্টি হইত, তবে এমন গড়া-পেটা ভাষা দিয়া তাহার আরম্ভ হইত না। প্রাকৃত বাংলা বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে প্রয়োজনমত সংস্কৃতের ভাণ্ডার হইতে আপন অভাব দূর করিয়া লইত। কিন্তু বাংলা গল্প সাহিত্য তাহার ঠিক উন্টা পথে চলিল। গোড়ার

দেখি তাহা সংস্কৃত ভাষা, কেবল বাংলার নামে চালাইবার জন্য কিছু সামান্য পরিমাণে বাংলার শব্দ মিশ্রণ করা হইয়াছে। এ এক রকম ঠকানো। বিদেশীর কাছে এ প্রতারণা সহজেই চলিয়াছিল,” কিন্তু দেশী লোকের হাতে ইহা ক্রমে ধরা পড়িল। এই জুয়াচুরি প্রথমে ধরিলেন টেকচাঁদ, তিনি “আলালের ঘরে ছলান” লিখিয়া ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু তখনও সেই ঠগের সর্দার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জীবিত ছিলেন, কাজেই টেকচাঁদ বেশী দিন টিকিতে পারিলেন না। সেই বিখ্যাত ঠগের ভয়ে, এমন কি, আমার পূর্ববর্তী সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও প্রথমতঃ এই প্রতারণাতে যোগদান করিতে হইয়াছিল। তিনিও বাংলা নাম দিয়া নিছক সংস্কৃত ভাষার “হর্গেশ-নন্দিনী,” “কপালকুণ্ডলা” প্রভৃতি লিখিতে আরম্ভ করেন। পরে তিনি সেই সাধুভাষার সঙ্গে অনেকটা ত্যাগ করিয়া সংপথে আসিয়াছিলেন। বাহারা ঋণদায়ে বিব্রত, তাহাদিগকেই অনেক সময়ে অসহ্যায় অবলম্বন করিতে দেখা যায়। “অল্প মূলধনে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মুনকার সঙ্গে সঙ্গে মূলধনকে বাড়াইয়া তোলা—ইহাই ব্যবসার স্বাভাবিক প্রণালী। কিন্তু বাংলা গণের ব্যবসা মূলধন লইয়া শুরু হয় নাই, মস্ত একটা দেনা লইয়া তার শুরু।” সাধুভাষা সংস্কৃত ভাষার উত্তরাধিকারী, ইহার কোনো Succession certificate দাখিল করা হয় নাই। অতএব সাধুভাষার সেই দেনাটা খোলসা করিয়া দিয়া স্বাধীনভাবে কারবার চালান কর্তব্য। এইরূপে (খ) ও (গ) সংখ্যক ইস্যু বাদীর অমুকুলে যৌমাংসা করা হইল।

এখন সেই অনধিকার-প্রবেশের কথা। বাংলার বাস্তব্ধিটার সীমানা লইয়া কিছু-কাল হইল বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। জরিপ-জমাবন্দী ভিন্ন এই সীমানা নির্দেশ করা কঠিন। পূর্বে যে চেষ্টাও যে না হইয়াছে, একরূপ নহে। “সংস্কৃত বৈয়াকরণের উপর যখন জরিপ-জমাবন্দীর ভার পড়ে, তখন একেবারে বাংলার বাস্তব্ধিটার মাঝখানটাতে; সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটগাড়ি হয়, আবার অপর পক্ষের উপর যখন ভার পড়ে, তখন তাঁরা বাংলার সংস্কৃত বিভাগে একেবারে দক্ষয়জ্ঞ বাধাইয়া দেন। এখন আমাদের ভাষা-বিচ্ছেদের উপর সাঁড়া-ত্রিঙ্ক বাধা হইয়াছে। এখন আমরা মুখের কথাতেও নূতন পুরাতন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করি, আবার পুঁথির ভাষাতেও এমন শব্দ চলিতেছে—পূর্বে সাধুভাষায় যাদের জলচল ছিল না। আসল কথা, সংস্কৃত ভাষা যে অংশে বাংলা ভাষার সহায়, সে অংশে তাহাকে লইতে হইবে; যে অংশে বোঝা, সে অংশে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু যত দিন বাংলা বইয়ের ভাষা চলিত ভাষার ঠাট না গ্রহণ করিবে, তত দিন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সত্য সীমানা পাকা হইতে পারিবে না।” অতএব (ঘ) সংখ্যক ইস্যুর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখন না করিয়া, সীমানা-নির্দেশের জন্য উপযুক্ত কমিশন নিযুক্ত করিতে আদেশ দিলাম।

কিন্তু বাদী-পক্ষের সুবিজ্ঞ কোন্সিল্ মিঃ চৌধুরী বলেন,—“বেচারী পুঁথির ভাষার প্রাণ কাঁদিতেছে, কথার ভাষার সঙ্গে মাল্য-বদল করিবার ক্ষমতা, কিন্তু গুরুজন ইহার প্রতিবাদী।” এই অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে আমি সেই গুরুজনদিগকে নিশ্চয়ই জামিন-মুচলিকার আবদ্ধ করিব। তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষে মিলন হইয়া যাইবে, আর কমিশন নিযুক্ত করার প্রয়োজন হইবে না।

কলিকাতা রাজধানীর ভাষাই কি তবে বঙ্গ-সাহিত্যের ভাষা হইবে, এখন এই ইস্যুর বিচার করিতেছি।

“যারা প্রতিবাদী, তাঁরা এই বলিয়া তর্ক করেন যে, বাংলার চলিত ভাষা নানা জেলায় নানা ছাঁদের, তবে কি বিদ্রোহীদিগের দল (অর্থাৎ বাদীপক্ষ) একটা অরাজকতা-ঘটাইবার চেষ্টায় আছে? ইহার উত্তর এই যে, যে যেমন খুসি আপন প্রাদেশিক ভাষার পুঁথি লিখিবে, চলিত ভাষার লিখিবার এমন অর্থ নয়।” যত সব মফঃস্বলবাসী লেখককে কলিকাতার আসিয়া কিছুকাল বাস করিয়া কলিকাতার প্রাদেশিক ভাষা, মায় তাহার খাঁটি উচ্চারণ শিখা করিতে হইবে—কারণ, আমার আদেশে উচ্চারণ অনুসারেই শব্দের বানান করিতে হইবে। এই জন্য আমি বাঙলা হইতে “জ”কে নির্দাসিত করিয়া তাহার স্থানে ‘অনুস্বার’ অথবা ব্যাঙের ঠ্যাঙের “ঙ” বসাইয়াছি। তবে তাই বলিয়া “কলিকাতার যে একটা স্বকীয়া অপভ্রাশা আছে, বাহাতে “গেহু,” “করহু” ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয় এবং “ভেরের বে,” “চেলের দাম” প্রভৃতি অপভ্রংশ প্রচলিত আছে, সেই ভাষাও সাহিত্যে অচল।” কারণ, বৈষ্ণব কবিগণের মতে “স্বকীয়া” অপেক্ষা “পরকীয়ার” রস-মাধুর্য্যই খুব বেশী। প্রতিবাদী-পক্ষের সুবিজ্ঞ কোন্সিল্ মিঃ দাস বোধ হয়, সেই রস-মাধুর্য্য সংশ্রুতি বিশেষরূপে আশ্বাদন করিয়াছেন, সেই জন্য তিনি বলেন, বৈষ্ণব কবিগণের পরে আর বাংলার গীতিকবিতা হয় নাই। বাহা হউক, এই স্বকীয়া ও পরকীয়ার সীমা কে সুনির্দিষ্ট করিয়া দিবে? তার উত্তর এক কথায় দিতেছি—প্রতিভাবান্ লেখক অর্থাৎ আমি। তবে এই “আমির” সামিল আমার ছুই একটি অনুচরও প্রতিভাবান্ বলিয়া গণ্য হইবে। আর বাদীর কোন্সিল্ মিঃ চৌধুরী, যিনি বহু কাল ধাবৎ কি না লইয়া বাদীপক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার প্রতিভা থাক বা না থাক, তাঁহাকেও এই অধিকার দেওয়া হইল। কলিকাতার ভাষা বঙ্গসাহিত্যে কেন চলিবে, তাহার একটা স্বাভাবিক কারণও আছে। কলিকাতা বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নীচু জায়গা। “দিকে দিকে বর্ষণ হয়, কিন্তু জমির ঢাল অনুসারে একটা বিশেষ জায়গায় তার জলাশয় তৈরি হইয়া উঠে। এই স্বাভাবিক কারণেই কলিকাতা অঞ্চলে

একটা ভাষা জমিয়া উঠিয়াছে। তাহা বাংলা সকল দেশের ভাষা।” অর্থাৎ “তাহা বাংলা রাজধানীতে সকল দেশের মণিত একটা ভাষা।”

“আমাদের পাক-যন্ত্রে নানা ধাতু আসিয়া রক্ত তৈরি হয়, তাহাকে বিশেষ করিয়া পাক-যন্ত্রের রক্ত বলিয়া নিন্দা করা চলে না, তাহা সমস্ত দেহের রক্ত। রাজধানী জিনিসটা স্বভাবতঃ দেশের পাকযন্ত্র। এইখানে নানা ভাব, নানা বাণী এবং নানা শক্তির পরিপাক ঘটতে থাকে এবং এই উপায়ে সমস্ত দেশ প্রাণ পায় ও ঐক্য পায়।” বাংলার ভিন্ন ভিন্ন জিলার প্রাদেশিক ভাষাসমূহ কি প্রকারে কলিকাতার আসিয়া মণিত হইয়া এই রাজকীয় চলতি-ভাষার উৎপাদন করিতেছে, তাহা নিয়ে একটি চিত্র দিয়া বুঝান যাইতেছে।

প্রাদেশিক ভাষাসমূহ।

“আমি কর্তে পারবো না”	(নদীয়া)	} “আমি কোর্তে পার্কো না”
“আমি কর্তি পারবো না”	(যশোর)	
“আমি কর্তে পারমু না”	(ঢাকা)	
“আমি কর্তাম্ পার্তান্ না”	(ময়মনসিং)	
“আমি হর্তাম্ হর্তাম্ ন”	(নোয়াখালী)	

সাধুভাষার অবশ্য লেখা হয়—“আমি করিতে পারিব না।” নদীয়ার ভাষা মৌখিক উচ্চারণে এই সাধুভাষা ভাঙ্গিয়া হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অথবা গ্রিয়ারসন্ সাহেবের মতে পণ্ডিতপ্রধান নদীয়ার চলতি ভাষা হইতেই সাধুভাষার উৎপত্তি। কিন্তু কলিকাতা নদীয়ার খুব নিকটবর্তী হইলেও রাজধানীর চলতি ভাষা নদীয়ার ভাষার স্তায় সাধারণভাবে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ম্যাকবেথ নাটকে বর্ণিত ডাইনীদিগের ঔষধ জাল-দেওয়া কড়ার মত খুব প্রকাণ্ড কড়ার (Coldren) নানা-দেশীয় প্রাদেশিক ভাষা স্মৃতি ও স্মৃপক হইয়া কলিকাতার “আমি কোর্তে পার্কো না” এই রাজকীয় চলতি ভাষা নিষ্কাশিত হইয়াছে। কলিকাতার কুমারটুলি অঞ্চলে আমি একরূপ বড় বড় কড়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, কলিকাতার এই “আমি কোর্তে পার্কো না”কে রাসায়নিক যন্ত্রসাহায্যে বিশ্লেষণ করিলে ইহার মধ্যে নোয়াখালির সেই “আমি হর্তাম্ হর্তাম্ ন” বীজভাবে ধরা পড়ে। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াবোলে তৈরি রাজধানীর চলতি ভাষা কালে ডিঃ গুপ্তের আয়কের স্তায় সমগ্র বঙ্গদেশে বোতলে বোতলে প্রচলিত হইলে, বঙ্গসাহিত্যের ম্যালে-

বিশ্রাজনিত কীণতা ও হুর্দলতা দূর হইয়া ইহার জীবনী শক্তি বাড়িবে এবং ইহাকে সবল করিবে ।

কিন্তু কলিকাতার এই চলতি ভাষা ঢালাইবার জন্ত এত ব্যস্ত হইলে চলিবে না । ইহা সময়সাপেক্ষ । “আমরা বাংলাসাহিত্যে আজ যে ভাষা ব্যবহার করিতেছি, তার একটা বীধন পাকা হইয়া গেছে । অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই বীধনের প্রয়োজন আছে । নহিলে সাহিত্যে সংযম থাকে না । এ ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খল স্বৈচ্ছাচারের আশঙ্কা যথেষ্ট আছে । মিঃ চৌধুরীর কথা-মত আজকের দিনে বাংলা দেশের সকল লেখকই যদি চলতি ভাষায় সাহিত্য-রচনা শুরু করিয়া দেয়, তবে সর্ব-প্রথমে তাঁহাকেই কানে হাত দিয়া দেশ-ছাড়া হইতে হইবে, এ কথা আমি লিখিয়া দিতে পারি ।” তাহার প্রমাণ ১৩২৩ সনের আষাঢ়ের “ভারতী”র “চলতিভাষা” প্রবন্ধ । আর এক প্রমাণ, আমি ছই একটা শব্দ উচ্চারণানুসারে লিখিবার চেষ্টা করিতেছি দেখিয়া আমার অশুচরগণ বাংলা পুস্তকে “বারো আনার, ভালো জিনিষ দ্যায়” এরূপ বুড়ি বুড়ি অশুদ্ধ কথা লিখিয়া পাঠশালার ছাত্রদিগের মনে বানান-শিক্ষার প্রতি ঘোর অশ্রদ্ধা ও পণ্ডিতগণের মনে ক্রোধের সঞ্চার করিতেছে । আর “এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, সাহিত্যে আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি, ক্রমে ক্রমে তার একটা বিশিষ্টতা দাঁড়াইয়া যায় । তাহার প্রধান কারণ, সাহিত্যে আমাদেরকে সম্পূর্ণ করিয়া চিন্তা করিতে এবং সম্পূর্ণ করিয়া ব্যক্ত করিতে হয়, আমাদেরকে গভীর করিয়া অনুভব করিতে এবং তাহা সরস করিয়া প্রকাশ করিতে হয় । অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্র নিত্য-তার ক্ষেত্র । অতএব এই উদ্দেশ্যে ভাষাকে বাছিতে, সাজাইতে এবং বাজাইতে হয় ।” আমরা যাহাকে সাধুভাষা বলিয়া নিন্দা করি, তাহাও এইরূপে অনেক বাছাই করিয়া, সাজাইয়া ও বাজাইয়া তৈরি করা হইয়াছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । “এই জন্তই সাহিত্যের ভাষা যুগের ভাষার চেয়ে বিস্তীর্ণ ও বিশিষ্ট হইয়া পড়ে ।” তবে আমার শেষ কথা এই—“প্রতি-দিনের যে ভাষার খাদে আমাদের জীবন-স্রোত বহিতে থাকে, সাহিত্য আপনার বিশিষ্টতার অভিমানে তাহা হইতে যত দূরে পড়ে, ততই তাহা কৃত্রিম হইয়া উঠে । চির-প্রবাহিত জীবনধারার সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা রাখিতে হইলে তাহাকে এক দিকে সাধারণ আর এক দিকে বিশিষ্ট হইতে হইবে ।” কিন্তু ইহাও আবার দেখা যায় যে, যদি কোন ব্যক্তি ছই নৌকার পা রাখিয়া দাঁড়ায় আর তাহার একখানা নৌকা যদি স্রোতের বেগে চলিতে

থাকে এবং আর একখানা নৌকা অচল হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির পক্ষে এক পা ভুলিয়া নেওয়াই মঙ্গল। এই সকল পর্যালোচনা করিয়া আমি এই ইস্ত তরমিস্ (partial) ডিক্রি দিলাম। বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে কলিকাতায় চলতি ভাষার title (স্বত্ব) সাব্যস্ত হইল, কিন্তু possession (দখল) আপাততঃ সাধুভাষারই থাকিবে। সাধুভাষাকে চলতি ভাষা eject (উচ্ছেদ) করিতে পারিবে না। উভয় পক্ষ নিজ নিজ ধরচা বহন করিবে। ইতি। *

(স্বাক্ষর) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রিপোর্টার—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

* সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ভাষার কথা” (সবুজ পত্র, চৈত্র ১৩২৩) অবলম্বনে লিখিত।
নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি ঐষ্টব্য :—

- (১) মিঃ পি, চৌধুরীর ১৯২২ সনের রাজসাহী সাহিত্য-সম্মিলনীর অভিভাষণ।
- (২) ১৩২২ সনের আষাঢ় মাসের নারায়ণে প্রকাশিত “ভাষার কথা”।
- (৩) ১৩২২ সনের আষাঢ় মাসের ভারতীতে প্রকাশিত “চলতি ভাষা”।
- (৪) ঐ সনের ভাদ্র মাসের ঢাকা রিভিউয়ে প্রকাশিত “ঢাকার রথযাত্রা”।

দুনিয়ায় দুদিন

সেই থেকে ধরতে গেলে আমি এই দুনিয়ায় দুদিনের না ত কি ? কোথা থেকে আমি জীব কালের ঘূর্ণি চক্রে এসে পড়েছি ? এখানে আমার আস্বার ধাঁধা ভাঙতে না ভাঙতে আমার দাবার ধুম লেগে যায় । এই দুই চক্ষু মেলতে না মেলতে এই চক্ষু বোজ্বার ফেসাদে পড়ি । কাজেই এই দুনিয়ায় দিনকটা কাটাই বড় দোটানায়, নয় ত ছিটকে এসে পড়ে, ছেড়ে যেতে আর লাগে কি ? রক্ত-মাংসের টানের কথা ছেড়ে দেও না, সে সব ত আমরা জন্মের তরে বয়ে লয়ে আসি, তাদের ছাড়তে চাইলেও ছাড়তে পারে না, একেবারে দেহের সাথে গাঁথা । কিন্তু এ জগতে এসে আর যে সব টানের হেঁফায় পড়ি, তারাই ত সব গোল বাধায় । তাই বলি, বেঁচে থাকতেই আমার বাঁচোয়া নেই, ম'রে গেলে ত আরো নেই । পঞ্চেন্দ্রিয়ের যদি বা ছাড়া পেলাম ত পঞ্চভূত এসে ঘাড়ে চাপল ! আঃ ! তখন যা টানাটানি আর যা কাড়াকাড়ি ! রক্তমাংসের টান আমার লাগে ভাল, তাতে দরদ আছে, দরদীর সঙ্গে বোঝা-পড়া আছে ! কি করব, সাক্ষাৎ রূপ ছেড়ে অরূপে আমার মন বসলে ত ? তোমাদের হাসতে হয় হাস না ? জানি, সে টান একটা গণ্ডী টে'নে এই বিপুল বিশ্বমাঝে আমার কোণ-ঠেসা করে, ছোট্ট ক'রে রেখে দেয় । তা যতক্ষণ বড়র আশ্বাদ না পেয়েছি, ততক্ষণ ছোট মন্দ কিসে ? তোমরা বলছ, “ছোটর যে সকলি ছোট্রি আকার । তার প্রাণ ছোট, প্রেম ছোট, প্রিয় ছোট, স্বভাব ছোট, সাধনা ছোট, বাসনা ছোট, এই ছোট্টকে নিয়ে কার-বার করতে করতে নিজেরও যে ছোট হয়ে যেতে হয় ।” তা কি আর আমি জানি না ! সাধ ক'রে কি আর আমি এর মধ্যে বাস করি ? কি বুঝবে তোমরা বাইরের লোক, কত কত দিন আমি এই গণ্ডীর ভিতর ফুট ক'রে, সেই ফুটর ভিতরকার ছিদ্র দিয়ে এই উন্মুক্ত জগৎকে দেখে লইতে চাই । কিন্তু শক্ত গাঁথনি, কঠিন বাধন, ভাঙ্গবার ছিঁড়বার সাধ্য আমার নাই অথচ এ প্রাচীর ভেদ না করলে যে কাঁপন হয়ে মরি । রক্ত-খাসে দিন দিন আমার ক্ষয় জানুছি । তখন আর না পেরে কাঁদি, কাঁদি আর বলি “দে গো দরদি ! আমার বাধন ছিঁড়ে দে ! দে গো অগতির গতি ! আমার গতির মুখে ফেলে দে ! দে, আমার মুক্ত আকাশে ছেড়ে দে, দে, আমার বন্ধ পাখা খুলে দে, আমি আলোর দেখা পেয়ে একবার উড়ে উড়ে নৃত্য করি ।” তাই বলছিলাম, আমিও তা করি । তা ব'লে টান ত আর উপড়ে ফেলতে পারি না—তার শেকড় যে আমার সকল জুড়ে জড় বেঁকেছে, তুলতে গেলে শিয়ার শিয়ার যে টান পড়ে ; করি

কি বল ? এই বেদনার ভয়েই ত কাবু হয়ে থাকি—টানকে বহাল রেখে চলি। বা বলব, শত হ'লেও পঞ্চভূতের টানাটানির চেয়ে সে আমার স্বর্গ।

কখন যে এই পঞ্চভূত এসে আমার পেয়ে বসে, তা ঠাণ্ডা করতে পারি না, কিন্তু এদের সঙ্গে যোগাযোগ টের পাই। বিশেষ এই ক্রিতির সঙ্গে। মাটিতে চোখ পড়েছে কি আর মাটিতে পা দিতে আমার মন সরে না। মনে হয়, মাড়াতে গেলেই ব্যথা পাবে। শক্ত মাটি দেখলেই গাটা কেমন শিউরে উঠে। “আহা গো! কে জানি দাবিয়ে দাবিয়ে এর এ দশা করেছে! যখন একে খণ্ড-বিখণ্ড করতে দেখি, তখন আর চক্ষের জল রাখতে পারি না। দিনরাত এর বুক-চেরা বুক-ফাঁড়া চলছেই চলছেই; নইলে কারো খাওয়া-পরা চলে না। তার পর এ জগতের যত কিছু রসাল—যা কিছু দিল-আরামের, সবই একে কামড়ে ধরে। কাজেই আমার মাটির ভাগ মাটিকে না দিলে কারোই যে বাঁচা চলে না! তাদের ধ্বংসে তোমার জন্ম, আবার তোমার ধ্বংসে তাদের জন্ম, এই ত ব্যাপার চলেছে। সাথে কি আর শ্মশানের ভাঙ্গা আমার এত ভয়! ও ছাই দেখলেই আমার প্রাণটা কেমন আঁতকে ওঠে! আহা! এই দেব হুল্লুভ দেহ, তার ছাইয়ের স্তূপ! না হবে কেন? এ দেবালয়ের গাঁথনিই হ'ল যে মাটির, সেই মাটিই যে সব মাটি ক'রে দেয়—রক্তমাংস যা কিছু! “কেমন করে” তা কি আর বোধ-বার বো আছে? আগে-ভাগেই যে চোখের মাথা খাইয়ে বসে! তখন মাটি শয্যা, মাটি সজ্জা, মাটিতে মিশে একেবারে মাটি! সেই আমি-মাটি নিয়ে পড়ি হাঁড়িগড়া কুমারের হাতে, সে যা জোরে পিটায়, উঃ! প্রাণ আমার যায়! আর না ত চেয়ে দেখ, আমি-মাটিকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে কেমন পাকা দালানের ইট তৈয়ারী হচ্ছে। আমার এক প্রাণীয়ে ঘেরে ভিতরে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, দিন নাই, রাত নাই, পুড়ছেই—পুড়ছেই। এই যে ধোঁয়া নিখাস ছাড়ছি, কারো কি তাতে ছাতি ফাটছে, আরো কেমন ভাষা দেখছে।

এই ধোঁয়া মিটলে তবে আমার নিষ্কৃতি! তোমরা সব কাজ হাঁসিল করবার লোক, তোমরা সেই পোড়া মাটির রাস্তা রঙ দেখে মহা তারিফ করছ, বড় বেখানে পুড়ে পুড়ে ঝাঁঝ হয়ে গেছে, ছুঁড়ে ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিচ্ছ। কিন্তু সে ফেলার চোটে যে নীচের মাটি ফাটল ধরছে, তার খবর রাখ কি? এ রকম পোড়া মাটি, ভিজা মাটি, শুকনা মাটি, ভোগ সবারি সমান। দেখছ না, কি যে ভিজ়ে মাটি চিরে চিরে লান্ন-লের ফাল যাচ্ছে, তার হ'ল শব্দটি করবার বো নাই। আবার ঐ শুকনো মাটি কেটে কেটে কেমন পোড়া মাটির ভিত্তি গাঁথছে, তখন মাথার উপর পাহাড়-পর্বত বোঝাই! থাক মুখটা শুঁজে বোবা হয়ে! তাই ভাবি, যদি মাটির বস্ত মাটিতেই মিশে যাব, তবে পোড়া কপাল! সে বস্ততে হ'ল দিয়েছিল কেন? মাটি ছেড়ে চড়তে, আকাশে উড়তে শেখালে কেন? হুদিনের ত ব্যবস্থা! তা এত বা—এত মার-

পিট—এত জালা কিসের লাগি! বল দেখি! আর তুমি অপ! আমার নিরে কি করছ তুমি? তোমার ঐ তরতর তরঙ্গে আমার স্থান দিচ্ছে কি? তোমার ঐ তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় আমার বসবার অধিকার আছে কি? ঐ যে গুরু-গরজনে জলদেবী মেদিনী কাঁপারে কাঁপারে, নৃত্যভঙ্গে তাদের গুরুভার লঘু করতে করতে আনন্দে চলেছে, সেই বলাহকের আমি কেউ কি? আমি জানতে চাই, উন্মাদিনী নিখরিনীরা আমার তাদের জেনে ওদের ঐ স্বরা-গতিতে আমাকেও সাগর-সঙ্গম পাওয়াবে কি? এ পারের খেরা ওপারে পৌছাতে বেগবতী স্রোতস্বতীদের মত আমিও বুক পেতে দিতে পারব কি? অনাবৃষ্টির দিনে ঐ আকাশ-পানে চাওয়া জলের শক্তি চকিত আশা আমা দ্বারা পূর্ণ হবে কি? অথবা তাবৎ দিনের কর্মের শেষে গ্রাম্যবধূগণ বধন বিন্ধু সরোবরে অবগাহন করতে যাবে, তখন তাদের মৃৎকুম্ভ ভ'রে ভ'রে আমার বরে নিরে আসবে কি? নয় ত ঐ যে মহা শ্মশানে চিতার আগুন নিরে তোমাদের নিত্য খেলা চলেছে, বল বল, সে খেলা সাক্ষ হলে, সে তাপ মিটাবার শক্তি-বারি আমার করবে কি? না কেবল খাল-বিলের বাক্সা জলে আমার আঁকা ক'রে রেখে দিবে।

আমি বুঝি না, এই যে তেজঃ তুমি। জীবের জীবন, উৎপত্তির কারণ হয়ে অনাদি কাল হ'তে বিরাজ করছ, বিরাট তুমি! ক্ষুদ্র তুমি! ক্ষুদ্র আমি—আমার ছিটা-কোঁটার তোমার এত লোভ কেন? উর্দ্ধ-নেত্রে, জীবলোক বধন করঘোড়ে তোমার তপস্তা করে, তখন তোমার সেই দেবত্বের ভাগী আমার করবে কি? এই স্বাবর-জন্মের স্পন্দনে স্পর্শনে যেখানে তুমি চিৎখন চিন্ময় হয়ে রয়েছ, বল—তুমি বল, সে চৈতন্ত-স্বরূপে আমার কোন অস্তিত্ব থাকবে কি? তোমার পুঞ্জীকৃত বৈভবে বধন জগৎকে তেজীয়ান্ ক'রে তোল, তার উন্মেষণায় আমারও শিল্পী ব'লে পশ্বে কি? অন্ততঃ পক্ষে, দীন-দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরে, ক্ষুধিত জনের অন্ন-পাকের শুকনা কাঠে, তেজোময় বহিরূপে আমার কেউ স্বীকার করবে কি? না কেবল তাদের গৃহনাহে, সস্তাপের দিনে তোমার ঐ বিনাশের লোল জিহ্বায় আমার আদর ক'রে বসিয়ে রাখবে? কোন্টা করবে তুমি?

আবার বধন ভাবি মরুৎ! তুমি ত জীবের প্রাণ জুড়োবার, প্রাণ জাগাবার ঐভু, তোমাতে মিশে আমাতেও এ শক্তি আসবে কি? ভয় হয়, না জানি চণ্ডী তুমি! প্রলয়ের দিনে এই জল-স্থল নতোমণ্ডলকে উল্ট-পাল্ট ক'রে তাবৎ সৃষ্ট গ্রামকে ত্রাসান্বিত ক'রে কেবল এ সব অবটন ঘটাতেই আমার শেখাবে। এমন কি হবে, ওগো মূহ-মন্দ মলমানিল! তোমার ঐ সুখ-পরশের নিছনি হয়ে আমিও তেমন তেমন পরাণ ছুঁয়ে পাপল-পারা ক'রে দিব? আমি ত জানি, বধন পতিহারী অভাগিনী তার একমাত্র সন্তান কোলে ক'রে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়ে তোমার কাছে তার শিশুর খাস তিক্কা করবে, তখন সে ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ড-রক্ষার আমার কিছু দাবি থাকবে না।

আর এও জানি যে, ভবলীলা-সাপ্পের সঙ্গে তোমার যেখানে গরমিল হবে, সেখানেই তুমি আমায় তোমার হাত ধ'রে স'রে পড়তে উপদেশ দিবে। তোমাদের এই টানা-টানি ছটপুটি দেখে আমি ভাবি, তোমরা আমায় ভাগাভাগী ক'রে নিয়ে, যাবে কোথা? ব্যোম যে বিশ্ব জুড়ে! তখন সে আমায় তার বিচিত্র বিমানে আশ্রসাৎ করতে চাইবে না? সে বিমানে একবার উড়তে গেলে আর আমার লাগল কেউ পাবে কি? খেলালী তোমরা, কেমনে বুঝবে, আমি তোমাদের কেহরি নহি। তোমরা আমায় যতই ভোলাও, যতই ভোগাও, ছেনো, তোমাদিগকে সঙ্গ দিতে, তোমাদিগের মনযোগাতে আমি এ জগতে আসিনি। সেই স্বয়ম্ভু বিশ্বস্তরের যোগভঙ্গের জন্তই যে আমার জন্ম, তা কি তোমরা জান? তোমাদের হট্টগোলে পড়ে আমি তার নিশানা সাজ কিছুই করতে পারছি না। পেয়েছিলাম, দেহে থাকতে তার দেখা পেয়েছিলাম, আমার পঞ্চেন্দ্রিয় আমার দেখিয়েছিল। সেই অবধি চোখ-ছাড়া করতে চাইনি। ছুটেছিলাম সে রূপ-সনাতনের অন্তরে—তারি স্বরূপ-দর্শনে। আজ তোমরা এ কি করলে? আমার চোখ কেড়ে নিলে? চোখ ছাড়া আমি তবে নজর দিব কেমনে? চোখ ছাড়া আমি তারে খোব কোন্খানে? যদি চোখ নিয়েছ, যদি আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে বেবশ ক'রে দিয়েছ, তবে বল বল, তোমরাই বল, তখন কি এই উদ্ভিদে জড় হয়ে, ক্ষতিতে বিচেষ্টন রয়ে, ব্যোমে মিশে গিয়ে, অনিলের সঙ্গে হলে, সেই ভেজোময়ের বিকাশে এসে, অতলের জলে ভেসে আমি চক্ষুহীন, আমার সেই মানসমোহন, অঁধি-রঞ্জনকে ইসারায় ইসারায় পাগল ক'রে দিতে পারব?

ঐজগদম্বা দেবী।

রূপান্তর

১

সে দিন রাত্রে বাড়ী আসিতে একটু দেরি হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া শুইয়া পড়িলাম।

২

আমি কে কে? বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম; সে কোন উত্তর দিল না, কেবল আমাকে সঙ্গে বাইবার জন্ত ইসারা করিতে লাগিল। অন্ধকারের মধ্যে তাহার চোখ দুটি জ্বলিতেছিল। আমি কিছুতেই আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না— তাহার সঙ্গ নিলাম। অবশেষে একটা পোড়ো বাড়ীর কাছে একটা পুকুরের পারে আসিয়া সে থামিল। সেই পুকুরের ভাঙ্গা ঘাটে আমাকে বসিতে ইসারা করিয়া সে একটু দূরে গিয়া বসিল। হঠাৎ তাহার মুখে যেন একটা অভাবনীয় বেদনার ছায়া দেখা দিল। সে একদৃষ্টে ঐ পুকুরের পানে চাহিয়া রহিল, হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, “আমার কথা শুনিবে?” আমার কথা কহিবার শক্তি ছিল না—সমস্ত প্রাণ-মন দিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। সে কিছুক্ষণ এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—“আজ সে অনেক দিনের কথা, আমার বয়স তখন সতের বছর। আমরা ঐ বাড়ীতে থাকিতাম, আমার বাবা একজন বড় জমিদার ছিলেন। আমি তাঁহার একমাত্র কন্যা। বুঝিতেই পার, বড় লোকের একমাত্র কন্যার কি অবস্থা হয়। সকলেই আমাকে খুব সুন্দরী বলিত কিন্তু আমি তার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতাম না। আমাদের বাড়ীর পাশে ঐ যে আর একটা ভাঙ্গা বাড়ী দেখিতেছ, ঐ বাড়ীতে একটা ছেলে থাকিত। আমি যখন সন্ধ্যাবেলা ছাদে বেড়াইতে যাইতাম, সে তখন আমার রূপের কথা ও কত কি সব লিখিয়া আমার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিত। আমি সে কাগজগুলি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতাম। ভাবিতাম, আমার ভিতর কি এমন আছে—যাহা দেখিয়া সকলে আমাকে এত সুন্দর বলে? মনে মনে অনেকবার ভগবানকে ডাকিয়াছি। আমার যেই রূপ দেখিয়া লোকে এত কথা বলে, আমি সেই রূপ দেখিতে চাহিয়াছি। আমার ভিতর এমন কি আছে? কিন্তু হায়, আমি অনেক দিন আশ্রিত সামনে দাঁড়াইয়া নিজের রূপ দেখিয়াছি, কিন্তু তেমন কিছু ত দেখিতে পাই নাই। কেন পাইলাম না? হায়!

তার ! কেন নিজের রূপ দেখিতে পাইলাম না ?” আমি দেখিলাম, সে চূপ করিয়া পুকুরের দিকে চাহিয়া আছে । খুব ক্ষীণ তাঁদের আলো সারা পুকুরে ছড়াইয়া পড়িল । বাতাসে পুকুর-পারের গাছের পাতাগুলি হুলিতে লাগিল । তার মাথার চুল উড়িয়া উড়িয়া মুখের উপর পড়িতে লাগিল । দেখিলাম, সে কান্দিতেছে—হাসিতেছে । আবার দেখিলাম, সব শান্ত—যেন ঝড় উঠিয়াছিল, থামিয়া গিয়াছে । সেই ক্ষীণ ছায়ার মত আলোকে তাহার মুখখানি জ্বলিতেছে । আবার সে আমার দিকে ফিরিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—“তার পর ? একদিন সন্ধ্যাবেলা এই পুকুরে গা ধুইতে আসিয়া-ছিলাম । জলের দিকে চাহিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম । ও রূপ কখনও আমার নয়, আমার নয় বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম । এত সুন্দর ! আমি কি সত্য সত্যই এত সুন্দর ?—আমি আর থাকিতে পারিলাম না ; মনে হইল ঐ ছায়াকে যদি বুকে করিতে পারি, তাহা হইলে আর কিছুই চাহি না । আমি ডুবিলাম । তুমি হাসিও না । তুমি মনে করিতেছ আমি পাগল—তাহা না হইলে নিজের রূপ দেখিয়া ডুবিব কেন ? কি জানি !”

৩

চমকিয়া উঠিলাম । সেই পুকুর-ঘাট, সেই পোড়ো বাড়ী কোথায় মিলাইয়া গেল । দেখিলাম, আমারই ঘরে আমারই বিছানায় আমি শুইয়া আছি ।

লণ্ডন, ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ ।

শ্রীচিরঞ্জন দাশ ।



মহাকবি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সাহিত্য-কুসুমের প্রমত্তমধুপ বঙ্গের উজ্জল রবি ।

তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার শ্রীমধুসূদন কবি !

বন্ধুবর যোগীন্দ্রনাথ কবিত্বষণ ও সমবেত সভ্যবৃন্দ, যে মহাকবির স্মৃতিবাসরে আজ আমরা সমবেত হইয়াছি, শুধু বঙ্গের নহে, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের বরগীষ, ও প্রেমিক কবিশ্রেষ্ঠগণের অগ্রতম ছিলেন। তাঁহার জায় মহাকবির আবির্ভাবে বঙ্গদেশ চিরদিনের মত পূজনীয় হইয়া রহিয়াছে। আর তাঁহার কবিতারূপিনী মন্দার-মালার বঙ্গভাষা আচ্ছন্ন-দিবাকর সুশোভিত হইয়া থাকিবে। কুন্তিবাস, কাশীদাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি মহাকবিগণের বহুবন্ধ-কল্পিত কবিতা-কাননে মধুময় মধুসূদনের মধুমতী ভাব-মন্ডাকিনী প্রবাহিত হইয়া, বঙ্গদেশকে যেন চিরদিনের মত সরস করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার জলের এমনই একটা মাহাত্ম্য, বাঙ্গালার শ্রামল শস্ত-ক্ষেত্রের, সুনীল বনাবলীর এমনই একটা মাধুরী, এমনই একটা উন্মাদকতা যে, অতিবড় নীরস পাষণেও এখানে নিখর দেখিতে পাওয়া যায়। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, আমরা সত্যই,

“পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখীর ডাকে জেগে”

তীর্থস্থানে উপনীত হইলে যেমন হৃদয়ে কেমন একটা স্পৃহণীয় ভাবের উদয় হয়, অরুণোদয়ে নীলাম্বরানির বেলাভূমিতে উপবিষ্টের মনে যেমন একটা অনির্কলচনীয় ভাবের আবেশ হয়, সায়ংকালে পল্লী-প্রান্তরে সমাসীন ব্যক্তির পশ্চাদ্ভর্তী দগ্নেল-জ্বালায় তানে নরন ও মনে যেমন একটা অননন্দময়ী জড়তার আবির্ভাব হয়,—এই বাঙ্গালার পল্লী-কুঞ্জে যাহারা বাস করেন, তাহাদের হৃদয়ে স্বতই ঐরূপ ভাবাবেশ জন্মিয়া থাকে। যাহারা আবার ভাগ্যবান, বিধাতার অনুগ্রহ যাহাদের মস্তকে বর্ষিত, তাহারা ঐ ভাবাবেশে আত্মোৎসর্গ করিয়া ধন্ত হন, মর-জীবন সার্থক করেন। দিবা-বসানে, যখন পল্লী-পাদ-বাহিনী তটিনী কুলকুল গীতিকার পথিকের প্রাণে কেমন একটা উদাস ভাব জাগাইয়া বহিয়া যায়, তটবর্তী বটবৃক্ষের মূলে সমাসীন পথিকের হৃদয় সাক্ষ্য-সমীরণে যেন কেমন বিস্তার হইয়া আপনার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, তখন, সেই আত্মবিস্মৃত ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে হৃদয়ের সুপ্ত বীণা আপনিই

অম্লরসিত হইয়া উঠে। যদি তাহার চিত্তে প্রেম থাকে, যদি তাহার জন্মান্তরের
পূণ্য থাকে, তবে তখন সে পাগলের মত গাহিতে থাকে, তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী
কল্পনাময়ী প্রতিমার চির-প্রসন্নমুখের দিকে মুদ্রিত-নেত্রে চাহিয়া বলে—

“মধুর-মুরতি তব, ভরিয়া রয়েছে তব,
সমুখে সে মুখশশী জাগে অনিবার !
কি জানি কি ঘুমঘোরে, কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর।”

(সারদামঙ্গল)

তখন সে যুক্তকরে তাহার আদরিনী প্রতিমাকে স্তব করিতে আরম্ভ করে, কখনো
ধ্যান করে, কখনো আবার দুই হাত বাড়াইয়া সেই সঙ্গিতবদনা জ্যোতির্ময়ীকে
ধরিতে যায়, সতাই সেই করুণাময়ীর স্কন্ধে নরনার দীপ্তিতে নিজেকে ডুবাইয়া
দিয়া তখন ঐ ব্যক্তি কত কি বলিতে থাকে,—কখনো শোকাশ্রতে ধরনী ভাসাইয়া
দেয়, আবার প্রেমাশ্রতে কখনো বা মরভূমি অমরধানে পরিণত করে,—তখন তার—

“সে শোক-সঙ্গীত কথা,
গুনে কঁাদে তরু লতা,
তমসা আকুল হয়ে কঁাদে উত্তরায়।
নিরপি নন্দিনী ছবি,
গদগদ আদি-কবি,
অস্তরে করুণানিধি উথলিয়া যায়।”

(সারদামঙ্গল)

যথার্থই তখন সেই বিশ্বনন্দিনী প্রতিমার প্রতি নিখাসে জগৎ রোমাঞ্চিত হইয়া
উঠে। ঐ সাধক কবি তখন বুকিতে পারেন না, বা জানিতেও পান না যে, তিনি
কি কহিতেছেন, কি গাহিতেছেন? তাহার অপ্রবুদ্ধ কণ্ঠের “মা নিষাদ” গীতিকা
যে জগতে এক নূতন ছন্দের সৃষ্টি করিবে, নূতন রাগের প্রবাহ বহাইবে, ইহার
বিন্দুবিসর্গও তিনি তখন ঘূর্ণাকরে জানিতে পান না। কবি তখন পার্ববর্ত্তিনী
বিলাস-বিহ্বলা কমলার দিকে জ্রঞ্জেণ না করিয়া, পুরোবর্ত্তিনী করুণাময়ী বাগ্‌দেব-
তার দিকে অনিমেঘে চাহিয়া অতৃপ্ত-হৃদয়ে বলেন,—

“এস মা করুণা-রাণী,
ও বিধু-বদন খানি,
হেরি হেরি আঁখি ভরি, হেরি গো আবার ;

শুনে সে উদার কথা,
জুড়াক মনের বাণী,
এস আনরিণী বাণী সমুখে আমার !
যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগি-জন-তপোবনে আর ।”

(সারদামঙ্গল)

কবির তখনকার সেই উন্মাদনা-সঙ্গীত যে, কালে এক নব-মন্দাকিনী প্রবাহিত করিবে, তাহা কবি বুঝিতে পারেন না । এমনই অপ্রবুদ্ধ ভাবে, বাঙ্গালার অমিত্রাক্ষরের কবি মধুসূদন একদিন সঙ্গীত ধরিয়াছিলেন । আদি-কবি বাঙ্গালীকি যখন আপনার গানে আপনিই বিমুগ্ধ ও কদাচিত্ “কি গাহিলাম” বলিয়া সংশয়িত, তখন চতুর্মুখ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া রত্নাকরকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন,— “ঋষিবর, তুমিই ভগতের আদি-কবি হইলে, অসঙ্কোচে ও উদাত্তকণ্ঠে রামায়ণ গান কর, বিশ্ব-ভ্রম্মাণ্ড বিমোহিত হইবে, তোমার গানে মর-জীব অমরতার সুখ উপলব্ধি করিবে ।” হায়, এ বাঙ্গালার রত্নাকর মধুসূদনের ভাগ্যে ঠিক ইহার বিপরীত ফলিয়াছিল । অথবা শুধু এ দেশে কেন, সকল দেশের মহাকবিদের ভাগ্যেই লাহুনা সমান ! দুর্জ্জন সমালোচকের মর্শ্ববাতিনী কশায় মহাকবি কীটসের হৃদয় শতধা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল ! হায়, অকালে ক্ষয়রোগে তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিল !!

বন্ধের কবিতাসুন্দরীর রাতুল-চরণ শৃঙ্খলিত দেখিয়া মধুসূদনের প্রাণে বাজিয়াছিল, উপাস্ত দেবতার দুর্দশায় ভক্তের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল, তাই কাদিতে কাদিতে মধুসূদন বলিয়াছিলেন,—

“বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে,
মিত্রাক্ষররূপ বেড়ি, কত ব্যথা লাগে,
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে !
চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-কাঁসে !”

প্রেমে হউক, শোকে হউক, আদরে হউক, উপেক্ষায় হউক, মানুষ যখন পাগল-পারা হয়, তখন তাহার সকল বিষয়েই শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া যায়, সে তখন উদ্ভাসভাবে বিচরণ করিতে চায়, তাহার সমক্ষে তখন বিশ্বের তাবৎ পদার্থই ঐহিক রীতিনীতির

শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, পুরাতন সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, এক অতি মনোরম নবীনতায় সাজিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

“বাদ্যশী ভাবনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী”

এই কবিবাক্যের তখন প্রকৃত সার্থকতা ভ্রমে। মহাকবি মধুসূদন বীণাপাণির প্রেমে পাগল হইয়াছিলেন,—আপনার ইহকাল-পরকাল, সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ-পুল-কলত্র,—সমস্ত ভুলিয়া কবিতার সেবা করিয়াছিলেন, যথার্থই “ক্ষিপ্তগ্রহের তায়” দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্য হইয়া, কবিতা-সুন্দরীর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়াছিলেন,—একাগ্রহৃদয়ে ধ্যানে বসিয়াছিলেন,—তাঁহার সাধনার সিদ্ধি হইয়াছে। তাঁহার “অনন্ত-পরতন্ত্রা” ভারতীকে মানস-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তিনি বলিয়াছিলেন,—

“হৃষ্মতি সে জন, যার মন নাহি মজে
কবিতা-অমৃত-রসে! হায়! সে হৃষ্মতি,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সদা যে জন না ভজে
ও চরণ-পদ্ম, পদ্ম-বাসিনি! ভারতি!
কর পরিমল-ময় এ হিয়া-সরোজে—
তুষ্টি যেন বিজে, মা গো, এ মোর মিনতি!”

তাঁহার মিনতি সফল হইয়াছে। শুধু “হিয়া” নহে, ভারতীর করস্পর্শে তাঁহার দেহ মন সমস্তই “পরিমলময়” হইয়াছিল, তাই তাঁহার সংস্পর্শে বঙ্গভাষা এবং বঙ্গভূমি চিরদিনের মত পরিমলময়ী হইয়া রহিয়াছে।

বঙ্গভাষার “রাঙা চরণে মিত্রাক্ষররূপ বেড়ি” দেখিয়া, মধুসূদনের হৃদয়ে যে কি ব্যথা লাগিয়াছিল, তাহা উপরিবৃত কর পঙ্ক্তি হইতেই বেশ বুঝা যায়। আমি যার সেবা করিয়া জীবন ধন্য করিব, যাহাকে মা বলিয়া প্রাণ নীতল করিব, কানন-প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া যাহাকে ডাকিব, আমার সেই ডাকে সমগ্র গোড়ভূমি চমকিয়া উঠিবে, আমার মাকে মা বলিয়া ডাকিবে,—আমার এমন যে মা, এত সাধের, এত আদরের যে মা, তাঁহার চরণে শৃঙ্খল! পুত্র আমি, আমার সমগ্র সামর্থ্য ব্যয় করিয়া সে শৃঙ্খল ভগ্ন করিব। মা আমার উদ্ধৃত-চরণে, বন-কুরঙ্গীর মত স্বৈর-চরণে ইতস্ততঃ বিচরণ করিবেন, আর পুত্র আমি মা মা বলিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বেড়াইব। যদি মায়ের চরণ-নিগড় মুক্ত করিতে না পারিলাম, তবে কিসের পুত্র আমি, কুপুত্র আমি। তাই বাণীর বরপুত্র মধুসূদন সজলনয়নে বলিলেন,—

ছিল নাকি ভাব-ধন কহ লো ললনে,
মনের ভাঙারে তার, যে মিথ্যা মোহাগে,

ভূলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ ভূষণে !

কি কাজ রঞ্জে রাঙ্গি কমলের দলে ?

নিজরূপে শশিকলা উজ্জল আকাশে !

লৌকিক ভাষায় অহুঁ পুঙ্খের প্রবর্তনের ভাষা বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করিয়া মধুসূদন বাঙ্গালা কবিতার পথ অতি সুগম করিয়া গিয়াছেন। যত দিন বঙ্গ-ভাষা ও বাঙ্গালী জাতি থাকিবে, তত দিন তাঁহার অমিত্রাক্ষরের মধুর বীণাধ্বনি শ্রুত হইবে। অনেকের কবিতা পাঠকালেই হৃদয়ের ওজস্বিতা যেন কর্পূরের মত ক্রমে উপিয়া যায়, ক্রমে শরীর কিমাইতে থাকে, দেহে অহিফেনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আর মধুসূদনের তরঙ্গিনী কবিতা পাঠ করিয়া—

“উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।”

(নবীনচন্দ্র)

মধুসূদন চাহিতেন যে, তাঁহার স্বজাতিকে, তাঁহার চিরপ্রিয় গোড়জনকে এমন সুখ-পান করাইবেন, যাঁহাতে তাঁহার মাতৃষের মত হইবে। একেই ত নানা ভাবে সকলে ক্রমে নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, ইহার উপর আবার ঘুমের ঔষধ প্রয়োগ কেন ? এখন জাগ্রত করিতে হইবে ; তাই মধুর সমস্ত কবিতাতেই একটা প্রাণের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, তাঁহার কবিতার সমস্তই প্রায় দেশীয় উপাদানে রচিত। তাঁহাতে বিদেশীয় রসনা নাই। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য-জগতের ভাল মন্দ সমস্তই দেখিয়াছিলেন ও শিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতৃ-পিতামহের প্রাচ্যের প্রতিমার স্থানে কদাচ পাশ্চাত্য প্রতিমা বসান নাই। জাতীয়তার বিসর্জন দেন নাই। পশ্চিম পূর্ণনের সূচক সাক্ষ্যরূপে আভাস তিনি তদীয় কবিতার ললাট নাক্ষত্র্য করিয়া দিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন প্রাচ্যের অরুণ রাগে। তাই তাঁহার কবিতার বিনাশ অসম্ভব। উপর্যুপরি কালে শুকাইয়া যায়, মূল বৃক্ষের কিছুই হয় না। সোজা কণায় ইউরোপের নানা কারু-কার্য্যখচিত সুন্দর ফ্রেমে তিনি ভারতীয় ছবি বাঁধাইয়াছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কলা দেশান্তর হইতে গ্রহণ করা কর্তব্য, কিন্তু জাতীয় কবিতা ও যদি বিজাতীয় ছাঁচে ঢালাই করিতে হয়, তবে আর রহিল কি ? এত পুঙ্খার্ঘ্যের ফল জাতীয়তার ক্রমিক ধ্বংস। মহাকবি মধুসূদন সে পথে যান নাই। তিনি ইউরোপের মিত্রাক্ষরে এ দেশের কবিতাকে সাজাইয়াছেন। তিনি গোড়কে প্রাণময় করিতে চাহিয়াছিলেন, বঙ্গের কবিতাকে মদালসার পরিবর্তে বীরাসনার ভূষায় বিভূষিত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন ; কৃতকার্য্য হইয়াছেন। নাটক-প্রহসনাদি সম্বন্ধে তাঁহার সাফল্য তর্কের বিষয় হইলেও, অমিত্রাক্ষরের সম্পর্কে তিনি যে নবযুগের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহা সর্ব্ববাদি-

সম্মত । মধুসূদনের পূর্বে বঙ্গভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ অন্তর্ভাবে কদাচিত্ পরিদৃষ্ট হইত বটে, কিন্তু তাহার কোনরূপ আকর্ষণী শক্তি ছিল না । মধুসূদনের যে কবুনাতে বঙ্গসাহিত্য-গগন মুখরিত, তাহার এক ভগ্নাংশও ঐ সব প্রাণহীন কবিতায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না । শুধু তাঁহার নয়নের নহে, তাঁহার কবিতার “হিরণ্ময় জ্যোতিতে”ও বাঙ্গালা ভাষা চিরদিনের মত জ্যোতিষ্মতী হইয়া রহিয়াছে । তাঁহার কার্য্যে এবং কবিতায়, উভয়ত্রই একটা উৎকট আবেগ দেখিতে পাই । কার্য্যক্ষেত্রে যেমন তিনি কদাচ ক্ষুণ্ণতার অধীন হইতেন না, কখনো একভাবে, একটা বিষয় লইয়া থাকিতে পারিতেন না, সর্বদাই চাহিতেন, যাহা করিতেছেন, তাহা ছাড়া আরও একটা কিছু ; কবিতার ক্ষেত্রেও তদ্রূপ । যখন যেখানে গিয়াছেন, ভালমন্দ যেমন অবস্থাতেই পড়িয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের টান কিন্তু কবিতার প্রতি সর্বদাই সমান । কোন কারণে, কোন অবস্থাতেই তাহার নূনতা ঘটে নাই । বরঞ্চ বাহ্য বিশৃঙ্খলা, সাংসারিক অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কবিতার সেবায় তিনি অধিকতররূপে নিবিষ্ট হইতে পারিতেন । আত্মসন্তোষ তাঁহার প্রভূত বিশ্বাস ছিল, তাই যখন একটা নূতন কিছু করিতে আরম্ভ করিতেন, তখন দৃঢ়তার সহিত বন্ধ-বান্ধবকে তাহার সাফল্যের কথা বলিতেন । সর্বপ্রথম যখন চতুর্দশপদী কবিতা লেখেন, তখন তিনি প্রথম কবিতাটি, তদীয় প্রিয় ও অকৃত্রিম সূহৃদ রাজনারায়ণ বাবুকে পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন,—

What say you to this my good friend ! In my humble opinion,
if cultivated by men of genius. our sonnet in time would rival the
Italian.

তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী তিনিই সার্থক করিয়া গিয়াছেন । তাঁহার এই সনেটটি কবি-ভূষণ বোগীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ মাইকেল-জীবনীতে আমরা এইরূপ দেখিতে পাই :—

কবিমাতৃভাষা

“নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য ; তা’ সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিহু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বানিজ্যের তরী ।
কাটাইহু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই স্বতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন শয়ন ত্যজে ইষ্টদেবে অরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কার-মন

বঙ্গকুললক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা, —‘হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী ।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ, ধনপতি !
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে’ !”

এই কবিতা-রচনার অনেক পরে মাইকেল চতুর্দশপদী কবিতাবলী নাম দিয়া যে
কবিতাগুলি প্রকাশ করেন, এইটি তাহার তৃতীয় কবিতা ; মনে হয়, ঐ প্রথম কবি-
৬-তাটি মাজিয়া ঘসিয়া কবির “বঙ্গভাষা” এই নামে বাহির করেন, কেন না, প্রথমের
কথা ভোলা বা প্রথমের মারা ছাড়া বড়ই কঠিন ।

বঙ্গভাষা

“হে বঙ্গ, ভাঙারে তব বিবিধ রতন,
তা’ সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিছ ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি ।
কাটাইছ বহুদিন সুখ পরিহরি ।
অনিদ্রার, নিরাহারে, স’পি কাম, মনঃ,
মজিছ বিফল তপে অবরোধে বরি ;—
কেলিছ শৈবলে, ভুলি কমল-কানন !
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী করে দিলা পরে,—
‘ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি !
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে !’
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপে ধনি, পূর্ণ মণিজালে ।”

তিলোত্তমা-রচনার পর চতুর্দশপদী কবিতার মাইকেল হাত দেন । তিলোত্তমা
অমিত্রাক্ষরের এক প্রকার প্রথম কাব্য । বোধ হয়, বঙ্গের তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলী
তিলোত্তমার প্রতি প্রথম প্রথম তত সদর ব্যবহার করেন নাই । মাইকেল যদিও
কখনো আত্মমতানুযায়ী কার্য্য করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই, বা পরের
মুখাপেক্ষী হইয়া কবিতা লেখেন নাই, তবুও কিন্তু বঙ্গের নূতনজন্মের আবিস্কৃতি

তাঁহার আদরিণী তিলোত্তমাকে অগ্রে আদর করিতেছে, দেখিয়া, আনন্দে বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন—You will be pleased to hear that the Pundits are coming round regarding Tillottoma. The renowned Vidyasagore has at last condescended to see 'great merit' in it, and the 'Shome Prokash' has spoken out in a favourable manner.

বঙ্গভাষার প্রধান মহাকাব্য মেঘনাদ-বধ-প্রকাশ-বিষয়ে রাজা দিগম্বর মিত্র অর্থ-সাহায্য করিবেন, এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া, বঙ্গ-কবিকুল-কেশরী মধুসূদন নিজেকে অশেষ সৌভাগ্যশালী মনে করিয়াছিলেন। হায়,—বাণীর বরপুত্রের এই সময়ের উক্তিতে নয়ন সজল হইয়া আসে। তিনি বলিয়াছিলেন,—In this respect, I must thankfully acknowledge, I am singularly fortunate. All my *idle* things find Patrons and customers. * * * তাঁহার 'idle things' গুলি আজ বঙ্গভাষার উজ্জলরত্ন, বঙ্গবাণীর কিরীটমণি এবং বাঙ্গালার তথা বাঙ্গালীর অশেষ গর্বের কারণ।

সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের কাব্যাবলীর প্রত্যেকখানিই যেমন নিজের নিজের এক অতি অসাধারণ ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠত্বসম্পন্ন, মধুসূদনের কবিতা-গ্রন্থগুলিরও প্রত্যেকখানি সেইরূপ এক একটি অসাধারণ ধর্ম্মে বিমণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠত্ব-সম্পন্ন। সেইরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম বাঙ্গালার অন্ত কোন কাব্যে আছে কি না, বা কালে থাকিবে কি না, তাহা বলিতে পারি না। মধুসূদনের বীরঙ্গনা যখন পড়ি,—দ্বারকানাথের উদ্দেশে কবিত্বীর সেই পত্র—সেই :—

“শরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে
এ পোড়া মনের কথা। চন্দ্রকলা সখী,
তার গলা ধরি, দেব, কাঁদি দিবানিশি !—
নীরবে ছুঁজনে কাঁদি সভয়ে বিরলে !
লইলু শরণ আজি ও রাজীব-পদে ;—
বিঘ্ন-বিনাশন তুমি, ত্রাণ বিঘ্নে মোরে ।
কি ছলে ভুলাই মনঃ, কেমনে যে ধরি
ধৈর্য, ভনিবে যদি, কহিব, ত্রীপতি !
বহে প্রবাহিনী এক রাজ-বন-মাঝে,
“যমুনা” বলিয়া তারে সম্বোধি আদরে,
গুণনিধি ! কুলে তার কত যে রোপেছি

তমাল কদম্ব—ভূমি হাসিবে শুনিলে !!
 পুষিমাছি সারী শুক, ময়ূর ময়ূরী
 কুঞ্জবনে ; অলিকুল গুঞ্জরে সতত,
 কুহরে কোকিল ডালে ; ফোটে কুলরাজী ।
 কিন্তু শোভাহীন বন প্রভুর বিহনে !
 কহ কুঞ্জবিহারীয়ে হে ষারকাপতি,
 আসিতে সে কুঞ্জবনে বেণু বাজাইয়া ;
 কিংবা মোরে লয়ে দেব দেহ তাঁর পদে ।”

এই অমূল্যম পঙ্ক্তিগুলি যখন পাঠ করি, তখন যথার্থই আত্মবিস্মৃত হই, কবির অপূর্ণ সৃষ্টিচাতুর্য্য দর্শনে ও শব্দগ্রন্থনের অনুপম কৌশলে একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়ি। তখন—

“তন্না কবিতন্না কিংবা তন্না বনিতয়াপি বা ।
 পাদবিজ্ঞাসমাত্রেণ মনো নাপ্রস্তুতং বন্না ॥”

আলঙ্কারিকের এই উক্তির প্রকৃত অর্থাববোধ হয়। এমন সুন্দর কবিতা, সুন্দর পদরচনা, সুন্দর ভাবাবেশ যে ভাষায় আছে, যে ভাষায় হইতে পারে, সেই ভাষা আমার মাতৃভাষা, সেই ভাষা আমার জন্মভূমির ভাষা, আমার বাঙ্গালার ভাষা, ইহা যখন ভাবি, তখন সত্যই একটা অপূর্ণ শ্রাব্য অনুভব করি। যখন—

“এই দেখ্ ফুলমালা গাঁগিমাছি আমি—
 চিকণ গাঁধন !

দোলাইব শ্রামগলে, বাধিব বঁধুরে ছলে—
 প্রেম-ফুল-ডোরে তাঁরে করিব বন্ধন !
 হৃদয়ে তোরে পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
 আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধা-বিনোদন ?
 কি কহিলি, কহ, সই, শুনি লো আবার—
 মধুর বচন ।

সহসা হইলু কালা, জুড়া এ প্রাণের জালা,
 আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন !
 মধু,—যার মধুধ্বনি— কহে, কেন কঁাদ, ধনি !
 ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন ?”

প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনার বিষাদ-গীতিকা শ্রবণ করি, তখন এই সকল কবিতার প্রতি চরণে, প্রতি অক্ষরে, মধুসূদনি, মধুসূদনের নবনীতকল্ল হৃদয়ের প্রকৃত রূপ দেখিতে পাই।

আবার

“কি কহিনি, বাসন্তি, পর্কতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিঞ্চুর উদ্দেশে,
কা’র হেন সাধ্য বল রোধে তার গতি !
দানব-নন্দিনী আমি, বক্ষঃকুল-বধু,
রাবণ স্বপুত্র মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই, মথি ! তিথারী রাঘবে ?”

প্রমোদার এই মেঘমন্ত্রধ্বনির সহিত ব্রজাঙ্গনার ঐ মধুসূদনি মিলাইয়া পড়িলে বুঝা যায় যে, বিধাতা কি অপূর্ব উৎকটে-মধুরে, কঠোরে-কোমলে, রৌদ্রে-ছোঁয়ায় মধুর কল্লনাপ্রতিমার গঠন করিয়াছিলেন। কল্লনা, সহচরীর স্তায় তাঁহার অনুবর্তন করিত। কোথাও কল্লনার মন্দতায় বা তাবের অল্পতায় তাঁহার কবিতার অঙ্গহানি ঘটে নাই। তাঁহার যে কোন কবিতা যখনই পাঠ করি, দেখি, তাহাতে তদীয় হৃদয়ের দৃঢ়তার একটা ছাপ্ বেন স্বতই লাগিয়া আছে। বঙ্গকাব্যকাননে তিনি দৃষ্ট সিংহের স্তায়, মদগর্জিত নাগেশ্বরের স্তায় বিচরণ করিয়া গিয়াছেন, কোথাও কদাচ কোন কারণে তিনি স্থলিত হন নাই। বিশ্বের কে কি বলিল, কে কি করিল, যে পথে চলিয়াছি, ইহাতে কোথায় কত দূরে বাইয়া পাহাশালা পাইব, যে পাথের আছে, তাহাতে কুলাইবে কি না, এই সব ঐহিক হিংসাব-নিকাশের তিনি কোন ধারই ধারিতেন না। তাঁহার পৃথিবী এক স্বতন্ত্র বস্তু ছিল। তাঁহার পৃথিবী ষপার্থই

“নিয়তি-কৃত-নিয়মরহিতা, ফ্লাট্টেকমরী,
অনন্ত-পরতত্ত্বা এবং নবরসকুচিরা” ছিল।

(কাব্যপ্রকাশ)।

মহাকবি তাঁহার সেই কল্পিত জগতের কল্লনাসাগরে নিজেকে ভাসাইয়া দিতেন, ক্ষীরোদশায়ী পুরুষোত্তমের স্তায় নিজের ভূমায় নিজেই ডুবিয়া থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে আনন্দালস-নেত্রে স্বদেশবাসীদের দিকে চাহিয়া প্রেমভরে মধুবর্ষণ করিতেন, “বোড় করি কর, গোড়মুভাজনে” কহিতেন ; “তন যত গোড়চূড়ামণি”—বলিয়া যে অমৃতে নিজে আত্মহারা, তাহা বিলাইবার জন্য স্বদেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দকে আহ্বান করিতেন।

“বিনা স্বদেশের ভাষা পুরে কি আশা ?”

এই কবিবাক্যে তাঁহাকে উদ্বোধিত করিয়াই যেন গন্তব্য পথ চিনাইয়া দিয়াছিল। যখন তিনি আদি-কবি বাল্মীকির গ্রাম দিবাচক্ষু পাইলেন, তখন ধ্যানভঙ্গের পর দেখিলেন, তাঁহার বড় সাধের “মাতৃভাষারূপে খনি পূর্ণ মণিজালে।” তদবধি কি এক উন্মাদনা তাঁহার হৃদয়ে আসন পাতিয়া বসিল, সেই উন্মাদনার অঙ্গুলিসঙ্কেতে কবির দিগ্‌বিদগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া স্বকীয় বৈরচারিণী কল্পনাকে লইয়া ছুটিলেন। অল্প কথা নাই, অল্প চিন্তা নাই, অল্প কার্য্য নাই, ঐ এক ধ্যান, এক জ্ঞান। কবিত্বের যোগীন্দ্রনাথের সঙ্কলিত মাইকেল-জীবনীতে কবিরের যে সকল পত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, মহাকবি মধুসূদনের চিত্তে দিবারজনী বঙ্গভাষার এবং বঙ্গ-কবিতার চিন্তা কিরূপ প্রকটভাব ধারণ করিয়াছিল। ঐ সকল পত্রের প্রত্যেকখানির গড়ে প্রতি ত্রিশ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সাতাইশ পঙ্‌ক্তি কেবল বঙ্গ-কবিতার কথাই পূর্ণ। বিধাতা দেবদুর্‌ভাগ প্রেমরত্রে তাঁহার হৃদয় বিমণ্ডিত করিয়াছিলেন, অপার্থিব কবিত্ব-সম্পদে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সগম্যই কবিত্বময় ছিল। তিনি দেখিতেন কবিতা, শুনিতেন কবিতা, কহিতেন কবিতা। কখনো তিনি ভারত-সাগরে ডুবিয়া তিলোত্তমারূপ মুকুতা তুলিতেন ও তাহার মালা গাঁথিয়া মাতৃভাষার কনককণ্ঠে পরাইয়া দিতেন,—কখন আবার

“গম্ভীরে বাজারে বীণা গাইল কেমনে,
নাশিলা স্মিত্তাস্মৃত লঙ্‌কার সমরে,
দেবদৈত্য-নরাতঙ্‌ক—রক্ষেন্দ্র-নন্দনে” ;—

কখন বা—

“কল্পনা-দূতীর সাথে লমি ব্রজধামে

গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি” শুনিতেন, ও সেই “বিরহে বিহ্বলা বাণীর” কনককণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া বিজ্ঞাপতি-চণ্ডিদাসের বীণায় বিরহসঙ্গীতের আলাপ করিতেন। কত সাগর মহাসাগর পার হইয়া দেশবিদেশে তিনি ঘুরিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের প্রতি তাঁহার কেমনই একটা আকর্ষণ ছিল যে, তিনি উদ্‌দাম যৌবনেও ডুব দিলেন “ভারত-সাগরে,” অল্প সাগরে নহে। পাশ্চাত্য কবিকুলের : প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াও তিনি তিলাক্ষের জন্ত প্রাচ্য কবিকুলের সেবা করিতে বিশ্বত হন নাই। “কবিগুরু বাল্মীকির প্রসাদ” পাথের লইয়া তিনি দুর্‌গম কবিত্ব-কাননে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

তাঁহার কবিক্রীবনের দুইটি স্তর দেখিতে পাই। প্রথমটি কবির ইউরোপ-গমনের পূর্বকাল, দ্বিতীয়টি ইউরোপ-যাত্রা হইতে তাহার পরবর্ত্তী কাল। তদীয় যে সমুদয় কাব্য-রচनावলীতে বঙ্গবাণী অলঙ্‌কৃত, সেগুলি ঐ পূর্বকালে গ্রথিত, আর হেঙ্‌টর-বধ,

মাস্তাকানন এবং কবিতামালা তাঁহার ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর লিখিত। ইহাতে বেশ দেখা যায় যে, যে শক্তি থাকায় তিনি “পূর্বে ভারতসাগরে” ডুবিয়া রক্ত তুলিতে পারিয়াছিলেন, ভারতসাগরের পারে যাইয়া তাঁহার সে শক্তির তিনি উপচয় করিতে পারেন নাই, প্রত্যুত অপচয়ই ঘটয়াছিল। যদিও চতুর্দশপদী কবিতার প্রকাশ ফরাসীর ভারসেলস্ নগরে, কিন্তু তাহার জন্মস্থান এই ভারতবর্ষ। রাজনারায়ণ বাবুর নিকট কবি নিজেই সে কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন ইউরোপে গমন করেন, তখন তাঁহার ঐ প্রথম সনেটটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, নতুবা রাজনারায়ণ বাবুর নিকট লিখিত সেই সনেট আমরা বর্তমান চতুর্দশপদী কবিতাপুস্তকে ঐরূপ সংশোধিত আকারে দেখিতে পাইতাম না। তিনি ইউরোপে যাইয়া বৃষ্টিতে পারিয়াছিলেন যে, যে উদ্দেশ্যে তিনি গিয়াছেন, তাহার সুসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না। তিনি আইন-কানুন বাহাই পড়ুন বা বাহাই করুন না কেন, প্রাণ কিন্তু তাঁহার সর্বদাই মাতৃভাষার জন্ত কঁাদিত। তিনি নিজেই কঁাদিতে কঁাদিতে বলিয়াছেন,—

“পরধন-লোভে নত, করিহু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুঞ্জে আচরি।
কাটাইহু বহুদিন সুখ পরিহরি !
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়-মনঃ,
মজ্জিহু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি॥”

বাহ্যতঃ মধুসূদন ইউরোপে ছিলেন, কিন্তু অন্তর তাঁহার ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গে পড়িয়া ছিল। কবে বাঙ্গালার শ্রীপঞ্চমী, কবে শরতে শারদার অর্চনা, কবে বিজয়া-দশমী, কপোতাক্ষ নদ কেমন কুল কুল করিয়া বহিয়া যায়, কোন্ বাটে ভাগ্যবান্ ঈশ্বরী পাটনী খেয়া দিয়াছিল,—সুদূর ফরাসীতে বসিয়া, বিলাসের তরঙ্গে যে দেশ প্রাবিতপ্রায়, সেই স্থানে বসিয়া তিনি বঙ্কের এই সমুদয় সুখস্মৃতি মনে জাগাইতেন, ও না জানি কত আনন্দই পাইতেন। বাঙ্গালার মেঘমুক্ত শারদাকাশে সায়ংকালের তারা যে কত সুন্দর, তাহা তিনি ভারসেলেসে বসিয়া কল্পনানেত্রে দেখিতে পাইতেন। জন্মভূমি যশোর-সাগর-দাড়ীর অবিদূরে, নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির নিশাকালে পর্যটকের মনে যে কি ভাব জাগাইত, কেমন একটা ঘুমে নয়ন ছাইয়া আসিত, সে সমুদয় তিনি সাগরপারে থাকিয়াও অনুভব করিতে পারিতেন। ফলতঃ তাঁহার হৃদয় যথার্থই মধুময় ছিল। “বাঙ্গালার ফুল, বাঙ্গালার ফলে, বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার জলে” তাঁহার অন্তর বাহির ভরপুর হইয়া গিয়াছিল। ফরাসীতে বসিয়া তিনি যমুনার কথা ভাবিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতেন,—

“আর কি কঁাদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
মধুরার পানে চেয়ে ব্রজের সুন্দরী?
আর কি পড়ে লো এবে তোর তীরে খসি
অশ্রুধারা, মুকুতার কমরূপ ধরি?”

বলিয়া তাঁহার মধুর বাঁশরী বাজাইতেন। কতকাল হইল, বঙ্গের কবিকুঞ্জ মধু-হীন হইয়াছে, কিন্তু অজ্ঞাপিও বেন সে বাঁশীর সুর বাঙ্গালার বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। “শ্রামা” বঙ্গভূমিকে লক্ষ্য করিয়া মধুসূদন বলিয়াছিলেন—

“মধুহীন করো নাক তব মনঃ-কোকনদে।”

তাঁহার সে প্রার্থনা সফল হইয়াছে। বঙ্গভূমি বঙ্গের উপর মধুর স্মৃতি ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যত দিনের পর দিন বাইতেছে, ততই মধুর মধুর কবিতার রসে বঙ্গ অধিকতররূপে নিমগ্ন হইতেছে। সভ্যবৃন্দ, কৃষ্টিবাস, কালীদাসের দেশে, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্রের দেশে, জয়দেব, মুকুন্দরায়, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাসের দেশে মধুসূদনের জন্ম, যে দেশে নির্মল আকাশে বলাকার খেলা, শ্রাবণ বনানীতে শ্রাবাদোহনের সঙ্গীত, সুনীলতটিনীতে দাড়িমাঝির সারি-গান, সেই দেশে মধুসূদনের জন্ম, যেখানে সাময়িকালে নদীতীরে বটবৃক্ষের মূলে বসিয়া রাখাল বালক—

“হরি, বেলা গেল সন্ধ্যা হলো
পার করো আমারে”

বলিয়া গান ধরে, নদীর কূল কূল গীতিকার সহিত সেই রাখাল-সঙ্গীত মিশিয়া ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে মিলাইয়া যায়, মধুর সেই দেশে জন্ম,—তাঁহার উপর আবার সম্ভ্রান্ত বংশের অবতংস, ধনে মানে, কূলে শীলে সর্বোংশে তদানীন্তন সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সকল রকমেই স্পৃহণীয় অবস্থার, অভিজাত ও অবস্থাপন্ন পিতা-মাতার আদরের পুত্র মধুসূদন পরিবর্তিত। সর্বোপরি, বিধাতার ততালীকাদ, বাগ্‌দেবতার কৃপামৃত তাঁহার উপর বর্ষিত; রাজরাজেশ্বরের অক্ষয় ভাণ্ডারেও যে রত্ন নাই, শত শত সাম্রাজ্য-বিনিময়ে যে রত্নের লাভ করা যায় না, সেই সর্বোত্তম কবিত্বরত্নের অগ্নান মালা বীণাপাণি স্বহস্তে তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছিলেন,—সুতরাং তাঁহার সমকক্ষ কে?

কৃতকণে মধুসূদন ভক্তিগদগদ-কণ্ঠে বাগ্‌দেবতার চরণে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

“* * * * * মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, খেতভূঞ্জে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,

বান্ধীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন) ।
 তেমতি দাসেরে আসি দয়া কর, সতি !
 ———তব বরে চোর রত্নাকর,
 কাব্য-রত্নাকর কবি !
 উর তবে, উর, দয়ানয়ি !
 গাইব, মা ! বীররসে ভাসি
 মহাগীত, উরি দাসে, দেহ পদ-ছায়া ।”

মধুসূদনের প্রার্থনায় বীণাপাণি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। মায়ের বীণার পুত্র স্বরসংযোগ করিতে পাইয়াছিল। পুত্রের জীবন সার্থক হইয়াছে। আর সেই সঙ্গে তদেশ-বাসী বলিয়া এবং সেই কবি যে ভাষায় দিবাকরকল্প, সেই ভাষায় সেবক বলিয়া আনরাও ধন্ত ও কৃতকৃতার্ণ হইয়াছি। তাঁহার বিরচিত মধুচক্রে গোড়জন দিবারজনী আনন্দে মধু পান করিতেছে ও করিবে। বঙ্গভাষাকে তিনি যে অনর্থ সম্পদে সাজাইয়া গিয়াছেন, যে “কাঞ্চন-কঙ্ক-বিভাগ” বঙ্গভাষাকে উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার মহিমা কোন দিন ক্ষুণ্ণ হইবে না। বঙ্গ-কবিতাসাম্রাজ্যে তিনি সম্রাটের স্থান আসিয়াছিলেন, সম্রাটজন্যই যেমন হওয়া উচিত, তেমনই ভাবে বুঝি বা ততোধিকরূপে বঙ্গভাষাকে সাজাইয়া গিয়াছেন। কালের নিরঙ্কুশ বিধানে কত কি ভাঙিবে, গড়িবে, কিন্তু মধুসূদনের কবিত্বপ্রতিমার জ্যোতিঃ দিন দিন আরও বর্ধিত হইবে বই ম্যান হইবে না। মধুসূদনের জন্মে বঙ্গভাষার ও বঙ্গদেশের মর্যাদা-বৃদ্ধি হইয়াছে। আর তাঁহার স্থান একজন জাতীয় মহাকবিকে বৎসরান্তে অন্ততঃ একটি দিনও আমরা পূজা করিতে আসি বলিয়া, আমরাও ধন্ত হইতেছি।

আহা !

বঙ্গভাষা স্তূল্যিত কুসুম-কাননে
 কত লীলা করি,
 কঁদাইয়া গোড়-জন, সে কবি মধুসূদন
 গিয়াছে,—বঙ্গের মধু বঙ্গ পরিহারি ।
 যাও তবে কবির, কীর্তিরথে চড়ি !
 বঙ্গ অঁধারিয়া,

যথায় বান্ধীকি ব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
 রহিয়াছে সিংহাসন তোমার লাগিয়া ।



১৮

নারায়ণ

যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া
কবিতা-ভাণ্ডারে ;
অনন্ত কালের তরে, গোড়মন-মধুকরে,
পান করি, করিবেক বশস্বী তোমারে ।
(নবীনচন্দ্র)

শ্রীঅন্ততঃব মুখোপাধ্যায়।

নারায়ণ

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

তৃতীয় বর্ষ,

দ্বিতীয় খণ্ড,

তৃতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩২৪ সাল

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কণ্ঠের কোমল সৃষ্টি	... শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৬৫৯
২। স্বামী	... শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬৭২
৩। আহ্বান (কবিতা)	... শ্রীগিরীন্দ্র মোহিনী	৬৮৯
৪। বাংলার চিত্রকলা	... শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়	৬৯১
৫। কমলের দুঃখ	... শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	৭০৩
৬। অদৃষ্ট	... শ্রীঅপর্ণা দেবী	৭১০
৭। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	... শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী	৭১২
৮। সাহিত্যে "রূপান্তর"	... শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	৭২২
৯। দোসরা নম্বর	... শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী	৭২৯

কলিকাতা, ১০০ নং বহুবাজার স্ট্রিট.

"বহুবাজারী" প্রেসে,—ঐপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা]

[শ্রাবণ, ১৩২৪

কণ্ঠের কোমন মূর্তি

কবচুনি কণ্ঠের বণে। তিনি কবি, তপস্বী, সংযমী, অতি কঠোর। তিনি নৈতিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ চির-ব্রহ্মচারী। তিনি গৃহস্থাত্ম্যে এবেশই করেন নাই। ব্রহ্মচর্য্যই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। তিনি শিকড়ের শিকড় ঘেঁষে, নিজে ব্রত, উপবাস, হোম, যজ্ঞ করেন, আর কমে বাস করেন। শকুন্তলাকে তিনি কুটাইয়া পান, তাঁহার দস্তা হয়। তিনি তাহাকে পালন করেন। ক্রমে শকুন্তলার প্রতি তাঁহার পুত্র মেহ হয়, পুত্র মাতা হয়। কণ্ঠের মূর্তির মন একটু পলে। শাক্তব্রত ও শারদতী তাঁহার কঠোরতা ও সংযমের প্রতিমূর্তি, আর অননুষ্ঠান, মোক্ষমী ও প্রিয়ংবদী তাঁহার মেহের বাহার প্রতিমূর্তি।

শকুন্তলা-নাটকে কালিদাস এই পাঁচটি পাত্তের দ্বারা কবচুনিকে কুটাইয়া কুলিগাছেন। সুতরাং ইত্যাদির দস্তা-চর্চির একটু-তাল করিয়া বুঝা চাই। মহাত্ম্যভেদে এ পাঁচটির একটিও নাই। একা শকুন্তলা—কণ্ঠের আশ্রয়ে প্রতিপালিতা শিকড়। শকুন্তলা একাই সব করিয়াছেন। রাজার সঙ্গে শাক্তব্রতবিবাহেও শকুন্তলা একা। রাজসভার ব্যবহারের ছেলে নইয়াও শকুন্তলা একা। পরপুত্র্যে আশ্রয়ে শকুন্তলার একটি সখী ছিল; কিন্তু পরপুত্র্যে আসে কি কালিদাস আসে, সে কথা নইয়া এখনকার পুরাণকারদের বতায়ত আছে। সে কতকটি আমাদের এখানে বরকার নাই।

মহাত্ম্যভেদে একা শকুন্তলা বাহা করিয়াছেন, কালিদাস তাহারই মত এই পাঁচটিকে

সৃষ্টি করিয়াছেন। শকুন্তলার লালন-পালনে শকুন্তলার ভাল-মন্দ করায় এই পাঁচটিই কণ্ঠের সহায়। তিনি যেন একাই পাঁচ হইয়া তাঁহার জীবিত-সর্ব্ব শকুন্তলার অদৃষ্ট-বিধাতা হইয়াছেন। সুতরাং এই পাঁচটিরই পরিচয় আবশ্যক এবং শকুন্তলার জন্ত কে কি করিল, তাহাও জানা আবশ্যক। কূটস্থ ব্রহ্ম যেমন দূরে থাকিয়া কূটে—পর্কতশিখরে—থাকিয়া জগতের কার্যকলাপ দেখেন, কথ-মুনিও দূরে থাকিয়া শকুন্তলার ভাগাচক্র চালন করেন। তাঁহাকে কালিদাস উপস্থিত করেন না। কেবল একবার উপস্থিত করিয়াছিলেন—সে কেবল করুণার মূর্তি, স্নেহের মূর্তি, পিতার মূর্তি। তিনি অতি কঠিন সময়ে বাহির হইয়া আসিয়াছেন এবং একটি বিষম সমস্যা পূরণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সমস্যাটিও বড়ই বিষম। অল্প সময়ে তাঁহার মূর্তিগুলিই কাজ করিয়াছে। এই মূর্তিগুলির মধ্যে অননুগ্রহ আর প্রিয়ংবদা সর্বদাই শকুন্তলার সঙ্গে থাকে। একজন কেবল শকুন্তলাকেই লইয়া থাকেন; আর একজন শকুন্তলার হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান। একজন শকুন্তলার জন্ত ভাবেন; আর একজন শকুন্তলার জন্ত কাজ করেন। একজন সব্জেক্টিব সখী; আর একজন অব্জেক্টিব সখী। একজন তাঁহার পরিচর্যা করেন; আর একজন তাঁহার জন্ত ওকালতি করেন। একজন ধীর, আর একজন ধরতর। একজন কেবল শকুন্তলাকেই দেখেন; আর একজন চারিদিক দেখেন কেবল শকুন্তলার ভালর জন্ত। কিন্তু দুজনেরই স্নেহ সমান, মায়া সমান এবং শকুন্তলার প্রতি সমান টান। কালিদাস সেই জন্ত অনেক জাগ্রগায় দুজনকে দিয়া একই কথা বলাইয়াছেন, দেখাইয়াছেন, শকুন্তলার উপর সমান টান ত আছেই, তাহার উপর দুইজনে দুই উপায়ে শকুন্তলার মঙ্গল চিন্তা করেন। এখন দেখা যাক, দুজনে কি কি উপায়ে শকুন্তলার হিত করিলেন। প্রথম অননুগ্রহ। শকুন্তলার এতটুকু কষ্টও তিনি সহিতে পারেন না। শকুন্তলা যে দুলগাছে জল দেন, অননুগ্রহ তাহাতেও কষ্ট। বলিলেন, “তোমার চেয়েও গাছগুলিকে কথমুনি অধিক ভালবাসেন বোধ হয়; নহিলে তুমি নবমালিকা-ফুলের মত নরম, তোমার কেন গাছে জল দিতে বলিবেন?” শকুন্তলাও ঠিক জানেন যে, অননুগ্রহ তাঁহার অধিক টান টানেন, তাই যখন বাকল পরিয়া তাঁহার কষ্ট হইতেছিল, তিনি প্রিয়ংবদার কাছে না গিয়া অননুগ্রহকে বলিলেন, “বাকল বড় আঁট হইয়াছে, তুমি একটু লোল করিয়া দেও।” শকুন্তলা যখন বনজ্যোৎস্না নামে নবমালিকাগাছটিকে জল না দিয়াই সারিয়া বাইতেছেন, তখন অননুগ্রহই তাঁহাকে মনে করিয়া দিলেন; কারণ, তিনি জানেন, বনজ্যোৎস্না শকুন্তলার বড় আদরের জিনিস। তিনি চালাক নন, রত্নরস তাঁহার বড় একটা পছন্দ নয়। তাই যখন প্রিয়ংবদা রত্ন করিয়া বলিল, “অননুগ্রহ, জানিস, বনজ্যোৎস্নাকে শকুন্তলা এত ভালবাসে কেন?”

সে সরলা উত্তর করিল, “আমি বলিতে পারি না।” রাজা তাহাদের সামনে উপস্থিত হইয়া বধন জিজ্ঞাসা করিলেন, “তপস্বিকৃতাদের উপর কে অত্যাচার করিতেছে?” তখন অননুয়া আসিয়া বলিলেন, “না না, কেহ কিছু করে নাই, কেবল একটি ভোমরা আমাদের সখীকে বড় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।” তার পর রাজা বধন শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন গো, তোমাদের তপস্যার কোন বিষ হইতেছে না ত?” আর শকুন্তলা ভয়ে সম্মুখে জড়গড় হইয়া পড়িলেন, কথা কহিতে পারিলেন না। তখন অননুয়াই বলিল, “বধন এমন অতিথি পাইয়াছি, তখন আর কি আমাদের তপস্যার বিষ হইতে পারে?” শকুন্তলার উপর অতিথিসংকারের ভার, তাই তাঁকে বলিলেন, “যাও শকুন্তলা, অর্থের জন্ত কঁড়েতে গিয়া জল আন, এই জলেই উহার পা ধোয়া হইবে।” তিনিই শকুন্তলাকে মনে করাইয়া দিলেন, অতিথির সংকারই আমাদের কাজ; বলিলেন, “এস আমরা বসি।” রাজার পরিচয় অননুয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বধন “হত ইতি গজ” করিয়া আপনার পরিচয় দিলেন, তখন তিনিই বলিলেন, “তপস্বীরা আজ কৃতার্থ হইলেন।” রাজা বধন শকুন্তলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনিই সরলভাবে সে পরিচয় দিয়া দিলেন। শেষ কথাগুলো একটু সরমের কথা, তাই তাহার একটু বাধ-বাধ করিতেছিল। রাজা বধন বলিলেন, “আর বলিতে হইবে না, ইহার পর বাহা বাহা হইয়াছে, আমিই বুঝিয়া লইয়াছি, ইনি অপসারার মেয়ে।” তখন হাঁপ ছাড়িয়া অননুয়া বলিলেন, “আজ্ঞা হাঁ।” রাজা বধন জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ মেয়ে লইয়া মূনি কি করিবেন?” তখন কিন্তু অননুয়া তাহার জবাব দিলেন না। কারণ, এখানে একটু ওকালতির দরকার, সেটা তার অভ্যাস নাই। তাই প্রিয়ংবদা তাহার জবাব দিল। শকুন্তলা বধন প্রিয়ংবদার জবাব শুনিয়া চলিয়া বাইতে চাহিলেন, তখন আবার অননুয়ার দরকার হইল। তিনি বলিলেন, “এমন অতিথি পাইয়াছ, ইহার সংকার না করিয়া আপন ইচ্ছায় চলিয়া যাওয়া উচিত নহে।” হাতীর কথা উঠিলে রাজা বধন উঠিয়া বাইতে ব্যস্ত হইলেন, তখন অননুয়াই বলিলেন, “আরণ্য হাতীর ব্যাপারে আমরাও ভয়ে আকুল হইয়াছি। অনুমতি করেন ত আমরাও যবে যাই।”

শকুন্তলা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলে সখীরা পদ্যের পাতা দিয়া উহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন এবং হুজনে উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, পদ্যপত্রের বাতাস তোমার ভাল লাগিতেছে ত?” আর শকুন্তলা জবাবে বলিলেন, “তোমরা কি আমার বাতাস করিতেছ?” তখন হুজনেই বিষম হইলেন, কিন্তু কেন শকুন্তলার এত অসুখ হইল, সে কথা জিজ্ঞাসার ভার অননুয়াই লইলেন। সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাই, ভালবাসার সুখহঃখ ত আমরা জানি না; কিন্তু বইয়ে যেমন পড়িয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তুমি কাহাকেও ভালবাসিয়া বড় কষ্ট পাইতেছ, তা তাই, আমাদের কাছে

পুলে বস। কারণ জানিতে না পারিলে কেমন করিয়া প্রতীকারের চেষ্টা করিব?" শকুন্তলা যখন সব খুলিয়া বলিলেন, তখন অননুয়াই বলিলেন, "অতীশীঘ্র এবং অতি-গোপনে এখন রাজার সহিত মিলনের উপায় কি?" উপায় করায়, ওকালতির ভার অননুয়ার নহে। কিন্তু যে উপায়টি স্থির হইল, অননুয়া বলিলেন, সেটি বেশ হইয়াছে। কিন্তু তবুও শকুন্তলার মত না লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। যখন রাজার ও শকুন্তলার মনের ভাব এক, এ কথাটা ঠিক বুঝা গেল, তখন অননুয়াই রাজাকে প্রথম "বয়স্তু" বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং শকুন্তলা যে পাথরখানিতে বসিয়াছিলেন, তাহারই একপাশে বসিতে বলিলেন। আবার রাজা যখন বলিলেন, "আমার মনের ভাব অন্তরূপ, এ কথাটা আপনারা একেবারেই মনে করিবেন না"; তখন অননুয়াই বলিলেন, "বয়স্তু," আপনাদের ত অনেক পরিবার আছে। তবে আমাদের যাহাতে সখীর জন্ত এর পর দুঃখ করিতে না হয়, তাহা করিবেন।" এই কথাটি বলিয়া তিনি রাজাকে বলাইয়া লইলেন যে, "শকুন্তলাই তাঁহার পাটরাণী হইবেন।"

রাজা যে দিন ঋষিদের নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী যাইবেন, সে দিন অননুয়া ভারী চিন্তিত—সবই ত হ'ল ভাল; শকুন্তলার গার্হস্থ্যবিবাহ ত হ'ল। বয়স্তু ভাল হ'ল। কিন্তু যদি দেশে গিয়া আর পাঁচরাণীর পাল্লায় পড়িয়া রাজা শকুন্তলাকে ভুলিয়া যান? তাহাতে প্রিয়ংবদা বলিলেন, "ওরকম চেহারায় এতটা ভুল সম্ভব হবে না। তবে কর্তা বাড়ী আসিয়া কি বলেন, সেইটাই ভয়।" তাহা শুনিয়া অননুয়া বলিলেন, "সে ভয় বড় নাই। তিনি ত ভাল বরে মেয়ে দেবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। তা যদি নৈবই ভাল বর জুটাইয়া দিয়াছে, তিনি ত কৃতার্থই হইয়াছেন।" ছুজনেই কুল তুলিতেছিলেন। প্রিয়ংবদা বলিলেন, "কুল যথেষ্ট হইয়াছে।" অননুয়া বলিলেন, "না, এখনও হয় নাই। কেন না, এখন যে শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার পূজা করিতে হইবে।" এই সব কথা হইতেছে, এমন সময়ে কে চীৎকার করিয়া বলিল, "অম্মহং ভোঃ!" কথাটা প্রথমেই অননুয়ার কানে গেল। তিনি বলিলেন, "অতিথি আসিয়াছে গো।" ইতিমধ্যেই দুর্কাসা আসিয়া শাপ দিয়া চলিয়া গেলেন। অমনি প্রিয়ংবদা বলিলেন, "বাপ্ রে, অস্ত্র কোন অতিথি নয়, স্বয়ং দুর্কাসা।" অননুয়া বলিলেন, "তবে তুমি যাও, পায়ে পড়িয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা কর। আমি পাণ্ড অর্ঘ্য লইয়া যাইতেছি।" এই সময় অননুয়া হেঁচট খাইলেন, তাঁহার হাত থেকে ফুলের সাজি পড়িয়া গেল। তিনি জানিলেন, শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতারা প্রসন্ন নন। তিনি ফুলগুলি কুড়াইয়া লইতেছেন, এমন সময়ে প্রিয়ংবদা আসিয়া খবর দিলেন যে, তিনি দুর্কাসাকে নরম করিতে পারিয়াছেন। অননুয়ার বড়ই আনন্দ। আশ্রয় করিয়া শুনিতে লাগিলেন। যখন শুনিলেন যে, অভিজ্ঞান দেখাইলেই সব চুকিয়া যাইবে, তখন বলিলেন, "তা এখন আমাদের আশা হইল। রাজা নিজেই একটি আঙঠী

দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম খোলা আছে, শকুন্তলা সেইটি দেখাইলেই চলিবে।” আবার বলিলেন, “দেখ তাই প্রিয়ংবদা, এ কথাটা আমাদেরই মনে মনে থাকুক। শকুন্তলাকে এ কথাটা বলার দরকার নাই। সে ভয় পাবে।”

শকুন্তলার বিদায় যে দিন, সে দিন অননুয়া খুব সকালে উঠিয়া ভাবিতেছেন, “রাজা ত শকুন্তলার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিলেন না। শকুন্তলা নিতান্ত সরল, সে ত সে কথা বুঝিতে পারিতেছে না। কিন্তু এত দিন কোন খবর দিলেন না, এইটা কি রাজার উচিত হইয়াছে? আমার যে আর কোন কাজে আস্তা নাই। আমার যে কোনও কাজে হাত-পা এগোয় না। হয় ত দুর্কীসার শাপই রাজাকে সব কথা ভুলাইয়া দিয়াছে। কি করি, অভিজ্ঞান আঙুটিটা রাজার কাছে পাঠাইয়া দিব? কে বা যাবে? তপস্বী বেচারারা সমস্ত দিন আপন কাজ লইয়াই থাকে, কাকেই বা বলি? আবার সমীরই দোষ, স্মৃতির কঠোর কাছে যে সব কথা খুলিয়া বলিব, তাও ত পারি না। এ দিকে শকুন্তলা যে গর্ভবতী, কি করি, ভাবিয়া কুল পাই না।” তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে প্রিয়ংবদা আসিয়া খবর দিল, শকুন্তলা ঋগুরবাড়ী যাইতেছে। অননুয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। আগ্রহ করিয়া তনিতে লাগিলেন। দৈববাণীতে কথন সব খবর তুলিয়াছেন, জানিতে পারিয়া অননুয়ার বড় আনন্দ। তিনি প্রিয়ংবদাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “শকুন্তলা যাবে, বড় আনন্দের কথা; কিন্তু আমাদের বড় উৎকণ্ঠা হইতেছে। দেখ, নারিকেলের ঠুলিতে একছড়া বকুলের মালা রাখিয়াছি, সে ছড়াটা এই সময়ে সঙ্গে লইয়া যাই। গোয়ালচনা, তীর্থযাত্রিকা, দুর্কা এ সকলগুলি আমিই সংগ্রহ করি গিয়া। মঙ্গলকাজে ত এ সবগুলি দিতেই হবে।”

বিদায়ের সময়ে কণ্ঠমুনির সম্মুখে ছই সমীপে একেবারে কথা কহিয়াছেন। কেবল যখন শকুন্তলা চক্রবাকীকে দেখিয়া জনান্তিকে বলিলেন, “এই চকী পদ্মপাতার আড়ালে থাকিলেও চকা চীংকার করিয়া দেশ মাতাইয়া তুলে। অতএব আমি বাহা করিতেছি, অন্তে তাহা পারে না। অর্থাৎ আমি যে রাজাকে ছাড়িয়া এত দিন আছি, এমন থাকাটা খুব কঠিন।” তাহাতে অননুয়া বলিলেন, “এও চকা ছাড়িয়া রাত্রি কাটায়। জাগরণের রাত্রি পোহায় না। কেবল আশা থাকে বলিয়াই বিরহের দুঃখটা কতক সহ্য যায়।”

এই ত গেল অননুয়ার কথা। তিনি শাহু, সরল, ধীর, বেশ বিজ্ঞ, অনেক খবর রাখেন আর শকুন্তলাতেও একেবারে তন্ময়।

তাহার পর প্রিয়ংবদা, বড় চালাক, চতুর, চঞ্চল, বড় রহস্যপ্রিয়; সুবিধা পাইলে কাহাকেও ছাড়েন না। শকুন্তলা যখন “বাকল কমা হইয়াছে, প্রিয়ংবদা কসিয়া

দিয়াছে” বলিতেছিলেন, প্রিয়ংবদা তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, “দোষ বুঝি আমার? নিছের যৌবন আরম্ভ হইয়াছে, ছাত্তী কুলিয়া উঠিয়াছে, কাপড় কমা হইতেছে, দোষ বুঝি আমার?” তার পর গাছে জল দিতে দিতে বকুলগাছের কাছে আসিয়া বলিলেন, “শকুন্তলা, তুই ভাই, এই গাছটার তলায় একবার দাঁড়া। গাছে আর লতায় একবার মিল হউক।” আবার যখন বনজ্যোৎস্নার কথা পড়িল, প্রিয়ংবদা বলিল, “অনসূয়া, জানিস্, শকুন্তলা কেন বনজ্যোৎস্নাকে এত ভালবাসে? ও যেমন মনের মত গাছের সঙ্গে মিলিয়াছে, আমিও ঐ রকম মনের মত বর পাব।” শকুন্তলা ত রাগিয়াই অস্থির। অনসূয়া যখন অতিথিসংস্কারের জন্ত পান্ড ও অর্ঘ্যের আয়োজন করিবার জন্ত বাস্ত, প্রিয়ংবদা বুঝিলেন, এ অতিথি পান্ড অর্ঘ্য চায় না, মিষ্ট কথাই চায়, তাই বলিলেন, “আপনি এই ছায়ায় ছাতিমগাছের তলায় বসুন ও বিশ্রাম করুন।” অতিথিটি কে, জানিবার জন্ত প্রিয়ংবদাই প্রথম উৎসুক হন এবং কানে কানে অনসূয়াকে বলেন, “জান না ভাই, এ লোকটি কে?” অনসূয়া শকুন্তলার পরিচয় দিলে পর, যখন মেয়ে লইয়া মুনি কি করিবেন কথা উঠিল, তখন প্রিয়ংবদা বলিলেন, “ভাল বর পেলে মুনি কতটা দান করিবেন।” শকুন্তলা এই কথা শুনিয়া যখন ঘাইতে উদ্যত হইলেন, কিছুতেই ফিরিবেন না, তখন প্রিয়ংবদা বলিলেন, “আমার ছকলসী জল ধারিস্, দিয়া তবে যা।” শকুন্তলার ধার রাজা যখন আঙুটি দিয়া শোধ দিলেন, তখন প্রিয়ংবদা আঙুটিতে রাজার নাম দেখিয়া অতিথি যে রাজা, এইটিই অনুমান করিলেন। তখন অতিথি বলিলেন, “আমি রাজপুরুষ, রাজা আমার এই আঙুটি দিয়াছেন।” প্রিয়ংবদা পাকা উকীলের মত, কাঁক পাইয়া, বলিয়া উঠিলেন, “তা হ’লে ‘ত’ অর্থাৎ রাজার প্রসাদ হ’লে ‘ত’ এটি আপনার হাত থেকে তফাৎ করা কি উচিত?” সুতরাং রাজাকে আঙুটি ফিরাইয়া লইতে হইল। কালিদাস রাজা যে আঙুটি ফিরাইয়া লইয়াছিলেন, সে কথা বলেন নাই। কিন্তু লওয়াটা সত্য; কারণ, অভিজ্ঞান দেওয়ার সময় যদি প্রিয়ংবদার কাছে আর একটা আঙুটি থাকিত, সেটির কথা অবশ্যই উঠিত, “তাত” উঠে নাই। বাবার দিন শকুন্তলাকে রাজা যে আঙুটি দিয়াছিলেন, তাহারই কথা উঠিয়াছিল। আঙুটি ফিরাইয়া দিয়া প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে বলিলেন, “এখন তুমি ঘাইতে পার।” এটা মর্মান্তিক ঠাট্টা, শকুন্তলা গেলেন না।

শকুন্তলার অসুখের সময় তিনি খসখসে ও পদ্মের মৃণাল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শকুন্তলার যখন বড় অসুখ, পদ্মপাতার বাতাসও তাঁহার গারে লাগিতেছে না। অনসূয়া অসুখের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আর শকুন্তলা ইতস্ততঃ করিতেছেন,

তখন প্রিয়ংবদা বলিলেন, “এ ত বেশ বলিতেছে, আপনার অশ্লথ গোপন করিতেছে কেন? তোমার শরীর রোজ রোজ রোগা হইয়া যাইতেছে। কেবল লাবণ্যময়ী ছায়া তোমায় ত্যাগ করিতেছে না।” শেষ শকুন্তলা যখন সব খুলিয়া বলিলেন, তখন কাজের ভার প্রিয়ংবদা লইলেন। “সখি, বেশ হইয়াছে। তুমি যাকে ভালবাস, সে পুরুবংশের প্রদীপ! সাগর ছাড়িয়া কি অশ্রুত মহানদী গিয়া পড়ে? মাধবীলতা কি আমগাছ ছাড়া ভালগাছে শোভা পায়?” অননুয়া যখন বলিলেন, গোপনেও নীত্র মিলন হওয়া চাই, তখন বুদ্ধিমতী প্রিয়ংবদা বলিলেন, “নীত্র হ’তে বড় কষ্ট হবে না, কিন্তু গোপনে হওয়াই দুর্ঘট। কেন না, শকুন্তলাকে দেখিয়া অবধি রাজাও যেন কেমন কেমন হইয়া গিয়াছেন। দেখিলে বোধ হয় যেন, রাজ্যে তাঁহার ভাল ঘুম হয় না, তাই তিনি শুকিয়ে যাইতেছেন।” এটা অননুয়া দেখেন নাই; কিন্তু প্রিয়ংবদা দেখিয়াছেন। প্রিয়ংবদা বলিলেন, “তবে এখন শকুন্তলা আপনার মনের ভাব খুলিয়া লিখুক, আপনাকে রাজার হাতে সঁপিয়া দিক। একখানি পত্র লিখুক, আমি নির্মালোর ভিতর পুরিয়া রাজার হাতে পহুঁছিয়া দিব। গানের আকারেই লিখুক।” গান লেখা হইলে শকুন্তলা বলিলেন, “গান ত তৈয়ার হ’ল, লেখার উপায়?” উপস্থিতবুদ্ধি প্রিয়ংবদা বলিলেন, “পদ্মপাতার উপর নখের আঁচড় দিয়া লেখ।” রাজা যখন অননুয়ার কথায় শকুন্তলার সঙ্গে এক বিছানায় বসিলেন, তখন প্রিয়ংবদা বলিলেন, “আপনারা দুজনেই পরস্পরকে খুব ভালবাসেন, আমার কোন কথার দরকার নাই, তবে সখীকে বড় ভালবাসি, তাই জিজ্ঞাসা করিতে হয়।” রাজা অসুস্থতি দিলে, বলিলেন, “রাজার অধিকারে যদি কাহারও ছঃখ হয়, রাজার উচিত নয় কি সে ছঃখমোচন করা?” রাজা বলিলেন, “সেও আবার কথা, তাও আবার বলিতে হয়?” তখন প্রিয়ংবদা বলিলেন, “আমার সখী আপনার জন্য বড় কাতর, উহার কাতরতা যাহাতে যায়, তাহা করিয়া দিউন।”

শকুন্তলাকে রাজা পাটরাণী করিবেন স্বীকার করিলে ছই সখীরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। কিন্তু প্রিয়ংবদা বুঝিল, আমাদের আর এখানে থাকা উচিত নয়। উহার যাহা জানে করুক; বলিলেন, “অননুয়া, ঐ দেখ, হরিণ-শিশুটা আমাদের দিকে দৃষ্টি দিয়া রহিয়াছে, আহা, বেচারার মা কাছে নাই, মাকেই খুঁজিতেছে। এস আমরা উহার মাকে খুঁজিয়া দিই।” বলিয়া অননুয়াকে সঙ্গে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

রাজার বিদায়ের দিন যখন অতিথি “অন্নমহং ভোঃ” বলিলেন, তখন প্রিয়ংবদা বলিলেন, “ঘরের কাছে শকুন্তলা আছে, তবে কি না, তাহার মন এখন তাতে নাই।” ছরীসার শাপ যখন শোনা গেল, তখন প্রিয়ংবদা প্রথম বলিলেন, এ ত যে সে অতিথি নয়, স্বয়ং ছরীসা এবং অননুয়ার কথায় দোড়িয়া ছরীসাকে ধরিলেন,

পারে ধরিয়া তাঁহাকে নরম করিলেন এবং শাপের একটা অবমান করিলেন। সমস্ত কথা অননুগ্ৰাহকে বলিলেন এবং বাইতে বাইতে শকুন্তলাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, “দেখ দেখ, শকুন্তলা বাঁ হাত গালে দিয়া কেমন ভাবিতেছে। যেন একখানি ছবি। রাজার চিন্তার ওর এখন আপনার কথাই মনে নাই, তাতে আবার অতিথি।”

শকুন্তলার বিদায়ের দিন প্রিয়ংবদাই অননুগ্ৰাহকে খবর দিল। শকুন্তলা আজ খণ্ডরবাড়ী যাবে। অননুগ্ৰাহ ত শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল, আর ভাবিয়া আকুল হইতেছিল। সে কাশ্মীরের আসা হইতে দৈববাণী শোনা ও শকুন্তলার যাওয়ার উজ্জোগ সব অননুগ্ৰাহর কাছে গল্প করিল। শকুন্তলাকে সাজাইতে হইবে, প্রিয়ংবদা ফুলের মালা গাধিতে লাগিল। এমন সময়ে হস্তিনাপুর বাইবার জন্ত শিব্যদের ডাক পড়িল। প্রিয়ংবদার কথায় তাহার দুইজনেই সেই দিকে বাইতে লাগিল। প্রিয়ংবদা বলিল, “ঐ দেখ, শকুন্তলা সকালেই ‘শিখাসম্মুখীন’ মান করিয়া অর্থাৎ মাথা ধুইয়া, ঐখানে দাঁড়াইয়া আছেন। আলীকাদ শেষ হইয়া গেলে সখীরা শকুন্তলাকে সাজাইতে লাগিলেন। প্রিয়ংবদা বলিলেন, “এ রূপ অলঙ্কারেরই উপযুক্ত। ফুলের মালার ইহার অবমান করা হয়।” বনদেবতাদের দেওয়া অলঙ্কার আনিলে প্রিয়ংবদা বলিলেন, “বনদেবতারা যখন এত অনুগ্রহ করিয়াছেন, তখন বোধ হয়, রাজার ওখানে তুমি রাজলক্ষ্মী ভোগ করিবে।” বাইবার সময় যখন শকুন্তলা বলিলেন, “আশ্রমত্যাগ করিয়া বাইতে আমার আর পা উঠিতেছে না;” তখন প্রিয়ংবদা বলিলেন, “তুমিই যে কেবল তপোবন-বিরহে কাতর, এমন নহে। তপোবনেরও কি দশা হইয়াছে, দেখ। হরিণের মুখ থেকে কুশের গ্রাস পড়িয়া বাইতেছে, ময়ূর নাচিতেছে না, গাছের ডাল থেকে শাদা পাতা করিয়া পড়িতেছে—বোধ হইতেছে, বেন তাহার চোখের জল ফেলিতেছে।”

কালিদাস এক একটি সখীদ্বারা এতগুলি কথা বলাইয়াছেন। যাহার যেমন স্বভাব, যাহার যেমন প্রকৃতি, তাহার মুখে সেই কথাই বলাইয়াছেন। কিন্তু দুজনেই ত সখী। শকুন্তলার অনেক কাজে দুজনেরই সমান টান, কিছুই ইতরবিশেষ নাই। সেই জন্য কালিদাস অনেক জায়গায় দুজনেরই মুখে এক সময়ে একই কথা বাহির করিয়াছেন। ষ্টেজডিরেক্সন দিয়াছেন “সংগী”—একেবারে দ্বিবাচনে। সেইগুলি একবার পড়িলে দুটি সখীর প্রকৃতি বেশ বুঝা যাইবে। প্রথম রাজা যখন আশ্রমে ঢুকিলেন, দূর হইতে তাঁহার কানে গেল—“ইন্দো ইন্দো সখীয়ো” “সখীরা এই দিকে এই দিকে”। রাজা প্রথম বুঝিতে পারিলেন না, এটা মানুষের শব্দ কি দূরে বনের গুঞ্জন, কি পাখীর ডাক, কি দূরস্থ সঙ্গীতের ধ্বনি। তাই বলিলেন, “যেন দূরে কে

আলাপ করিতেছে।” কালিদাস এখানে ঐ যে “আলাপ ইব শ্রমতে” লিখিয়াছেন এবং “ইব” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, উহার অর্থ অনেক। সে কথা থাক।

গোড়ায়ই কালিদাস বলিয়াছিলেন যে, শকুন্তলার দুই সখীর প্রতিই সমান টান। তিনি দুজনে বড় ইতরবিশেষ করেন না। সেটা জেনে রাখা প্রেক্ষকের পক্ষে বড় দরকার। তার পর অনেককণ দুজনে নানা কথাবার্তা হইলে পর, ভোমরাটা যখন শকুন্তলাকে বড় জালাতন করিতেছে, আবার শকুন্তলা দুই সখীকেই পরিত্রাণের দ্রুত ডাকিলেন, তখন দুই জনেই বলিয়া উঠিল, “আমরা তোমার পরিত্রাণ করিবার কে ? দৃশ্যমুখে ডাক। তপোবন “ত” রাজাই রক্ষা করেন।” এ জায়গায় দুই সখীর মুখ থেকেই এক কথা বাহির হইল। রাজা যখন সত্য সত্যই আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন দুজনেই সমান আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আবার যখন শকুন্তলা ও রাজার আকার-প্রকার দেখিয়া দুজনেই বুঝিলেন, একটা কিছু হইয়াছে, শকুন্তলা রাজাকে ভালবাসিয়াছে, রাজাও শকুন্তলার রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছেন ; তখন দুজনেই শকুন্তলাকে আস্তে আস্তে বলিলেন, “শকুন্তলা, আজ যদি বাবা এখানে থাকিতেন।” শকুন্তলা বলিলেন, “তা হ’লে কি হ’ত,” “আপনার জীবনসর্ব্বস্ব দিয়াও এমন অতিথির সৎকার করিতেন।” এ জায়গায় কেহ মনে করিতে পারেন, এ কথাটা প্রিয়বদার মুখে দিলেই ভাল হইত। সেই ঠাট্টা ভালবাসে, তারই মুখে শোভা পাইত। অননুয়া গম্ভীরা, তার মুখে তত শোভা পায় না। কিন্তু আসল কথাটা এই যে, এমন একটা সুযোগ পেলে যতই ভালমানুষ হউক, কোন মেয়েই ছাড়ে না। তাই কালিদাস দুটি মেয়ের মুখেই ঠাট্টাটা তুলিয়া দিয়াছেন।

রাজা আবার যখন বলিলেন, “আমি আপনাদের সখীর সম্বন্ধে গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিব”, তখন দুজনেই বলিলেন, “এ ত আপনার অনুগ্রহ, এর জন্ত আবার প্রার্থনা কেন ?” দুজনেই যেমন রাজার পরিচয় পাইতে ব্যস্ত, তেমনি দুজনেই শকুন্তলার পরিচয় দিতেও ব্যস্ত। রাজা যখন ছকলসী জলের বদলে আঙুটীটি দিলেন, তখন দুজনেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন। দুজনেই আশ্চর্য্য হইয়াছেন, আনন্দিত হইয়াছেন, দুজনেরই যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার পথ হইয়াছে। আবার যখন হাতীর উপদ্রবে সকলেই আপন আপন জায়গায় বাইতে উত্তত, তখন দুই সখী একবাক্যে বলিলেন, “আজ ভাল করিয়া অতিবিসংকার করিতে পারিলাম না। তাই লজ্জা হয় বলিতে, আবার কি দেখা হবে ?”

শকুন্তলা একখানা বড় পাখরে শুইয়া আছেন, তার উপর ফুলের চাদর বিছান, আর সখীরা বাতাস করিতেছে, তখন দুই সখীই একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “পদ্মপত্রের বাতাস তোমার ভাল লাগিতেছে ত ?” শকুন্তলার জবাবে দুজনেরই মুখে বিষাদের ছায়া

পড়িয়া গেল। হুজনে হুঃখে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। শকুন্তলা যখন গান রচনা করিতেছেন, কিন্তু পাছে রাজা তাচ্ছল্য করেন, সেই ভয়ে একটু কাতরও হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে একটু উৎসাহিত করা হুজনেরই দরকার, তাই হুজনেই বলিলেন, “হাতী আপনার শরীর দেখিতে পায় না, মনে করে, আমি কত ছোট। তোমারও ভাই হয়েছে তাই! তুমি আপনার গুণ জ্ঞান না, চাঁদের কিরণে শরীর জুড়ায়। পৃথিবীতে কে এমন আছে যে, আঁচল দিয়া চাঁদের আলো গারে পড়িতে দেয় না?” শকুন্তলার রূপ যে অপরূপ, আর তাহার গুণও যে অনেক, তাহা ছই সখীরই ঐক্য বিশ্বাস। শকুন্তলার গান বাধা হইয়া গেলে হুজনকেই শুনাইতে চাহিলেন। হুজনেই মন দিয়া শুনিলেন। রাজা যখন প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, শকুন্তলাই তাঁহার পাটরাণী হইবেন, তখন হুজনেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, “আঃ! বাচ্চাম!”

অনন্তর ও প্রিয়ংবদা হুজনেই লতার ঘর হইতে চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। শকুন্তলা যখন বলিলেন, “তোমাদের হুজনের একজন আমার কাছে থাক। নহিলে আমি একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িব।” তাহাতে হুজনেই বলিলেন, “যিনি সমস্ত পৃথিবীর আশ্রয়, তিনি যখন তোমার নিকটে আছেন, তখন তুমি নিরাশ্রয় কিসে?”

শকুন্তলাকে স্বত্তরবাড়ী পাঠাইবার সময়ে যখন তাপসীরা আশীর্বাদ করিয়া গেলেন, ছই সখীই একেবারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার মান হইয়াছে ত?” শকুন্তলা হুজনকেই আদর করিয়া বসাইলেন। উভয়েই মাল্লাভবোর দ্বারা তাঁহাকে সাজাইতে চাহিলেন। শকুন্তলা বলিলেন, “এখন এটা আমার ভাগ্য করিয়া মানিতে হইবে। আর আমার ‘ত’ সখীদের হাতে এ রকম সাজসজ্জা হইবে না”, বলিয়া কাদিতে লাগিলেন। হুজনেই বলিয়া উঠিলেন, “এটা মঙ্গলের সময়, এখন কাদিতে নাই।” আবার যখন ঋষিকুমারেরা রাশি রাশি অলঙ্কার আনিয়া দিল, তখন হুজনেই বিপদে পড়িলেন, অলঙ্কার কোথায় কি কি পরাইতে হয়, কেহই জানেন না। তখন হুজনেই একস্থরে বলিলেন, “আমি ত কখন অলঙ্কার কাহাকে বলে, জানি না। তবে অনেক ছবি আঁকিয়াছি ও দেখিয়াছি, সেইমত করিয়া সাজাই।” এখানে কালিদাস একবচন প্রয়োগ করিয়াছেন। হুজনেই আপনার আপনার কথা বলিয়াছেন; কিন্তু একবচনেই বলিয়াছেন, “আমরা” বলেন নাই। সাজান হইয়া গেলে হুজনেই বলিলেন, “সাজান শেষ হইয়াছে। এখন ঢেলীখানি পর।” যখন শকুন্তলা তাঁহার বড় আদরের বনজ্যোৎস্নাকে ছই সখীর হাতে সঁপিরা দিয়া গেলেন; তখন হুজনেই শোকে ও যোহে আচ্ছন্ন হইয়া বলিলেন, “আমাদের ভাই কাহার হাতে সঁপিরা দিলে?” বিদায়ের সময় অন্ত সকলের কাছে বিদায় লইয়া শকুন্তলা সখীদের কাছে আসিলেন; বলিলেন, “তোমরা হুজনে

আমার একবারে আলিঙ্গন কর, কোল দাও।” সখীরাও তাহাই করিল। তখন দুজনেই বলিলেন, “যদি রাজা অভিজ্ঞান চাহিয়া বসেন, তাঁহাকে এই অঙ্গুরীটি দেখাইও।” শকুন্তলা এ কথার অত্যন্ত ভীত হইলেন। অত প্রণয়—অত ভালবাসা—আবার অভিজ্ঞান চাহিবে? শকুন্তলা চলিয়া গেলে দুজনেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “হায় হায়, মাঝে বন পড়িয়া গেল, আর যে শকুন্তলাকে দেখা যায় না।” তাঁহারা দুজনেই শকুন্তলার পথের দিকে চাহিয়াছিলেন, যতক্ষণ দেখা যাইতেছিল, একবারও চক্ষু ফিরাইতে পারেন নাই। এখন গাছের আড়াল পড়িয়া গেল, “আর দেখা যায় না” বলিয়া উঠিলেন। দুজনেরই এখন কথের আশ্রয় শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কথের আর এক ককণামূর্তি তাঁহার ভগিনী গৌতমী। কথ বিদেশে গেলে শকুন্তলা আশ্রমের কত্রী হইলেও, গৌতমী আছেন, তিনিই ভরসা। প্রিয়ংবদা যখন নানারকম ঠাট্টা-তামাসা করিয়া শকুন্তলাকে একটু জ্বালাতন করিলেন, তখন শকুন্তলা রাগিয়া বলিলেন, “আমি বাই, প্রিয়ংবদা বাজে কথা বলিতেছে, আৰ্য্যা গৌতমীকে বলিয়া দিই গিয়া।” শিষ্য যখন কুল আনিতে গিয়া শুনিল, শকুন্তলার বড় অসুখ, সে বলিল, “আমি গৌতমীর হাতে শাস্তিজন পাঠাইয়া দিতেছি।” গৌতমী যখন লতাগৃহে বাইতেছেন, সখীরা দুজনেই তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেলেন। তিনি গিয়াই শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “একটু ভাল আছ ত?” শকুন্তলা “হাঁ আছি” বলিলে, তিনি তাঁহার মাথায় শাস্তি-জন দিয়া বলিলেন, “যদি কিছু কষ্টের থাকে, এই শাস্তিজলেই তোমার শরীর স্বচ্ছন্দ হইবে।” তাহার পর বেলা আর নাই দেখিয়া শকুন্তলাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

শকুন্তলা স্বপ্নরবাড়ী বাইবার সময় যখন তাপসীরা তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন, গৌতমীও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তাপসীরা আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেলে গৌতমী রহিয়া গেলেন। ঋষিকুমারেরা অলঙ্কার আনিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা এ সব কোথায় পাইলে?” উত্তর হইল, “তাঁত কাঞ্চপের প্রভাবে।” গৌতমী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি মানসী সিক্তি?” উত্তর হইল “না। তিনি আমাদের বলিয়াছিলেন, শকুন্তলার জন্ম বড় বড় গাছ থেকে ফুল আন, আমরা ফুল আনিতে গিয়া এই সব পাইয়াছি; কোন গাছ গর-দের সাড়ী দিয়াছে, কোন গাছ আন্তা দিয়াছে, কোন কোন গাছে আবার বনদেবতারা হাতের পৌঁচাটি বাহির করিয়া এক একখানি করিয়া গহনা দিয়া-ছেন।” কথ আসিতেছেন দেখিয়া গৌতমী শকুন্তলাকে বলিলেন, “এই তোমার

বাপ আসিতেছেন। তাঁহার চোখ দিয়া আনন্দের স্রোত ছুটিতেছে, যেন চোখ দিয়াই তোমায় কোলে করিতেছেন। উহাকে নমস্কার কর।” কথ আশীর্বাদ করিলে গৌতমী বলিলেন, “এ তোমার আশীর্বাদ নয়—‘বর’!” আশীর্বাদ ফলিতেও পারে, না ফলিতেও পারে, কিন্তু বর ফলিবেই। তাই ভগিনী গৌতমী ভাইএর আশীর্বাদকে “বর” করিয়া দিলেন। গুরু ভট্টাচার্য্যদিগের বাড়ী এরূপ হু একটি পিসীমা প্রায়ই থাকেন—“এ কথা যখন দাদা বলিয়াছেন, এ কখন বার্থ হইবার নহে।” গৌতমীও আমাদের সেই পিসীমা। যখন কোকিল ডাকিয়া উঠিল, যখন বনদেবতারা কোকিলের মুখে শকুন্তলাকে স্বচ্ছন্দমনে বিদায় দিলেন, তখন পিসীমা বলিলেন, “বাহু, ভপোবনদেবতারা তোমায় বড় ভালবাসেন, তাঁরা যেন তোমার জাতি, তাঁহারা তোমায় বাইবারি অনুমতি দিতেছেন; বিদায় দিতেছেন। তাঁহাদের প্রণাম কর।” শকুন্তলা গিয়া কি করিতে হইবে, সে বিষয়ে উপদেশ দিয়া কথ যখন “গৌতমী কি মনে করেন?” জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, “নূতন বোকে এই উপদেশই দিতে হয়। শকুন্তলা, কথাগুলি সব মনে করিয়া রাখিও।”

গৌতমী যখন দেখিলেন, ডুমুরগাছের তলার বসিয়া কথ ও শকুন্তলার কথা ও কান্নাকাটি আর গামে না, শাস্ত্রীর “সূর্য্য মাথার উপর উঠিল, শকুন্তলা, শীঘ্র শীঘ্র কথাবার্তা সারিয়া লও” বলিয়াও উহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না, তখন নিজেই বলিয়া উঠিলেন, “বাওয়ার সময় উত্তরিয়া গেল। বাবাকে ফিরিয়া বাইতে বল, অথবা শকুন্তলাকে বলিয়াই বা কি হইবে? সে ক্রমেই নানা কথা কহিতে থাকিবে, ক্রমেই কালক্ষেপ করিবে। দাদা, আপনিই ফিরুন, থামুন।” তাহার পর কোলাকুলির পালা পড়িল, ফিরিবার চেষ্টা হইল।

রাজবাড়ীতে শিষ্টাচারের পর যখন শাস্ত্রীর ঘনি-আজ্ঞা শুনাইয়া রাজাকে বলিলেন, “আপনি শকুন্তলাকে ‘সহধর্ম্মাচরণের’ জন্ত গ্রহণ করুন,” তখন গৌতমী বলিলেন, “আমি কিছু বলিতে চাই; কিন্তু আমার কোন কথা বলিবার কোনও পথ তোমরা রাখ নাই। ইনিও গুরুজনের অপেক্ষা করেন নাই। ভূমিও বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা কর নাই। পরস্পরে এরূপ ব্যবহার করিলে অস্ত্রে এক জনের হইয়া আর এক জনকে কি বলিতে পারে?”

যখন রাজা ও শাস্ত্রীর বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছেন, কথা-কাটাকাটি হইতেছে, গৌতমী বলিলেন, “বাহু, লজ্জা করিও না, তোমার মুখের কাপড় খুলিয়া দিই, তা হলে রাজা তোমার চিনিতে পারিবেন।” যখন অঙ্গুরী না পাইয়া শকুন্তলা কোণে হুখে গৌতমীর দিকে চাহিলেন, তখন গৌতমী বলি-

লেন, “ইন্ডের ঘাটে শচীতীর্থে জল লইয়া নমস্কার করিবার সময় তোমার আংটাটি পড়িয়া গিয়াছে।” রাজা একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, “জীলোকের কি উপস্থিতবুদ্ধি!” রাজা আবার যখন শকুন্তলা মিছা কথা বলিয়া তাঁহাকে ছলনা করিতেছেন, বলিয়া উঠিলেন, তখন গৌতমীর আর সহিল না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, “এ রকম কথাটা বলা একেবারেই ভাল নয়। ইনি ভপোবনেই পালিত, জুয়াচুরি কাহাকে বলে, তাহার লেশও জানেন না।” তখন রাজা বলিলেন, “বুড়ি, পশুপক্ষীদের মীথো ও স্বীণ্ডলা বড়ই চালাক হয়, মানুষ ত হবেই। দেখ না, কোকিলগুলা কাকের বাসায় রাখিয়া কেমন ডিম ফুটাইয়া লয়।” রাজা ও শাক্ত’রবে যখন বোরতর বিবাদ উপস্থিত, শায়বত বলিলেন, “আর কথায় কাজ কি, গুরু বলিয়া দিয়াছিলেন, শকুন্তলাকে পঁহুছিয়া দিতে, আমরা দিলাম। ইনি আপনার ধর্মপত্নী—আপনি ইহাঁকে গ্রহণ করুন বা না করুন, সে আপনার ইচ্ছা ও অধিকার” বলিয়াই গৌতমীকে বলিলেন, “তুমি আগে আগে যাও।” তাহাতে শকুন্তলা সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। তখন গৌতমী বলিলেন, “বাবা শাক্ত’রব, এ যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। স্বামী যখন ত্যাগই করিল, তখন আর কি করেই বা বেচারা?” এইখানে গৌতমীর কথা শেষ হইল।

আবার বলি, অননুয়া শকুন্তলার জন্ত দিন-রাত ভাবেন, আপনার ভাবনার চেয়ে শকুন্তলার ভাবনা তাঁহার বেশী। প্রিয়ংবদাও নিজের জন্য কিছুই করেন না। যাহা কিছু করেন শকুন্তলারই ভালর জন্য। আর গৌতমী, শকুন্তলার প্রতি তাঁহার স্নেহ অপার, শকুন্তলার প্রতি তাঁহার বিশ্বাস অপার। শকুন্তলার জন্য তিনি মান অপমান কিছুই জ্ঞান করেন না। বলিতে কি, তিনিই শকুন্তলার এক রকম মা।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

স্বামী

সৌদামিনী নামটা আমার বাবার দেওয়া। আমি প্রায়ই ভাবি, আমাকে এক বছরের বেশী ত তিনি চোখে দেখে যেতে পাননি, তবে এমন ক'রে আমার ভিতরে বাহিরে মিলিয়ে নাম রেখে গিয়েছিলেন কি কোরে? বৌদ্ধমন্ত্রের মত এই একটি কথা আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের ইতিহাসটাই যেন বাবা ব্যক্ত ক'রে গেছেন।

রূপ? তা আছে মানি; কিন্তু, না গো না, এ আমার দেমাক নয়—দেমাক নয়। বুক চিরে যে দেখান যায় না, নইলে এই মুহূর্তেই দেখিয়ে দিতুম, রূপ নিয়ে গোরব করবার আমার আর বাকি কিছু নেই—একেবারে কিছু নেই! আঠারো—উনিশ? হ্যাঁ, তাই বটে। বয়স আমার উনিশই। বাইরের দেহটা আমার তার বেশী প্রাচীন হতে পারনি। কিন্তু এই বুকের ভিতরটার? এখানে যে বুড়ী তার উনআশী বছরের শুকনো হাড়গোড় নিয়ে বাস ক'রে আছে, তাকে ত দেখতে পাচ্চো না? পেলে এতক্ষণ ভয়ে অঁৎকে উঠতে!

একলা ঘরের মধ্যে মনে হলেও ত আজও আমার লজ্জায় মরতে ইচ্ছা করে; তবে এ কুঁলকের কালী কাগজের ওপর ঢেলে দেবার আমার কি আবশ্যক ছিল! সমস্ত লজ্জার মাথা খেয়ে সেইটেই ত আজ আমাকে বলতে হবে। -নইলে আমার মুক্তি হবে কিসে?

সব মেরের মত আমিও ত আমার স্বামীকে বিয়ের মস্তরের ভিতর দিয়েই পেয়েছিলুম। তবে, কেন তাতে আমার মন উঠল না। তাই যে দামটা আমাকে দিতে হ'ল, আমার অতি বড় শত্রুর জন্তেও তা একদিনের জন্তে কামনা করিনে। কিন্তু দাম আমাকে দিতে হ'ল। যিনি সমস্ত পাপ-পুণ্য, লাভ-ক্ষতি, শ্রায়-অশ্রায়ের মালিক, তিনি আমাকে একবিন্দু রেহাই দিলেন না। কড়ার ক্রান্তিতে আদায় ক'রে, সর্বস্বান্ত ক'রে যখন আমাকে পথে বার কোরে দিলেন—লজ্জা-সরমের আর যখন কোথাও কিছু অবশিষ্ট রাখলেন না—তখনই শুধু দেখিয়ে দিলেন, ওরে সর্ব-নাশী, এ তুই করেছিস্ কি? স্বামী যে তোরা আত্মা! তাঁকে ছেড়ে তুই বাবি কোথায়? একদিন-না-একদিন তোরা ঐ শূন্য বুকের মধ্যে তাঁকে যে তোরা পেতেই হবে। এ জন্মে হোক, আগামী জন্মে হোক, কোটি জন্ম পরে হোক, তাঁকে যে তোরা চাই-ই। তুই যে তাঁরই।

জানি, বা হারিয়েছি, তার অনন্ত গুণ আজ ফিরে পেয়েছি। কিন্তু তবু যে এ কথা কিছুতেই ভুলতে পারিনি, এটা আমার নারী-দেহ। আজ আমার আনন্দ রাখবার জায়গা নেই, কিন্তু বাথা রাখবারও যে ঠাই দেখি না প্রভু! এ দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু বে অহোরাত্র কাঁদচে—ওরে অস্পৃশ্য, ওরে পতিতা, আমাদের আর বেঁধে পোড়াসনে—আমাদের ছুটি দে, —আমরা একবার ম’রে বাঁচি!

কিন্তু থাক সে কথা।

বাবা মারা গেলেন, একবছরের মধ্যে নিয়ে মা বাপের বাড়ী চলে এলেন। মামার ছেলেপিলে ছিল না, তাই গরীবের বর হলেও আমার আদর বন্ধের কোন ক্রটি হ’ল না। বড় বয়স পর্যন্ত তাঁর কাছে বসে ইংরাজী বাঙলা কত বই না আমি পড়েছিলাম।

কিন্তু মামা ছিলেন ঘোর নাস্তিক। ঠাকুর-দেবতা কিছুই মানতেন না। বাড়ীতে একটা পূজা-অর্চনা, কি বার-ব্রতও কোন দিন হতে দেখিনি—এ সব তিনি দৃঢ়ক্ষে দেখতে পারতেন না।

নাস্তিক বই কি! মামা মুখে বলতেন বটে তিনি ‘Agnostic’ কিন্তু সেও ত একটা মস্ত ফাঁকি! কথাটা যিনি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি ত শুধু লোকের চোখে ধূলা দিবার জন্তেই নিজেকে আগাগোড়া ফাঁকির পেছনে আর একটা আকাশ-পাতাল জোড়া ফাঁকি জুড়ে দিয়ে আশ্রয় করেছিলেন! কিন্তু তখন কি ছাই এ সব বুঝেছিলাম! আসল কথা হচ্ছে স্থায়ী চেয়ে বালির তাতেই গায়ে বেশি ফোঁস পড়ে। আমার মামারও হয়েছিল সেই দশা।

শুধু আমার মা বোধ করি যেন লুকিয়ে ব’সে কি সব করতেন। সে কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ জানতে পেত না। তা মা বা খুসি করুন, আমি কিন্তু মামার বিপ্তে ঘোল আনার জায়গায় আঁঠার আনা শিখে নিয়েছিলাম।

আমার বেশ মনে পড়ে, দোরগোড়ায় সাধু-সন্ন্যাসীরা এসে দাঁড়ালে সঙ্ক-দেখ-বার জন্তে ছুটে গিয়ে মামাকে ডেকে আনতুম। তিনি তাদের সঙ্গে এমনি ঠাট্টা শুরুর ক’রে দিতেন যে, বেচারারা পালাবার পথ পেত না। আমি হেসে হাততালি দিয়ে গড়িয়ে লুটিয়ে পড়তুম। এমনি করেই আমার দিন কাটছিল।

শুধু মা এক-একদিন ভারি গোল বাধাতেন। মুখ ভার ক’রে এসে বলতেন, “দাদা, সত্তর ত দিন দিন বয়স হচ্ছে, এখন থেকে একটু খোঁজা-খুঁজি না করলে সময়ে বিয়ে দিবে কি ক’রে?”

মামা আশ্চর্য্য হয়ে বলতেন, “বলিস্ কি গিরি, তোর মেয়ে ত এখনো বারো পেরোয়নি—এর মধ্যেই তোর—সাহেবদের মেয়েরা ত এ বয়সে—”

মা কাদ কাদ গলায় জবাব দিতেন, “সাহেবদের কথা কেন ভুলচ দাদা,

আমরা ত সত্যিই আর সাহেব নই ! ঠাকুর-দেবতা না মানো, তাঁরা কিছু আর ঝগড়া করতে আসছেন না, কিন্তু পাড়ারগায়ের সমাজ ত আছে ? তাকে উড়িয়ে দেবে কি ক'রে ?”

মামা হেসে বলতেন, “ভাবিস্নে বোন, সে সব আমি জানি । এই যেমন তোকে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছি, ঠিক এমনি ক'রে আমাদের নচ্ছার সমাজটাকেও হেসে উড়িয়ে দেব ।”

মা মুখ ভার করে বিড়্ বিড়্ করে বকতে বকতে উঠে যেতেন । মামা গ্রাহ্য করতেন না বটে, কিন্তু আমার ভারি ভয় হ'ত । কেমন ক'রে যেন বুঝতে পারতুম, মামা বাই বলুন, মার কাছ থেকে আমাকে তিনি রক্ষা করতে পারবেন না ।

কেন যে বিশ্বের কথায় ভয় হতে শুরু হয়েছিল, তা বল্চি । আমাদের পশ্চিম পাড়ার বুক চিরে যে নালাটা গ্রামের সমস্ত বর্ষার জল নদীতে ঢেলে দিত, তার দুই পাড়ে যে দু'ঘরের বাস ছিল, তার এক ঘর আমরা, অল্প বয়সে গ্রামের জমিদার বিপিন মহুমদার । এই মহুমদার-বংশ যেমন ধনী, তেমনি দুর্দান্ত । গায়ের ভেতরে বাইরে এদের প্রতাপের সীমা ছিল না । নরেন ছিল এই বংশের একমাত্র বংশধর ।

আজ এত বড় মিথোটা মুখে আনতে আমার যে কি হচ্ছে, সে আমার অন্তর্যামী ছাড়া আর কে জানবে বল, কিন্তু তখন ভেবেছিলাম, এ বুঝি একটা সত্যি জিনিস,— সত্যিই বুঝি নরেনকে ভালবাসি ।

কবে যে এই মোহটা প্রথম জন্মেছিল, আমি বলতে পারি না । কলকাতার সে বি, এ পড়ত ; কিন্তু ছুটির সময় বাড়ী এলে মামার সঙ্গে ফিলজফি আলোচনা করতে প্রায়ই আসত । তখনকার দিনে ‘agnosticism’ই ছিল বোধ করি লেখাপড়া-জানাদের ক্যাস্যান । এই নিরৈই বেশী ভাগ তর্ক হ'ত । কতদিন মামা তাঁর গৌরব দেখাবার জন্তে নরেন বাবুর তর্কের জবাব দিতে আমাকে ডেকে পাঠাতেন । কতদিন সন্ধ্যা ছাড়িয়ে রাত্রি হয়ে যেত, দুজনের তর্কের কোন মীমাংসা হ'ত না । কিন্তু আমিই প্রায় জিততুম, তার কারণও আজ আর আমার অবিদিত নেই ।

মাঝে মাঝে সে হঠাৎ তর্কের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়ে মামার মুখপানে চেয়ে গভীর বিষয়ে ব'লে উঠত, “আচ্ছা ব্রজ বাবু, এই বয়সে এত বড় লজিকের জ্ঞান, তর্ক করবার এমন একটা আশ্চর্য ক্ষমতা কি আপনি একটা কিনোমিনন ব'লে মনে করেন না ?”

আমি গর্কে, সোভাগ্যে ঘাড় হেঁট করতুম । ওরে হতভাগী ! সে দিন ঘাড়টা তোর চিরকালের মত একেবারে ভেঙে মাটিতে গুটিয়ে পড়েনি কেন ?

মামা উচ্চ অঙ্গের একটু হাস্ত ক'রে বলতেন, “কি জ্ঞান নরেন, এ শুধু শেখাবার ক্যাপাসিটি ।”

কিন্তু তর্কাতর্কি আমার তত ভাল লাগত না, বত ভাল লাগত তার মুখের মস্তকিষ্টোর গল্প। কিন্তু গল্পও আর শেষ হ'তে চায় না, আমার অধৈর্য্যেরও আর সীমা পাওয়া যায় না। সকালে ঘুম ভেঙে পর্য্যন্ত সারাদিনে একশ বার মনে করতুম, কখন বেলা পড়বে, কখন নরেন বাবু আসবে।

এমনি তর্ক ক'রে আর গল্প শুনে আমার বিয়ের বয়স বারো ছাড়িয়ে তেরোর শেষে গড়িয়ে গেল, কিন্তু বিয়ে আমার হ'ল না।

তখন বর্ষার নবযৌবনের দিনে মজুমদারদের বাগানের একটা মস্ত বকুলগাছের তলা ঝরা কুলে-কুলে একেবারে বোঝাই হয়ে যেত। আমাদের বাগানের ধারের সেই নালাটা পার হয়ে আমি রোজ গিয়ে কুড়িয়ে আনতুম। সে দিন বিকালেও মাথার উপর গাঢ় মেঘ উপেক্ষা করেই দ্রুতপদে যাত্রি, না দেখতে পেয়ে বনলেন, “ওলো, ছুটে ত যাচ্চিস্, জল যে এল ব'লে।” আমি বনলুম, “জল এখন আসবে না, মা, ছুটে গিয়ে ছুটো কুড়িয়ে আনি।” মা বনলেন, “পোনের মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি নামবে, সহ কথা শোন্—যাস্নে। এই অবেলার ভিজে গেলে ঐ চুলের বোঝা আর শুকাবে না, তা ব'লে দিচ্ছি।”

আমি বনলুম, “তোমার ছুটি পায় পড়ি মা, যাই। বৃষ্টি এসে পড়লে মালীদের ওই চালাটার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াব।”—বলতে বলতেই ছুটে পালিয়ে গেলুম। মায়ের আমি একটি মেয়ে—ছঃখ দিতে আমাকে কিছুতে পারতেন না। ছেলেবেলা থেকেই কুল যে কত ভালবাসি, সে ত তিনি নিজেও জানতেন, তাই চুপ ক'রে রইলেন। কত দিন ভাবি, সে দিন যদি হতভাগীর চুলের মুঠি ধ'রে টেনে আনতে মা, এমন ক'রে হয় ত তোমার মুখ পোড়াতুম না।

বকুল-কুলে কোঁচড় প্রায় ভর্তি হয়ে এসেছে, এমন সময় মা যা বনলেন, তাই হ'ল। ঝম্-ঝম্ ক'রে বৃষ্টি এল। ছুটে গিয়ে মালীদের চালায় মধ্যে ঢুকে পড়লুম। কেউ নেই, খুঁটি ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে মেঘের পানে চেয়ে ভাবছি, হুম্ হুম্ ক'রে ছুটে এসে কে ঢুকে পড়ল। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখি—ও মা! এ যে নরেন বাবু! কলকাতা থেকে তিনি যে বাড়ী এসেছেন, কৈ, সে তো আমি শুনি নি।

আমাকে দেখে চমকে উঠে বনলেন, “অ্যা, সহ যে! এখানে? অনেক দিন তাঁকে দেখিনি, অনেকদিন তাঁর গলা শুনি নি, আমার বুকের মধ্যে যেন আনন্দের ঢেউ ব'রে গেল। কান পর্য্যন্ত লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল;—মুখের পানে চেয়ে ত জবাব দিতে পারলুম না, মাটির দিকে চেয়ে বনলুম, “আমি ত রোজই কুল কুড়তে আসি। কবে এলেন?” নরেন মালীদের একটা ভাঙা খাটিয়া টেনে নিয়ে ব'সে বনলে, “আজ সকালে। কিন্তু তুমি কার হকুমে কুল চুরি কর শুনি?”

গম্ভীর গলায় আশ্চর্য্য হয়ে হঠাৎ মুখ ভুলে দেখি, চোখ ছোটো তার চাপা হাসিতে নাচছে।

লজ্জা! লজ্জা! এই পোড়ার মুখেও কোথা থেকে হাসি এসে পড়ল; বললুম, “তাই বই কি! কষ্ট ক’রে কুড়িয়ে নিলে বুঝি চুরি করা হয়?” নরেন ফস্ ক’রে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, “আর আমি যদি ঐ কুড়োনো ফুলগুলো তোমার কোঁচড়ের ভেতর থেকে আর একবার কুড়িয়ে নিই, তাকে কি বলে?”

জানিনে, কেন আমার ভয় হ’ল, সত্যিই যেন এইবার সে এসে আমার আঁচল চেপে ধরবে। হাতের মুঠো আমার আলগা হয়ে গিয়ে চোখের পলকে সমস্ত ফুল ঝপ্ ক’রে মাটিতে পড়ে গেল।

“ও কি করলে?”

আমি কোনমতে আপনাকে সামলে নিয়ে বললুম, “আপনাদেরই ত ফুল, বৈশত, মিন্ না কুড়িয়ে।”

“এঁা! এত অভিমান!” বলে সে উঠে এসে আমার আঁচলটা টেনে নিয়ে ফুল কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখতে লাগল। কেন জানিনে, হঠাৎ আমার ছচোখ জলে ভ’রে গেল, আমি জোর ক’রে মুখ ফিরিয়ে আর একদিকে চেয়ে রইলুম।

সমস্ত ফুলগুলি কুড়িয়ে আমার আঁচলে একটা গেরো দিয়ে নরেন তার জায়গায় ফিরে গেল। খানিকক্ষণ আমার পানে চূপ ক’রে চেয়ে থেকে বললে, “যে ঠাট্টা বুঝতে পারে না, এত অস্বস্তি রাগ করে, তার ফিলজফি পড়া কেন? আমি কালই গিয়ে ব্রজ-বাবুকে ব’লে দেব, তিনি আর যেন পণ্ডিত না করেন।”

আমি আগেই চোখ মুছে ফেলেছিলুম, বললুম, “কে রাগ করেছে?”

“যে ফুল ফেলে দিলে।”

“ফুল ত আপনি পড়ে গেল।”

“মুখখানাও বুঝি আপনি ফিরে আছে?”

“আমি ত মেঘ দেখছি।”

“মেঘ বুঝি এ দিকে ফিরে দেখা যায় না?”

“টেক যায়?” ব’লে আমি ভুলে হঠাৎ মুখ কেঁরাতেই ছজনের চোখোচোখি হয়ে গেল। নরেন ফিক্ ক’রে হেসে বললে, “একখানা আরসি থাকলে যায় কি না দেখিয়ে দিভুম। নিজের মুখে চোখেই একসঙ্গে মেঘ-বিজ্ঞাৎ দেখতে পেতে; কষ্ট ক’রে আকাশে খুঁজতে হ’ত না।”

আমি তখ্খুনি চোখ ফিরিয়ে নিলুম। রূপের প্রশংসা আমি ঢের শুনেছি, কিন্তু নরেনের চাপা হাসি, চাপা ইঙ্গিত সে দিন আমার বুকের মধ্যে ঢকে আমার

দুইপিণ্ডটাকে ঘেন সছোরে ঘুলিয়ে দিলে। এই ত সে পাঁচ বছর আগের কথা, কিন্তু আজ মনে হয়, সে সোদামিনী বৃষ্টি বা আর কেউ ছিল! নরেন বললে, “মেঘ না কাটলে ব্রহ্ম বাবুকে ব’লে দেব, লেখা-পড়া শেখানো মিছে। তিনি আর ঘেন কষ্ট না করেন।”

আমি বললাম, “বেশ ত, ভালই ত। আমি ও সব পড়তেও চাইনে, বরং গল্পের বই পড়তেই আমার চের ভাল লাগে।”

নরেন হাততালি দিয়ে ব’লে উঠল, “দাঁড়াও ব’লে দিচ্ছি,—আজকাল নভেল পড়া হচ্ছে বৃষ্টি?”

আমি বললাম, “গল্পের বই তবে আপনি নিজে পড়েন কেন?”

নরেন বললে, “সে শুধু তোমাকে গল্প বলবার জন্যে। নইলে পড়তুম না।” বৃষ্টির দিকে চেয়ে বললে, “আচ্ছা, এ জল যদি আজ না ধামে? কি করবে?”

বললাম, “ভিজে-ভিজে চ’লে যাব।”

“আচ্ছা, এ যদি আসামের পাহাড়ী বৃষ্টি হ’ত তা’হলে?”

গল্প জিনিসটা চিরদিন কি ভালই বাসি! একটুখানি গরু পাবা-মাত্র আমার চোখের দৃষ্টি একমুহূর্তে আকাশ থেকে নরেনের মুখের উপর নেমে এল। জিজ্ঞেস কর’রে ফেললাম, “সে দেশে বৃষ্টির মধ্যে বৃষ্টি বেরোনো যায় না?”

নরেন বললে, “একেবারে না। গায়ে তীরের মত বেঁধে।”

“আচ্ছা, তুমি সে বৃষ্টি দেখেচ?” পোড়া মুখ দিয়ে ‘তুমি’ বার হয়ে গেল। তাবি জিভটা সঙ্গে সঙ্গে যদি মুখ থেকে খসে পড়ে যেত!

সে বললে, “এর পর যদি একজন ‘আপনি’ ব’লে ডাকে, সে আর একজনের মরা-মুখ দেখবে।”

“কেন দিবি্য দিলেন? আমি ত কিছুতে ‘তুমি’ বলবো না।”

“বেশ, তা হ’লে মরা-মুখ দেখো।”

“দিবি্য কিছুই না। ও আমি মানিনে।”

“কেমন মান না, একবার ‘আপনি’ ব’লে প্রমাণ কর’রে দাও।”

মনে মনে রাগ কর’রে বললাম, “পোড়ারমুখী! মিছে তেজ তোর রইল কোথায়? মুখ দিয়ে ত কিছুতে বার করতে পারলিনে! কিন্তু ঐখানেই সেদিন ছুঁতুর যদি শেষ হয়ে যেত!”

ক্রমে আকাশের জল থামল বটে, কিন্তু পৃথিবীর জলে সমস্ত ছনিয়াটা ঘেন ঘুলিয়ে একাকার কর’রে দিলে। সন্ধ্যা হয়-হয়। কূল কটি অঁচলে বীধা, কাদা-ভরা বাগানের পথে বেরিয়ে পড়লাম।

নরেন বললে, “চল, তোমাকে পৌছে দি।”

আমি বললাম, “না।”

মন যেন ব’লে দিলে, সেটা ভাল না। কিন্তু অদৃষ্টকে ডিঙিয়ে যাবো কি ক’রে? বাগানের ধারে এসে ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। সমস্ত নালটা জলে পরিপূর্ণ! পার হই কি কোরে?

নরেন সঙ্গে আসেনি, কিন্তু, সেইখানে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, আমাকে চূপ ক’রে দাঁড়াতে দেখে অবস্থাটা বুঝে নিতে তার দেরি হ’ল না। ছুটে এসে বললে, “এখন উপায়?”

আমি কান্দ-কান্দ হয়ে বললাম, “নালার ডুবে মরি, সেও আমার ভালো, কিন্তু একলা অত দূর সদর রাস্তা ঘুরে আমি কিছুতে যাব না। মা দেখলে—”

কথাটা আমি শেষ করতেই পারলুম না।

নরেন হেসে বললে, “তার আর কি, চল, তোমাকে সেই পিঠুলি গাছটার উপর দিয়ে পার ক’রে দিই।”

তাই ত বটে! আহ্লাদে মনে-মনে নেচে উঠলুম। এতক্ষণ আমার মনে পড়েনি যে, খানিকটে দূরে একটা পিঠুলি গাছ বহুকাল থেকে ঝড়ে উপড়ে নালার ওপর ব্রিজের মত পড়ে আছে। ছেলেবেলায় আমি নিজেই তার উপর দিয়ে এপার-ওপার হয়েছি।

খুসি হয়ে বললাম, “তাই চল—”

নরেন তার চেয়েও খুসি হয়ে বললে, “কেমন মিষ্টি শোনালে বলত!”

বললাম, “যাও—”

সে বললে, “নির্কিস্মে পার না ক’রে দিয়ে কি আর যেতে পারি!”

বললাম, “তুমি কি আমার পারের কাণ্ডারী না কি?”

আমি আজও ভেবে পাইনি, এ কথা কোথায় শিখলুম এবং কেমন করেই বা মুখ দিয়ে বার করলুম। কিন্তু, সে যখন আমার মুখপানে চেয়ে একটু হেসে বললে, “দেখি, তাই যদি হ’তে পারি”—আমি বেগায় যেন ম’রে গেলুম।

সেখানে এসে দেখি, পার হওয়া সোজা নয়। একে ত স্থানটা গাছের ছাওয়ার অন্ধকার, তাতে, সেই পিঠুলি গাছটাই জলে ভিজে ভিজে যেমন পিছল, তেমনি উঁচু-নীচু হয়ে আছে। তলা দিয়ে সমস্ত বৃষ্টির জল হুহু শব্দে বয়ে যাচ্ছে—আমি একবার পা বাড়াই, একবার টেনে নিই। নরেন খানিকক্ষণ দেখে বললে, “আমার হাত ধ’রে যেতে পারবে?”

বললাম, ‘পারব।’ কিন্তু তার হাত ধ’রে এমনি কাণ্ড করলুম যে, সে কোন মতে টাল-সামলে এদিকে লাফিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করলে। কয়েক মুহূর্ত সে চূপ ক’রে আমার মুখপানে চেয়ে রইল, তার পরেই তার চোখ দুটো যেমন ঝক ঝক করে উঠল। বললে, “দেখবে, একবার সত্যিকারের কাণ্ডারী হ’তে পারি কি না?”

আশ্চর্য্য! হয়ে বল্লুম “কি কোরে?”

“এমনি কোরে” বলেই সে নত হয়ে আমার হুই হাঁটুর নীচে এক হাত, বাড়ির নীচে অন্য হাত দিয়ে চোপের নিমিষে তার বুকের কাছে তুলে নিয়ে সেই গাছটার উপর পা দিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে আমি চোখ বুজে বাঁ হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলুম। নরেন ক্রতপদে পার হয়ে এপারে চলে এল। কিন্তু নামাবার আগে,—আমার ঠোঁট ছ’টোকে একেবারে যেন পুড়িয়ে দিলে। কিন্তু থাক গে। কম ঘেরায় কি আর এ দেহের প্রতি অঙ্গ অহর্নিশ গলার দড়ি দিতে চায়!

শিউরতে শিউরতে বাড়ী চলে এলুম, ঠোঁট ছ’টো তেমনি অন্তেই লাগল বটে, কিন্তু সে আলা লঙ্কামরিচখোরের অলুনির মত যত অন্তে লাগল, আলার তৃষ্ণা তত বেড়ে যেতেই লাগল।

মা বললেন, “ভালা মেয়ে তুই সচ্ছ,—এলি কি কোরে? নানাটা ত জলে জলময় হয়েচে দেখে এলুম। সেই গাছটার ওপর দিয়ে বুঝি হেঁটে এলি? পড়ে মরতে পারলিনে!”

না, মা, সে পুণ্য থাকলে আর এ গল্প লেখবার দরকার হবে কেন! কিন্তু সে দিন তোমার অভিসম্পাতটা যদি কলে যেত মা, হতভাগিনীর এত বড় বয় তবে আর ছিল কি!

তার পর দিন নরেন, মামার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমি সেইখানেই বসে ছিলাম,—তার পানে চাইতে পারলুম না, কিন্তু আমার সর্কান্ধে কাঁটা দিয়ে উঠল। ইচ্ছে হ’ল ছুটে পালাই, কিন্তু ঘরের পাকা মেঝে যেন চোরা বালির মত আমার পা ছটোকে একটু একটু ক’রে গিলতে লাগল—আমি নড়তেও পারলুম না, মুখ তুলে দেখতেও পারলুম না।

নরেনের যে কি অসুখ হ’ল, তা শরতানই জানে, অনেকদিন পর্য্যন্ত আর সে কলকাতায় গেল না। রোগই দেখা হতে লাগল। মা মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে আমাকে আড়ালে ডেকে পাঠিয়ে বলতে লাগলেন, “ওদের পুরুষমানুষদের লেখাপড়ার কথাবার্তা হয়, তুই তার মধ্যে হাঁ ক’রে বসে কি শুনিব বলত? বা বাড়ীর ভেতরে যা। এত বড় মেয়ের যদি লজ্জা সরম এতটুকু আছে!”

একপা একপা ক’রে আমার ঘরে চলে যেতুম, কিন্তু কোন কাজে মন দিতে পারতুম না। যতক্ষণ সে থাকতো, তার অম্পট কর্তব্যর অবিশ্রাম বাইরের পানেই আমাকে টানতে থাকত।

আমার মামা আর বাই হোন, তাঁর মনটা প্যাচালো ছিল না। তা’ছাড়া, লিখে পড়ে, তর্ক ক’রে ভগবানকে উড়িয়ে দেবার ফন্দিতেই সমস্ত অন্তঃকরণটা তাঁর এমনি

অনুগ্রহ বাস্তু হয়ে থাকত যে, তাঁর নাকের ডগায় কি যে ঘটেছে, তা দেখতেও পেতেন না। আমি এই বড় একটা মজা দেখেছি, জগতের সব চেয়ে নামজাদা নাস্তিকগুলোই হচ্ছে সব চেয়ে নিরোট বোকা। ভগবানের যে লীলার অস্ত নেই, তিনি যে এই ‘না’ রূপেই তাদের পোনের আনা মন ভরে থাকেন, এ তারা টেরই পায় না। সপ্রমাণ হোক, অপ্রমাণ হোক, তাঁর ভাবনাতেই সারাদিন কাটিয়ে দিয়ে বলে, সংসারে মানুষগুলো কি বোকা! তারা সকাল-সন্ধ্যায় বসে মাঝে মাঝে ভগবানের চিন্তা করে! আমার মামারও ছিল সেই দশা! তিনি কিছুই দেখতে পেতেন না। কিন্তু, মা ত তা’ নয়। তিনি যে আমারই মত মেয়েমানুষ। তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া ত সহজ ছিল না। আমি নিশ্চয় জানি, মা আমাদের সন্দেহ করেছিলেন।

আর সামাজিক বাধা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে কত বড় ছিল, এ শুধু যে তিনিই জানতেন, আমি জানতুম না, তা নয়। ভাবলেই আমার বুকের সমস্ত রস শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠত, তাই ভাবনার এই বিলী দিকটাকে আমি হৃদাতে ঠেলে রাখতুম। কিন্তু শত্রুর বদলে যে বন্ধুকেই ঠেলে ফেলছি, তাও টের পেতুম। কিন্তু হলে কি হয়? যে মাতাল একবার কড়া-মদ খেতে শিখেছে, জল-দেওয়া মদে আর তার মন ওঠে না। নির্জলা বিশ্বের আগুনে কল্জে পুড়িয়ে তোলাতেই যে তখন তার মস্ত সুখ!

আর একটা জিনিস আমি কিছুতে ভুলতে পারতুম না। সেটা মজুমদারদের ঐশ্বর্যের চেহারা। ছেলেবেলা মায়ের সঙ্গে কতদিনই ত তাদের বাড়ীতে বেড়াতে গেছি। সেই সব ঘর-দোর, ছবি-ধোয়ালগিরি-আলমারি সিন্দুক, আসবাব-পত্রের সঙ্গে কোন্ একটা ভাবী ছোট্ট একতারা খণ্ডরবাড়ীর কদাকার স্মৃতি কল্পনা কোরে মনে মনে আমি যেন শিউরে উঠতুম।

মাসখানেক পরে একদিন সকালবেলা নদী থেকে স্নান ক’রে বাড়ীতে পা দিয়েই দেখি, বারান্দার ওপর একজন প্রোটা-গোছের বিধবা স্ত্রীলোক মায়ের কাছে ব’সে গল্প করছে। আমাকে দেখে মাকে জিজ্ঞেস করলে, “এইটি বুঝি মেয়ে?”

মা ঘাড় নেড়ে বললেন, “হঁ। মা, এই আমার মেয়ে। বাড়ন্ত গড়ন ন’হলে—”

স্ত্রীলোকটি হেসে বললে, “তা হোক। ছেলেটির বয়েসও আর ত্রিশ, হৃদয়ের মানাবে ভাল। আর ঐ শুন্তেই দোজ্বরে, নইলে যেন কার্তিক।

আমি ক্রতপদে ঘরে চ’লে গেলুম। বুঝলুম, ইনি ঘটক ঠাকরণ, আমার সম্বন্ধ এনেছেন।

মা চোঁচিয়ে বললেন, “কাপড় ছেড়ে একবার এসে বোস্ মা।”

কাপড় ছাড়া চুলোয় গেল, ভিজ়ে কাপড়েই দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুন্তে লাগলুম। বুকের কাঁপুনি যেন আর খাম্বতে চায় না। শুন্তে পেলুম, চিতোর গ্রামের কে একজন রাধাবিনোদ মুখুবার ছেলে ঘনশ্যাম। পোড়াকপালে না কি অনেক ছঃখ ছিল, তাই আজ যে নাম জপের মন্তর, সে নাম শুনে সে দিন গা অলে বাবে কেন!

শুনলুম, বাপ নেই, কিন্তু মা আছেন। ছোট ছুটি ভাই, এক ভায়ের বিয়ে হয়েছে, একটি এখনও পড়ে। সংসার বড়রই বাড়ে, তাই, এন্ট্রান্স পাশ করেই রোজগারের খান্দার পড়া ছাড়তে হয়েছে। ধান, চাল, তিসি, পাট প্রভৃতির দালালি ক'রে, উপায় মন্দ করেন না। তাঁরই উপর সমস্ত নির্ভর। তা'ছাড়া ঘরে নারায়ণ-শিলা আছেন, দুটো গরু আছে, বিধবা বোন আছে—নেই কি?

নেই শুধু সংসারের বড়-বো। সাত বছর আগে বিয়ের একমাসের মধ্যেই তিনি মারা যান, তার পরে এতদিন বাদে এই চেষ্টা। সাত বছর! বটকীকে উদ্দেশ্য ক'রে মনে মনে বললুম, 'পোড়ার মুখী, এত দিন কি তুই শুধু আমার মাথা খেতেই চোখ বুজে ঘুমুচ্ছিলি?'

মায়ের ডাকাডাকিতে কাপড় ছেড়ে কাছে এসে বললুম। সে আমাকে খুঁটিয়ে দেখে বললে, "মেয়ে পছন্দ হয়েছে, এখন দিনস্থির করলেই হ'ল। মায়ের চোখ ছুটিতে জল টল্ টল্ করতে লাগল, বললেন, "তোমার মুখে কুল-চরন পড়ুক, মা, আর কি বলব!"

মামা শুনে বললেন, "এন্ট্রান্স? তবে, বলে পাঠা, এখন বছর দুই সহর কাছে ইংরিজি পড়ে যাক্, তার পরে বিয়ের কথা কওয়া বাবে।"

মা বললেন, "তোমার পায়ে পড়ি দাদা, অমত কোরো না, এমন সুবিধে আর পাওয়া বাবে না। দিতে খুতে কিছু হবে না—"

মামা বললেন, "তা'হলে হাত-পা বেঁধে গঙ্গায় দিগে যা, সেও এক পরস্যা চাইবে না।"

মা বললেন, "পোনরয় পা দিলে যে—"

মামা বললেন, "তা'ত দেবেই; পোনর বছর বেঁচে রয়েছে যে!"

মা রাগে ছঃখে কান্দ-কান্দ হয়ে বললেন, "তুমি কি ওর তবে বিয়ে দেবে না দাদা? এর পরে যে একেবারেই পাত্র জুটবে না।"

মামা বললেন, "সেই ভয়ে ত আগে থেকে ওকে জলে ফেলে দিতে পারা যায় না।"

মা বললেন, "ছেলেটিকে একবার নিজের চোখে দেখে এসো না দাদা, পছন্দ না হয়, না দেবে।"

মামা বললেন, “সে ভাল কথা। রবিবারে যাবো ব’লে চিঠি লিখে দিচ্ছি।”

ভাঙুর ভয়ে কথাটা মা গোপন রেখেছিলেন এবং মামাকেও সাবধান ক’রে দিয়েছিলেন। তিনি ত জানতেন না, এমন চোখ-কানও ছিল—যাকে কোন সতর্কতা ক’কি দিতে পারে না।

বাগানে একটুকুরো শাকের ক্ষেত করেছিলুম। দিন দুই পরে দুপুরবেলা একটা ভাঙা খুন্টি নিয়ে তার ঘাস তুলচি, পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখি নরেন। তার সে রকম মুখের চেহারা অনেক দিন পরে আর একবার দেখেছিলুম, সত্যি, কিন্তু, আগে কখনো দেখিনি। বুকে এমন একটা ব্যথা বাজল, যা কখনো কোন দিন পাইনি। সে বললে, “আমাকে ছেড়ে কি সত্যিই চলে গেল?”

কথাটা বুকেও বেন বুকে পাবলুম না। ব’লে ফেললুম, “কোথায়?”

সে বললে, “চিতোর।”

স্পষ্ট হ’বামাত্রই লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল—কোন উত্তর মুখে এলো না।

সে পুনরায় বললে, “তাই আমিও বিদায় নিতে এসেছি। বোধ হয়, জন্মের মতই। কিন্তু, তার আগে ছোটো কথা বলতে চাই। শুনে?” বলতে বলতেই তার গলাটা যেন ধ’রে গেল। তবুও আমার মুখে কথা যোগাল না—কিন্তু মুখ তুলে চাইলুম। এ কি? দেখি, তার হ’চোখ বয়ে ঝর-ঝর ক’রে জল পড়ছে।

ওরে পতিতা! ওরে হুঁসল নারী! মানুষের চোখের জল সহ্য করবার ক্ষমতা ভগবান্ তোরে বধন একেবারে দেন নি, তখন তার আর সাধ্য ছিল কি! দেখতে দেখতে আমারও চোখের জলে বুক ভেসে গেল। নরেন কাছে এসে কৌটার খুঁট দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে হাত ধ’রে বললে, “চল, ওই পাছটার তলায় গিয়ে বসি গে—এখানে কেউ দেখতে পাবে।”

মনে বুঝলুম, এ অন্তার—একান্ত অন্তার! কিন্তু তখনও যে তার চোখের পাতা ভিজ়ে, তখনও যে তার কণ্ঠস্বর কান্নার ভরা!

বাগানের এক প্রান্তে একটা কাঁঠালি-চাঁপার কুঞ্জ ছিল, তার মধ্যে সে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালে।

একটা ভয়ে আমার বুকের মধ্যে ছর ছর করছিল, কিন্তু, সে নিজেই দূরে গিয়ে ব’সে বললে, “এই একান্ত নির্জ্জন স্থানে তোমাকে ডেকে এনেছি বটে, কিন্তু তোমাকে ছোঁব না। এখনও তুমি আমার হওনি।”

তার শেষ কথার আবার গোড়া চোখে জল এসে পড়ল। আঁচলে মুছে মাটির দিকে চেয়ে চুপ ক’রে ব’সে রইলুম।

তার পরে অনেক কথাই হ'ল, কিন্তু থাক্ গে সে সব। আজও ত প্রতিদিনকার অতি তুচ্ছ ঘটনাটি পর্য্যন্ত মনে করতে পারি,—বরণেও যে বিশ্বাস আসবে, সে আশা করতেও যেন ভরসা হয় না। একটা কারণে আমি আমার এত বড় দুর্গতিতেও কোন দিন বিধাতাকে দোষ দিতে পারিনি। স্পষ্ট মনে পড়ে, আমার চিন্তের মাঝে থেকে নরেনের সংস্রব তিনি কোন দিন প্রসন্ন-চিন্তে গ্রহণ করেন নি। সে যে আমার জীবনে কত বড় মিথ্যে এ তো তাঁর অগোচর ছিল না। তাই তার প্রণয়-নিবেদনের মুহূর্তের উদ্বেজনা পরক্ষণের কত বড় অবসাদে যে ডুবে যেত সে আমি ভুলিনি। যেন কার কত চুরি-ডাকাতি, সর্বনাশ ক'রে ঘরে ফিরে এলুম এমনি মনে হত। কিন্তু এমনি পোড়া কপাল যে, অন্তর্যামীরা এত বড় ইজিতেও আমার হুঁস হয় নি। হবেই বা কি ক'রে? কোন দিনত শিখিনি যে ভগবান্ মানুষের বুকের মধ্যেও বাস করেন। এ সব তাঁরই নিষেধ।

মামা পাত্র দেখতে যাত্রা করলেন। বাবার সময় কতই না ঠাট্টা-তামাসা ক'রে গেলেন। মা মুখ চূণ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন, মনে মনে বেশ বুঝলেন, এ বাওয়া পণ্ডিত। পাত্র তাঁর কিছুতে পছন্দ হবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্য, ফিরে এসে আর বড় ঠাট্টা, বিক্ষিপ করলেন না। বললেন, “হাঁ ছেলেটি পাশ-টাশ তেমন কিছু করতে পারনি বটে, কিন্তু মুখ্য বলেও মনে হ'ল না। তা ছাড়া বড় নম্র, বড় বিনয়ী। আর একটা কি জানিস্ গিরি, ছেলেটির মুখের ভাবে কি একটু আছে, ইচ্ছে হয়, ব'নে ব'সে আরও হৃদয় আলাপ করি।”

মা আহলাদে মুখখানি উজ্জল ক'রে বললেন, “তবে, আর আপত্তি কোরো না দাদা, মত দাও—সহর একটা কিনারা হয়ে যাক্।”

মামা বললেন, “আচ্ছা ভেবে দেখি।”

আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে নিরাশার আশাটুকু বুকে চেপে ধ'রে মনে মনে বললুম, “যাক্, মামা এখনো মনস্থির করতে পারেন নি। এখনো বলা যায় না। কিন্তু কে জানত, তাঁর ভাবীর বিয়ের সম্বন্ধে নতিস্থির করবার পূর্বেই তাঁর নিজের সম্বন্ধে মতিস্থির করবার ডাক এসে পড়বে। যাকে সারাজীবন সন্দেহ ক'রে এসেছেন, সে দিন অত্যন্ত অকস্মাৎ তাঁর দূত এসে যখন একেবারে মামার শিয়রে দাঁড়াল, তখন তিনি চমকে গেলেন। তাঁর কথা শুনে আমাদেরও বড় কম চমক লাগল না। মাকে কাছে ডেকে বললেন, “আমি মত দিয়ে যাকি বোন, সহর সেইখানেই বিয়ে দিস্। ছেলেটির বখাৰ্ধ ভগবানে বিশ্বাস আছে। মেয়েটা স্ত্রীে থাকবে।”—অবাক্ কাও!

হৃদরোগে মামা যারা গেলেন, আমরা অকূল পাথারে পড়লুম। হঃখে হঃখে কিছুদিন গেল বটে, কিন্তু যে বাড়ীতে অবিবাহিতা মেয়ের বয়স পোনের পার হয়ে

যায়, সেখানে আলস্যভরে শোক করবার সুবিধে থাকে না। মা চোখ মুছে উঠে ব'সে আবার কোমর বেঁধে লাগলেন।

অবশেষে অনেক দিন, অনেক কথা কাটাকাটির পর, বিবাহের লগ্ন বধন সত্যিই আমার বুকে এসে বিধ্বল, তখন বয়সও যোল পার হয়ে গেল। তখনও আমি প্রায় এমনিই লম্বা। আমার এই দীর্ঘ দেহটার জন্য জননীর লজ্জা ও কুণ্ঠার অবধি ছিল না। রাগ ক'রে প্রায়ই ভৎসনা করতেন, 'হতভাগা মেয়েটার সবই সৃষ্টিছাড়া!' একেত বিয়ের কনের পক্ষে সতেরো বছর একটা মারাত্মক অপরাধ, তার উপর এই দীর্ঘ গড়নটা যেন তাকেও ডিঙিয়ে গিয়েছিল। অস্তুতঃ, সে রাতটার জন্যও যদি আমাকে কোন রকমে মুচড়ে-নাচড়ে একটু খাটো ক'রে তুলতে পারতেন, মা বোধ করি তাতেও পিছুতেন না। কিন্তু সে তো হবার নয়। আমি আমার স্বামীর বুক ছাড়িয়ে একেবারে দাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছুলুম।

কিন্তু শুভদৃষ্টি হ'ল না, আমি ঠিক রাগে নয়, কেমন যেন একটা বিতর্কায় চোখ বুজে রইলুম। কিন্তু তাও বলি, এমন কোন অসহ্য মর্মান্তিক দুঃখও তখন আমি মনের মধ্যে পাইনি।

ইতিপূর্বে কত দিন সারা রাত্রি জেগে জেগে ভেবেছি, এমন দুর্ঘটনা যদি সত্যিই কপালে ঘটে, নরেন এসে আমাকে না নিয়ে যায়, তবু আর কারও সঙ্গে আমার বিয়ে কোনমতেই হ'তে পারবে না। সে রাত্রে নিশ্চয় আমার বুক চিরে ভলকে ভলকে রক্ত মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়বে, ধরাধরি ক'রে আমাকে বিবাহ-সভা থেকে বিছানায় তুলে নিয়ে যেতে হবে, এ বিশ্বাস আমার মনে একেবারে বদ্ধমূল হয়ে ছিল। কিন্তু কৈ, কিছুইত হল না! আরও পাঁচজন বাঙ্গালীর মেয়ের যেমন হয়, শুভকর্ষ তেমনি করে আমারও সমাদা হয়ে গেল, এবং তেমনি করেই একদিন খুশুরবাড়ী যাত্রা করলুম।

শুধু বাবার সময়টিতে পাকীর ফাঁক দিয়ে সেই কাঁটালি-চাপার কুঞ্জটার চোখ পড়ার হঠাৎ চোখে জল এল। সে যে আমাদের কত দিনের কত চোখের জল, কত দ্বিবি-দিশাশার নীরব সাক্ষী।

আমার চিতোর গ্রামের সম্বন্ধটা যে দিন পাকা হ'য়ে গেল, ওই গাছটার আড়ালে বসেই অনেক অশ্রু-বিনিময়ের পর স্থির হয়েছিল, সে এসে একদিন আমাকে নিয়ে চলে যাবে। কেন, কোথায় প্রভৃতি বাহুল্য প্রশ্নের তখন আবশ্যকও হয় নি।

আর কিছু না, শুধু বাবার সময় একবার যদি দেখা হ'ত! কেন সে আমাকে আর চাইলে না, কেন আর একটা দিনও দেখা দিলে না—শুধু যদি খবরটা পেতুম!

খণ্ডরবাড়ী গেলুম, বিয়ের বাকি অনুষ্ঠানগুলোও শেষ হয়ে গেল। অর্থাৎ আমি আমার স্বামীর ধর্মপত্নীর পদে এইবার পাকা হয়ে বোসলুম।

দেখলুম, স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণা শুধু একা আমার নয়। বাড়ীগুরুই আমার দলে। স্বত্তর নেই সং শাওড়ী, তাঁর নিজের ছেলে ছুটি, একটি বউ এবং বিধবা মেয়েটি নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। এতদিন নিরাপদে সংসার করছিলেন, হঠাৎ একটা সতেরো আঠারো বৎসরের মস্ত বোঁ দেখে তাঁর সমস্ত মন শব্দ জেগে উঠল। কিন্তু মুখে বললেন, “বাঁচলুম বোঁমা, তোমার হাতে সংসার ফেলে দিয়ে এখন ছদ্ম ঠাকুরদের নাম করতে পাবো। ঘনগ্রাম আমার পেটের ছেলের চেয়েও বেশী; সে বেঁচে থাকলেই তবে সব বজায় থাকবে। শুধু এইটি বুঝে কাজ করো মা, আর কিছু আমি চাইনে।” তাঁর কাজ তিনি করলেন, আমার কাজ আমি করলুম। বললুম, “আচ্ছা”। কিন্তু সে ওই কুস্তিগীরের তাল ঠোকার মত। পাঁচ মারতে যে ছুঁতেনেই জানি, তা ইসারার জানিয়ে দেওয়া।

কিন্তু কত শীঘ্র মেয়েমানুষ যে মেয়েমানুষকে চিন্তে পারে এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। তাঁকে জানতে আমারও যেমন দেরি হোল না, আমাকেও ছুদিনের মধ্যে চিনে নিয়ে তিনিও তেমনি আরামের নিশ্বাস ফেললেন। বেশ বুঝলেন, স্বামীর খাওয়া পরা, ওঠা বসা, খরচপত্র নিয়ে দিবারাত্র চক্র ধরে ফোঁস ফোঁস করে বেড়াবার মত আমার উৎসাহও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

মেয়েমানুষের ভূণে বত প্রকার দিব্যান্ত আছে “আড়ি পাতাটা” ব্রহ্মান্ত। সুবিধে পেল এতে মা মেয়ে, শাওড়ী-বোঁ, জা-ননদ, কেউ কাকে খাতির করে না। আমি ঠিক জানি, আমি যে পালঙ্কে না শুয়ে ঘরের মেঝেতে একটা মাছুর টেনে নিয়ে সারা রাত্রি পড়ে থাকতুম, এ সুসংবাদ তাঁর অগোচর ছিল না। আগে যে ভেবেছিলুম, নরেনের বদলে আর কারো ঘর করতে হ’লে সেই দিনই আমার বুক ফেটে যাবে, দেখলুম সেটা ভুল। ফাটবার চেরবার কোন লক্ষণই টের পেলুম না। কিন্তু তাই ব’লে এক শয্যার শুতেও আমার কিছুতে প্রবৃত্তি হলো না।

দেখলুম, আমার স্বামীটি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। আমার আচরণ নিয়ে তিনি কিছুদিন পর্য্যন্ত কোন কথাই কইলেন না। অথচ, মনে মনে রাগ কিংবা অভিমান ক’রে আছেন, তাও না। শুধু একদিন একটু হেসে বললেন, “ঘরে আর একটা খাট এনে বিছানাটা বড় ক’রে নিলে কি শুতে পার না?”

আমি বললুম, “দরকার কি, আমার তো এতে কষ্ট হয় না।”

তিনি বললেন, “না হলেও একদিন অস্থখ করতে পারে যে।”

আমি বললাম, “তোমার এতই যদি ভয়, আমার আর কোন ঘরে শোবার ব্যবস্থা ক’রে দিতে পার না ?”

তিনি বললেন, “ছিঃ, তা কি হয় ? তাতে কত রকমের অগ্নির আলোচনা উঠবে।”

বললাম, “ওঠে উঠুক, আমি গ্রাহ্য করিনে।”

তিনি একমুহূর্ত চুপ ক’রে আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে বললেন, “এত বড় বুকের পাটা যে তোমার চিরকাল থাকবে, এমন কি কথা আছে ?” বোলে একটু খানি হেসে কাজে চলে গেলেন।

আমার মেজ দেওর টাকা চল্লিশের মত কোথায় চাকুরি করতেন, কিন্তু, একটা পরস্য কখনো সংসারে দিতেন না। অথচ, তাঁর আফিসের সময়ের ভাত, অফিস থেকে এলে পা খোবার গাড়ু-গামছা, জলখাবার, পান-তামাক ইত্যাদি যোগাবার জন্তে বাড়ী-গুরু সবাই যেন ভ্রম হয়ে থাকত। দেখতুম, আমার স্বামী আর আমার মেজ দেওর হয় ত কোন দিন এক সঙ্গেই বিকেলবেলায় বাড়ী ফিরে এলেন, সবাই তাঁর জন্তেই ব্যতিব্যস্ত ; এমন কি, চাকরটা পর্য্যন্ত তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্তে ছুটোছুটি ক’রে বেড়াচ্ছে। তাঁর একতিল দেবী কিংবা অশুবিধা হলে যেন পৃথিবী রসাতলে যাবে। অথচ আমার স্বামীর দিকে কেউ চেয়েও দেখত না। তিনি আশ্চর্য্যের ধ’রে হয় ত এক ঘটি জলের জন্তে দাঁড়িয়ে আছেন—কারও-সে দিকে গ্রাহ্যই নেই। অথচ এদের খাওয়া-পরা সুখ-সুবিধের জন্তেই তিনি দিবা-রাত্রি খেটে মরুচেন। ছাফ্‌ফা গাড়ীর ঘোড়াও মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে, কিন্তু, তাঁর যেন কিছুতেই প্রতি নেই, কোন দুঃখই যেন তাঁকে পীড়া দিতে পারে না। এমন শাস্ত্র, এত ধীর, এত বড় পরিশ্রমী, এর আগে কখনো আমি চোখে দেখি নি। আর চোখে দেখেছি বলেই লিখতে পারছি, নইলে শোনা কথা হলে বিশ্বাস করুতেই পারতুম না, সংসারে এমন ভাল মানুষও থাকতে পারে। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। সবজাতাই বলতেন, “থাক থাক, আমার এতেই হবে।”

স্বামীর প্রতি আমার মায়াই ত ছিল না, বরঞ্চ বিভ্রমের ভাবই ছিল, তবু এমন একটা নিরীহ লোকের উপর বাড়ীগুরু সকলের এত বড় অন্তর্য্য অবহেলার আমার গা যেন জলে যেতে লাগলো।

বাড়ীতে গরুর দুধ বড় কম হ’ত না। কিন্তু তাঁর পাতে কোন দিন বা একটু পড়ত, কোন দিন পড়ত না। হঠাৎ এক দিন সহিতে না পেরে ব’লে ফেলেছিলুম আর কি ! কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ’ল, ছি ছি, কি নিরীহ জীব আমি! তা হ’লে এরা মনে করত ! তা ছাড়া এরা সব আপনার লোক হয়েও যদি দয়া-মায়া না করে, আমারই বা এত মাথা ব্যথা কেন ? আমি কোথাকার কে ? পুর বই ত না !

দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন সকালবেলা রান্নাবরে ব'সে মেজ ঠাকুরপোর জন্তে চা তৈরী কর্চি, স্বামীর কণ্ঠস্বর আমার কানে গেল। তাঁর সকালেই কোথায় বার দবার দরকার ছিল, কিব্বতে দেরি হবে, মাকে ডেকে বললেন, “কিছু খেয়ে গেলে বড় ভাল হ'ত, মা, খাবার টাবার কিছু আছে?”

মা বললেন, “অবাক্ করলে ঘনশ্রাম! এত সকালে খাবার পাবো কোথায়?”

স্বামী বললেন, “তবে থাক্ ফিরে এসেই খাযো।” বলে চলে গেলেন।

সে দিন আমি কিছুতে আপনাকে আর সামলাতে পারলুম না। আমি জান্তুম ওপাড়ার বোসেরা তাদের বেয়াই-বাড়ীর পাওয়া সন্দেশ-রসোগোলা পাড়ার বিগিয়েছিল। কাল রাত্রে আশাদেরও কিছু দিয়েছিল।

শাওড়ী ঘরে ঢুকতেই ব'লে ফেললুম, “কালকের খাবার কি কিছুই ছিল না মা?”

তিনি একেবারে আকাশ থেকে পড়ে বললেন “খাবার আবার কে কিনে আনলে বউ মা?”

বললুম, “সেই যে বোসেরা দিয়ে গিয়েছিল?”

তিনি বললেন, “ও মা, সে আবার কটা যে, আজ সকাল পর্যন্ত থাকবে? সে তো কালই শেষ হয়ে গেছে।”

বললুম, “তা ঘরেই কি কিছু খাবার তৈরি ক'রে দেওয়া যেত না মা?”

শাওড়ী বললেন, “বেশ ত বোমা, তাই কেন দিলে না? তুমিও ত বসে বসে সমস্ত শুন্ছিলে বাছা।”

চুপ ক'রে রইলুম। আমার কিই বা বলবার ছিল! স্বামীর প্রতি ভালবাসার টান ত আর বাড়ীতে কারো অবিদিত ছিল না।

চুপ করে রইলুম সত্যি কিন্তু ভেতরে ভেতরে মনটা আমার অলুতেই লাগল। উপরবেলা শাওড়ী ডেকে বললেন, “খাবে এস বউ মা, ভাত বাড়ি হয়েছে।”

বললুম, “আমি এখন খাব না মা, তোমরা খাও গে।”

আমার আজকের মনের ভাব শাওড়ী লক্ষ্য করছিলেন, বললেন, “খাবে না, কেন শুনি?”

বললুম, “এখন ক্ষিদে নেই।”

আমার মেজ যা আমার চেয়ে বহর চারেকের বড় ছিলেন। রান্নাবরের ভেতর থেকে ঠোকর দিয়ে ব'লে উঠলেন, “বট্ঠাকুরের খাওয়া না হলে বোধ হয় দিদির ক্ষিদে হবে না মা।”

শাওড়ী বললেন, “তাই না কি বউ মা? বলি, এ নূতন চঙ লিখলে কোথায়?”

তিনি কিছু মিথ্যে বলেন নি, আমার পক্ষে এটাই বটে, তবু খোঁটা সহ্যে পার্লাম না, জবাব দিয়ে বললাম, “নতুন হবে কেন মা, তোমাদের সময়ে কি এ রীতির চলন ছিল না? ঠাকুরদের খাবার আগেই কি খেতে?”

“তবু ভালো, ঘনজামের এতদিনে ‘কপাল ফিরল’ বলে শাওড়ী মুখখানা বিকৃত করে রাগাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

মেজ জায়ের গলা কানে গেল। তিনি আমাকে তুলিয়েই বললেন, “তখন ত বলেছিলুম মা, বুড়ো শালিক পোষ মানবে না।”

রাগ করে ঘরে এসে গুয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু এইবার সমস্ত জিনিসটা মনে মনে আলোচনা করে লজ্জার বেন মাথা কাটা যেতে লাগল। কেবলই মনে হ’তে লাগল, তাঁর খাওয়া হয় নি বলে খাইনি, তাঁর কথা নিয়ে ঝগড়া করেছি, ফিরে এসে এ সব যদি তাঁর কানে যায়? ছি ছি! কি ভাববেন তিনি! আমার এতদিনের আচরণের সঙ্গে এ ব্যবহার এমনি বিসদৃশ, খাপছাড়া যে, নিজের লজ্জাতেই নিজেকে মরে যেতে লাগলাম।

কিন্তু বাচ্চলাম, ফিরে এলে এ কথা কেউ তাঁকে শোনালে না।

সত্যিই বাচ্চলাম; এর এক বিন্দু মিছে নয়। কিন্তু আচ্ছা—একটা কথা যদি বলি, তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে কি? যদি বলি, সে রাত্রে পরিশ্রান্ত স্বামী শয্যার উপর ঘুমিয়ে রইলেন, আর নীচে বতরুণ না আমার ঘুম এল, ততক্ষণ ফিরে ফিরে কেবলই সাধ হ’তে লাগল কেউ যদি কথাটা তাঁর কানে তুলে দিত, অভূক্ত স্বামীকে ফেলে আজ আমি কিছুতে খাইনি, এই নিয়ে ঝগড়া করেছি, তবু মুখ বুজে এ অন্তায় সহ্য করিনি—কথাটা তোমাদের বিশ্বাস হবে কি? না হলে তোমাদের দোষ দেব না, হলে বহু ভাগ্য বলে মানব। আজ আমার স্বামীর বড় ত ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নেই, তাঁর নাম নিয়ে বল্টি, মানুষের মন পদার্থটার যে অন্ত নেই, সেই দিন তার আভাস পেয়েছিলুম। এত বড় পাপিষ্ঠার মনের মধ্যেও এমন ছোটো উল্টো স্রোত এক সঙ্গে বয়ে যাবার স্থান হতে পারে দেখে তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলুম।

মনে মনে বলতে লাগলাম এ যে বড় লজ্জার কথা। নইলে এখনি ঘুম থেকে জাগিয়ে বলে দিইুম শুধু সৃষ্টিছাড়া ভালোমানুষ হলেই হয় না, কর্তব্য করতে শেখাও দরকার। যে জীব তুমি একবিন্দু খবর নাও না, সে তোমার জন্য কি করেছে, একবার চোখ মেলে দেখ। হা রে পোড়া কপাল! খজোঁ চার স্বর্গদেবকে আলো ধরে পথ দেখাতে! তাই বলি, হতভাগীর স্পর্কার কি আর আদি অন্ত দাওনি ভগবান!

গরমের জন্য কি না বলতে পারিনে, কদিন ধরে প্রায়ই মাথা ধরছিল। দিন পাঁচেক পরে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ছটফট ক'রে কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমের মধ্যেই যেন মনে হচ্ছিল, কে যেন পাশে বসে ধীরে ধীরে পাথার বাতাস করচে। একবার ঠক করে গায়ে পাখাটা ঠেকে যেতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে আলো জলছিল, চেয়ে দেখলুম স্বামী!

রাত জেগে বসে পাথার বাতাস ক'রে আমাকে ঘুম পাড়াচ্ছেন!

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আহ্বান

“এসো, এসো, বঁধু এসো, আধ আঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি”
এসেছে মধুর মধু আইস রাধার বঁধু
কলিকা খুলেছে লাক্ষ্মী অঁখি।
শীতের প্রকোপ-দস্ত হয়ে গেছে গুঁড়া
জেগেছে বানর ভেরী ঐ কৃষ্ণ চূড়া!

গুচ্ছে গুচ্ছে বনফুল কুটেছে সৌরভাকুল
এসেছে মধুপকুল লয়ে গুঞ্জরণ
আকুল তোমার আলি এস এস বনমালী
পরিপূর্ণ ফুলডালি রাধা-বিনোদন!

ডাকিছে নন্দের বাধা আয় আয় আয় মাধা
ডাকিছেন মা যশোদা লইয়া নবনী
পরিপূর্ণ ক্ষীর বাটী অঞ্চল লুটায় মাটী
এস এস এস এস আরে নীলমণি।

বাজাইয়া শিঙা বেণু রাখাল ডাকিছে কাণু ;
 গগনে উদেছে ভামু, ডাকে ধেমুপাল ।
 ছায়াময় স্নানীতল ডাকিছে তমালতল
 লয়ে বেণু এসো কাণু, এসো নন্দলাল !—

কল্ কল্ চল্ চল্ চুমিয়া সোপান-তল
 ডাকে যমুনার জল ডাকিছে মরালী
 অমল-কমল-নিভ বাঁকায়ে ধবল গ্রীব,
 ডাকিছে মৃণালদল চকুপুটে তুলি !

সজল নয়ন তুলে ডাকিছে গো-ধন কুলে,
 নীরব আস্থানে ডাকে কদম্বের তল ।
 শিরে দধিঘট সারি ডাকিছে আভিরী নারী
 ডাকিছে খেয়ার তরা, নাচি-টলমল !

ডাকিতেছে বিলম্বিনী ছলে ছলে শিরঃবেণী
 ডাকিছে ওড়নীর চারু চঞ্চল-অঞ্চল !
 মৃদু মৃদু অশ্রুতুলে কুণ্ডল ডাকিছে ছলে,
 চুমি চুমি গ্রীবাতল ইঙ্গিত-কুশল ।

মৃদু মৃদু বোল কাঞ্চা ডাকে তুলি রোল
 রুণু রুণু রুণু রুণু ডাকিছে নূপুরা ।
 লুঠি লুঠি পদতলে না জানি কি কথা বলে
 তুলিয়া অতীত স্মৃতি নিলাজ-মুখরা !

এসো এসো বঁধু, বলি ডাকিছে তরঙ্গ তুলি
 রাখার সর্ববাস্তব মন হৃদয় পরাণ—
 এস এস এস পিয়া ! ডাকিছে তোমার প্রিয়া
 সুরভি মাধিয়া ডাকে নিভৃত-শয়ান ।

শ্রীগিরীন্দ্র মোহিনী ।

বাংলার চিত্রকলা

বাংলার এক নবযুগ আসিয়াছে। এই নবযুগের কথা অনেকেই অনেকবার অনেক বিষয়ে বলিয়াছেন। এই নবযুগ বাংলার বিভিন্ন চাক্রকলায়ও বিশেষরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। আমরা এখানে আর তাহার অবতারণা করিব না। এখানে আমরা কেবল বাংলার চিত্রকলার নবযুগের কথাই বলিব। বাংলার চিত্রকলা এক নবজীবন পাইয়াছে। বাংলার চিত্রকলার আবহমান কাল হইতে যে স্রোত চলিয়া আসিতেছিল, বাংলা বহুশ বাত-প্রতিঘাতে এবং বিবিধ প্রেরণায় তাহা এখন কতকটা বৃদ্ধিতে পারিয়াছে। হিন্দুর চিত্রকলা, বৌদ্ধের চিত্রকলা, উড়িষ্যার মধ্যযুগের চিত্রকলা, মোগলদিগের চিত্রকলা, রাজপুতদিগের চিত্রকলা এবং বাংলার পুরাতন চিত্রকলা বাংলার আধুনিক চিত্রকরের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে। তাঁহার মনে পড়িয়াছে—তাঁহার সাহিত্যের আদর্শ উপনিষদ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, কাত্যায়ন, পাণিনি, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, বৈষ্ণব-কবিতা। তাঁহার মনে পড়িয়াছে—তাঁহার ভাস্কর্যের আদর্শ ধ্যানী বুদ্ধ এবং শিবের তাণ্ডব নৃত্য। তাঁহার মনে পড়িয়াছে—তাঁহার গৃহনির্মাণ শিল্পের চরম আদর্শ। ভারতের বিভিন্ন হিন্দু এবং বৌদ্ধমন্দির, কনারকের সূর্য্য-মন্দির, আগার তাজমহল। তাঁহার মনে পড়িয়াছে—তাঁহার গুহাশিল্পের আদর্শ অজন্তা গুহা, ইলোরার গুহা, এলিকাটা গুহা, এবং উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি। তাঁহার মনে পড়িয়াছে—তাঁহার সঙ্গীতের আদর্শ পৌরানিক হিন্দুসঙ্গীত, মোগলের সঙ্গীত, তানসেনের সঙ্গীত এবং বৈষ্ণবদিগের কীর্তন। যখন বাংলার চিত্রকর ভারতের এই বিভিন্ন চিত্রগুলি দেখিলেন এবং ভারতের সেই সাহিত্যের, ভাস্কর্যের এবং সঙ্গীতের কথা মনে করিলেন, তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল; তিনি তখন দেখিলেন যে, বাংলার চিত্রকলার বিশেষত্ব কোথায়? তিনি তখন সম্পষ্ট বুঝিলেন যে, বাংলার চিত্রকলার আদর্শ বাংলার জাতীয় জীবনের মত, ইউরোপীয় চিত্রকলার আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি আরও বুঝিলেন যে, ইউরোপীয় চিত্রকলার অনুকরণে বা অনুগত্যে বাংলার চিত্রকলার অভিব্যক্তি হইবে না। তিনি দেখিলেন যে, বাংলার চিত্রকলা দৈবী প্রকৃতি—স্বপ্রধান। কেবলমাত্র কল্পণ এবং প্রেমরসের পূর্ণবিকাশ। তিনি দেখিলেন, বাংলার চিত্রকলার অন্তর অত বৈশিষ্ট্য নাই—রংএর অত বাহার নাই—বস্তুদের অত ক্ষুণ্ণ নাই। আছে আধ্যাত্মিকতা—অন্তক্ষুণ্ণ—আত্মবিকাশ

বা এক কথায় পূর্ণ-রস-সুখ। বস্তুর অস্তরের রহস্যটি কেবল কুটাইয়া তোলে—বহিরা-
ডম্বর মোটেই নাই। বাংলার ভাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার চিত্রকরেরও যুগ ভাঙ্গিল।

কলিকাতায় একটি কলা-বিদ্যালয় আছে। কিছুকাল পূর্বে হেভেল সাহেব এই
বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ভারতের পুরাতন চাক্রকলা দেখিয়া অতিশয়
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বাংলার যখন নবযুগ আসিল, তখন তিনিও এই নবভাবে উদ্ভা-
সিত হইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে ইতিপূর্বে চিত্রকলা ইউরোপীয় প্রণালীতে শেখান
হইত,—তিনি এক নূতন ভারতীয় প্রথা অবলম্বন করিলেন। ইউরোপীয় ভাস্কর্য্যের এবং
চিত্রের আদর্শ ফেলিয়া দিয়া ভারতীয় ভাস্কর্য্য এবং চিত্রের আদর্শ স্থাপন করিলেন।
বাংলার চিত্রকলার নববক্তা খুলিয়া গেল। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রমুখ এই মহা-
বক্তায় ভাসিয়া গেলেন। অক্ষতা গুহার চিত্রলিপি তাঁহাদের আদর্শ হইল। মোগল
এবং রাজপুতদিগের চিত্রের আদর্শে তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইলেন। ভারতীয় পুরাতন
চিত্রের এবং ভাস্কর্য্যের আদর্শ তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা
বাংলার চিত্রকলার জীবন্ত প্রাণের কতকটা সাক্ষাৎ পাইলেন।

বাংলার আধুনিক চিত্রকরেরা ইউরোপীয় কলাবিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন, এই
শিক্ষা তাঁহারা বর্জন করিতে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছেন ; কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে
পারেন নাই। তাই ইউরোপীয় কলাবিদ্যার আভাস তাঁহাদের চিত্রকলার কখন কখন
লক্ষিত হয়। কোন কোন ইউরোপীয় কলাবিদ ইংলণ্ডের পূর্ব র্যাফেল-পন্থী চিত্রকরদের
আভাস বাংলার আধুনিক চিত্রকলার পাইয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। বাংলার
চিত্রকরেরা ভারতের পুরাতন আদর্শের অনুকরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অক্ষতা গুহার
আদর্শই প্রধান এবং সেই আদর্শ ভারতীয় চিত্রকলার উচ্চতম আদর্শ। সেই আদর্শ
অনুকরণ করিতে যাইয়া আধুনিক চিত্রকলার অনেক দোষ ঘটিয়াছে। চিত্রকলার
আত্মসুখি হয় নাই। তাই তাঁহারা সেই দোষ খানিকটা ঢাকিবার জন্য সামান্য-
গুজান চিত্রলিপির আশ্রয় লইয়াছেন। ইউরোপীয় চিত্রকলার পূর্ব-র্যাফেল-পন্থীদেরও
সেই একই দোষ ঘটিয়াছে। এই দুই-ই অনুকরণজনিত দোষে দূষিত। তাই খানিকটা
সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। কেহ কেহ আবার বলেন যে, ইউরোপীয় * ছায়াপন্থী চিত্রকর-
দের অনুকরণ এই আধুনিক চিত্রকরেরা খানিকটা করিয়াছেন। এই অশ্রুযোগের সত্যতা
আমরা স্বীকার করি না ; কারণ, এই দুইয়েরই আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাংলার
চিত্রকরেরা অসুখি লইয়া ব্যস্ত—আর ছায়াপন্থীরা ছায়ার আভাস দিয়াই ক্ষান্ত।
বরং জোরের সহিত বলা যাইতে পারে যে, এই ভারতীয় চিত্রকলার আধ্যাাত্মিকতা

ইউরোপীয় ছায়াপট্ট চিত্রকরেরা দুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সময়ে ইহা আশা করা যায় যে, এই আধ্যাত্মিকতা ক্ষুণ্ণির আদর্শ ইউরোপীয় চিত্রকলা ক্রমে গ্রহণ করিবে। এই বাংলার চিত্রকলার পারস্তের চিত্রকলার আভাষ লক্ষিত হয়। ইহা স্বাভাবিক। ভারতের সহিত পারস্তের সম্বন্ধ অনেক দিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। এমন কি, পারস্তকলার আদর্শ মোগল-সময় হইতেই ভারতীয় কলার আদর্শের অন্তর্ভূত হইয়াছে। সুতরাং পারস্ত চিত্রকলার যে আভাষ বাংলার আধুনিক চিত্রকলার থাকিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? ইহা বরং আমাদের চিত্রকলার গৌরবই বৃদ্ধি করিয়াছে। তবে পারস্তের আদর্শ আমাদের চিত্রকলার পরিমাণ বড় ছোট হইয়া গিয়াছে। মোগল চিত্রকরেরা এবং তাঁহাদের অনুকরণে রাজপুতেরা ছোট ছোট চিত্র আঁকিতেন; কিন্তু পুরাতন বা মধ্যযুগের হিন্দু বা বৌদ্ধ চিত্র স্বল্প আয়তনের নহে। আর কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের এই বাংলার চিত্রকলা খানিকটা জাপানের আদর্শেও গঠিত হইয়াছে, ইহা অনেকটা সত্য। তবে এশিয়ার সকল দেশেরই কলার আদর্শের অনেকটা সামঞ্জস্য আছে। তার পর বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে জাপানের আদর্শের সহিত ভারতীয় আদর্শের অনেক মিল আছে। ভারতীয় বৌদ্ধকলার অনেক আভাষ জাপানী কলার দেখা যায়।

ভারতবর্ষের পুরাতন চিত্রকলার আদর্শ হইতেই এই নূতন চিত্রকলার আদর্শ গঠিত হইতেছে। ইউরোপীয় আদর্শ বধাসম্ভব বর্জিত হইয়াছে, ইহা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, আদর্শ অনুকরণে—সে যে আদর্শই হউক না কেন, বিদেশীয়ই হউক বা স্বদেশীয়ই হউক, বিশেষ দোষ আছে। অনুকরণে কলার আত্মক্ষুণ্ণি বা রসসৃষ্টি হয় না। অনুকরণে কলার উন্নতি অসম্ভব। এই কথা স্বতঃসিদ্ধ। ইহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে অনেক বিষয়েই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। এই কথা রাষ্ট্রনীতিতে যতটা প্রযোজ্য—কলা সম্বন্ধেও ততটাই খাটে। এই বর্তমান বাংলা সাহিত্যেও ইহা বিশেষ লক্ষিত হয়। সুপ্রতি বৈষ্ণব বা পুরাতন বাংলা কবিতা অনুকরণ করা একটা আদর্শের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব সবাই একবাক্যে মানিবে। কিন্তু তাহার আধুনিক অনুকরণে যে কবিতা রচিত হইতেছে, তাহা কি গীতিকবিতার অপভ্রংশ নহে? রবীন্দ্রনাথ যে বড় কবি, ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাঁহারও বিদেশীয় আদর্শের ছাঁচে যে কবিতা আছে, তাহাতেও কি বিশেষ দোষ লক্ষিত হয় না?

সেই রকম চিত্রকলা সম্বন্ধেও খাটে। আমরা ফরাসী চিত্রকলার ইতিহাসেও ইহা দেখিতে পাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসী চিত্রকর ডেভিড্ এবং

ইংগ্রেস • গ্রীক এবং রোমান আদর্শে উদ্ভাসিত হইরাছিলেন। তাঁহাদের চিত্রকলাও সেই আদর্শে গঠিত হইরাছিল। কিন্তু সহস্রই তাঁহাদের অনুকরণের দোষ লক্ষিত হইল। ফরাসী চিত্রকরেরা তাঁহাদের নিজের আদর্শ খুঁজিতে এবং চিত্রকলার ফুটাইয়া তুলিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার প্রথম চেষ্টা + ছায়া-পছীরা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল বাহিরের জিনিস লইয়াই তোলপাড় করিলেন।

• এই চেষ্টায়ও আদর্শ ফুটিল না। তার পর ‡ রসপছী চিত্রকরেরা এই আদর্শ আবার তাঁহাদের চিত্রকলার ফুটাইতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদের আদর্শ কবি-অনোচিত, কিন্তু তাঁহাদের আদর্শ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বলিয়া, ফরাসীর আদৃত আদর্শ সম্পূর্ণভাবে ফুটিল না। তখন ফরাসী চিত্রকর কুর্কো তাঁহার এবং তাঁহার কাল কুকুরের সেই বিখ্যাত চিত্র আঁকিলেন। ফরাসীর আদর্শ ফুটিয়া উঠিল—ফরাসীর আত্মবিকাশ হইল—ফরাসীর চিত্রকলার আত্মক্ষুণ্ণিতে নবযুগ আসিল। ইহাতে রোম বা গ্রীকের আদর্শের আভাষ নাই। ছায়াপছীদের বাহ্যিক আবরণের অন্তঃসূততা নাই, স্বভাবপছীদের কল্পনাধিক্য নাই—আছে কেবল ফরাসীর প্রাণ এবং তাহার সরল বিকাশ। ¶

• সেই রকম ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। রবিবর্মার চিত্রগুলি সকলই ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত। এই চিত্রগুলি কি চিত্রকলার অপভ্রংশ নহে? রবিবর্মার বিখ্যাত শকুন্তলা-চিত্র দেখিলেও ইহা সম্পষ্ট প্রতীত হয় এবং ভবানী-চরণ লাহার গণেশজননীও তাহাই প্রমাণ করে।

কোন আদর্শের অনুকরণেই চিত্রকলার আদর্শের পূর্ণক্ষুণ্ণি কখন হয় না বা হইতে পারে না। এমন কি, যে আদর্শ আমাদের দেশের, কিন্তু যাহা আমাদের অহিমজাগত হয় নাই, তাহার অনুকরণেও প্রকৃত কলানৃষ্টি হয় না। আবার বিদেশীয় আদর্শের অনুকরণে এই দোষ ত শতগুণে বাড়িয়া থাকে। যাহা চিত্রকরের অন্তরের কথা, তাহা চিত্রকর চিত্রে ফুটাইয়া তোলে। সে তাহা অন্তের ভাষায় কি করিয়া ফুটাইবে? সে অন্তের আদর্শই বা কি করিয়া ফুটাইবে? সে ত কেবল নিজের অন্তরের কথা—নিজের ভাষায় সরলভাবেই প্রকাশ করিতে পারে। ভাব থাকিলে ভাবপ্রকাশের উপায়ের অভাব হয় না। ভাবকে স্বাধীন ভাবে খেলিতে দিলে, সে নিজ ভাবে নিজকে সহজেই প্রকাশ করিবে। চিত্রকর

• Classical School.

+ Impressionist School.

‡ Romantic School.

¶ Realistic School.

আপন ভাবে আত্মক্ষুধি করিতে সহজেই পারে। এই কথাগুলি সকল চিত্রকলা-সম্বন্ধেই খাটে। কাব্যেও তাই, সঙ্গীতেও তাই, চিত্রকলায়ও তাই এবং ভাস্কর্য্যেও তাই। তাই চাই, চিত্রকরের চিত্রপটে সহজ আত্মবিকাশ--আত্মক্ষুধি বা রস-সৃষ্টি--তবেই না আধুনিক চিত্রকলা চরম সীমায় উঠিবে।

বাংলার চিত্রকলার সাধকেরা তাঁহাদের সমস্ত প্রাণের সাধনায় চিত্রকলার আদর্শ উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই সেই একই মন্ত্রে, একই সাধনায়, একই ভাবে দীক্ষিত। কি করিয়া বাংলার আদর্শের আত্মক্ষুধি দেখাইবেন, তাহাই তাঁহাদের সমবেত এবং ঐকান্তিক চেষ্টা। তাঁহারা নানা বিষয়, নানা বাধা অতিক্রম করিয়া, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে উত্তত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের অনেক সংগ্রহ, অনেক স্বার্থত্যাগ, দেশপ্রীতি এবং সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা বাংলার আবহমানকাল হইতে চলিত আদর্শ উদ্ধার করিতে বাইরা কেবলমাত্র ভারতের পৌরাণিক আদর্শেরই অনুকরণ করিয়া বাংলার সেই মহা আদর্শেরই কেবল অংশমাত্র উদ্ধার করিয়াছেন। আবার ছুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা সেই পুরাতন আদর্শও সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সেই পৌরাণিক যুগের অস্তরায়ার পূর্ণসাক্ষাৎ পান নাই। পৌরাণিক আদর্শ, পৌরাণিক ভাব, পৌরাণিক জীবন তাঁহারা নিজস্ব করিয়া লইতে পারেন নাই। পৌরাণিকত্বে তাঁহাদের বশেষে ভক্তি এবং প্রীতি আছে, কিন্তু তাহা তাঁহাদের একেবারে নিজের হয় নাই। পৌরাণিকত্ব তাঁহাদের অস্থিমজ্জাগত হয় নাই। চিত্রগুলির বিষয় এবং ভাব অনেক সময়েই পুরাণ হইতে তাঁহারা লইয়াছেন। পৌরাণিক ভাব ও পৌরাণিক কথাই সাধার্নতঃ এই চিত্রকরেরা প্রচার করিয়াছেন; এবং তাহা তাঁহারা পুরাতন চিত্রকলার আদর্শ অবলম্বনে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের চিত্রকলায় বাংলার আদর্শের আত্মক্ষুধি হয় নাই এবং হইবারও কথা নহে। আমরা ইহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ৬শুরেন্দ্র গাঙ্গুলীর “কার্ত্তিক” একটি অপক্লপ সৃষ্টি। দেহের কান্তিতে, শৌর্য্যে, বীৰ্য্যে এবং সৌন্দর্য্যে এই চিত্রটি অতুলনীয়। কিন্তু আত্মক্ষুধির অভাব। অস্তরায়ার পূর্ণবিকাশ নাই। কার্ত্তিক তেমন জাগ্রত ও সজীব নহেন। পৌরাণিক আদর্শ হইতে এই ভাবটি উদ্ধার করা হইয়াছে এবং পুরাতন ভারতীয় চিত্রকলার অনুকরণে ইহা চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু চিত্রকর কি পৌরাণিক আদর্শ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন? আবার অনুকরণেই কি পূর্ণ আত্মক্ষুধি সম্ভবে? তাই “কার্ত্তিকও” বাংলার চিত্রকলার আদর্শে পৌছিতে পারে নাই। গ্রীক ভাস্কর্য্যের বিখ্যাত “এপল বেলভেডিয়ান”এর সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে।

তাই-ই পূর্ণোক্ত দোষে সমভাবে দূষিত। ছই-ই খানিকটা অন্তঃসারশূন্য। যেন পূর্ণ-রসফুর্তি নাই। অবনীন্দ্র ঠাকুরের “বুদ্ধ এবং সৃজাতাও” এই দোষে দূষিত। বুদ্ধের বুদ্ধত্বের ফুর্তি হয় নাই। শ্রীনন্দলাল বোসের “সাবিত্রী ও বম” ইহারই আর একটি উদাহরণ।

অনেক সময়ে বাংলার চিত্রকরেরা এই দোষ ছাড়াইরা উঠিয়াছেন। পৌরাণিক কথা হইতে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিষয়ের অন্তর্ভাবে তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন এবং সেই ভাবে চিত্রে কুটাইরা তুলিয়াছেন। পুরাতন চিত্রকলার আদর্শ অনুকরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই আদর্শকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। যেখানেই এই অন্তর্ভাবের প্রফুটন এবং আদর্শের নিজস্বকরণ হইয়াছে, সেখানেই এই চিত্রগুলি চিত্রকলার উচ্চতম আদর্শে পৌছিয়াছে। আমরা ইহা এখন উদাহরণ দিয়া বুঝাইব। শ্রীবুদ্ধ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ভিষ্মরক্ষিতা” আর একটি চিত্রকলার অপূর্ণ সৃষ্টি। হিংসা, ঘেঘে প্রাণ জর্জরিত, অহঙ্কারে ক্ষীণ ও সৌন্দর্য্যবোধে গর্জিত। ছবিটি এই ভাবগুলির জলন্ত ও সজীব প্রতিমা। রুদ্র ও শাস্ত্র ভাবের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য। চিত্রকলার অন্তরাখ্যার পূর্ণ-বিকাশ ও আত্মফুর্তি ইহাতে লক্ষিত হয়। শ্রীনন্দলাল বোসের “কৈকেয়ী”ও চিত্রকলার উচ্চতম আদর্শের আর একটি উদাহরণ। কৈকেয়ীর অন্তরাখ্যার পূর্ণমাত্রার প্রফুটন হইয়াছে। মুরেরাজ গাঙ্গুলীর “লক্ষ্মণ সেন” আর একটি উদাহরণ। ইতিহাসে ইহার সত্যতা নাই। কিন্তু কাল্পনিক লক্ষ্মণসেনের অন্তরাখ্যার এবং বাঙ্গালীর কলঙ্কের ইহা আশ্চর্য্য অস্তফুর্তি। শ্রীঅবনীন্দ্র ঠাকুরের “দেয়ালী,” “আধার রাত,” এবং শ্রীনন্দলাল বোসের “কুমারী-পূজা” এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বাংলার আধুনিক চিত্রকরদের অঙ্কনবিজ্ঞাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোন কোন ইউরোপীয় কলাবিদেরা মনে করেন যে, বাংলার চিত্রকরেরা অঙ্কনে বা চিত্রের আকার-প্রকারগঠনে বিশেষ পটু নহেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। পুরাতন ভারতের চিত্রগুলিতে রেখা অঙ্কনের এবং আকারগঠনের বিশেষ - পটুতা লক্ষিত হয়, এবং এই কথা আধুনিক চিত্রগুলিতেও সম্পূর্ণভাবে খাটে। তাঁহাদের অঙ্কন এবং আকার-গঠনের ক্ষমতা ইউরোপীয় চিত্রকর হইতে কিছুতেই ন্যূন নহে; বরং অধিক। এই প্রাধান্তের বিশেষ কারণ আছে। ইউরোপীয় চিত্রকরেরা পেন্সিল প্রয়োগ করিয়া হাতের রেখা অঙ্কনের নৈপুণ্য লাভ করেন। ভারতীয় চিত্রকরেরা তুলি প্রয়োগ করেন। পেন্সিলের গতির তত স্বাধীনতা নাই, কিন্তু তুলির গতির স্বাধীনতা পেন্সিলের গতি অপেক্ষা অনেক অধিক, তাই ভারতীয় চিত্রকরের অঙ্কন-নৈপুণ্য এত সহজ। খুঁটিনাটি জিনিসেও তাঁহাদের যথেষ্ট দৃষ্টি

আছে। এখন ইহা আমরা উদাহরণ দিয়া বুঝাইব। শ্রীযুক্ত অমীক্স ঠাকুরের “পাগল বাজনদার” এই অঙ্কন নৈপুণ্যের একটি অপূর্ণ দৃষ্টান্ত; ইহাতে যেমন রেখার আশ্চর্য্য নৈপুণ্য, তেমন ভাবপ্রকাশেরও অদ্বিতীয় কথতা লক্ষিত হয়। বাজনদার আপনার বাজনা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন, এবং সেই আনন্দে উৎক্লিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীমান-লাল বসু “জগাই মাধাই” আর একটি দৃষ্টান্ত। জগাই মাধাইর প্রাণের আনন্দ রেখার রেখার, দেহের কান্তিতে কুটরা উঠিয়াছে। জগাই মাধাইর পৌরানিক সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে।

আমাদের মধ্যে অনেকেই বিক্রম করিয়া বলেন যে, সৰু সৰু এবং কাঠি কাঠি হাত-পা, অদ্বিতীয় আকৃতি, টানা চোখ না হইলে নাকি চিত্রকলার পরিসমাপ্তি হয় না। ইহা যাহারা বলেন, তাঁহারা আরও বলেন যে, তাঁহারা আমাদের এই আধুনিক চিত্রকলার সৌন্দর্য্য দেখিতেও পান না, বুঝিতেও পারেন না। ইহাদের মত আমরা খানিকটা বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ আমাদের বুঝিতে হইবে যে, বাংলার ও ইউরোপের চিত্রকলার আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইউরোপীয় আদর্শের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রগুলিতেও জড়ভাব লক্ষিত হয়। আত্মা যেন শরীর ছাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। অন্তর্জগৎ হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই অন্তরের শরীরের মধ্য দিয়া স্থল-ভাবে স্ফুর্তি হইয়াছে। জড়, শরীর, মাংস সর্বদাই চোখে ঠেকে। আমরা এখন ইহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইব। র্যাকেলের সিসটিসকা মেডোনা চিত্র জগতের একটি অপকল্প সৃষ্টি—মাতৃশ্বের চরম বিকাশ। কিন্তু তাহাতেও কি খানিকটা জড়ভাবের, শরীরের, দেহের, রক্তমাংসের বিকাশ দৃষ্ট হয় না? আবার গ্রীকদের ভাস্কর্য্যও আমরা সেই জড়ভাব দেখিতে পাই। কিন্তু ভারতের চিত্রকলার আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভারত সত্যতা নিবন্ধনই হউক কিংবা ভ্রমবশতই হউক, চিরকালই আত্মকে দেহের অনেক উঁচুতে রাখিয়াছে। হয় ত জড়-জগৎকে খানিকটা তাক্সিয়া করিয়াছে। হয় ত শরীরকে, দেহকে, রক্তমাংসকে সত্য-রূপ করিয়া সম্যকভাবে দেখে নাই। তাই ভারতের চিত্রকলার আমরা কেবল শুষ্ক আত্মাই পূর্ণবিকাশ-প্রয়াস দেখিতে পাই; কিন্তু শরীর, দেহ, বা রক্তমাংসের আতিশয্য দেখিতে পাই না। এইখানেই ইউরোপীয় এবং ভারতীয় চিত্রকলার আদর্শের বৈষম্য। আর বাংলার আধুনিক চিত্রকরেরা সনাতন এই পুরোঁক হিন্দু-আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই ভাবকেই প্রচার করিতে বদ্ধবান হইয়াছেন। কাজেই ইউরোপীয় চিত্রকলার মাপকাঠি দিয়া বাংলার আধুনিক চিত্রকলাকে বিচার করিলে চলিবে না, ইউরোপীয় চিত্রকলার অভ্যাস চক্ষে এই বাংলার চিত্রগুলিকে দেখিলে চলিবে না, ফটোগ্রাফের দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না।

ইউরোপীয় দেহ-শাস্ত্র এই চিত্রগুলিতে খাটাইলে চলিবে না। ইউরোপীয় চিত্রের দেহ-কাস্তির সৌন্দর্য্য এখানে মিলিবে না। এখানে আছে অস্ত্রফুর্তি, এখানে দেখিবে আত্মার বিকাশ,—এখানে পাইবে ভাবের এবং রসের প্রস্রবণ। কিন্তু এই ভাব বাংলার চিত্রকরেরা বিস্মৃতিভাবে ফুটাইতে যাইয়া খানিকটা ভুল করিয়াছেন। শরীর, দেহ, রক্ত, মাংস ও ত তাহিল্যের জিনিস নহে। তাহার স্থিতি আছে, সত্যতা আছে। দেখিব না বলিলে চলিবে কেন? আঁকিব না বলিলে কি স্থিতির লোপ হয়? শরীর ছাড়া কি আত্মা আছে? আত্মারও ত শরীরে বিকাশ—আবার শরীরেই আত্মার লগ্ন। কাজেই ছুই সত্য। তাই হয় ত আধুনিক বাংলার চিত্রকরেরা একটা ভাব ফুটাইতে যাইয়া আর একটা ভাবের অপলাপ করিয়াছেন। হয় ত সময়ে এই দোষ বাংলার চিত্রকরেরা দেখিতে পাইবেন—বুঝিতে পারিবেন—এবং আবার বাংলার সমগ্র আদর্শ বাংলার চিত্র-কলার পূর্ণবিকাশ করিবেন, তাহারও সূচনা আমরা এইখানেই দেখিতে পাইতেছি।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, আধুনিক চিত্রকরেরা ইউরোপের আদর্শ যথাসম্ভব বর্জন করিয়াছেন। তাঁহারা এমন কি এশিয়ার আদর্শ, বিশেষতঃ জাপানের আদর্শও অনেকটা ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা ভারতের পৌরাণিক আদর্শ ও চাক্রকলা তাঁহাদের চিত্রকলার আদর্শ করিয়াছেন। তাঁহারা বিশেষতঃ অজস্রা গুহার চিত্র, রাজপুতদিগের চিত্র, তাঁহাদের চিত্রের আদর্শ করিয়াছেন। তাঁহারা ভারতের সেই পৌরাণিক আদর্শই অনুপ্রাণিত হইয়াছেন এবং চিত্রগুলিতে কেবল ভারতের সেই আদর্শই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতের আদর্শ অনু-করণেই সেই চিত্রগুলি গঠন করিয়াছেন। সেই আদর্শই চিত্রগুলি রচনা করিয়াছেন, সেই আদর্শই চিত্রগুলি অঙ্কন এবং চিত্র করিয়াছেন। তাই এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, বাংলার আধুনিক চিত্রকরেরা কেবলমাত্র ভারতের পৌরাণিক আদর্শই তাঁহাদের চিত্রগুলিতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের আদর্শ এবং বাংলার আদর্শ কি এক? বাংলার আদর্শের কি কোন বিশেষত্ব বা স্বাতন্ত্র্য নাই? বাংলার জীবনের কি কোন বিশেষ ধারা নাই? বাংলার ইতিহাসের কি কোন বিশেষ সূত্র নাই? বাংলার চাক্রকলার কি কোন বিশেষ রসফুর্তি নাই? এই বাংলার বিশেষ-ত্বের এবং স্বাতন্ত্র্যের কথা অনেকে অনেক জায়গায় অনেকবার বলিয়াছেন। তাহার সূচনা আমরা এখানে আর করিব না; তবে এইমাত্র বলিব সে, বাংলার আদর্শের একটা বিশেষত্ব আছে, বাংলার জীবনের একটা ধারা আছে, বাংলার ইতিহাসে একটা একক-ভাব আছে, বাংলার চাক্র-কলার একটা অস্ত্রফুর্তি আছে, এবং বাংলার প্রাণের একটা বিশেষ বিকাশ আছে। আমরা বাংলার সেই বিশেষত্ব এবং স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ বাংলার চাক্র-কলার কতকটা দেখিতে চেষ্টা করিব।

ভারতীয় চাক্রকলায় সাধারণতঃ যোগ এবং জ্ঞানভাবের বিকাশ বিশেষ লক্ষিত হয়। ইউরোপীয় চাক্রকলায় এই ভাবগুলির বরং অভাবই লক্ষিত হয়। ভারতের অন্ত্র প্রদেশের স্থায় বাংলাতেও এই ভাবগুলির যথেষ্ট বিকাশ আছে। কিন্তু এই যোগ এবং জ্ঞানভাবের প্রধান বাংলাতেই প্রেমভাবের সহিত সমভাবে অভিব্যক্তি হয়। বুদ্ধদেব এবং শঙ্কর এই যোগ ও জ্ঞানভাব ভারতে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু বাংলার মাটিতে, বাংলার আকাশ এবং বাতাসের প্রভাবে বাঙ্গালীর ভাব-লালিত্য এবং মহাপ্রভু চৈতন্যের লীলামাধুর্য্যে এই ভাব বাংলায় প্রেমভাবে পরিণত হইয়াছে। বাংলার ধর্ম, অর্থ, কাগ, মোক্ষ, বাংলার জীবনে, বাংলার ইতিহাসে এবং বাংলার চাক্রকলায় এই প্রেমভাবের বিশেষ বিকাশ দেখা যায়।

কালী, দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ, শাক্ত, নৈব এবং বৈষ্ণব ভাব,—রুদ্র এবং শান্ত, কোমল এবং কঠোর ভাব, সমভাবে যুগপৎ বাংলার প্রাণে বিরাজ করে। কিন্তু কোমল, শান্ত বা প্রেমভাবের অভিব্যক্তিই বাংলায় বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। রাধাকৃষ্ণের মোহন বাঁশরীর রবই, কালীদুর্গার অসির স্ননস্নাননি অপেক্ষা বাংলার প্রাণে প্রাণে বেশী বাজে। এমন কি, বাংলার বৈষ্ণবভাবও অন্ত্র অন্ত্র প্রদেশের বৈষ্ণবভাবের তুলনায় অনেক কোমল এবং মধুর। দাক্ষিণাত্যের রামানুজের বৈষ্ণবভাবের সহিত তুলনা করিলেই ইহা সম্পষ্ট প্রতীত হয়। আমরা বাংলার চাক্রকলায় এই প্রেমভাবেরই বিকাশ দেখিতে পাই। বাংলার সেই প্রেমভাব বৈষ্ণব কবিতায় বিশেষ সরলভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে বিকাশ পাইয়াছে। চণ্ডিদাস, বিষ্ণুপতি, জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাস এই প্রেমভাব তাঁহাদের কবিতায় প্রচার করিয়াছেন। মহাপ্রভুর জীবন সেই প্রেমভাবেরই একটি বিচিত্র চিত্র। আমরা বাংলার বৈষ্ণব চাক্রকলায় সেই প্রেমভাবেরই বিকাশ দেখিতে পাই। এই প্রেমরসের বিকাশ আর একবারমাত্র ইটালীতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহা কেবল চিত্রকলায়ই হইয়াছিল। ইটালীর সাধকেরা চিত্রকলায় অতি সুন্দরভাবে এই প্রেমরস ফুটাইয়াছিলেন। তাই চিত্রকলা-জগতে ইটালীর চিত্রকলা এত উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বাংলা-দেশেও এই প্রেমরস ফুটিয়াছিল; কিন্তু তাহা কবিতাতে। তাই ইটালীর চিত্রকলা এবং বৈষ্ণব কবিতায় এতটা সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, এবং তাই বৈষ্ণব কবিতা এবং ইটালীর চিত্রকলা কলা-জগতে এত উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে।

বাংলার চাক্রকলায় সেই প্রেমভাব বাংলার গার্হস্থ্যজীবনে এখনও লক্ষিত হয়। বাংলা চাক্রকলাকে গৃহস্থালীর সামগ্রী করিয়া রাখিয়াছে। চাক্রকলাকে গার্হস্থ্যজীবনে পরিণত করিয়াছে। সমস্ত জীবনকে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যেন এক কলানুজ্ঞে গাঁথিয়া রাখিয়াছে। জন্মের আচার-পদ্ধতি, বাল্যের বিদ্যাভাস, নামকরণ, চূড়া-করণ, গোঁথিয়া রাখিয়াছে। জন্মের আচার-পদ্ধতি, বাল্যের বিদ্যাভাস, নামকরণ, চূড়া-করণ, উপনয়নপদ্ধতি, যৌবনের শিক্ষা-দীক্ষার পদ্ধতি, আচার-ব্যবহার, বিবাহ, প্রৌঢ়ের কস্ম-

পদ্ধতি এবং বৃহত্তর ধর্মোচিতপদ্ধতি আমাদের সমগ্র জীবনকে কলাময় করিয়া রাখি-
 য়াছে। বারমাসের বারপূজা, তেরপার্বণে সেই চাক্কলারই পূর্ণ বিকাশ দেখিতে
 পাই। দেহের প্রসাধনে—তিলক, গোধূলি, চন্দনচর্চার, সিন্দূর ও আলতার প্রয়োগে
 সেই চাক্কলারই বিকাশ দেখি। শাড়ীর বিচিত্র চিত্রে, গহনার কারুকার্যে, নামাবলীর
 সুন্দর বিচিত্র অঙ্কনেও সেই চাক্কলারই প্রভাব দেখি। পিঠার ও আমসত্ত্বের সাজে এবং
 • নানাবিধ খাঙ্গামঞ্জীর সুন্দর গঠনে আমরা সেই চাক্কলারই মাধুর্য্য দেখিতে পাই।
 চিত্রকরের নানাবিধ সুন্দর পট অঙ্কনে, আঙ্গিনার আলপনায়, পিঁড়ি ও কুলা-চিত্রিতে,
 মধুখামের চিত্রিতে এবং গৃহের বিচিত্র চিত্রগুলিতে আমরা বাংলার সেই চিত্রকলার
 আভাষ পাই। বাংলার এই চাক্কলার স্মৃতি একই ধারাবাহিক স্রোতে চিরকাল চলিয়া
 আসিতেছে। বাংলার বিভিন্ন যুগ ভিন্ন করিয়া দেখিলে বাংলার চাক্কলার
 সেই একভাবেই বিকাশ দেখিতে পাই। বাংলার চাক্কলার এই ধারাবাহিক
 একভাবে বাংলার আধুনিক চিত্রকরেরা সম্যক উপলব্ধি করেন নাই। বাংলার চিত্র-
 লিপিকে তাঁহারা তাঁহাদের আদর্শের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। বাংলার চাক্কলার আদর্শ
 তাঁহাদের সম্পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত করে নাই। বাংলার ইতিহাস, বাংলার কাব্য,
 বাংলার শিক্ষাদীক্ষা, বাংলার আকাশ-বাতাস তাঁহাদের অনুপ্রাণিত করে নাই।
 বাংলার মাধুর্য্য, বাংলার রহস্য, বাংলার সুখ-দুঃখের কথা তাঁহাদের প্রাণের তারে সম-
 তানে বাজিয়া উঠে নাই। শিশুর জননী-জঠরে যেমন মাতৃনাড়ীর সহিত সংযোগ থাকে,
 বাংলার চিত্রকরের বাংলার নাড়ীর সহিত তেমন সংযোগ হয় নাই। শিশু যেমন মাতৃ-
 প্রাণে অনুপ্রাণিত হয়, বাংলার চিত্রকরেরা তেমন বাংলার প্রাণে অনুপ্রাণিত হন নাই।
 তাঁহারা সাধারণতঃ চিত্রগুলি বাংলার বিষয় হইতে রচনা করেন নাই। বাংলার
 চিত্র পদ্ধতিতে অঙ্কন করেন নাই। বাংলার চিত্রপ্রণালীতে চিত্র করেন নাই।
 তাঁহারা চিত্রগুলিতে বাংলাকে কুটাইয়া তোলেন নাই। বাংলাকে প্রকাশ
 করেন নাই, বাংলার রসস্মৃতি করেন নাই। তাই বাংলার চিত্রকলার বাংলার
 জলন্ত প্রাণের সম্যক বিকাশ হয় নাই।

আমরা বিভিন্ন দেশের চিত্রকলার বিভিন্ন দেশের স্বাতন্ত্র্যের অন্তর্ভুক্তি দেখিতে
 পাই। ইটালী চিত্রকলার এক পুণ্যভূমি। র্যাফেল, লিওনার্ডোভিঞ্চি এবং টিসিয়ান
 এই চিত্রকলার মহারথী। কিন্তু তাঁহারাও ইটালীর বিভিন্ন প্রদেশের বিশেষ রসই
 কুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইউরোপে, হল্যান্ড ও চিত্রকলার আর একটি বিশেষ তীর্থ।
 বেমত্রান্ট, রুবেন্স এবং ভ্যেনডাইক এই চিত্রকলার মহারথী। কিন্তু তাঁহারাও এই
 হল্যান্ডের বিভিন্ন প্রদেশের বিশেষভাবেই বিকাশ দেখাইয়াছেন। স্পাইনের
 বুরিলো এবং ভেলাস্কোয়ের চিত্রেও আমরা ইহাই দেখিতে পাই।

এখন আমরা ইহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাংলার চিত্রকলার রস সাধারণতঃ অতি সহজভাবে বাংলার গীতি-কবিতাতেই বিকাশ পাইয়াছে। আমরা এখানে চণ্ডিদাসের গীতি-কবিতা হইতে ইহা দেখাইব। চণ্ডিদাস শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরূপ আমাদের দেখাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ একদিন যমুনার ঘাটে শ্রীরাধিকাকে স্নান করিতে দেখিলেন। দর্শনমাত্রেই নারকের প্রাণ নারিকার ছটার বলকে চমকিয়া উঠিল। বড় আশা—রাধাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিবেন। কিন্তু শ্রীরাধা যমুনার জল হইতে উঠিয়া গৃহাতিমুখে চলিলেন। নারক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—গাহিয়া উঠিলেন—

“চলে নীল শাড়ী, নিজারি নিজারি
পরান সহিত মোর।”

এখানে চণ্ডিদাস নারকের সমস্ত প্রাণের কথা দুই পদে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রেমিক-মাত্রই স্বীকার করিবেন যে, এই চিত্রে পূর্ণমাত্রার নারকের অন্তর্লীলাঙ্গন হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে, চণ্ডিদাস এই সুন্দর চিত্রে এই বাংলারই প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকিয়াছেন। বাংলার প্রেমিককেই নারক করিয়া রচনা করিয়াছেন এবং বাংলার সুন্দরীকেই নীল শাড়ী পরাইয়া নারিকা করিয়া চিত্র করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বাঙ্গালী, শ্রীরাধা বাঙ্গালী, প্রকৃতি বাংলার, যমুনাও বাংলার। সমস্তটাকেই বাঙ্গালীর চক্ষে দেখিয়াছেন এবং সেই বাঙ্গালীকেই তাঁহার গীতিকবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। চণ্ডিদাস শ্রীকৃষ্ণকে মথুরার সাজে সাজাইতে পারিতেন, শ্রীরাধাকে ষাগরী পরাইয়া বৃন্দাবনের সাজে সাজাইতে পারিতেন, এবং নারক-নারিকাকে মথুরা-বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক দৃশ্যে শোভন করিতে পারিতেন এবং যমুনাতে মথুরা-বৃন্দাবনকে বিভাগ করিয়া কুনুকু শব্দে প্রবাহিত হইতেছে দেখাইতে পারিতেন। কিন্তু চণ্ডিদাস বাঙ্গালী, বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস, বাংলার দৃশ্য, বাংলার নর-নারী তাঁহার প্রাণের সঙ্গে জড়াইয়াছিল। তাই তিনি বাংলাকে ফুটাইয়াছেন, বাঙ্গালীকে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বাংলার কলারসের অন্তর্লীলাঙ্গন দেখাইয়াছেন। তাই তাঁহার গীতিকবিতা এত সহজ, সরল এবং স্বাভাবিক, এবং তাই তাঁহার গীতিকবিতা সাহিত্যজগতে এত উচ্চ আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। এই চিত্রটি আমাদের আধুনিক চিত্রকরেরা কি এইরূপই আঁকিতেন?

আমরা ইটালীর চিত্রকলায় এই আশ্চর্যবিকাশ দেখিতে পাই। রাফেল, লিওনার্ড-ভিন্সি ও টিসিয়ান ইটালীকে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই খৃষ্টের এবং তাঁহার মাতার চিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁহারা খৃষ্টের মাতাকে ইটালীর নারীসাজে সাজাইয়াছেন এবং শিশু খৃষ্টকে ইটালীর বালগোপালের সাজে সাজাইয়াছেন।

আবার হল্যাণ্ডে রেমব্রেন্ট, রুবেন্স এবং ভ্যেনডাইক হল্যাণ্ডকে চিত্রে ফুটাইয়াছেন। এই মহাজনদের দুর্ভাগ্যবশতঃ হল্যাণ্ড নারীর রূপমাধুর্যের জন্য কখনও বিখ্যাত ছিল না। তথাপি এই চিত্রকরেরা সুন্দরীর অধেষণে দেশান্তরে যাওয়ার আবশ্যক বোধ করেন নাই। স্পাইনের মুরিলো এবং ভেলস্কোরের চিত্রেও তাহাই দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের এই আধুনিক চিত্রকরেরা বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিতৃপ্ত না হইয়া ভারতের অন্ত প্রদেশের প্রকৃতিকে আঁকিয়াছেন। তাঁহারা বাংলার নরনারীর কমনীয় দেহকাস্তিতে মুগ্ধ না হইয়া, অন্ত প্রদেশের নরনারীতে তাঁহাদের চিত্রপট শোভিত করিয়াছেন। বাংলার কথা তাঁহাদের প্রাণে প্রাণে বাজিয়া উঠে নাই। তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ও বিভিন্ন যুগের কথা তাঁহাদের চিত্রে প্রচার করিয়াছেন। তাই বলি যে, বাংলা তাঁহাদের অনুপ্রাণিত করে নাই; বাংলার আদর্শ তাঁহাদের চিত্রকলা উদ্ভাসিত করে নাই, তাঁহারা বাংলাকে বা বাঙ্গালীকে তাঁহাদের চিত্রকলার পূর্ণ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু আবার ইহাও বলি যে, বাংলার এই চিত্রকলার একটি অনভিব্যক্ত শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং এই শক্তি ক্রমে বিকশিত হইয়া বাংলার চিত্রকলাকে ক্রমে সর্বদুঃসুন্দর করিয়া তুলিবে এবং কলাজগতে বাংলার গীতিকবিতার স্থায় শীর্ষস্থানীয় করিয়া তুলিবে।

বাংলার আধুনিক চিত্রকরেরা ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের এই ভুল বুদ্ধিতে পারিতোছেন। তাই তাঁহারা এখন বাংলার প্রাণে নিজেকে অনুপ্রাণিত করিতে চাহিতেছেন, বাংলার আদর্শে নিজেকে গড়িতে চেষ্টা করিতেছেন, বাংলার ভাবে নিজেকে উদ্ভাসিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন এবং বাংলার সেই বিশেষ রস তাঁহাদের চিত্রগুলিতে ফুটাইতেছেন।

এই অল্পকালমধ্যেই বাংলার চিত্রকলা অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই চিত্রকলার বাংলার অন্তান্ত বিষয়ের মত ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। চিত্রকলা চিত্রকরের সাধনার এবং প্রচারের এক সহজ এবং সুন্দর উপায়। কবি কবিতা লেখেন, ভাস্কর মূর্তি গড়েন, বাজনদার বাজান, গায়ক গান করেন এবং চিত্রকর চিত্র করেন। সকলেই নিজেকে প্রকাশ করেন, এবং আপনভাবে অন্তকে অনুপ্রাণিত করেন। এই আত্মবিকাশে এবং এই অনুপ্রাণনায় জগতের হিত সাধিত হয়। তাই অন্যান্য চারুকলার সাধকের মত বাংলার চিত্রকর বাঙ্গালীকে আপনভাবে বড় বেশী অনুপ্রাণিত করিতেছেন এবং বাংলার আদর্শ বাংলার চোখের সম্মুখে ধরিতেছেন। তাঁহাদের আশা যে, এই চিত্রকলার সাধনায় বাংলাকে পুনরায় জগৎমাঝে উঁচু করিয়া তুলিবেন। আমরা এই চিত্রগুলিতে তাহারই কেবল সূচনা দেখিতেছি।

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়।

কমলের দুঃখ

(হেনা—গোলাপ)

তোকে সে দিন ত আমি বলুম যে, সবাই সমান ; যেমন আমরা, তেমনি ওরা ।
তুই বলি, ‘না লো না—তুই গরবে চোখে কানে দেখতে পাসনি, তাই ।’ গরব কেন
করব না লো বল্—গরবের ঢের পেয়েছি, তাই গরব হয়েছে, তার গরবে এখন
তাই গরবিনী ; তোরা এখন বা বলিস্, তা বল্ গে ধনি ! বেস্তা হয়ে বেস্তা-জন্মের
সার্থক করতে যাচ্ছি—আমার গরব হবে না ? আহা ! রূপ বেচে সুখ কিনে—
প্রাণের হাসিতে আঁধুন লাগিয়ে দাঁতে মিশি দিয়ে হাসছি—গরব করব না ? বাবু
সে দিন রস পেড়ে ভর দেখিয়েছেন, হীরের কুঞ্জে বাসর জাগাবেন, তবে আমি ত
ম’রে আছি—হায় ! হায় ! বলে

“এল কত গেল তল

উঠতে বসতে এমনি ছল”

আমার ত তার প্রাণ উড়ে গেল আর কি ? জ্বাকামি দেখে গা জ’লে যায়—
বত সব হাবাতে, সাধ ক’রে কি ভাল লাগে না ? এটা বোঝে না যে,
আমি তার কন্তে প্রায় ম’রে আছি আর কি ? যেখানে ইচ্ছা থাক, তাতে
আমার কি—আমার কি—আমি কি তার, না সেই আমার যে, তার কন্তে চোখের
জল ফেলব—হা হতোশ করব ?—আহা, ব্যাটাছেলে সেরনা কত, আমার কাছে
সাতলাক ছিনিমিনি খেললেন—দেবতার মত তাই ছিল, তাই বাচলেন—এখন
আবার বুড়মালিনীর কুঞ্জে তৃতীয় প্রহরে রাসের বাচ খেলতে যাবেন, তাই আবার
আমার ভর দেখাচ্ছেন ! চুলোর থাক্ গে,—যা তার খুসী তাই করুক, আমার
তাতে কিবা আসে যায় ! ও সব তাব্বার আর ইচ্ছাও নেই । নদীর জল সাগরের
দিকে ছোট্টে, সে দাঁড়িয়ে ভাবে না—আমিও দাঁড়াতে পারছি নি, ছুটেছি—উধাও—
উধাও—কত দিনে তার চরণে গিয়ে পড়ব । কত দিনে আমার সেই রূপের সাগরে
প্রেমের ধারা বয়ে এক হয়ে মিশিয়ে যাবে । নদীস্রোত বাধা মানে না—আমার
মনও বাধা মানতে চায় না—সেও চলেছে ; যেমন স্রোতের জলে গাছের ছায়া
মানুষের ছবি পড়লে স্রোতের জলের কিছু হয় না—চলেছে—তেমনি এ নগেনের
ছায়া, ওতে মন আর মাতে না । এখন টাকার সুখ, ইয়ারকির সুখ ভাল লাগছে

না—সেই এক রূপের কথা প্রাণে টেনেছে—মনে লেগেছে। সেই দেবতার পারে ঝরা শিউলির মত সব গন্ধ নিয়ে—যৌবনের তনু মন ভার প্রাণের সব আবেগ ঢেলে দিতে প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করছে।

সে দিন মিত্‌মার আরী এসেছিল, বলে—‘মর্ আবাগী, মানুষ গেছে, তার আবার ভাবনা? তোর তরে কত আলগোছ হয়ে রয়েছে, বলিস্ত’ আজই—এখনই। তা নর—গুণ গান কর, মানুষের আবার ভাবনা?—বলে—ফোটা ফুলে আবার ভোমরার অভাব?’ আমি শুনে হেসে মরি। বুড়ীর কথা যদি শুনি ত হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে যাবে। আমি বলুম ‘আরি, মানুষ অমন ঢের মেলে, কিন্তু মনের মানুষ কৈ মেলে আরি?’ আরী বলে—‘আ মর্ লো মর্—মনের মানুষ কি জন্মায়? মন দিয়ে মন খুঁজে নেয়—সে এ রাস্তা নয় লো; মর্ মর্, এখন মনের মানুষ খুঁজছে—তা বলছি ত গুণ গান কর, অমনি কি হয়? এই আমাবস্ত্রে আসছে—ভরা আমাবস্ত্রের রেতের বেলা এলোচুলে সেই ফুল তুলে আন্বি, ওই শ্রামের বাগানে আছে—মাণিকঘোড় গাছ, ডালে ডালে পাতার পাতার মেশামিশি—তার মাঝে এক শিশ থেকে সাদা ফুল আর তার বুকের কাছটা লাল টুকটুকে, সেই ফুল তুলে এনে যার বুকে মারবি, সে ইন্দির, চন্দর, বায়ু, বরুণ হলেও পারে লুটিয়ে পড়বে। মর্ লো মর্—মনের মানুষ খুঁজে মর্ছে—তা গুণ গান কর—তা নর—নিশি জাগছে। মর্ লো মর্—সে ওই আমাবস্ত্রের রাস্তিরেই ফোটে। যা বলছি, তা ক’রে দেখ—মনের মানুষের আবার ভাবনা?’ শুনে প্রাণের ভেতর সেই অবধি একটা ভয়ানক পিপাসা জেগেছে, তাকে আমার চাই—আমি চাই—দেখি—তেমনি একবার চেষ্টা করব—তাতেও কি হবে না? আরী আমার ঠিক ব’লে গেছে, আজ দশমী—এই কদিন কাটলে আমি তাই করব।

কাল একজনরা—ওই সেনেরা বাগানের জন্তে এসেছিল, যাব নাই বলেছিলাম—বলেছি, আমি আর মজ্‌রো করব না—ভাব্‌লুম বলি, যদি কমলবাবু ভোমাদের বাগানে আসে, আমি তাঁকে একবার গান শোনাতে চাই—সে জন্তে আমি পরসাদ নেব না। এতে যদি ভোমরা রাজি হও, আমি যাব—নইলে—লক্ষটাকা দিলেও নয়। আমি ত টাকার কাঙালী নই। টাকা আমার ঢের আছে—আবার ভাব্‌লুম, তা কেন—তাদের কেন, বলতে যাব; আমার লুকোন—প্রাণের লুকোন কথা তোর কাছে বলি ব’লে সবাইকে ব’লে বেড়াব। বললাম ‘যাব না’—আবার তখন মনে মনে সেই হিংসার বুক জলে যেতে লাগল; আমি যাকে ভালবাসি, তাকে কেন অন্তে ভালবাসে—আমি পাই আর নাই পাই, সেত আমার—সেত আমার; তাকে কেন—তার ছবির সামনে হাঁটু গেড়ে কেন—আর একজন পূজা করবে। মনে মনে

হয়, ভাবি—ছবিখানা কেড়ে নেব, তার পরই মনে হয়—বাইরের ছবি কেড়ে নিয়ে আর কি হবে—তার মনের আঁকা পটখানি ত মুছে ফেস্তে পারব না। আমার ত ঘরে তার ছবি নেই—আমি ত তাকে প্রাণভরে—সমস্ত মন এক ক’রে, কখন দেখতে পাই নি—তবুও প্রাণে যে ছবি—যে আলোর খেলা ফুটেছে, তাকে কে মুছতে পারে। এ ক্ষণিক বিহ্বলের রেখার মত একবার ফুটে অলস্ত আঙনের দাগ বসিয়ে গেছে,—সে কি ও সুখের রেখা, আর ওই মোহাগের তুলি তাকে মুছতে পারে। আবার ভাবি, আমিও ভালবাসি, সেও ভালবাসে—তার দোষ কি? হিংসা করি কেন,—না, তা হবে না, তাকে পেতে হবে, তাকে চাই। কিন্তু গোলাপ, মনে হয়, কি দিয়ে, কোন্ গুণে—তাকে চাই। কি আমার গুণ আছে যে, সে আমার এ প্রেমের—এ ভালবাসার—এ আশ্বদানের সার্থকতা তাতে লাভ করব। এ উচ্ছ্রিত দেহ নিয়ে কেমন ক’রে তাঁকে—তাঁর ভোগের জন্তে নিরে যাব। ভাবি—কতই ভাবি—কতই ভাবি—ভাবনার শেষ নেই। এ শোঁকা বাসিফুল নিয়ে—কেমন ক’রে তার কাছে যাব; কেমন ক’রে এ দেহকে পাত্র ক’রে, তার পূজোর ফুল সাজাব। ভাবি, বুঝতে পারি না—কি হবে—কি করব—শুধু ছুটেছি আশ্বহারা দিশেহারা হয়ে, তার জন্তেই ছুটেছি। চাই তাকে,—পাব না কি? হায়! আমার এ কি ছরাশা,—চাতকের বাস মাটিতে গাছের খোপে—সে অমন দিগন্তের শেষে—সেই কোন্ উর্দ্ধে—সেই মেঘের ধারার জন্তে ছোট্ট কেন? কেন তার এ ছরাশা! প্রতি নিমেষেই বজ্রপতনের রোল, মেঘ মেঘের উপর গড়িয়ে যায়,—তবু সে ওই ফটিক জলের আশায়ই প্রমত্ত—সে কখন বাজের ভয় করে না! তাকে এই চিঠি লিখছি, তখন আবার এই কতক্ষণ হ’ল, তারা এসেছিল। সঙ্গে নাষ্টার। বললে, ‘বন্ধু, এ বাগানে কমলবাবু আসছেন, বুঝলে; বন্ধু, আমি তোমার হিঠৈতবী, তাই বলতে এসেছি। অবুঝ হয়ো না বন্ধু—অবুঝ হয়ো না! হাজার টাকা দিতে চাইবে। তোমার ওর নাম কি—টাকার ভাবনার কথা বলছি নি—বা চাও, তাও ত একটা! হ্যাঁ হ্যাঁ কি বল—সুবিধেও হবে—বল ত আজ সব ঠিক করি। আসছে শনিবারে তবে সব বোড়শোপচারে আয়োজন হ’ক—আর ব্রাহ্মণ বন্ধু, কিছু পেরে যাক?’ অনেকক্ষণ হাঁ ক’রে তার কথা শুন্লুম; ভাবলুম—কখন এদের বাগানে আসবে—আমি গাইতে যাব, সে শুন্তে তাই আসবে—স্বপ্নের মত চোখের উপর সেই স্নাতিরের কথা মনে হ’ল, বুকটা ভালপাড় হ’য়ে গেল। বললুম—আচ্ছা যাব। মাষ্টার ত’ নাচতে নাচতে গেল। কলম ফেলে চুপ ক’রে ভাবতে লাগলুম, আমি চাই কি?—আমি ত তাকে অমন ক’রে চাইনে—আমি তাকে আমার প্রাণের মত ক’রে চাই, জগৎ থেকে আলাদা ক’রে প্রাণভরে চাই। ওই সব সকলের মত হয়ে আসবে,—এসে আমার কাছে ধরা দেবে। তা হবে না—আমি তাকে আমার

মত ক'রে চাই! মনের মত, প্রাণের মত, বুকের ভাবের মত চাই! তখনই মনে পড়ল, বেশ হয়েছে—ভালই হয়েছে, শনিবার আমাবস্তু—আরীমার সেই মানিকজোড় ফুল—তার বুকে একবার সমস্ত প্রাণমন এক ক'রে নির্নিমেষ হয়ে মারুব, দেখি হয় কি না? কিন্তু কি জানি কেন, প্রাণে এক মহা ভাবনা—যেন কি করতে কি হবে মনে হচ্ছে! যাই হোক, ভয় কিসের—যেমন ক'রে হোক—তাকে পাবার জন্তে সব করব। তাকে পাবার জন্তে আমি সব করতে পারি, এ নারীজন্ম যে তার সার্থক হবে। দেখি কি হয়! এ কটা দিন বে কি ক'রে কাটবে, তাই ভাবছি—না—কাটবে—আর কিছু না হয়, তাকে ত একবার দেখতে পাব; তার পায়ে একবার নুটিয়ে পড়তে পাব ত। সে কি সত্যিই বাসি ফুল ব'লে ফেলে দেবে! কখন নয়। এখন ত তেমনি শিরায় তপ্ত শ্রোত ছুটছে, এখন তেমনি প্রাণের আকুল আবেগ ভরে রয়েছে, তবে এখনও ত তেমনি আগ্রহের সঙ্গে সবাই ধরে আসে, তবে সে কি তুলে নেবে না! কেন নেবে না,—আমি যে তাকে ভালবাসি—আমি দীনা-হীনা ব'লে, আমারও ত প্রাণ আছে, এ প্রাণের সমস্ত ভালবাসাখানির কি কোন মূল্য নেই? বিকিকিনির হাতে আমার এ পসরা সে কি একবার তুলে নিতে যাবে না? তার হয় ফেলে দেবে,—তা ব'লে কি করব। আমি পসরা আর কাকেও বেচতে পারবো না—কেউ ত বিনামূল্যে কিনতে পারবে না—কেউ ত অমন রূপ দিয়ে পসরা আলো ক'রে নিতে পারবে না। কেউ ত অমন চরণমূলে প্রাণপণের পাপড়ী খুলে দেবে না। একবার তাকে দেখতেও ত পাব। সেও কি তোমার ঢের নয়? তবু একবার দেখব।

ওই নিশি বন ঘোর ক'রে এলো। যত রাত হয়, তত আমার আশা বাড়ে। মনে মনে কত ছবি আঁকি। ভাবি, এমনি নিশায় ওই তারাতারা আকাশের তলার, আমার বুকে ক'রে সে বন্বে ভালবাসি। বন্তে বন্তে চুমু দিয়ে আমার ভরিয়ে দেবে। কখন ভাবি—যেমন পুকুরের জলে উন্টে পড়া পদ্মপাতার উপর ফোটা পদ্ম নুটিয়ে পড়ে, তেমনি করে তার—আমার সেই কমলের—কমল চরণের পাতার উপর আমার এই কামরাণ শিশিরে আহত পদ্মের মত মুখখানা পেতে রাখব। কখন ভাবি, আমি মান ক'রে বসে থাকব, আমার পিরা কত সোহাগে আমার এই বুকে সোনার গাঁথা মুক্তার মালা দোলাবে, আমি অধর ফুলিয়ে হেসে—তার কোলে নুটিয়ে পড়ব। কখন ভাবি, বুকে বুকে মুখে মুখে নীরবে ছদ্মবে ফুলশেয়ে সুখের আবেশে আতিশয্যে ঘুমিয়ে পড়ব, কিন্তু কি ছর্ভাগ্য—ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি, স্বপনে চমকে উঠি! পিরা! পিরা! ব'লে অঙ্ককারে বাতাসকে বুকের ভেতর চেপে ধরতে যাই; প্রাণের ভেতর থেকে ডুকরে ওঠে। কাকে

কোকিলে সাড়া দেয়, ভোর হয়, ঘুম ভাঙে, তখন দেখি, সান্নানিশি ধ'রে যে ছবি আঁকলেম, স্বপ্নে যাকে বুকে করলেম, নিষ্ঠুর প্রভাত দেখালে—সে সব হাসির ফাঁকি—একটি তার সত্য নয়! অবশ্য দেহ মন যেন—বিছানায় মিশিয়ে পড়ে থাকে। এমনি ক'রে আর বইতে পারি নে—ভাবছি তাই কতদিনে তাকে পাই। রাত্তিরের সমস্ত সঞ্চিত আশা ভোরের বেলায় নিরাশায় ঝরে যায়। যেনন আমাদের জীবন! সমস্ত রাতের কলকণ্ঠের ঝঙ্কার—যেনন নাকের হাড় উচু, জিব গুথনো, চোখের কোলে কালো—মার শরীর এগিয়ে পড়ছে। আশার স্বপ্নে আঁকি ছবি বার বার, সত্য কভু হ'ল না আমার। কি এ যেন কিসের দুর্ভোগ—যে কি এ জীবন। অন্ধকার আমাদের আশা, দিবা আমাদের নিরাশা! আর ত পারি না, জীবন যেন কেমন হয়ে গেল, কি হবে কি করব। তাই, তুই হয় ত মনে করছিস, আমি পাগল হয়েছি! পাগল হই নি লো—পাগল হই নি, সত্যি যা তাই তোদের কাছে বলছি। ভাণ করতে করতে এমন হয়ে যাই যে, সত্যিতে ও ছলনার তফাৎ করতে পারি নি। তাই এমন দুর্দশা! এতদিন ত ভাণ করেছি, এখন সত্যি করেছে দেখি না, যদি কিছু পাই। এত ক'রে প্রাণ ধ'রে যার কামনা করছি, তার কি কিছুই হবে না! প্রাণের কামনা কি বিকল হয়!

অনেক রাত্রে নেশায় টলতে টলতে নগেন এসে গোলমাল করছিল। দরওয়ান ভয়ে-ভয়ে দরজা খুলে দেয়—আমার এসে জ্বালাতন করে—আমি তার সঙ্গে দেখা করিনি। রাগে আপনি বধন ফিরল—তখন নেশার ঝোঁকে কত কি বক্তে বক্তে চ'লে গেল। গোলাপী, আজ সবাই কেমন জ্বালাতন ক'রে তুলেছে। পাখীটা পর্যন্ত চোঁচাচ্ছে। ছাড়লেও ছাড়েনা, এ কি অভ্যচার! আমি চাই না, তবু কেন আমার ব্যস্ত করা। ইচ্ছে হচ্ছে তার সব টাকা-কড়ি ফিরিয়ে দিয়ে বলি, এই নাও—এই নাও, দেহের বিনিময়ে যা নিয়েছিলুম, তাও তোমায় ফিরিয়ে দিলাম; আর আমার তোমার সঙ্গে কোন-সম্পর্ক নেই,—ফিরিয়ে নাও। সেই চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে মন তার মনের সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চাইছে,—এখন আর হাটের বেচা-কেনা পারব না, প্রাণ আকাশে উঠেছে। যত দিন না তাকে পাই—তত দিনই এ জ্বালায় নিবৃত্তি হবে না। প্রাণে প্রাণে এ এক অপূর্ব জাগরণ, এ কখন আমার জীবনে হয় নি। তোরা যাই কেন মনে কর না—আমার এ মন তাকেই দিতে পারি! দেহ মন আমার সেই এক মহা-মিলনের জন্তে উন্মুখ হয়ে উঠেছে! আর কিছু চাই না! আর কোন সাধ আমার নেই! মনের মাঝে এ আমার কি আকুলতা—ভাবছি ফুল ছুঁড়ে মারলে আমার হবে; আর আমি যে প্রাণ-মন-দেহ পণে তাকে পাবার জন্তে লালস্বিত—সে নিফল হবে!

ভাবছি ফুল ত বাইরের—আমার মনের ভেতরে যে ফুল ফুটেছে, তার পূজোর
সে ভুলবে না—তার পূজো সে নেবে না! আর এলোচুলে, সোঁত কাপড়ে
একটা ফুল ছুড়ে মারলে—তার সমস্ত বুকে ফুলশর বিধবে। আমার এ ফুলের মত—
ফুলের বজ্রার মত গাঁথনি, সাজিভরা শুবকের মত দেহে ভুলবে না,—আর ওই
আম্রীমার কথায় সব হবে। জানি না—এ অদৃষ্টে কি আছে। আর আশা ও
নিরাশার মাঝে, সুখ ও দুঃখের মাঝে, জন্ম ও মরণের মাঝে দোলার দোলার মত
প্রাণ হাঁপারে থাকতে পারি না। সব যেন কেমন এক পৌঁচড়া টেনে কালীমাথা
ঘরকে সাদা করার মত—কালী-ঝুলি তার অন্তর থেকে ফুটে ফুটে বের হচ্ছে;
সে সাদা করা শুধু ও জোমড়ার চূণের কাজ নয়। ভাঙ্গ বালি,—বালি ভেঙ্গে নূতন
কলি ধরিয়ে দিলে, তার পর যদি আবার সাদা হয়—যদি বালি সেই পুরণো ইঁটে
ভাল ক’রে ধরে। বুঝতে পারছি নি—আর ভাবতেও পারি নি—এ অদৃষ্টে কি শেষ
দাঁড়াবে। এত যে সুখের জন্তে ঘুরে মলাম, সে সুখ কোথায়? শুধু একবার
আকাশপানে চাই,—একবার নিজের মনের ভেতর ডুবতে যাই, দেখি—সেই
ছবি! রঙ নিরে তুলি নিরে মনে করি, মনের সেই ছবি আঁকব—মনের মতন
ক’রে আঁকব। তুলি নিরে বসি, হাতের তুলি হাতেই থাকে,—সে ছবি দেখতে
দেখতে বিভোর হয়ে যাই! তুলি তখন হাত থেকে কখন পড়ে যায়, মনেই থাকে
না। এমনি ক’রে মাহুষ কি ক’রে দিন কাটার বল। ছবি আঁকাও আর
আমার হয়ে উঠে না। কেবল খোঁজাই সার, সুখ কি মেলে! শুধু ধেরেই
চলি, শুধু ভাবি সুখ! সুখ! কি ক’রে দিতে হয় তা ত শিখিনি। না দিলে
কি সুখ মিলে—দেওয়া কাকে বলে, কি ক’রে দিতে হয়! হার! কে ব’লে
দেবে, সে ভালবাসে কি না। হার! সুখ, কোথায় তুমি? হেমন্তের কুয়াসার মত
কোথা দিয়ে চলে যাও, বসন্তের স্নিগ্ধ স্পর্শের মত কোথা থেকে মুকুলে ভরে দাও।
একবার ছুটি, পালিয়ে গাছের পাতা ঝরিয়ে দাও; : আবার ছুটি—বকুল ফুটিয়ে
পথে ছড়িয়ে দাও। কিসে তোমার মিলে ব’লে দাও—আমি তাই করি। কি দেব
যে নেব, কি দিয়ে সুখ গড়ে তুলব,—কি দিয়ে তাকে পাব—এই কথা ভাবছি।
ভাবের ঘোরে ছুটেছি, ধরি ধরি, যদি তার পাই, কিন্তু হার, কেবলই সে দূরে চলে
যায়। হার সুখ! হার সুখ! হার সুখ! কোথা তুমি জীবনের শেষ চরম—
কোথা তুমি! কই? এই কি সুখ। ওই যে নরনারী কেমন হাসছে—কেমন
সব পুরুষগুলো কেমন ভাবনা-শূন্য। ওই যে নৃত্যগীত, সুরার উল্লাস,
তালে তালে কেউর বাজছে, কুস্তল ছলছে—ওই কেমন ললিত লীলাভঙ্গে লাক্ষ্য
উছলে পড়ছে,—যেন ধীর সমীরের সমুদ্র আবেগভরে উথলে উঠছে। ওই ভাল কাটল,

কথা জড়িয়ে এল, নরনারী পরস্পর পরস্পরকে কি দৃঢ় আবেগে স্নেহের আশায় জড়িয়ে ধরলে—ও ধরনীতে লুটাল।

উন্মাদক মানকের স্মৃতিস্তম্ভ তারি দেখলে না, ঘন ঘোর তিমির ছেয়ে আসছে। সবই হ'ল, তবু তৃপ্তি নেই! ওই যারা স্মরণ ছিল, কত ক'রে সাজিয়ে মাথিরে রূপ তৈরী করেছিল,—সে রূপ নেই, চোখের কাজলে মুখ ভরে গেছে— অমন স্মরণ বিচিত্র বাস মলিন, ধূলায় ক্লিন্ন, চক্ষু কোটরগত, মড়ার মত পাণ্ডুর মুখের রঙ, সমস্ত বাধা কবরীর ছেঁড়া চুল লুটিয়ে পড়চে, রঙ-করা ছেঁড়া কাপড় টুকুরো টুকুরো হয়েছে,—কে জানে, কখন বাতি নিবে যাব, তাই তিমির, তাদের এই স্নেহের বাসর আর দেখতে দেয় না। এই স্মৃতি গোলাপী—এই স্মৃতি! মসীমাখা মৃত্যুর অধার গ্রাস করলে—তার পর কি? তার পর কি?

তোরই হেনা।

সত্যোক্তকৃষ্ণ গুপ্ত।

অদৃষ্ট *

আমি একা বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম, বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ আমার পশ্চাতে যেন কাহার লঘু পদক্ষেপ শুনিলাম। আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কেহ অনুসরণ করিতেছে, মনে করিয়া আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলাম—দেখিলাম, এক বৃদ্ধা—তাহার সর্বাঙ্গ মলিন বস্ত্রাচ্ছাদিত, কেবল পাণ্ডুর দন্তবিহীন মুখখানি দেখা যাইতেছিল।—আমি তাহার কাছে বাইবামাত্র সে থামিল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি কে? কি চাও? তুমি কি ভিখারী? ভিক্ষা চাও?” সেই বৃদ্ধা কোন উত্তর করিল না—আমি বুঁকিয়া দেখিলাম যে, তাহার হুটি চক্ষুই বন্ধ, সে চোখ খুলিল না এবং খুলিবার কোন চেষ্টাও করিল না দেখিয়া অনুমান করিলাম যে, সে অন্ধ—আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি কি ভিক্ষা চাও?” কিন্তু আগের মত এবারও সে নির্বাকু রহিল দেখিয়া তখন আমি ফিরিয়া আবার গন্তব্য পথে চলিলাম। কিছু দূর গিয়া পুনরায় পশ্চাতে সেই পদশব্দ শুনিলাম—আবার পশ্চাতে তাকাইলাম—দেখিলাম, সেই বৃদ্ধা। প্রথমে মনে হইল যে, এ আমাকে ছাড়িতেছে না কেন? শেষে মনে করিলাম, সে অন্ধ, হয় ত পথ হারাইয়া গিয়াছে—আমার পদশব্দ অনুসরণ করিলে লোকালয়ে যাইতে পারিবে বলিয়া হয় ত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। কে জানে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমার কেমন অসোয়াস্তি লাগিতে লাগিল—আমার কেমন মনে হইতে লাগিল যে, বৃদ্ধাটি শুধু আমাকে অনুসরণ করিতেছে না,—সে আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন আমাকে পথ দেখাইয়া, জোর করিয়া ঠেলিয়া লইয়া যাইতে বাধ্য করিতেছে।

আমি অনন্তোপায় হইয়া চলিতে লাগিলাম—কিন্তু এ কি কি দেখিলাম? আমার সম্মুখে ভীষণ অন্ধকার—তমসাচ্ছন্ন সর্বগ্রাসী দিগন্তব্যাপী ঘনাস্থকার—এ কি? এ কি বিশ্ব-সমাধি? তবে এইখানেই কি বৃদ্ধা আমাকে লইয়া যাইতেছে?

আমি তৎক্ষণাৎ পশ্চাদিকে ফিরিলাম—আবার সেই বৃদ্ধা আমার দিকে চাহিল—কি আশ্চর্য্য! এইবার তাহার চোখে দৃষ্টি দেখিলাম—কিন্তু কি ভয়ানক—ঠিক যেন ক্ষুধার্ত শকুনির দৃষ্টি! আমি আবার বুঁকিয়া দেখিলাম—ভাল করিয়া দেখিলাম—চোখ পূর্বের স্থায় বন্ধ!

জানি না, কেন তখন আমার মনে হইল যে, এই আমার অদৃষ্ট—ইহার নিকট হইতে কেহ পলাইতে পারে না—ইহাকে কেহ ছাড়াইতে পারে না—যেখানেই যাও না কেন, ইহা সর্বদাই তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে।

তখন বুঝিলাম না ; একবার শেষ চেষ্টা করিব ভাবিয়া আমি অন্য পথে পলাইলাম।

আমি খুব তাড়াতাড়ি চলিলাম—কিন্তু ওই সেই!—আবার সেই পদশব্দ! এবার যেন কাছে—খুব কাছে—এবং সম্মুখে আবার সেই ঘনাকার!

যখনি যে দিকে ফিরি না কেন, তাহাকে ছাড়াইতে পারিলাম না—পশ্চাতের সেই পদশব্দ, আর সম্মুখের সেই অন্ধকার আমাকে ছাড়িল না।

এইবার মনে মনে কন্দি অঁটিলাম—উহাকে ঠকাইব—আমি কোথাও যাইব না। এই ভাবিয়া আমি তৎক্ষণাৎ মাটিতে বসিয়া পড়িলাম—সেই বৃদ্ধা আমার পশ্চাতে ধামিল। আমি এইবার আর তাহার পদশব্দ শুনিলাম না বটে, কিন্তু সে যে কাছে আছে, তাহা বেশ অনুভব করিলাম।

হঠাৎ আমি দেখিলাম, সেই সম্মুখের অন্ধকার যেন ক্রমশই আমার দিকে ঘনাইয়া আসিতেছে ; তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিলাম ; দেখিলাম, সেই বৃদ্ধা—আমার অদৃষ্ট—আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

বুঝিলাম, অদৃষ্টের হাত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই !!

শ্রীঅর্পণা দেবী।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮১৭—১৯০৫)

ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ (১৮৪৮) ।

বেদকে ব্রাহ্মসমাজ কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, এই প্রশ্ন বখন অক্ষয়কুমার প্রথম উত্থাপন করিলেন—তখনই দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি বেদ-সমস্তার উপর পতিত হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শাস্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে যে প্রথম সংশয় ও আলোচনা উদ্ভূত হইয়াছিল—তাহা সর্বপ্রায়ে অক্ষয়কুমারের প্রতিভা-প্রসূত। দেবেন্দ্রনাথ বা আর কেহ পরে এই সংশয় ও আলোচনার যোগ দিয়াছেন, এবং অনুসন্ধান ও বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, সম্ভবতঃ অস্বাভাবিক স্বতন্ত্র মীমাংসার গিয়া উপনীত হইয়াছেন।

যে কালের মধ্যে বেদের প্রামাণ্য লইয়া অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ অতিশয় বিব্রত এবং নানারূপ আলোচনা ও অনুসন্धानে প্রবৃত্ত, ঠিক সেই সময়েই দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের উদ্ভব। স্মরণ্য ব্রাহ্মসমাজের একটি স্মরণীয় কালের ইতিহাসের ছাপ এই গ্রন্থে আছে বলিয়া, ইহা একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। তদ্ব্যতীত দেবেন্দ্রনাথ বেদ-সমস্তা-সম্বন্ধে কিরূপ মীমাংসার উপনীত হইয়াছেন, এই গ্রন্থ তাহার এক প্রধান প্রমাণ এবং পরিশেষে দেবেন্দ্রনাথের সমকালীন ও পরবর্তী ব্রাহ্মগণ এই গ্রন্থকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সাধারণতঃ ব্রাহ্মসমাজের উপর এই ধর্মগ্রন্থ কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ইহাও সম্যক আলোচনার বিষয়। দেবেন্দ্রনাথের নিজের জীবনের ও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের দৃষ্টি হইতে উপরি-উক্ত আলোচনার মূল্য যথেষ্ট বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ইহা ছাড়া দেবেন্দ্রনাথ-প্রণীত এই ধর্মগ্রন্থের আরও এক প্রকার সমালোচনা হইতে পারে, বাহা সাধারণতঃ বিশ্লেষণমূলক। তাহা হইতেছে এই ধর্মগ্রন্থের মতবাদের বিচার, এবং এই গ্রন্থ-সংকলনের যে পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার বিচার।

অক্ষয়কুমারের হস্তে একরূপ ‘তাড়া’ খাইয়াই বখন ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ বেদের প্রামাণ্যসম্বন্ধে সচকিত হইয়া উঠিলেন এবং অক্ষয়কুমারের প্রথম যুক্তি বখন তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল যে, আধুনিক যুগের জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিতান্ত অলৌকিক ও অসম্ভবমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে, বেদ বখন সেই সমস্ত কাল্পনিক ও অসম্ভব সিদ্ধান্তকেই আপত্তিকৃত্য বলিয়া বন্ধে ধারণ করিয়া

আছে, তখন ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে বেদকে প্রামাণ্য গ্রহণ করিয়া গ্রহণ করা যায় কিরূপে? তখন দেবেন্দ্রনাথ এই যুক্তির হস্ত হইতে সহজে নিজেকে নিষ্কাশিত হইবার পথ পাইলেন না। দেবেন্দ্র-পন্থী রাজনারায়ণ বাবু তাঁহাদের বেদ-বিশ্বাসের আত্মকুলে নিতান্তই খোঁড়া এবং খেলো যুক্তি লইয়া আসরে নামিলেন। তাঁহার কথাটা সাধা বাংলায় এই যে, আমরা ত জানিতাম, বেদের মধ্যে কেবল জ্ঞানসম্মত বাক্যই আছে, এবং তাই জানিতাম বলিয়াই ত বেদকে ঈশ্বর-বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। কে জানিত যে, ঐ ঈশ্বর-বাক্যের মধ্যে এমন মারাত্মক ও ভ্রমাত্মক অবাস্তব-কথার সম্মিলন রহিয়া গিয়াছে। বেদের বাক্যকে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ জানিয়া কি আর আমরা তাহাকে অপৌরুষেয় বাণী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম? বস্তুতঃ আমরা জ্ঞান ও যুক্তিতেই বিশ্বাসী ছিলাম এবং এখনও আছি। তা যখন বেদ যুক্তিবৃত্ত নয় (অক্ষয় বাবু দেখাইতেছেন) তখন—না হয়—(যদি মহর্ষি অনুমোদন করেন) বেদকে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে বর্জনই করা যাউক।

রাজনারায়ণ বাবু উপরি-উদ্ধৃত যুক্তির চাতুর্য্যে শুধু তাঁহার নিজের নয়, দেবেন্দ্রনাথেরও বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে মতপরিবর্তনের একটা স্পষ্ট আভাস দিয়াছেন। সুতরাং সমগ্র বেদাদির প্রামাণ্য যখন স্বীকার্য্য নহে, তখন দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের অন্ত কি প্রামাণ্য গ্রহণ সংগ্রহ করা যায়, ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, অক্ষয়কুমার জ্ঞান ও যুক্তির উপর দাঁড়াইয়াই বেদকে অস্বীকার করিতেছেন, সুতরাং জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, দেবেন্দ্রনাথ এই জ্ঞান ও যুক্তিকেই অনুসরণ করিলেন। অক্ষয়কুমারের জ্ঞান ও যুক্তি যেমন আত্মজ্ঞান ও আত্মযুক্তি, দেবেন্দ্রনাথও সম্ভবতঃ অক্ষয়কুমারকে অনুসরণ করিয়া এবং বিশেষতঃ নিজের স্বভাবানুযায়ী আত্মজ্ঞান ও আত্মযুক্তিকেই অবলম্বন করিলেন। শাস্ত্রের প্রামাণ্য দেবেন্দ্রনাথ বস্তুতঃই বর্জন করিলেন।

কিন্তু অক্ষয়কুমারের মতবর্জন করিবার ঐকান্তিক দুঃসাহস ও নির্ভীকতা দেবেন্দ্রনাথের ছিল না, এবং ছিল না বলিয়াই ব্রাহ্মধর্মের প্রামাণ্য গ্রহণ-সংকল্পনে তিনি ‘অধিল সংসারই আমাদের ধর্ম’ আর ‘উদার ও সার্বভৌমিক সত্যকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে সাহসী হইলেন না; পুনরায় পিছু হটিয়া গিয়া উপনিষদের গভীর মধ্যেই আশ্রয় লইলেন। দেবেন্দ্রনাথ ভাবিলেন যে, আত্মজ্ঞান ও যুক্তির প্রমাণই ত অক্ষয় বাবু এ যুগের উপযোগী মনে করিতেছেন, এবং শাস্ত্রের সব কথাই কিছু অজ্ঞানের কথা বা অব্যক্তির কথা বলিয়া প্রমাণ হইতেছে না, সুতরাং শাস্ত্রের যে অংশ আত্মজ্ঞান ও যুক্তির অনুমোদিত, তাহাই বাছাই করিয়া লইলেই ত হইল। তাহাতে শাস্ত্রও বাঁচিল, আত্মজ্ঞানও বজায় রহিল। এই চিন্তা করিয়া দেবেন্দ্রনাথ নিজের

জানমত উপনিষদ হইতে শ্লোক বাছিয়া যে গ্রন্থ তৈয়ার করিলেন, তাহাই হইল 'ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থ'।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে বেদের প্রামাণ্য লইয়া যখন সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সংশয়ের ব্যাধা, হৃদয়, কোলাহল ও তর্কের মধ্য হইতে জন্ম লাভ করিয়াছিল এই ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থ। এই ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থে সেই সংশয়কালের কি ইতিহাস আমরা পাই? এই ইতিহাস যে, বেদাদি সমগ্র শাস্ত্র ব্রাহ্মধর্মের স্বীকার্য্য নহে। আর কি মীমাংসা এই ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থে পাওয়া যায়? এই মীমাংসা যে—কতিপয় উপনিষদের কয়েকটি বিশেষ শ্লোকই ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি। সেই সমস্ত শ্লোক-সংগৃহীত গ্রন্থই ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থ।

দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছেন কি বর্জন করিয়াছেন,—এই ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থের প্রতি প্রথম দৃষ্টিতে তাহা স্থির করা কঠিন। সমস্ত শাস্ত্রকে তিনি গ্রহণ করেন নাই, একজন্ত তাঁহাকে শাস্ত্রভাগী বলা বাইতে পারে। আবার প্রাচীন শাস্ত্রের উপরেই মূলতঃ তিনি ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, একজন্ত তাঁহাকে শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাও বলা বাইতে পারে। বস্তুতঃ এই দুই শ্রেণীর সমালোচকেরা এই দুই প্রকার পরস্পর-বিরোধী সমালোচনাই তাঁহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন,—ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এবং আশঙ্কার বিষয়ও বটে যে, সম্প্রতি আর এক তৃতীয় শ্রেণীর সমালোচনা দেখা দিয়াছে—বাহা উপরি-উক্ত পরস্পর-বিরোধী দুইটি সমালোচনাই একসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের প্রতি প্রয়োগ করিতে যত্ববান! দেবেন্দ্রনাথকে শাস্ত্রভাগীদের প্রথম ও প্রধান বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বেদবর্জন-রূপ এত বড় ঐতিহাসিক ব্যাপারের গৌরবটাকে কোনমতেই শুধু একা অক্ষয়কুমারের ভাগে বা ভোগে ফেলিয়া দেওয়া যায় না। আবার দেবেন্দ্রনাথকে শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাও বলা চাই। কেন না, তাহা না হইলে রাজা রামমোহনের সহিত তাঁহার সাদৃশ্যের খেই যে হারাইয়া যায়। অথচ সামলাইতে হইবে দুই দিকই। আধুনিক চেষ্টার মুষ্টিল যে খুব বেশী, তা বুঝিতে পারি। কিন্তু এক নিঃশ্বাসে এইরূপ পরস্পর-বিরোধী দুই কার্য্য—অথবা দুর্কার্য্য বাহারা করিতে পারেন, তাঁহারা যে কি না পারেন, চিন্তার খুঁজিয়া পাই না।

বাহা হউক, ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে অনুসরণ করিয়া আমরা দেখিতে পাই-তেছি যে, দেবেন্দ্রনাথ প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ অক্ষয়কুমারের যুক্তি দ্বারাই বেদ-বর্জন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং অক্ষয়কুমারের যুক্তি হইতেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর কন্নাসীজাতির যুক্তিবাদ—বাহা নির্ভীক, প্রথর ও প্রচণ্ড, অথচ বাহা কেবল যুক্তি, শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তি। অক্ষয়কুমারের ভিতর দিয়া কন্নাসীর এই অষ্টাদশ শতাব্দীর

যুক্তিবাদের তপ্ত হাওয়া যে কিঞ্চিৎ দেবেন্দ্রনাথে সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? দেবেন্দ্রনাথের বেদ-বর্জনে মূলতঃ এইরূপে বৈদেশিক যুক্তিবাদের প্রেরণা কার্য্য করিয়াছে ।

যুগসন্ধিক্ষণে নবযুগের উপযোগী শাস্ত্রব্যাখ্যার মীমাংসার ও সংস্কারের যে সনাতন-পদ্ধতি আবহমানকাল হইতে হিন্দুজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে, প্রধানতঃ এ যুগে রাজা রামমোহনকে বলা যাইতে পারে যে, তিনি শাস্ত্রকে গ্রহণ করিলেন না; গ্রহণ করিলেন—তাহার ‘আত্মপ্রত্যয়’কে এবং ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থের ঐ সমস্ত বাছাই শ্লোক তাহার আত্মপ্রত্যয়েরই প্রতিধ্বনিমাত্র ।

যদি তাহাই হয়, তবে অক্ষয়কুমার ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, আত্মপ্রত্যয়ের প্রতিধ্বনি শুধু হিন্দুজাতির বিরাট শাস্ত্রগ্রন্থাদির মধ্যে কেবলমাত্র কয়েকখানি উপনিষদের গোটাকয়েক শ্লোকের গভীতে নিবন্ধ করিয়া নিরাপদে শৈলশিখরে গিয়া চক্ষু মুদিলে ত চলিবে না। ব্রাহ্মধর্ম জাতিবর্ণনির্কিশেষে ব্রহ্মবাদীদিগের ধর্ম । অন্তান্ত জাতির ধর্মশাস্ত্র হইতেও ব্রাহ্মধর্মের প্রতিধ্বনিমূচ্চক শ্লোক সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং সেই সকলকে একসঙ্গে গ্রথিত করিতে হইবে । শুধু ধর্মশাস্ত্র কেন? বাহা সত্য, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম । কোমৎ ও লাগ্নাসের নাস্তিক্যবাদও সত্যমূলক । অতএব অক্ষয়কুমারের মতে তাহাও ব্রাহ্মধর্ম ! দেবেন্দ্রনাথ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন । তিনি ভাবিলেন, “কতকগুলো নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে,—ইহাদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারের সুবিধা নাই ।”

আবার পক্ষান্তরে অক্ষয়কুমার ভাবিলেন যে, দেবেন্দ্রনাথের এই ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ না হইলে উদার ও বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম বেদকে বর্জন করিয়াও, কার্য্যতঃ উপনিষদের কয়েকটা শ্লোকের আওতার পড়িয়া সম্যক্ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারিবে না । সুতরাং অক্ষয়কুমার প্রকাশ্যে এই গ্রন্থের প্রতিবাদ করিলেন । ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে তিনি বক্তৃতা দিলেন~~১৮৪০~~, “অধিল সংসারই আমাদের ধর্মশাস্ত্র । বিত্তজ্ঞানই আমাদের আচার্য্য । যে পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, এবং রামমোহনের ব্যাখ্যার শাস্ত্রের বর্জন ও গ্রহণকার্য্য যে ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে, দেবেন্দ্রনাথের শাস্ত্র-বর্জন ও গ্রহণ সে দিক্ দিয়াই নহে । হিন্দুর আবহমান-প্রচলিত শাস্ত্র-সংস্কারের পদ্ধতিকে দেবেন্দ্রনাথ বিন্দুবিসর্গও বুদ্ধিতে পারেন নাই । শাস্ত্রের গ্রহণে ও বর্জনেই তাহার প্রমাণ । রাজা রামমোহন সমগ্র শাস্ত্রটাকে হাতে লইয়া, নবযুগের বিশালতা ও আকাঙ্ক্ষাকে তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, শাস্ত্রের প্রাচীন অবয়ব ও আয়তনের মধ্যেই বিশ্বমানবের ও হিন্দুর জাতীয় বিশিষ্টতার মূলমন্ত্রগুলিকে ধ্বনিত করিয়া দিয়াছেন । ব্যবহারশাস্ত্রের পরিবর্তনকল্পে

—যুগসন্ধিক্ষেপে, রোমক জাতির ব্যবস্থাপকেরাও এইরূপ পদ্ধতিই অবলম্বন করিতেন।

“যাহা হউক, দেবেজনাথের বেদবর্জিত ত ফরাসীর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রেরণায়; কিন্তু তাঁহার উপনিষদের শ্লোকসংগ্রহের প্রেরণা কোথা হইতে? আমাদের বিবেচনা এইরূপ যে, দেবেজনাথের প্রতিভা খুব তীক্ষ্ণ ছিল না। রামমোহনের প্রতিভার ছায়ার কাছেও তাঁহার পক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া শক্ত ছিল। কিন্তু দেবেজনাথের রক্ষণশীল স্বভাবের মধ্যে একটা হিন্দুভাব চিরকালই ছিল। অথবা এই রক্ষণশীল স্বভাবই হিন্দুভাবাপন্ন হওয়ার রূপান্তর মাত্র। সুতরাং এই রক্ষণশীলতার জন্তই বা হিন্দুভাবাপন্ন হওয়ার জন্তই হউক, কিংবা অক্ষয়কুমারের মত প্রবল যুক্তিবাদী হইয়া শাস্ত্রবর্জনের দুঃসাহস তাঁহার মধ্যে না থাকার জন্তই হউক, অথবা এই সমস্ত কারণ একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়াই হউক, দেবেজনাথ শাস্ত্রকে মূলতঃ বর্জন করিয়া, বাহ্যতঃ শ্লোক-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া—তাহাকে পুনরায় গ্রহণই করিলেন।

“ব্রাহ্মধর্ম-সংক্রান্ত সমুদয় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, আর কিছুই নির্দ্ধারিত হইবার সম্ভাবনা নাই, আমাদের এরূপ অভিপ্রায় নয়।.....ধর্মবিষয়ে ইতিপূর্বে যাহা কিছু নির্ণীত হইয়াছে, এবং উত্তরকালে যাহা নির্ণীত হইবে, সে সমুদয়ই আমাদের ব্রাহ্মধর্মের অন্তর্গত। সহস্র শতাব্দী পরেও যদি কোন অভিনব ধর্মতত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম।.....”

অক্ষয়কুমারের এই প্রতিবাদ-বক্তৃতাটিকে কতকগুলি উৎসাহী ব্রাহ্ম “ধর্মোন্নতি-সংসাধন” নাম দিয়া—উহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, অক্ষয়কুমার একা নহেন, অনেকগুলি ব্রাহ্ম দলবদ্ধ হইয়া এই ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থের প্রকাশের পরেই তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন, এবং অক্ষয়কুমার সেই প্রতিবাদী ব্রাহ্মদলের মুখপাত্রস্বরূপ।

সুতরাং দেখা গেল যে, ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ অক্ষয়কুমারের মত-বিরুদ্ধ। তাঁহার মতে এরূপ গ্রন্থ ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি হওয়া অসম্ভব ও অসঙ্গত। কেন না, ইহা কালে আবদ্ধ, সম্প্রদায়ে আবদ্ধ এবং দেশে আবদ্ধ। ব্রাহ্মধর্ম দেশ, কাল ও সম্প্রদায়ে আবদ্ধ হইতে পারে না।

ওধু অক্ষয়কুমার নহেন,—এক দল উৎসাহী ব্রাহ্মও মনে করিতে লাগিলেন যে, এই ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ ধর্মোন্নতির বিশ্বস্বরূপ। সুতরাং তাঁহারা অক্ষয় বাবু কর্তৃক এই গ্রন্থের প্রতিবাদ-বক্তৃতাটিকে “ধর্মোন্নতিসংসাধন” এই নাম দিয়া বাহির করিলেন। রাখালদাস হালদার নামে আর একজন ব্রাহ্ম “ব্রাহ্মদিগের বর্তমান আন্তরিক অবস্থা-বিষয়ক পর্যালোচনা” নাম দিয়া প্রকাশিতঃ দেবেজনাথের নিকট ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের এক প্রতি-

বাদ প্রেরণ করেন। তাহাতে সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে উক্ত গ্রন্থে বাংলাভাষা-প্রবর্তনের কথা বলা হয়, এবং আরও একটি গুরুতর অভিযোগ রাখালদাস বাবু করেন যে, ব্রাহ্ম-ধর্মগ্রন্থে বহু স্ববিরোধী বাক্যের একত্র সমাবেশ রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের প্রকাশ বস্তুতঃ তখনকার ব্রাহ্মসমাজকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। স্বপক্ষে দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ প্রভৃতি, বিপক্ষে অক্ষয়কুমার, রাখালদাস হালদার প্রভৃতি। সুতরাং ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থকে সমস্ত ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ বলিয়া প্রথম হইতেই অস্বীকার করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরবর্তীকালে ব্রাহ্মধর্মের বিবর্তন ও বিকাশের যে চিত্র ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও এই ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ, উপেক্ষা এবং অগ্রাহ্য করিয়াই কুটিয়া উঠিয়াছে। পরন্তু পরবর্ত্তিগণ দেবেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া অক্ষয়কুমারের প্রতিবাদ-বক্তৃতার উপদেশ অনুসারে অক্ষয়কুমারকেই অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের প্রভাব কি দেবেন্দ্রনাথের সমকালীন ব্রাহ্মগণ, কি তাঁহার পরবর্ত্তী ব্রাহ্মগণ কেহই বিশেষ স্বীকার ত করেনই নাই। পরন্তু প্রকাশ্যে অস্বীকার করিয়াছেন। কোন একটা নূতনধর্মের ধর্মগ্রন্থ,—আপন সম্প্রদায়-মধ্যে এইরূপে উপেক্ষিত হইতে অল্পই দেখা গিয়াছে।

কারণ কি? দুইটি কারণ আমাদের বিবেচনার আইসে। প্রথম কারণ ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা। কেন না, এই ব্রাহ্মধর্মসম্বন্ধে রাজা রামমোহনের ট্রাষ্টে-ডিডে যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে জাতিবর্ণ-নির্কিশেষের একটা সাধারণ সার্বভৌমিক ধর্ম বলিয়াই মনে হয়। যে কোন মনুষ্য অপৌত্তলিক ও ব্রহ্মবাদী হইলেই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিতে পারেন। কিন্তু উপাসনার যে পদ্ধতি রাজা রামমোহনের ব্রহ্মসভার দৃষ্ট হয়, তাহা ত খুব অসাম্প্রদায়িক নহে। হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রাধান্যই তাহাতে লক্ষিত হয়।

রামমোহনের ব্রহ্মসভার উপাসনাপদ্ধতির হিন্দুবিশেষত্বের উপরেই দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মকে এই হিন্দু-বিশেষত্বের দিক্ হইতেই দেখিয়াছেন। পক্ষান্তরে অক্ষয়কুমার ব্রহ্মসভার ট্রাষ্টেডিডের উপরে লক্ষ্য রাখিয়া, ব্রাহ্মধর্মকে অসাম্প্রদায়িকভাবে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং কি দেবেন্দ্রনাথ, কি অক্ষয়কুমার ইহারা কেহই রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মের পূর্ণ স্বরূপটি দেখিতে পারেন নাই। ইহারা দুইজনে একই বস্তুর দুইটি বিভিন্ন দিক্ দেখিয়া, প্রত্যেকেই আপন আপন দিক্‌টাকেই সমগ্র ও পূর্ণ বস্তু বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। এই ভ্রম দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থ প্রকৃত প্রস্তাবে—ব্রাহ্মদের ধর্মগ্রন্থ হইবার যোগ্য নহে। ইহা অসম্পূর্ণ গ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথ যে হিসাবে উপনিষদকে খনির সহিত তুলনা করিয়া ইহাকে অসম্পূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন,

সে হিসাবে শুধু অসম্পূর্ণ নহে। অক্ষয়কুমারের অসাম্প্রদায়িক সংগ্রহ-প্রণালীও খুব উচ্চ শ্রেণীর মীমাংসা নহে। উহাও বৈদেশিক প্রণালীর অন্ধ, নিষ্ফল ও নিরর্থক অনুকরণ মাত্র। রামমোহন ঐক্যপ সংগ্রহ-প্রণালীর (Ecticism) পক্ষপাতী ছিলেন না। যাহারা Precepts of the Jesus এর মধ্যে ঐক্যপ প্রণালী রাজ্য অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা রাজ্যের প্রণালীও বুঝেন নাই এবং Ectic প্রণালী সম্বন্ধেও অজ্ঞ।

দ্বিতীয় কারণ, যে ক্ষত্র ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ সমকালীন ও পরবর্তী ব্রাহ্মগণের মধ্যে অস্বীকৃত হইয়াছে,—তাহা হইতেছে দেবেন্দ্রনাথের উগ্র প্রভুত্বাভিমান ও অহুদার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। শাস্ত্রবর্জন দেবেন্দ্রনাথ করিলেন, কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে একটা প্রামাণ্য শাস্ত্রের আবশ্যক, এই সংস্কারের হস্ত হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন না। কাজেই তিনি স্বয়ং সেই প্রামাণ্য শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে উজ্জ্বল হইলেন এবং হিন্দুসমাজ যেমন সমগ্র বেদকে মানিয়া চলে, ব্রাহ্মসমাজও যাহাতে তদ্রূপ ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থকে মানিয়া চলে, ইহাই ছিল দেবেন্দ্রনাথের মনের অভিপ্রায়। শাস্ত্র বর্জন করিয়াও তিনি শাস্ত্রের অনুশাসন ব্রাহ্মসমাজে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিয়াছিলেন।

সেই প্রকার ব্রাহ্মগণ কোলিক গুরু বর্জন করিয়া আসিলেও, দেবেন্দ্রনাথকেই তাঁহারা ধর্মগুরুর আসনে বসাইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্র ও গুরুকে তাহাদের ঐতিহাসিক অবিচ্ছিন্ন ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজে নিজের প্রণীত গ্রন্থকে শাস্ত্র বলিয়া এবং স্বয়ং নিজেকে গুরু বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা রক্ষা পায় নাই। কেন না, যে ধারা তিনি নিজ হস্তে ছিন্ন করিয়াছেন, সেই ধারার মধ্যে তিনি নিজেকে ও ব্রাহ্মসমাজকে একসঙ্গে গ্রথিত করিতে পারেন নাই।

তার পর ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থ যদি আত্মপ্রত্যয়েরই গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে সেই আত্ম-প্রত্যয় দেবেন্দ্রনাথের নিজের। নিজের প্রত্যয়কে সকলের,—একটা উন্নতিশীল সমগ্র ধর্মসম্প্রদায়ের বলিয়া চালাইবার চেষ্টার মধ্যে এতখানি অসংযত প্রভুত্ব ও উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে,—যাহা বস্তুতঃই “পৃথিবীর খুব অল্প জননারকদের মধ্যেই দেখা গিয়াছে।”

এখন আমরা দেখিব, ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের মতবাদের বিচার। এই সকল গ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের যে শ্লোকটি ভাল লাগিয়াছে, উপনিষদ্ হইতে সেই শ্লোকটিকেই তুলিয়া লইয়াছেন। যেমন মালী কোন একটি পুষ্প-কানন হইতে নানাবৃক্ষের নানাপুষ্প আপন পছন্দমত বৃক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া একত্রে গ্রথিত করে,—দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ্ কাননে প্রবিষ্ট হইয়া তদতিরিক্ত আর কিছুই করেন নাই। তাঁহার

এই সকল-গ্রন্থের প্রামাণ্যের মূল কি ? ইহা ঋতিবাক্য বলিয়া প্রামাণ্য, না ইহা দেবেন্দ্রনাথের আত্মপ্রত্যয় বলিয়া প্রামাণ্য ? ঋতিবাক্য বলিয়া ইহার যে প্রামাণ্য-মর্যাদা,—দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত দাস্তিকতার সহিত তাহার গৌরব হইতে এই সমস্ত শ্লোককে ত্রুটি করিয়াছেন । ইহার প্রামাণ্য নির্ভর করিতেছে, তাঁহারই আত্মপ্রত্যয়ের উপর,—প্রাচীন ঋষিদের উপলক্ষির উপর নহে । প্রামাণ্যের কষ্টি-পাথর তাঁহার প্রত্যয় ; আর কিছুই নহে । ঋষি-সম্মুখের ঐতিহাসিক সত্যোপলক্ষির অবিচ্ছিন্ন ধারাকে তিনি এইরূপ অসংঘত ঔদ্ধত্যে আঘাত করিয়াছেন । ঋষিরা সেই প্রাচীন যুগে কোন্ উপলক্ষিটাকে কেন সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোন্ অবস্থার কোন্ মন্ত্রের সাক্ষাৎ তাঁহারা পাইয়াছিলেন,—অবস্থাভেদে, কালভেদে আজ তাহা কিরূপে গ্রহণীয়,—এ সম্বন্ধে কোনই সন্ধান দেবেন্দ্রনাথ করেন নাই, এবং আমাদের বিশ্বাস, তদ্রূপ সন্ধানের উপযোগী প্রতিভাও তাঁহার ছিল না ।

দেবেন্দ্রনাথ যেমন আত্মপ্রত্যয়ের দোহাই দেন, প্রাচীন ঋষিরাও তদ্রূপ আত্মপ্রত্যয়েই ঋতিবাক্যসমূহ লাভ করিয়াছিলেন । তবে মস্তদৃষ্টা ঋষিদের আত্মপ্রত্যয় উপেক্ষা করিয়া দেবেন্দ্রনাথের আত্মপ্রত্যয়ে অধিকতর আস্থা বান্ হইবার কি কারণ বিদ্যমান ?

ঋষি তাঁহারা—যাঁহারা তত্ত্বের প্রথম সাক্ষাৎ পান ও সেই তত্ত্বকে ঘোষণা করেন । আর সাধক তাঁহারা—যাঁহারা সেই প্রদর্শিত তত্ত্বকে জীবনে সাধনা দ্বারা লাভ করেন । দেবেন্দ্রনাথ আত্মপ্রত্যয়ের বলে এমন একটি তত্ত্বও লাভ করেন নাই, যাঁহা নূতন অনাবিষ্কৃত, যাঁহা তাঁহার পূর্বের কোন ঋষিই উপলক্ষিতে পান নাই । তাঁহার স্বাধীনভাবে প্রাপ্য (যদি ধরিয়া লওয়া যায়) সমস্ত তত্ত্বই ঋষিদের বহু বর্ষে আবৃত্তীকৃত । ঋষিদৃষ্টি কেবল পুরাতনের আবছায়া দেখে না, নূতনের সাক্ষাৎ লাভ করে । কিন্তু আক্ষেপ এই, নূতন বাদ দেখিলে আমরা চঞ্চল হইব কেন ? দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মানুভূতিতে বিন্দুমাত্রও নূতন উপলক্ষি নাই । পুরাতনের গুটিকয়েক ঋতিবাক্যেই তাহা নিঃশেষিত । তার পর আমাদের ঋতিবাক্যের বহু ঋষি । বহু ঋষির বিভিন্ন উপলক্ষির একত্র সমাবেশ বলিয়া, ঋতিবাক্য যে আপাততঃ বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহা ঋষিদের মত-বিভিন্নতা মাত্র এবং ইহা খুব স্বাভাবিক । কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের একার অনুভূতির মধ্যে অসামঞ্জস্য ও স্ববিরোধিতার কৈফিয়ৎ কোথায় ? ক্রমোন্নতি ? এক গ্রন্থে এত বেশী ক্রমোন্নতি বড়ই অশোভন, আমাদের বিবেচনায় যেকোন উপলক্ষিতে স্বাধীনভাবে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয় দেবেন্দ্রনাথের সেকোন উপলক্ষি ছিল না । তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর উপলক্ষি হইতে তিনি নিজের পছন্দমত শ্লোক বাছাই করিয়াছেন । এই সমস্তই মন্ত্রের প্রথম দৃষ্টা, নব নব ধর্ম্মতত্ত্বের প্রথম আবিস্কর্তাদিগকে

যে হিসাবে ঋষি বলা যায়, সে হিসাবে দেবেজনাথকে ঋষি বলিতে অনেকেরই বিবেক আপত্তি করিবে।

‘সেকালেই ঋষি বাহা হইবার হইয়া গিয়াছে’ এমন কথা আমরা বলি না। তবে এ কথা আমরা হুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য যে, এ কালের ঋষিদের দেখিয়া মনে হয় যে, সেকালে যে সমস্ত কারণে ঋষি হওয়া যাইত, একালে বা তাহা না হইলেও চলে।

ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থকে কেহ কেহ ব্রাহ্মী উপনিষদ বলিয়াছেন। আমরা তাহাতে কিছুই আপত্তি করিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থের অধিকাংশ শ্লোকগুলিই এক নিরাকার সত্ত্ব আনন্দময় ব্রহ্মকে প্রতিপন্ন করিতেছে কিন্তু ইহা ছাড়াও ব্রহ্মপ্রতিপাদক বহু শ্লোক ত উপনিষদে রহিয়াছে—দেবেজনাথ বাহা সংগ্রহ করেন নাই? তাহা কি ব্রাহ্মী উপনিষদ হইবে না? যদি হয়, তবে বিশেষভাবে ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থকে ব্রাহ্মী উপনিষদ বলিবার সার্থকতা কি?

আমাদের ঋতিশাস্ত্রে ব্রহ্মের দুইটি দিকের বিষয়ই খুব স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। এক নিগুণের দিক্, আর সত্ত্বের দিক্। এই ঋতির উপর নির্ভর করিয়া যে সমস্ত দার্শনিক মতবাদ দেখা দিয়াছে, তাহার কোন মত নিগুণ ব্রহ্মকে এবং কোন মত বা সত্ত্ব ব্রহ্মবাদকে সমর্থন করিয়াছে। ঋতিশাস্ত্রের মধ্যে নিগুণ ব্রহ্মবাদমূলক শ্লোকগুলিকে দেবেজনাথ বাছাই করিয়া ‘নীর’ বিবেচনার ত্যাগ করিয়াছেন, আর সত্ত্ব ব্রহ্মবাদমূলক কতকগুলি শ্লোককে ‘কীর’ বিবেচনার গ্রহণ করিয়াছেন; এবং এই বাছাই প্রণালীকেই এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভার এক অত্যাশ্চর্য কাণ্ড বলিয়া আমরা গণ্য করিবার জন্য এক আধুনিক চেষ্টা দেখা দিয়াছে। তাহার যুক্তি হইতেছে এই যে, নিগুণ ব্রহ্মবাদে ব্যক্তিত্বের আদর্শ ফুটে না, নৈতিকধর্ম জাগে না, সমাজধর্ম অব্যাহত থাকে না, সমস্ত জাতির পক্ষে একটা স্থিতির আদর্শ ঘোচে না,— ইত্যাদি। খৃষ্টান পাদ্রীদের এই সমস্ত যুক্তির উত্তর রামমোহন হইতে আমরা বিবেকানন্দ পর্যন্ত সমানে দিয়া আসিতেছেন, তাহার পুনরাবলম্ব আবশ্যক করে না। বাহারা দেশী খৃষ্টান, ধর্ম না হইলেও ভাবে ও আচরণে, তাঁহারা হিন্দুর জাতীয় চিন্তার বিশিষ্টতাকে হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ্য-ভ্রষ্ট হইয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সুতরাং তাঁহারা না দেশী, না বিলাতী, এই দুইয়ের বার! তাঁহাদের সহিত তর্ক পণ্ড্রম। তবে অষ্টেতবাদের সমাধিকে বাহারা ‘একরকমের জীবন্ত কবর’ বলিয়া উপহাস করিবার স্পর্ধা রাখেন, তাঁহাদের ধর্মাত্মত্বের নিকট আমরা জানিতে চাই যে, তাঁহারা ইহা জানিলেন কিরূপে? সমাধি একটা মতের ব্যাপার নহে। ইহা সাধনার ফল, সিদ্ধির অবস্থা। যে সাধনা করে নাই, যে সিদ্ধ হয় নাই, সে যদি এবংবিধ ধুষ্ট-বাক্য

দ্বারা জাতীয় ধর্মামুভূতিকে অবধা ব্যঙ্গ করে এবং প্রশংসা পায়, তবে বস্তুতঃই অনুতাপের বিষয়।

এই ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থে উপনিষদের শ্লোকের একরূপ উদ্ধৃত বাছাই, বোধ হয়, কোন বিদেশী-তেও সম্ভব হয় না। ব্রহ্মের নিগূর্ণের দিকটাকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া হিন্দু-জাতির সমগ্র ঐতিহাসিকের উপর এই বাছাই-প্রণালী এক অতি অমার্জনীয় অবিচার বলিয়া আমরা মনে করি। আর বিশেষতঃ এইরূপ বাছাই-প্রণালী ও মতবাদ যে উভয়তঃই রাজা রামমোহনের আদর্শ ও প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে প্রস্তুত। একটা বিশেষ দার্শনিক মতবাদের মধ্যে এই বাছাই-প্রণালী ব্রাহ্মধর্মকে আবদ্ধ করিয়া, ব্রাহ্মধর্মের স্বাভাবিক বিকাশের পথে এই গ্রন্থ এক বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল সন্দেহ নাই।

বাহা হউক, ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থসম্বন্ধে আমরা ইহার উৎপত্তিকালে ব্রাহ্মসমাজের অবস্থার আলোচনা করিয়াছি। এই গ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথের শাস্ত্রমীমাংসার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি; ব্রাহ্মসমাজের উপর এই গ্রন্থের কিরূপ প্রভাব, তাহা দেখাইয়াছি; শাস্ত্রের গ্রহণ ও বর্জন ব্যাপারে এই গ্রন্থে কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি এবং এই গ্রন্থের মতবাদেরও যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি।

আমাদের বিবেচনার ইহা দেবেন্দ্রনাথের আত্মপ্রত্যয়লব্ধ অথচ ঐতিবাক্যানুগামী ধর্মামুভূতির গ্রন্থ বলিলেই অধিকতর শোভন হইত। ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থ বলিতে অনেক দিক হইতে অনেক রকম আপত্তি উঠিয়াছিল এবং এখনও উঠিবে। উঠা স্বাভাবিক।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

সাহিত্যে “রূপান্তর”

সকল সাহিত্যেই মাঝে মাঝে এমন এক একটা কথার সৃষ্টি হয়, যাতে জন-সাধারণের চিন্তাতে একটা যুগান্তর আনিয়া দেয়।

“সাহিত্যের রূপান্তর” কথাটি, আমার মনে হয়, এই জাতীয়।

প্রথমে যখন এই কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছিল, সাধারণ লোকে ইহার মর্ম বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই; তবে ইহাতে যে বুঝিবার বস্তু আছে, এ ধারণা অনেকেরই জন্মিয়াছিল। কথাটি এখনও সকলে ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। ধরিতে পারিলে সাহিত্য সমালোচনায় একটা নূতন বিজ্ঞানের সূত্রপাত হইবে।

সাহিত্য বলিতে এক্ষেত্রে রন-সাহিত্যমাত্র বুঝিতে হইবে। ব্যাপক অর্থে আজ কালি সাহিত্য শব্দে গণিত, দর্শন, ইতিহাস, জড়বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি বাবতীয় লিপিবদ্ধ জ্ঞানকেই বুঝায়। ইংরাজিতে এ সকলই লিটারেচারের (literature) অন্তর্গত। কিন্তু যে সাহিত্যের রূপান্তরের কথা বলা হয়, তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গণিত, দর্শন, ইতিহাস, জড় বা জীব বিজ্ঞানাদির কোনও সম্বন্ধ নাই। গণিতের বা দর্শনের ইতিহাসের বা ভূতত্ত্বের বা রসায়নের বা জড়বিজ্ঞানের বা physics'এর কথা যখন সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়, অর্থাৎ কোনও গণিতবিদ বা দার্শনিক বা ঐতিহাসিক বা ভূতত্ত্ববিদ বা রাসায়নিক বা জড়বিজ্ঞানবিদ যখন আপনাপন গবেষণাদিকে লিপিবদ্ধ ও প্রণালিবদ্ধ করিয়া কোনও সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি সম্পাদন করেন, তখন তাঁহাদের এ সকল রচনাতে গণিতের বা দর্শনের, ইতিহাসের বা ভূগোল, জড়বিজ্ঞানের বা জীববিজ্ঞানের সত্য ও তথ্য সকল কোনও প্রকারের রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না। ইহারা যে বস্তু বা ব্যাপারকে যে ভাবে দেখেন, ঠিক সেই ভাবেই তার বর্ণনা করিয়া থাকেন। আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী যেখানে যে ভাবে ও যে রূপেতে, যে সকল সম্বন্ধেতে আবদ্ধ হইয়া দূরবীক্ষণের প্রত্যক্ষীভূত হয়, জ্যোতির্বিজ্ঞান তাহাদের সেই সংস্থান ও সেই সম্বন্ধই বর্ণিত হইয়া থাকে। দ্রষ্টার অস্ত্রের রসামুভূতির দ্বারা তাহাতে কোনও প্রকারের রং ফলিয়া উঠে না।

এই রং ফলানটা আমাদের দর্শনের বা জ্ঞানের কর্ম নহে। আমাদের অস্ত্রের যে বৃত্তির দ্বারা আমরা বস্তু-সাক্ষাৎকারে স্পর্শ বা হৃৎস্পর্শ, কিম্বা হাত, অঙ্গুল, করুণ, রক্ত, বীর, বীভৎস, ভয়ানক প্রভৃতি রস আশ্বাদন করিয়া থাকি, সেই বৃত্তিই এ সকল বস্তুতে এ সকল রসের রং ফলাইয়া থাকে। এই ক্ষণ এই বৃত্তিকে রঞ্জিনী

বুঝি কহে। এই রঞ্জিনী বৃত্তির দ্বারাই বাবতীয় রসানুভব ও এই রসানুভূতির ফলে সমুদায় রস-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

আলোক-বিজ্ঞান বর্ণের ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, বিশ্বের অপূর্ণ বর্ণ-বৈচিত্র্যের নিদানাদির নির্ণয় করিয়া থাকে। যে বর্ণটি যেভাবে যেখানে প্রকাশিত হয়, কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণসমাবেশে আকাশের মেঘমণ্ডলে নানাপ্রকারের রং-লীলা প্রকটিত হয়, অথবা কি স্ত্রে বনস্থলীতে পত্র-পল্লব-পুষ্পাদিতে বিচিত্র বর্ণ সকল ফুটিয়া উঠে, আলোকবিজ্ঞান কেবল তাহাই ব্যক্ত করে। কিন্তু শারদীয় উষার উদ্ভিন্ন আলোকে হিমালয়-মণ্ডিত অত্যাশ্চর্য গিরিশৃঙ্গের বর্ণবিলাস দেখিয়া কবির বা ভাবুকের প্রাণের মর্মে মর্মে যে আনন্দলহরী জাগিয়া উঠে, আলোকবিজ্ঞান তার খবর রাখে না।

সেইরূপ বিশ্বের বিচিত্র ধ্বনিসকলের অনুভূতিকে ধরিয়া, কিরূপে কোন স্ত্রে কোন্ বাহন অবলম্বন করিয়া, এ সকল শব্দ দ্বন্দ্বমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে; শব্দের সহিত আমাদের ক্রতিষুগলের কি সম্বন্ধ; আমরা যেসকল শব্দ বা ধ্বনি উচ্চারণ করি, তার সঙ্গে আমাদের কণ্ঠনালীর কি সম্বন্ধ; সংগীতের মুচ্ছনা অন্তরা প্রভৃতির মূল উৎপত্তি ও লক্ষণ কি,—ধ্বনি-বিজ্ঞান বা acoustics তাহারই সত্য ও তথ্য নির্ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু এ সকল ধ্বনিসংযোগে মানুষ সংগীতের সৃষ্টি করিয়া কিরূপে যে আপনার অন্তরের বিবিধ রসানুভবকে ব্যক্ত ও সম্বোগ করে, সে কথা শব্দ-বিজ্ঞান জানে না। কেন যে প্রত্যাষে ভৈরবীর আলাপ শুনিয়া, আমাদের মর্মের স্তরে স্তরে জীবনের তরঙ্গ নাচিয়া উঠে; আবার কেনই বা মধ্যাহ্নে বেহাগের আলাপ শুনিয়া আমাদের চিত্তের উপরে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা আসিয়া ছাইয়া পড়ে; কিহা সারাহ্নের প্রাকালে, সূর্য্য যখন পশ্চিম গগনে ডুবিতে থাকে, আসন্ন অন্ধকারের ভয়ভাবনায় পাখীরা যখন আপন আপন কুলায়ে প্রতিনিবৃত্ত হয়, পথশ্রান্ত পথিক যখন প্রান্তর-মধ্যে পথ চলিতে চলিতে গ্রামান্তে বাইয়া আশ্রয় লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন পূর্ববীর আলাপ শুনিয়া আমাদের প্রাণ, ঘরে বসিয়াই, কেন উদাস হইয়া উঠে,—এ সকল খবর শব্দবিজ্ঞান বা acoustics কিছুই রাখে না।

সেইরূপ দেহ-বিজ্ঞান বা physiology অস্থিবিজ্ঞান বা anatomy জীবদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের, পেশি ও অস্থিসমূহের, অন্তঃসন্ধির সন্ধান করিয়া, কোথায় কি ভাবে কোন্ পেশী বা কোন্ অস্থি সমাবিষ্ট, তাহাই কেবল বলিয়া দেয়। কিন্তু এই রক্ত মাংসের, এই অস্থিপেশিময় দেহযষ্টি দেখিয়া, আমাদের অন্তরে যে সকল অনুরাগ বা বিরাগের সঞ্চার হয়, তার কথা দেহবিজ্ঞান বা অস্থি-বিজ্ঞান কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না। এই অনুরাগে বা এই বিরাগে আমাদের, চক্ষুতে একই দেহ-যষ্টির যে সকল রূপান্তর ঘটে, তার কথা বিজ্ঞান বা দর্শন জানে না, বুঝে না, বলিতে

পারে না। এ রূপান্তর ঘটায় আমাদের অন্তরের রঞ্জিনী বৃত্তি। এই রূপান্তরের সংবাদ বহন করিয়া থাকে, রস-সাহিত্য বা কল্প-সাহিত্য।

বর্ণবিজ্ঞান জগতের রং মহলে যাহা দেখে না, চিত্রকর তাহা দেখেন। শব্দ-বিজ্ঞান আকাশের শব্দভাণ্ডারে যাহা শুনিতে পায় না, গায়ক এবং সংগীতজ্ঞ তাহা শোনেন। দেহবিজ্ঞান বা অস্থিবিজ্ঞান জীবদেহের মধ্যে যে বস্তুর কোনও সন্ধান পায় না, চিত্রকর ও ভাস্কর তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহাতেই মজিয়া যান। জ্যোতির্বিদ গ্রহনক্ষত্র-খচিত, শতরঞ্জিত গগনপটে যে ছবি দেখেন না, কবি তাহা দেখিয়া বিভোর ও বিহ্বল হইয়া যান। এইরূপভাবে, এ সকল ক্ষেত্রে, চিত্রকর, গায়ক, ভাস্কর, ও কবির অন্তরের প্রফুটরঞ্জিনী বৃত্তি, বর্ণের, স্বরের, জীবদেহের কিম্বা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যাহা কেবল বাহ্য ও বাহিরের পক্ষেদ্বির গ্রাহ্য, তাহাকে আপনার রসের রং'এ রঞ্জিত করিয়া, তার অদ্ভুত রূপান্তর ঘটাইয়া থাকেন। এই বস্তুকেই সাহিত্যের রূপান্তর বলিতে পারা যায়।

আমাদের দেশের প্রাচীনেরা পঞ্চকোষের কথা কহিয়াছেন। প্রথম অন্নময় কোষ। আমরা আচ্ছিকালি যাহাকে ঙ্গবিজ্ঞান বলি, ইংরাজিতে যাহাকে physico-chemical group of the sciences বলিতে পারা যায়, এই অন্নময়-কোষেই তার অধিকার। এই কোষের প্রতিষ্ঠা আমাদের পঞ্চজ্ঞানেদ্বিয়েতে। তার উপরে বা ভিতরে প্রাণময় কোষ। এই প্রাণময় কোষেই আধুনিক জীববিজ্ঞান—ইংরাজীতে যাহাকে biological group of the sciences বলে, তার অধিকার। এই কোষের প্রতিষ্ঠা আমাদের প্রাণাহুভূতিতে। তারপর মনোময় কোষ, এই কোষের প্রতিষ্ঠা আমাদের মনোবৃত্তিতে; মনস্তত্ত্ব বা psychological group of the sciences'এর অধিকার এই কোষেতে। তার উপরে বা অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় কোষ। আমাদের অন্তরের যে বৃত্তির দ্বারা আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বহুত্বের মধ্যে একত্বের, অদ্ভুতের মধ্যে অঙ্গীর, অংশের মধ্যে অংশীর, বৈষম্যের মধ্যে সাম্যের প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি, যে বৃত্তির দ্বারা, এক কথায়, আমরা যাবতীয় বিজ্ঞানাদি গড়িয়া তুলি, সেই বৃত্তিতে এই বিজ্ঞানময় কোষের প্রতিষ্ঠা। দর্শনের বা তত্ত্বজ্ঞানের metaphysics বা philosophyর অধিকার এই কোষে।

এই কোষ-চতুষ্টয়ের মধ্যে অন্নময়-কোষ একান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। রূপরসশব্দস্পর্শাদি এই কোষের উপাদান। পক্ষেদ্বির, পঞ্চমাত্রা ও পঞ্চমহাভূতের উপরে এই কোষ প্রতিষ্ঠিত। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহক দ্বারা এই অন্নময়কোষের জ্ঞানলাভ সম্ভব। এই ক্ষুদ্র কোষ-পঞ্চকের মধ্যে এই অন্নময় কোষ সর্বাঙ্গপেক্ষা স্থূল। ইহা জীবের বহিরতম আবরণ।

তার পর প্রাণময় কোষ। প্রাণাবস্তুর প্রমাণ ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সত্য; কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাম এই প্রাণ যে আছে, কেবল তাহাই বলিতে পারে; এই প্রাণের স্বরূপ কি, তাহা বলিতে পারে না। এই প্রাণ বস্তু ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের মধ্যবর্তী প্রথম সোপান-স্বরূপ হইয়া আছে। এই প্রাণের একদিকে ইন্দ্রিয়গ্রাম ও অন্যদিকে মন। প্রাণের এক প্রান্তে senses আর অন্যপ্রান্তে psyche; একদিকে বিষয়্যপেক্ষী দর্শনাদি ইন্দ্রিয়, অন্যদিকে এ সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মন। ইন্দ্রিয়কে ধরিয়া যেমন প্রাণের জগতে যাইয়া পড়ি, এই প্রাণকে ধরিয়া সেইরূপ মনোময় জগতে যাইয়া উপস্থিত হই। এই জন্তই এই প্রাণময়-কোষ, অন্নময়-কোষ ও মনোময়-কোষের মধ্যে সেতু-স্বরূপ হইয়া আছে।

তার পর মনোময় কোষ। এই মনোময়-কোষেই আমরা সর্বপ্রথমে ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যের সাড়া পাই। ইন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা একদিকে অগ্নিতে, অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রায় ও পঞ্চ-মহাত্মতে; আর অন্যদিকে প্রাণেতে। ইন্দ্রিয়ের আশ্রিত অন্নময় জগৎ, ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় প্রাণ। ইন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা প্রাণে, প্রাণের প্রামাণ্য ইন্দ্রিয়ে। ইন্দ্রিয় যেমন বিষয় ছাড়া নহে, প্রাণ সেইরূপ ইন্দ্রিয় ছাড়া নহে। কিন্তু মনের মধ্যে বিষয়ের অবর্ত্তমানেও ইন্দ্রিয়-রসের প্রত্যক্ষ ও অনুভব হয়। মন অনুপস্থিতকে উপস্থিত, অবর্ত্তমানকে বর্ত্তমান, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ বলিয়া ধারণ করিতে পারে। এই জন্ত মন ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্বতি বা আভাসমাত্র গ্রহণ করিয়া, আপনার মধ্যে বিবিধ বিষয়ের সৃষ্টি করিতে পারে। এই জন্তই, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠযোগে আবদ্ধ হইলেও, মনের এমন শক্তি আছে, যাহাতে ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ বিষয়কে সে আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারে এবং পূর্ব-প্রত্যক্ষ বিবিধ ইন্দ্রিয়ানুভবকে মিলাইয়া মিশাইয়া, অভূতপূর্ব বস্তুর সৃষ্টি করিয়া থাকে। নৃশৃঙ্গ, আকাশ-কুসুম এই সকলই এই জাতীয় মানস-সৃষ্টি। ইংরাজিতে এ সকলকে fancy creation বলা যায়।

এই জাতীয় মানস-সৃষ্টিতেও এক প্রকারের রূপান্তর হয় বটে, কিন্তু এখানে যে রূপান্তরের কথা হইতেছে, যে রূপান্তর রস-সাহিত্যের প্রাণ-স্বরূপ, ইহা সে জাতীয় রূপান্তর নহে। ফলতঃ ইহাকে রূপান্তর না বলিয়া রূপমিশ্রণ বলা যাইতে পারে। কেহ কখনও মানুষের শিং দেখে নাই, তবে অন্য জন্তুর শিং দেখিয়াছে। সে সকল জন্তুতে যে শিং দেখা গিয়াছিল, সেই শিংকে মানুষের মাথায় আনিয়া বসাইয়া নৃশৃঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ এবং শৃঙ্গ দুই, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বস্তু। নৃশৃঙ্গে এই দুই ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বস্তুর নিজের বিশিষ্টরূপের কোনও বিপর্যয় বা পরিবর্তন ঘটে না। মানুষ মানুষই থাকিয়া যায়, আর শৃঙ্গও শৃঙ্গই থাকিয়া যায়, মানুষও বদলায় না, শৃঙ্গও বদলায় না। কেবল বাহ্য ভিন্নস্থানে, ভিন্ন সময়ে ছিল, তাহাকে এক করিয়া এই নৃ-শৃঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে।

আকাশ-কুসুম সম্বন্ধেও তাহাই ঘটে । আকাশও প্রত্যক্ষ বস্তু, কুসুমও প্রত্যক্ষ বস্তু । কিন্তু আকাশেতে কুসুম ফোটে না, গাছে বা লতাতেই ফোটে । আকাশ-কুসুমে আকাশে ও কুসুমের মধ্যে যে সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাই অদৃষ্ট-পূর্ব । এই সম্বন্ধ দুইটি পূর্বদৃষ্ট বস্তুর মিলনে রচিত । এই সম্বন্ধ বাস্তব নহে, কল্পিত । এই সম্বন্ধেতে আকাশের আকাশত্ব বা কুসুমের কুসুমত্ব, দু'য়ের কোনটাই বদলাইয়া যায় না, অথচ একটা নূতন কল্পিত বস্তুর সৃষ্টি হয় । এই কারণে এখানে রূপান্তর শব্দের প্রয়োগ সত্য হইবে না ।

যেমন মনোময়-কোষেতে সত্য রূপান্তর ঘটে না, সেইরূপ বিজ্ঞানময় কোষেও ঘটে না । মন ইন্দ্রিয়ানুভূতি লইয়াই কারবার করে । ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বিষয় লইয়াই মন আপনার বাবতীর মানস-সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করে । বিজ্ঞান সেইরূপ অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব বিহার করে । বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন করিতে গেলে, এই বহুত্বের প্রত্যক্ষ রূপ-রসাদির বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করিয়া, এ সকলের মধ্যে ও অন্তরালে অপ্রত্যক্ষ তত্ত্ববস্তুর ধ্যান করিতে হয় । মনোময় কোষের আশ্রয়—রূপ ; বিজ্ঞানময় কোষের আশ্রয়—স্বরূপ । রূপ বৈচিত্র্যের প্রকাশ করে । জগতের বহুত্ব রূপ লইয়া । অরূপই কেবল এই বৈচিত্র্য ও এই বহুত্বকে নিরস্ত করিয়া, নিরাকার ও শূন্যেতে বিশিষ্টতা ও বিচিত্রতা-পূর্ণ এই বিশ্বের একত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে । বিজ্ঞান যে একত্ব প্রতিষ্ঠিত করে, তাহার উপলব্ধি করিতে হইলে, সকল রূপকে নিরস্ত করিতে হয় । অথচ রূপকে রাখিয়াই কেবল রূপান্তর ঘটাইতে পারা যায়, রূপকে বিনাশ করিয়া নহে । কিন্তু একত্বে, নিরাকারে, নির্কিশেষে, কোনও রূপের প্রতিষ্ঠা হয় না, হইতেই পারে না । একত্বে যখন রূপের প্রতিষ্ঠা হয়, তখনই সে এক বহু হয় । নিরাকারে যখন রূপের প্রকাশ হয়, তখনই তাহা সাকার হইয়া যায় । নির্কিশেষে যখন বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তাহা আর নির্কিশেষ থাকে না । অতএব রূপের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলিয়া, বিজ্ঞানময়-জগতে, যেখানে কেবল সত্তা বা Being মাত্র আছে, কিন্তু প্রকাশ বা Doing নাই, সেখানে রূপান্তর হয় না, হইতে পারে না ।

কিন্তু এখানেও কবি-কল্পনা নানা প্রকারের রূপের সৃষ্টি করিতে গিয়াছে । বেদের পুরুষ সৃষ্টে তার প্রমাণ পাই ।

“পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ । তিনি পৃথিবীকে সর্কজ ব্যাপ্ত করিয়া দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত থাকেন ।

“যাহা হইয়াছে, অথবা যাহা হইবেক, সকলি সেই পুরুষ । তিনি অমরত্ব লাভে অধিকারী হইবেন, কেন না, তিনি অন্ন দ্বারা অভিরোহণ করেন ।

“তাহার এতাদৃশ মহিমা, তিনি কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর । বিশ্বজীবসমূহ তাঁহার একপাদ মাত্র, আকাশে অমর অংশ তাঁহার তিন পাদ ।

“পুরুষ আপনার তিন পাদ লইয়া উপরে উঠিলেন। তাঁহার চতুর্থ অংশ এই স্থানে রহিল। তিনি তদনন্তর ভোজনকারী ও ভোজনরহিত (চেতন ও অচেতন) তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলেন।

“তাঁহা হইতে বিরাট জন্মিলেন, এবং বিরাট হইতে সেই পুরুষ। তিনি জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পশ্চাভাগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করিলেন।”— ইত্যাদি।

এখানে কবি এক অদ্ভুত পুরুষ কল্পনা করিয়াছেন। নিরাকার, সম্ভ্রামাত্র জ্ঞেয়, পরম-তত্ত্ব কি বস্তু, ইহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ না হইলেও, সমাধি-প্রত্যক্ষ বটে। এই বিচিত্রতা-ময় জগতের মূলে যে একটা একত্ব আছে, ইহা আমরা বুঝি। এই একত্বের উপলক্ষিত করিতে হইলে, আমাদের মন হইতে, চিন্তা হইতে, ধ্যান ও জ্ঞান হইতে, জগতের যাবতীয় রূপরসাদির বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য, ও বহুত্বকে দূর করিয়া দিতে হয়। রূপের অনুভবের সঙ্গে এই একের অপরোক্ষ উপলক্ষি সম্ভব নহে। “নেতি” “নেতি” বলিয়া ব্যতিরেকী পন্থার অনুসরণেই এই একত্বের উপলক্ষি করিতে হয়। আর যখন অল্প-পন্থাতে ইহার অনুভব লাভ করিতে হয়, তখন—“এই সকল রূপের মধ্যে সেই অরূপ আছেন”, “এই সকল বিচিত্রতার অন্তরালে সেই মহান্ এক রহিয়াছেন” এই ভাবে; অথবা “তাঁহারই দ্বারা এই সকল রূপের প্রকাশ হইতেছে,” “তাঁহারই শক্তিতে ও জ্ঞানেতে বিশ্বের অশেষ বৈচিত্র্য স্থিতি করিতেছে,— এই রূপে তাঁহার চিন্তা বা ধ্যান করিতে হয়।

এইরূপ ধ্যানেতেও বস্তুর রূপান্তর হয় বটে। কিন্তু হয়,—বিজ্ঞানময় কোষে নহে, কিন্তু আনন্দময় কোষেতে। এই ধ্যান করিতে করিতে চিন্তে যে সকল ভাব উৎসারিত হয়, সেই ভাবের রং পড়িয়া তখন বিশ্বের রূপ বদলাইয়া যায়। তখন, সেই ভাবের অঙ্কনে রঞ্জিত-চক্ষু সাধক—

স্বাধর জন্ম দেখে,
দেখে না তারা মূর্তি,
যাহা নেত্র পড়ে,
হয় ইষ্টদেব মূর্তি।

নিরাকারের সাধকের অধিকার মুখ্যতঃ বিজ্ঞানময় কোষে। কিন্তু যদিও কোষপঞ্চকে আনন্দময় কোষ বলিয়া একটা পৃথক্ কোষের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আনন্দবস্তুর সকল কোষকে ছাইয়া, সকল কোষকে ছাপিয়া আছে। অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান—সকলই আনন্দময়। জড়, জীবে, মননে, চিন্তনে, ধ্যানে, আনন্দ সর্বত্র উৎসারিত, সর্বত্র উচ্ছসিত। এই জন্য, নিরাকারের ধ্যানে যখন এই আনন্দরস উৎসারিত



উঠে, তখন নিরাকারেরও “আকার” বদলাইয়া যায় ; “অরূপে”—রূপ ফুটিয়া উঠে ।
তখন—

সর্বজীবে হয়,

ব্রহ্মভাবোদয়,

চিদানন্দ ভোগে উঠে ।

কিন্তু এইটি হয়, আনন্দ-রস প্রভাবে । সকল ক্ষেত্রেই এই আনন্দ-বস্তু বা রসবস্তু,
আপনার রসান নাখাইয়া, বস্তুর রূপান্তর ঘটায় । এই রূপান্তরকেই সাহিত্যের রূপান্তর
বলা যায় ।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল ।

দোসরা নম্বর

হে আমার অতীতের স্বামিন্ !

আমি চল্লাম। আমার খোঁজ করো না ; করলেও খুঁজে পাবে না, তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী, তা জানি। তা ছেনেও আমি তোমার ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি। কেন যে তোমার ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি, তা স্পষ্ট ক'রে আমি বলতে পারছি না। একমুহূর্তে তুমি হয় ত আশ্চর্য্য হবে ! তা হবে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেকেই আশ্চর্য্য হচ্ছি। অথচ তোমারে ছেড়ে না গেলেই নয়।

তুমি হয় ত অনেক রকম ভাববে। কিন্তু তার বেশীর ভাগই ভুল ক'রে ভাববে। প্রথমে তুমি ভাববে যে, এমন কি গুরুতর পাপ তুমি করেছ, যার জন্যে কোথাও কিছুই নেই, আমি তোমার স্ত্রী, হঠাৎ তোমাকে এক মুহূর্তে এমনি ক'রে ছেড়ে চ'লে গেলাম, এ তুমি যতই ভাববে, কিছুতেই স্থির ক'রে উঠতে পারবে না। কেন না, আমিই খুঁজে পাই না যে, কি বিশেষ কারণে আমি তোমার ছেড়ে যাচ্ছি। কিন্তু এ বেশ বুঝতে পারছি যে, তোমাকে আমার ছেড়ে যেতে হবেই।

আমি হিন্দুর মেয়ে, বাঙ্গালীর মেয়ে, তা জানি। স্বামীকে যে কোন দোষেই ছেড়ে চ'লে আসা যায় না, বাঙ্গালীর ঘরের কোন্ মেয়ে তা না জানে ? আমিও তা জানি, কিন্তু জানলেও আমি আজ তা মানবো না। তা মানতে গেলে তোমার যে আমার ছেড়ে যাওয়া হয় না।

তুমি ক্লাব নিরে বাইরের বৈঠকখানার পড়ে থাকতে, আর ভাবতে বুঝি যে, আমি তোমাদের জন্ত দিন-রাত রান্নাঘরে ব'সে মাছের কচুরী আর আমড়ার চাটনীর তৈরী ক'চ্ছি। না গো না, ঐ রান্নাঘরের বন্ধ খোঁয়াটে কারাগারের ছোট জানালাটির ভিতর দিয়েই একদিন হঠাৎ আমি বাহিরের পৃথিবীটাকে দেখে ফেলেছিলাম। বাহিরের পৃথিবীটা জানি না কেন,—আমাকে যেন সেই থেকে হাতছানি দিয়ে ডাক্ত। বন্ত, আর, আর, বেরিয়ে আর ! আমি স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলাম যে, বাহিরে আসার প্রয়োজন আছে। সে দিন তালপত্র বাসিক কাগজের একটা গল্পেই আমি আমার এই নতুন অনুভূতির একটা সাড়াও পেয়েছিলাম। সেই গল্প পড়েই ত আমার মনের জোর এত বেড়ে গেল। বাহিরের পৃথিবী আমাকে চায়। আমি এত দিন এই বাহিরকে—এই পৃথিবীকে—এই অসীম বিশ্বকে বঞ্চিত ক'রে

ঘরের কোণে অন্ধকারে আরম্ভলা-মাকড়সার মত দিনগুজরান করছিলাম। না, তা হ'তে পারে না। কখনই না। স্ত্রীজাতিও মনুষ্যজাতি,—তাহাদেরও স্বাধীন ইচ্ছা আছে,—দারিদ্র্য আছে—কর্তব্য আছে। সে দারিদ্র্য আর কর্তব্য শুধু ঘরের কোণে কাঁদিয়া মরিবার জন্ত নহে। এ আমি বেশ বুঝে ফেললাম। বাহিরের একটা টান আমার মনের মধ্যে দিনরাত আনুতান করতে লাগলো। আমি নিজের মধ্যে কত খুঁজেছি, তা তুমি কিছুই জান না। তুমি ভাবতে বসি, আমি তোমার পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমুছি। কিন্তু হয়, যদি জানতে—

তবে তাও বলি শুন,—ঐ ১লা নংএর বাড়ীর দিকে তাকিয়ে প্রথমে আমার বাহিরের পৃথিবীর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, আমি পৃথিবীর—আমি সকলের—আমি বিশ্বের। এই বিশ্বের হাতে আমি একবার নিজেকে আগে ঝাটাই করিব। আমি বুটা কি সাজা, তার ত পরখ হওয়া চাই? তবে যদি,—না,—তা হবে কেন—? ১লা নম্বর আমার কে? আমি আপনি আপন ইচ্ছাতেই বেরিয়ে যাচ্ছি।

তুমি এবং তোমার আর দশজন ইয়ার-বন্ধু, হয় ত আমাকে অসতী পর্য্যন্ত বলতে সঙ্কোচ বোধ করবে না। কিন্তু সে দিন 'আন্তরিক বানী' মাসিক পত্রের একটা সমালোচনার সতীত্বের যে নূতন আদর্শের কথা পড়েছি, তাতে এ আর কি? এ ত—কিছুই না। পর-পুরুষের পারে লুটিয়ে পড়েও, স্ত্রীর সতীত্ব যায় না,—তা জান? তুমি হয় ত সে সমালোচনাটা পড় নাই? আমার দেবাজের ড্রয়ারের তিতরে সে মাসিক পত্রটা আছে; খুঁজে বের ক'রে পড়ো, বুঝতে পারবে। আর তাতেও যদি বুঝতে না পার, তবে বুঝতে হবে, তোমার বোকার ক্ষমতার চেয়ে না বুঝবার ক্ষমতা ঢের বেশী। কাজেই বোঝবার আর বেশী চেষ্টা করো না। কেন না, তখন থেকে আমার যা কিছু হবে, তা বোকা বাস্তবিক শক্ত।

তোমার অতীতের স্ত্রী—

শ্রীঅনিলা দেবী।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

নারায়ণ

মাসিক পত্র।

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

তৃতীয় বর্ষ,

দ্বিতীয় খণ্ড,

চতুর্থ সংখ্যা,

ভাদ্র, ১৩২৪ সাল

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। মেদিনীপুর পরিষদে সভাপতির কথা	... শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৭৩১
২। নিধুগুপ্ত	... শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়	৭৪১
৩। ভক্তিহীন। (কবিতা)	... শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	৭৫৩
৪। স্বামী	... শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭৭৫
৫। জয়দেব (কবিতা)	... শ্রীজ্ঞানানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৭৮০
৬। বঙ্গভাষা ও বাংলাভাষা	... শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৭৮১
৭। বুদ্ধিমানের কণ্ঠ	... শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	৭৮২
৮। কমলের ছঃখ	... শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	৮০৪
৯। গান (কবিতা)	... শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	৮১৪



কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
“বসুমতী” প্রেসে—ত্ৰিপুৰ্ণচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় দ্বাৰা মুদ্ৰিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা]

[ভাদ্র ১৩২৪

মেদিনীপুর পরিষদে সভাপতির কথা

আপনারা আমার এখানকার বার্ষিক অধিবেশনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ইহাতে আমি একটু আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি। এই সকল কাজে দুই প্রকার লোকের নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে; এক হোমরা-চোমরা লোক—হয় লাটসাহেব, না হয়, লাট-কাউন্সিলের মেম্বর, নিতান্ত না হয়, হাইকোর্টের জজ, কেননা, তাহা হইলে খুব সোর-গোল হয়, এবং অনেক জায়গায় তাহাই উদ্দেশ্য; আর এক বক্তা—বাঁহারা দাঁড়াইয়া উঠিয়াই, মুখ খুলিয়াই, লোকজনকে ইচ্ছামত হাসাইতে পারেন, কাঁদাইতে পারেন,—কেননা, তাহা হইলেও থিয়েটার দেখানর কাজটা হয়। আমার মত গরীব ব্রাহ্মণকে একরূপ স্থলে আনা, আমারও বিড়ম্বনা, আর বাঁহারা আনেন, তাঁদেরও বিড়ম্বনা। এ সকল কথা আমি আপনাদের মুকুটপক্ষকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু যখন দেখিলাম, আপনারা আমার জন্য দুইবার দিন বদল করিলেন, তখন ভাবিলাম, না আগটা নিতান্ত গোস্তাগি হইবে। আসিয়াছি—কিন্তু আমার কথা আপনাদের মনঃপূত হইবে কিনা বলিতে পারি না।

তাহার পর যখন আসিতেছি,—একটা কিছু বলিতে হইবে; কি বলিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না, আপনারা গ্রামোফনের বক্তৃতা চান—একজন বক্তৃতা লিখিয়া দিবে, রেকর্ড করিয়া দিবে, আর আমি সেই রেকর্ডখানি হাতে করিয়া আনিয়া গ্রামোফনে চড়াইয়া, চাবিটি ঘুরাইয়া দিয়া বসিয়া থাকিব, একরূপ গ্রামোফনের বক্তৃতা

করা আমার অভাগ নাই; আপনারা ইহা চাহিয়া থাকেন, আপনাদের আশা পূর্ণ হইবে না ।

আপনারা যদি ফাঁকা দেওড়া চান, শব্দের ঘটা, অলঙ্কারের ছটা, জলদগন্তীর বক্তৃতা চান, আমার দিয়া তাহা হইয়া উঠিবে না । আমি মাতৃভাষার কথা কই; অতি শিশুকালে বাপ মা যে কথাগুলি শিখাইয়াছেন, সেই কথাগুলিই আমার মুখে আইসে, কলমে বাহির হয় । সংস্কৃতে পোরা সাধুভাষা আর সেই ভাষার ইংরেজীভাবে ইংরেজী ইডিয়মের তর্জমা দিয়া একটা জাঁকালো বক্তৃতা করিতে পারিব না । আর আপনারা যদি খুব গোলাগুলি চান, অনেক বড় বড় লোকের কোটেশান চান, বৈজ্ঞানিকরীতিতে ইতিহাস চান, আমার মতের যাহারা বিরুদ্ধবাদী, তাহাদের উপর খুব গালিবর্ষণ চান, তাহাও আমার দ্বারা হইয়া উঠিবে না, কারণ, আমি আর এই শেষবয়সে নূতন ধরণের নূতন রীতিতে লেখা শিখিয়া উঠিতে পারিব না ।

তাহার পর আপনারা ছই বৎসর ধরিয়া কি ভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, তাহা বিশেষ করিয়া জানি না । আপনারা কি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস চান? আলোআন কবি, পরাগলি মহাভারত, ছুটিখার অশ্বমেধের কথা শুনিতে চান, না বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, লোচনদাস, বাসুদেব, মাধব ঘোষ, গোবিন্দদাস, রামচন্দ্রদাসের কীর্ত্তন শুনিতে চান? গোস্বামীমতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস প্রভৃতির লেখা চৈতন্যচরিত শুনিতে চান, না গোস্বামীমতের বিরুদ্ধ চূড়ামণি দাস বা জয়ানন্দ দাসের চৈতন্যচরিত শুনিতে চান? আপনারা হিন্দুর গান শুনিতে চান, কর্ত্তান্তকার গান শুনিতে চান, শ্রামাবিষয় শুনিতে চান, না বৌদ্ধদিগের গীতি, গাথা ও ছড়া শুনিতে চান? আপনারা আধুনিক সাহিত্য চান, না প্রাচীন সাহিত্য চান, না প্রাচীনতম সাহিত্য চান? আপনারা দর্শন শুনিতে চান, না বিজ্ঞান শুনিতে চান, না শাস্ত্র, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, মীমাংসা শুনিতে চান, না সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, মাধ্যমিক, যোগাচার শুনিতে চান, না শ্বেতাশ্বর আইত দর্শন শুনিতে চান, না দিগম্বর আইত শুনিতে চান? লাকুলিশ মত শুনিতে চান, না পাণ্ডমত মত শুনিতে চান, না স্পন্দ শাস্ত্র শুনিতে চান, না প্রত্যতিক্সা শাস্ত্র শুনিতে চান? বিষ্ণুস্বামী মত শুনিতে চান, না রামানুজের মত শুনিতে চান, না মাধ্বাচার্য্যের মত শুনিতে চান, না নিম্বাদিত্যের মত শুনিতে চান, বল্লভের মত শুনিতে চান, না চৈতন্যের মত শুনিতে চান? গোস্বামীদের মত শুনিতে চান, না তত্ত্বের মত শুনিতে চান? ত্রিক-পূজা শুনিতে চান, না কুজিকামত শুনিতে চান? ডাকের তত্ত্ব শুনিতে চান, না চণ্ড মহারোষণের তত্ত্ব শুনিতে চান? হেরুকের মত শুনিতে চান, না হেবজ্জ মত শুনিতে চান? কাদিমত হাদিমত বা কহাদিমত চান? বিজ্ঞানে আপনারা

কি চান? প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোঠামস্তর শুনিতে চান বা নবকাল দেখিতে চান? কিছুই না বুঝিতে পারিয়া খানিকটা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছিলাম, এমন সময়ে শুনিলাম, আপনারা মেদিনীপুরের ইতিহাস শুনিতে চান ।

আপনাদের সম্পাদক শ্রীমান্ মনমোহন বসু মহাশয় আমার লিখিয়াছেন যে, আপনারা মেদিনীপুরের ইতিহাস শুনিতে চান । তাঁহার ঐক্লপ লেখায় আমি গোলে পড়িয়াছি । কারণ, মেদিনীপুরের ইতিহাস যতদূর জানা যায়, সবই তা বেঙ্গলডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের ২৬শ ভলুমে দেওয়া আছে । যিনি এই গেজেটিয়ার লিখিয়াছেন, তিনি একজন পাকা লোক, বহুকাল ইতিহাসের চর্চা করিয়া আসিতেছেন এবং বাঙ্গালার সমস্ত জেলায়ই ইতিহাস লিখিয়াছেন । তিনি মেদিনীপুরের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহার উপর কিছু বলা একপ্রকার অসম্ভব । তাই আমি ইতিহাস লেখার ব্যাপারটা ছাড়িয়াই দিয়াছিলাম । কিন্তু একজন প্রধান ছাত্রের অমুরোধ রাখিতে না পারাও দোষ । তাই ভাবিতেছিলাম, কোনরূপ যদি নূতন কথা কিছু বলা যায় । শেষ স্থির করিলাম, চেষ্টাতো করা যাক, তাহাতে যতদূর হয় । আমার মনে হইল, সংস্কৃতে কতগুলি পুঁথি আছে, তাহাতে নানাদেশের কথা পাওয়া যায় ; সেও একপ্রকার গেজেটিয়ার ; যদি সেগুলি হইতে কিছু সংগ্রহ করিতে পারি ।

আপনারা সকলেই জানেন যে, এ জেলার মধ্যে তাম্রলিপ্তি বা তমলুক সকলের অপেক্ষা প্রাচীন ; মেদিনীপুর সদর হইলেও তত প্রাচীন নয় । প্রায় ২২০০ বৎসর পূর্বে অশোকরাজ্য ছিল ও মেঘের যখন “বোধিজ্ঞান”র ডাল লইয়া সিংহলে যান, তখন তাঁহার তমলুকেই জাহাজে উঠেন । ইহার পূর্বে তমলুকের নাম পাওয়া যায় না । বুদ্ধদেবের জাতকগুলিতে সমুদ্র-যাত্রার অনেক খবর থাকিলেও, তাহাতে তমলুকের নাম নাই । সেকালের জাহাজ যেন ভড়োচ দিয়াই যাইত ; ভড়োচ ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে । কিন্তু তাই বলিয়া তখন যে তমলুক ছিল না, এ কথা বলা যায় না । কারণ, চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কোটিল্য যে অর্থশাস্ত্রের পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে তাম্রলিপ্তির নাম পাওয়া যায় । আর, দশকুমার-চরিতেও তাম্রলিপ্তির নাম পাওয়া যায় । অনেকে মনে করেন, দশকুমার-চরিত গ্রন্থের ছয়শত বৎসর পরের লেখা । কিন্তু আমি মনে করি, গ্রন্থের দুইশত বৎসর পূর্বের লেখা । যখনকারই লেখা হউক, উহাতে তাম্রলিপ্তির নাম দামলিপ্তি । তাম্রলিপ্তি শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে, এইখান হইতে অনেক তাঁবা রপ্তানি হইত ; তাহা তাঁবার লেপ বলিয়া, উহার নাম হইয়াছে তাম্রলিপ্তি । কথাটা কিন্তু মনে ধরে না । তাম্রলিপ্তি দামলিপ্তির সংস্কৃত হওয়াই সম্ভব । দামলিপ্তি সূর্য দেশের নগর । দামলিপ্তি শব্দের অর্থ দামল জাতির নগর, অর্থাৎ তামিল জাতির নগর । চন্দ্রগুপ্তেরও বহুপূর্বে তামিলেরা যে বঙ্গদেশে বাস করিত, তাহার প্রমাণ

আছে ; উহার আশ্রয় চেষ্টা নৌকা-যাত্রার পটু ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । সুতরাং তাম্রলিপি হইতে তাম্রলিপি হওয়াই সম্ভব ; যদি হয়, তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্তেরও বহুপূর্বে তমলুক একটি বড় বন্দর ছিল ।

ততকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত তমলুক সহর আছে এবং একটি বাণিজ্যের জায়গাও বটে । কিন্তু এখন সেখান হইতে সমুদ্রে যাওয়া যায় না । ওয়েলি সাহেব বলেন যে, ইংলিসিয়াং ও হর্লুংএর পর তাম্রলিপ্তের নাম আর পাওয়া যায় না ; অর্থাৎ খ্রীষ্টের পর ৭০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত মাত্র উহার নাম পাওয়া যায় । কিন্তু পেশদেহে কল্যাণীগ্রামে যে শিলালিপি আছে, তাহাতে বলে যে, খ্রীষ্টের পর বারশ, এমন কি, তেরশ বৎসর পরেও তাম্রলিপি হইতে বৌদ্ধভিক্ষুগণ পেশদেহে যাইয়া তথায় ধর্মসংস্কার করেন । তমলুকের সামনে চড়া পড়িয়া যাওয়ায় ক্রমে এখান হইতে সমুদ্র-যাত্রা বন্ধ হয় । খ্রীষ্টের পর চৌদ্দশ পনরশ বৎসরের যে সকল মনসার ও চণ্ডীর গান পাওয়া যায়, তাহাতে তমলুকের নাম নাই । সেকালের লোকে পিছলদা ও ছত্রভোগ হইয়া সমুদ্রে যাইত । বৈষ্ণবদের পুঁথিতেও ঐ কথা শুনা যায় ।

তমলুক বাঙ্গালার প্রধান বন্দর না থাকিলেও, উহা যে একটি প্রধান নগর ও বাণিজ্যের স্থান ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । আইন-ই-আকবরীর সরকার ও মহলবিভাগে উহার নাম পাওয়া যায় না । কিন্তু পার্টনার জায়গীরদার বা সুবাদার বিজ্ঞান চৌহানের আজ্ঞায় জগমোহন পণ্ডিত যে ‘দেশাবলী-বিস্তৃতি’ নামে পুঁথি লিখেন, তাহাতে দেখা যায়, আদিগঙ্গার পশ্চিমে সমস্ত দেশকেই তমলুক দেশ বলিত । বেহালা, বড়িশা, মহিষাদল, মণ্ডলঘাট, এ সমস্তই তমলুক দেশ । জগমোহন পণ্ডিত খ্রীঃ অবঃ ১৬৪৮-এর কিছু পূর্বে এই পুঁথিখানি লিখেন । তাহার পর আর একখানি পুঁথিতে আছে :—

“মণ্ডলঘট্টদক্ষিণে চ হৈজলস্ত চ ছাস্তরে ।

তাম্রলিপ্তো হি দেশঃ চ বণিজ্যঃ চ নিবাসভূঃ ॥ ৪৮ ॥

ষাদশবোজ্ঞনৈষু ত্তরুপানন্তাঃ সমীপতঃ ।

মংস্তা গব্যানি যত্রৈব সম্প্রস্তুস্তে ভূশং নৃপঃ ॥ ৪৯ ॥

কেচিদামলকো দেশঃ গায়ন্তি দেশবাসিনঃ ।

লবণানামাকরশ্চ যত্র তিষ্ঠতি ভূরিশঃ ॥ ৫০ ॥

প্রণালী দ্বিতিকা তত্র সদা বহতি ভূমিপ ।

মালংগানাং মহুযাণাং নীচানাং বসতিঃ কিল ॥ ৫১ ॥

প্রায়ঃ সমুদ্রবেগশ্চ তাম্রলিপ্তনদীষু চ ।

দিবানিশং কদাচিত্ত বিপ্রাম্যতি মহীপতে ॥ ৫২ ॥”

তমলুক অঞ্চলে মুণের কারবার সেকালে কিরূপ ছিল, ঐ পুথিতেই তাহার বর্ণে
প্রমাণ পাওয়া যায় ।

“বিশাখিলাখ্যবিষয়াদিগুপ্তির্মহীপতিঃ ।
সর্কেষাং বণিজ্যং মধ্যে ধনধান্যাদিকো মতঃ ॥ ৮৯৭ ॥
নদীপোতং সমাক্রম্য লবণক্রয়হেতবে ।
ঔৎকলোদধিকূলে চ মালরংগিকদেশতঃ ॥ ৮৯৮ ॥
গতবানাদিগুপ্তিচ্চ পঞ্চপোতসমন্বিতঃ ।
দেশব্যবহারমালোক্য সদাশ্রম্যসমন্বিতঃ ॥ ৮৯৯ ॥
বরাটিকাকরং তত্র তুংকং বরাটিকাদিকম্ ।
তালপত্রে চ লিখনং বিপরীতং ভিন্নভিন্নকম্ ॥ ৯০০ ॥
দ্বিপোতং লবণানাং চ পুরিতং মালরংগিকে ।
ভাস্করভূমেহি বণিজ্য লাভস্তেন সমং ধনু ॥ ৯০১ ॥
বিহারিদত্তস্ত পুত্রেণ তাম্রলিপ্তাংতরস্ত চ ।
মিত্রতা চাদিগুপ্তেন জাতা হি লবণিকেন চ ॥ ৯০২ ॥
আলাদন্তেন চোক্তং চ হাদিগুপ্তে শৃণু তৎ ।
যেন সপ্তগুণা লাভাঃ তং বদামি হিতং তব ॥ ৯০৩ ॥
মালবর্ণিকদেশাচ্চ দ্বাবিংশবোজনাত্যয়ে ।
পাংগাভূমিমধ্যভাগে লবণং বহু জায়তে ॥ ৯০৪ ॥
মহা সহ প্রগস্তব্যং বাণিজ্যং যদি রোচতে ।
আলাদন্তবচঃ কৃত্বা চাদিগুপ্তির্বাণিকপতিঃ ॥ ৯০৫ ॥
নৌকামাক্রম্য গতবান্ তেন সাকং জগাম হ ।
গত্বা তত্র পাংগাভূমৌ একস্মা যুজয়া নৃপ ॥ ৯০৬ ॥
ভারত্বয়পরিমিতং লবণং নাভিপূরিতম্ ।
নাগপুরং চ গতবান্ তুঙ্গানন্তাচ্চ স্রোতসি ॥ ৯০৭ ॥
মুদ্রেকামূল্যলবণৈরেকবিংশতিমুদ্রকান্ ।
কৃত্বা চাদিগুপ্তির্বাণিক্ ধনাদিপূরিতপ্রবঃ ॥ ৯০৮ ॥
দদারকেহপি নদীতীরে গতবান্ নাগপুরতঃ ।
কদলিপাতাসংজ্ঞকঞ্চ গ্রামং গত্বা বণিগ্‌বরঃ ॥ ৯০৯ ॥”

এই পুস্তকের মতে ব্রহ্মপাণেই তাম্রলিপ্তের অধঃপতন হয় । এখানে গোপীচন্দ্র
নামে এক রাজা ছিলেন । তিনি ছত্রেখরী দেবীর সম্মুখে ক্রোধে এক ব্রাহ্মণের শির-
চ্ছেদ করিয়াছিলেন । সেই অবধি ছত্রেখরী অধোমুখী হইয়া থাকেন । কিছুদিন পরে

রাজা গোপীচন্দ্র পাংগাভূমিতে গিয়া গঙ্গাসাগরপ্রান্তে মংতেখরের কাছে সপরিবারে
জলে ডুবিয়া যান। সেই সময়ে কাঁধির্ পশ্চিমে কাঁকড়দেশের কৈবর্তরাজা, হাজার
কৈবর্ত সেনা সঙ্গে লইয়া তিন দিন রাজধানী লুণ্ঠ করেন এবং পুড়াইয়া দিয়া যান।
ব্রহ্মশাপে তাম্রলিপ্তের অধঃপতন সম্বন্ধে ঐ পুথিতে আরও একটি গল্প আছে।

“দেবদত্তাদয়ঃ প্রায় ভাগ্যবন্তো হি তত্র বৈ ।

তাম্রলিপ্তে মহীপত্নং প্রাপুর্ভোমাপ্রসাদতঃ ॥ ৭৪ ॥

দেবীদত্তস্ত পুত্রোহভূদ্বনদত্তো মহীপতিঃ ।

দশকোটিপতিভূত্বা ননন্দ তাম্রলিপ্তকে ॥ ৭৫ ॥

ধনদত্তস্ত ভাৰ্য্যায়াং শিবাত্মাং তাম্রলিপ্তকে ।

জাতঃ কুলিশদত্তস্ত ত্রীন্ দেশান্ স প্রশশাস হ ॥ ৭৬ ॥

হলংদিদেশঃ স্বর্ণরেখাতটিনীপার্বত্যো নৃপ ।

কলিভূমিং মহীপালশাসনং কৃতবান্ স চ ॥ ৭৭ ॥

যমবাই-তটিনীপাশ্বে বালিশগ্রাম এব হি ॥ ৭৮ ॥

কাসজোষশ্চ দেশশ্চ পালিতস্তেন ভূভূতা ॥ ৭৯ ॥

কুলিশদত্তস্ত বংশেষু একত্রিংশচ্চ পুরুষাঃ ।

তাম্রলিপ্তঃ চ ভূক্তঃ হি জগ্মুস্তে যমমন্দিরম্ ॥ ৮০ ॥

ততঃপরং চিত্রগুপ্তবংশে পরগুধারাখ্যসংজ্ঞকম্ ।

জাতঃ কারস্থকূলে মতিমান্ চাকবিদ্যাশিষ্যদঃ ॥ ৮১ ॥

কাসজোষাদিদেশাংশ্চ পরগুধারো মহীপতিঃ ।

শাসনং সংযতশ্চক্রে তাম্রলিপ্তিহিতঃ স চ ॥ ৮২ ॥”

এই পরগুধার নামে কারস্থ রাজা তাম্রলিপ্তে অনেক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি
সমস্তল হইতে অনেক ষাঙ্কিকব্রাহ্মণ আনাইয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়াছিলেন। অনেক
যজ্ঞভুত্বের শাখাচ্ছেদ করাইয়াছিলেন। ভীমাদেবী তাঁহার উপর সর্বদা প্রসন্ন
ছিলেন। তিনি যজ্ঞ করিতেছেন, এমন সময়ে কোশিকী নদীর তীরস্থ মাতবপুর
হইতে একজন কস্তাদায়গ্রস্ত সনাঢ্যশ্রেনীর ব্রাহ্মণ আসিয়াই তাঁহাকে কস্তাদায়
জানাইয়া লক্ষমুদ্রা প্রার্থনা করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া
দিলেন ; বলিলেন :—

“কস্তানাং চ স্তুখেনৈব ত্বয়া চোৎপাদনং কৃতম্ ।

তাসাং বিবাহে লক্ষমুদ্রাঃ কথং দাস্তাম্যহং দ্বিজ ॥”

ব্রাহ্মণ, ইহার পরও পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে, রাজা মহাশয় তাঁহাকে অর্ধচন্দ্র
দিয়া দেশ হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন :—

“অস্ত্র প্রভৃতি তাম্রলিপ্তে সমুদ্রো হি মমাজ্জরা ।
 মধ্যে মধ্যে স্রোতসা চ পূরয়িষ্যতি ভূমিকাম্ ॥ ৯৭ ॥
 শস্ত্রহীনা বহুমতী ভবিষ্যতি হি হৃষ্মতে ।
 ক্ষারভূমিঃ ক্রিয়াহীনা নরাণাং শ্রীপদপ্রদা ॥ ৯৮ ॥
 বিরুদ্ধশ্রুতিনিত্যং মুকবন্ধঃ চ তে গলে ।
 মহান্ হৃষ্মচ্চ পংক্তিচ্চ সর্ষজন্তুষু জায়তে ॥ ৯৯ ॥
 স্বদ্ধাবারং রূপা চেয়ং কুভূপস্য সরিদ্বরা ।
 ভঞ্জনং নাগপঞ্চমাং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১০০ ॥
 কলেক্ষর্ষণি যান্ত্রস্তি সহস্রাণি চ বৈ বদা ।
 বেদাসংখ্যাকানি বাণসংখ্যাকানি শতানি চ ॥ ১০১ ॥
 তদা স্নেচ্ছমুখা দেশে তাম্রলিপ্তে হি ভাবিনঃ ॥
 তব বংশা হি নির্কংশা ভবিষ্যন্তি তদা ধনু ॥ ১০২ ॥
 ভীমাদেবী তদৈবাপি নিজধাম গমিষ্যতি ।
 অর্থহীনা বলৈর্হীনা ভাবিনো মানবাঃ সদা ॥ ১০৩ ॥”

এইবার মেদিনীপুরের কথা বলি । আইন-ই-আকবরীতে মেদিনীপুর একটি মহলের নাম আছে । উহা সরকার জলেখরের অন্তর্গত ছিল । উহাতে দুইটি কেন্দ্র ছিল ; একটি পুরাতন, আর একটি নূতন । ইহার পূর্বে মেদিনীপুরের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না । বৈষ্ণবগ্রন্থেও মেদিনীপুরের নাম নাই । আমরা পুরাণপুথিতে উহার আদি পাইরাছি । কথাটি বিশ্বাসযোগ্য কি না, শুধুন, পরে বিচার করিবেন । রাজা চন্দ্রদীপ্তি হিমালয় হইতে ওড়িশা দেশে বাইতেছিলেন ; তিনি পথের মধ্যে আল-মোড়া, শরপুর, উত্তরকোশলা, অযোধ্যা, প্রতীক্ষানপুর (এলাহাবাদ), বিক্র্যাচল, পৌণ্ড্রদেশ, কুশাবতী, কীকট, পঞ্চকোট, ছত্রভূমি, রাজহাট, মল্লদেশ, বকদ্বীপ, বেতগাঁও, চন্দ্রকোণা ছাড়াইরা গাণ্ডিচা দেশ পাইলেন । গাণ্ডিচা দেশেই আমনপুর কায়স্থের বাস ।

“আমনপুরঞ্চ তৈজৈব কায়স্থানাং সুখাম্পদম্ ।
 শালিধান্তস্ত চোৎপাদো গাণ্ডিচাদেশে প্রজায়তে ॥ ৭৫২ ॥
 কুষকাণাং ভুরিবাসো যত্র নাস্তি চ কাননম্ ।
 প্রাপকরাধ্যো নৃপতির্গাণ্ডিচাদেশশাসকঃ ॥ ৭৫৩ ॥
 মেদিনীকোষকারশ্চ যন্ত পুত্রো মহানভূৎ ।
 বিহার্য গাণ্ডিচাদেশং মেদিনীপুরং জগাম সঃ ॥ ৭৫৪ ॥”

মেদিনীকর নিজেরও বলিয়াছেন যে, তিনি প্রাপকের পুত্র । তিনি যে সকল পুথির

অনুসরণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বিশ্বপ্রকাশকোষের নাম আছে। আমরা জানি, বিশ্বপ্রকাশকোষ ১১১১ খ্রীঃ অঃ লেখা হয়। সুতরাং মেদিনীকর ১১১১ খ্রীঃ অঃ পরেই হইবেন। খ্রীঃ ১৪৩১ সালে বৃহস্পতি মতিলাল নানে একজন রাঢ়িশ্রেনীয় ব্রাহ্মণ রাজা গণেশ ও তাঁহার মুসলমান পুত্রগণের রাজসভার থাকিয়া অমরকোষের এক টীকা লিখেন। এই টীকার তিনি মেদিনীকোষ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন; সুতরাং ১১১১ হইতে ১৪৩১ এর মধ্যে তাঁহার সময়। ইহার মধ্য হইতেও আবার কিছু কম করা যাইতে পারে। কারণ, মেদিনীকর হলায়ুধ ও গোবর্দ্ধন এই দুই জন পণ্ডিতের নাম করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই লক্ষ্মণসেনের সভাসদ ছিলেন এবং খ্রীঃ ১২০০ বৎসরের কিছু পূর্বে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ১২০০—১৪৩১ এর মধ্যে মেদিনীকরের সময় ধরিলে বিশেষ হানি হয় না। তিনিই যদি নিজ নামে মেদিনীপুর স্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে খ্রীঃ ১৩শ বা ১৪শতকে মেদিনীপুর সহর বসিয়াছিল বলা যাইতে পারে।

পিতা গাণ্ডিচা দেশে রাজত্ব করিতেন, পুত্র মেদিনীকর রাজ্যের সীমা বাড়াইয়া গাণ্ডিচা দেশের পাশেই নিজ নামে মেদিনীপুর নাম দিয়া সহর বসান—ইহা অনায়াসেই মনে করা যাইতে পারে।

উইলসন সাহেব বলিয়াছেন, করেরা কারস্থ। সোমনাথ পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছেন, বৈদ্যও হইতে পারে। কিন্তু করেরা বৌদ্ধও হইতে পারে। কারণ, নিধান কর নামে একজন বৌদ্ধ একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। বৈদ্যদিগের মধ্যে করবংশ নিকৃষ্ট। সম্প্রতি বেহার রিসার্চ সোসাইটীর জার্নালে করবংশের একখানি তাম্রলিপি বাহির হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়, করেরা এক সময়ে ভুবনেশ্বর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। কেশরি, গয়াড়, উন্মট্ট প্রভৃতি বংশ ধ্বংস হইয়া গেলে করবংশ রাজত্ব লাভ করেন। পরে গঙ্গদের হাতে করবংশের নাশ হয়; তাঁহার সময় খ্রীঃ অঃ ১১০০ এর কাছাকাছি হইবে। মূলবংশ ধ্বংস হইলে তাহার কোন শাখা উত্তরাঞ্চলে আসিয়া রাজত্ব করা সম্ভব। এ সকল কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মেদিনীপুরের বড়ই গৌরব। অন্ত অন্ত নগরে গ্রন্থকারের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের গৌরব হয়। কিন্তু মেদিনীপুর গ্রন্থকর্তারই স্থাপিত, আবার সে গ্রন্থকর্তা যেমন তেমন গ্রন্থ-কর্তা নন; তাঁহার গ্রন্থ অমরকোষের স্তার প্রামাণিক ও সর্বত্র প্রসিদ্ধ। তিনি নিজেই বলিতেছেন, তিনি আরও একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম আরও ছড়াইয়া পড়ে; তাহার নাম ষট্শতগাথাকোষ। এখানি অভিধান নহে, কাব্য-সংগ্রহ।

সেকালে মেদিনীপুর জেলার অনেকটা লইয়া ভানদেশ হইয়াছিল।

কংসবত্যা হি সরিতঃ শিলাবত্যা হি ভূমিতঃ ।
 উভয়োর্মধ্যবর্তী চ ভানকো বিষ্ণতো ভূবি ॥ ১ ॥
 বকসীপাৎ পূর্বভাগে মণ্ডলঘটস্য পশ্চিমে ।
 ত্রয়োদশযোজনৈশ্চ মিতো হি ভানদেশকঃ ॥ ২ ॥
 কেচিদ্বদন্তি ভূপাল ভানকঃ ক্ষৌমভূমিকম্ ।
 কদলীপটুশ্চত্রাণামাকরো হি স্থলে স্থলে ॥ ৩ ॥
 পটুশ্চত্রস্য জননাৎ ক্ষৌমভূমিশ্চ বিষ্ণতা ।
 ধীবরাণাঞ্চ নিবাসো বর্ততে যত্র ভূরিশঃ ॥ ৪ ॥
 মধ্যদেশিত্রাঙ্কণানাং বসতিরেব পুরা কৃত্য ।
 বল্লালসেনেন ভূপাল রাজাদিশূরশূন্যনা ॥ ৫ ॥
 অকুলীনকুলীনদ্বং ত্রাঙ্কণানাং বিভাগশঃ ।
 স্থানং ত্রিষু হি দেশেষু কৃতং বৈ নৃপশূন্যনা ॥ ৬ ॥

ভানদেশে মধ্যদেশী ত্রাঙ্কণদিগের নিবাস । এই পুথিতে বলে, বল্লালসেন মধ্যদেশী ত্রাঙ্কণদিগের এই স্থানে বাস করাইয়াছিলেন । কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, রাঢ়ি, বারেন্দ্র, বৈদিক ভিন্ন অনেক ত্রাঙ্কণ বল্লালের পূর্বেও মধ্যদেশ হইতে আসিয়া দক্ষিণ-রাঢ়ে ও উড়িষ্যায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন । ইহারাই আমাদের মধ্যশ্রেণী ত্রাঙ্কণ । মধ্যশ্রেণী ত্রাঙ্কণের আদিবৃত্তান্ত লইয়া অনেকরূপ করুনা-জরুনা শুনা যায়, সে সব ঠিক নয় । রাঢ়িশ্রেণীদের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই । রাঢ়ে ও বারেন্দ্রে পঞ্চ ত্রাঙ্কণের সন্তানেরা বসতি করার পর মধ্যদেশ হইতে আসিয়া যে সকল ত্রাঙ্কণ এ দেশে বাস করেন, তাহ্রপট্টে ও শিলালিপিতে ইহাদিগকে “মধ্যদেশবিনির্গত” লেখা আছে । একঘর মধ্যদেশী ত্রাঙ্কণ সিদ্ধল গ্রামে বাস করেন ; তাঁহার বজুর্কেন্দী ছিলেন, অথচ, সিদ্ধলগ্রামী রাজীরা সামবেদী । এই “মধ্যদেশবিনির্গত” ত্রাঙ্কণেরা পূর্ববঙ্গের রাজা ভোজবর্ম্মার নিকট অনেক জমিজমা পাইয়াছিলেন ।

ভানদেশে তিনটি শূন্যর নগর ছিল :—একটির নাম চক্রকোণা, ইহার চারিদিকে বাঁশের বন ছিল ; একটির নাম বলিয়ার, তাহার চারিদিকে নারিকেলগাছ ; আর একটির নাম ভূরিশ্রেষ্ঠী, ইহা এখন মেদিনীপুর জেলায় নাই, হুগলী জেলায় পিয়াছে ।

ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রামে অনেক সম্ভ্রমের বাস ছিল । কিন্তু বুনা মহিষের বড়ই উপদ্রব ছিল । এখন ভূরিশ্রেষ্ঠী বা ভূরশূট মেদিনীপুর জেলায় না থাকিলেও, এখানে দুই চারি কথা তাহার সম্বন্ধে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না । এককালে ইহা দক্ষিণ-রাঢ়ের রাজধানী ছিল । ১১৩ শকে ভূরশূটে পাণ্ডুদাস নামে একজন রাজা ছিলেন । তাঁহারই উৎসাহে ত্রীধর পণ্ডিত বৈশেষিক দর্শনের প্রণয়িতাভাষ্যের এক টীকা

লিখেন; টীকার নাম জ্ঞানকলসী। উহা এখনও বৈশেষিক দর্শনের একখানি প্রধান পুস্তক বলিয়া গণ্য। খ্রীঃ ১০৯২ সালে যখন কুমারগুপ্ত চণ্ডেলরাজের প্রধান সেনাপতি গোপাল রায়ের অভিযানের জন্ত নাটক লিখেন, তখন ভূমিশ্রেষ্ঠে নানাশাস্ত্রের আলোচনা ছিল; সেখানকার ব্রাহ্মণেরা কুমারিলের মত মানিতেন না; প্রভাকর-মতের শালিকনাথী পুথি পাঠ করিতেন; এবং আপনাদিগকে অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব করিতেন। বাংলার মহাকবি ভারতচন্দ্রও এই ভূমিশ্রেষ্ঠে জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু এখন ভূমিশ্রেষ্ঠের আর সে দিন নাই। এখন ভামাকের জন্তই লোকে ভূমিস্টের নাম করে।

মেদিনীপুর জেলার এবং হাবড়া ও হুগলী জেলার অধিকাংশ লইয়া উড়িষ্যার হিন্দু রাজাদের সহিত গোড়ের মুসলমান সুলতানদিগের সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ হইত। বঙ্গের এই প্রান্তদেশে অনেক হিন্দু রাজাদের বংশধরেরা ছোট ছোট রাজ্য লইয়া শাসন করিতেন। ময়না, কর্ণগড়, নারায়ণগড়, দাঁতন, এই সকল স্থানে মুসলমান-বিজয়ের পরও শত শত বৎসর ধরিয়া হিন্দু সভ্যতার ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাওয়া যাইত। বীহার। বাংলার প্রাচীনত্ব অন্বেষণ করেন, তাহাদের পক্ষে মেদিনীপুরের মত জায়গা আর নাই। ময়না, বৌদ্ধধর্মের শেষ বে ধর্মঠাকুরের পূজা, তাহার একটি প্রধান জায়গা। এখানকার ধর্মব্রতেরা বোধ হয় হীনযানী বৌদ্ধদিগের বংশধর। মেদিনীপুরে এখনও প্রাচীনত্বের বিশেষ আলোচনা হয় নাই। এখানকার শাখা-পরিষদ যদি তাহার আলোচনা করেন, তবে অনেক জটিল বিষয়ের মোমাংসা হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

নিধু গুপ্ত

[৩]

চাকরীতে জবাব দিয়া, ছাপরা ছাড়িয়া, নিধুবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। ছাপরা ছাড়িলেন বটে, কিন্তু ছাপরার স্মৃতি তাঁহাকে ছাড়িল না। যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, তত দিন কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে সেখানকার কথা স্মরণ করিতেন। সুবিধা পাইলেই সেখানে যাইয়া বন্ধুবান্ধবদের সহিত বেথা-গুনা করিয়া আসিতেন। সেখানকার কথা উঠিলে তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিত।—সে গল্প বলিতে আরম্ভ করিলে শীঘ্র শেষ করিতে চাহিতেন না।—ছাপরার উপর মায়ী তাঁহার এতই বেশী জন্মিয়াছিল।

মায়ী জন্মিবারই কথা। কারণ, ছাপরায় যাওয়া না হইলে তাঁহার নাম আজ বাঙ্গালীর মুখে-মুখে ফিরিত কি না সন্দেহ! সঙ্গীত-শিক্ষা তাঁহার এই দেশে হইয়াছিল। দীক্ষা-গুরুও তাঁহার এই স্থানে মিলিয়াছিল। এমন কি, চির-জীবনের অন্ন-সংস্থানের উপায়ও তিনি এই ছাপরা হইতে করিয়াছিলেন।—যে দেশের নিকট এত ঋণ, তাহার কথা কি কখনও মন হইতে মুছিয়া কেলা যায়?

তবে কথা এই যে, ছাপরাকে অত্যন্ত ভালবাসিলেও সেটা ছিল তাঁহার প্রবাস। তাঁহার সুখ-দুঃখের ভাগী হয়, এমন মানুষ সেখানে কেহ ছিল না। তাই যখন সেখানকার আপিসের সঙ্গে তাঁহার বনিল না, তখন তাঁহার—“মনে পড়িল রে ব্রজভূমি।”—তখন তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া গৃহপানে ছুটিয়া আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া, জননীর স্নেহ-শীতল ছায়ায় আশ্রয় পাইয়া, পুত্র-পরিজনদের হাসিমুখ দেখিয়া, পুরাতন বন্ধু-বান্ধবের সহিত গল্প-গুজব করিয়া তাঁহার মনের সকল অসুখ সারিয়া গেল। গৃহে আসিলেন—মনে হইল যেন স্বর্গে আসিয়াছেন। এত সুখ—এত শান্তি জীবনে তিনি আরও কখনও লাভ করেন নাই।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সুখ-ভোগ—এ শান্তি-ভোগ তাঁহার কপালে বেশী দিন টিকিল না। বৎসর দুই যাইতে না যাইতে তাঁহার একমাত্র শিশু-পুত্রটিকে নিষ্ঠুর কাল কাড়িয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শোকাতুরা সহধর্মিণীও পুত্রের অহুসরণ করিলেন। উপর্যুপরি এই দুই শোকের আঘাতে নিধুবাবুর হৃদয় ভাঙিয়া গেল। তাঁহার বয়স তখন অল্প—২৭।২৮ বৎসরের বেশী হইবে না। সেই বয়সে—নূতন সুখ-ভোগের সময়ে, সহসা শোকের আঘাতে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখাশুনা করা—আমোদ-আহ্লাদে যোগদান করা সমস্তই বন্ধ করিয়া দিলেন।

ঘরে বসিয়া নির্জনে শোক-সঙ্গীত রচনা করিতেন, এবং আপন মনে তাহাই গানিতেন।—শোকে বোধ করি ইহাই তাঁহার কতকটা সাধনা ছিল।

সে সময়ে কত গান তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার এখন উপায় নাই। তবে ঈশ্বর গুপ্ত বলেন যে, সেই সব গানের মধ্যে একটি গান হইতেছে এই ;—

“মন-পুর হোতে আমার হারায়েছে মন।
কাহারে কহিব, কার দোষ দিব, নিলে কোন্ জন।
না বোলে কেমনে রব, বোলে বল কি করিব,
তোমা বিনে আর, সেখানে কাহার গমনাগমন।
অন্তের অগমনীয়, জানি সে স্থান নিশ্চয়
ইথে অসুমান, এই হয় প্রাণ, তুমি সে কারণ।
যদি তাহে থাকে ফল, লোয়েছ কোরেছ ভাল,
নাহি চাহি আমি, যদি প্রাণ তুমি, করহ যতন।”

অনেকের মতে এই তিনটি গানও তাঁহার শোকের সময় রচিত ;—

(১)

“না হ’তে পতন তমু দাহন হইল আগে।
আমার এ মনস্তাপ তাহারে তো নাহি লাগে।
চিতে চিত সাজাইয়ে, তাহে ছঃখ-ভৃগু দিয়ে,
আপনু হইনু দন্ধ, আপনারি মনস্তাপে।”

(২)

“এমন যে হবে প্রেম বাবে এ কত মনে ছিল না।
এ চিতে নিশ্চিত ছিল, এ প্রেমে বিচ্ছেদ হবে না ॥
ভেবেছিলাম নিরন্তর, হয়ে রব একাকার,
যদি হয় প্রাণান্তর, মনান্তর তার হবে না ॥”

(৩)

“বিরহেতে মরি হে বিধি অসুকল হইয়ো।
পঞ্চভূত পঞ্চস্থানে নিবৃত্ত করিয়ো ॥
যে আকাশ বাস তার, আকাশের ভাগ মোর—
এবে সে এই বাসনা তাহাতে মিলায়ো ॥

পবন তার ব্যজনে, তেজ মিতুক্ দর্পণে,
জলে সেই জলে রাখ তার ব্যভারিণী ॥
পদ-বিহরণ যথা, পৃথ্বী-অংশ রাখ তথা,
ইহার অধিক আর বে হয় বুঝিণী ॥”

যাহা হউক, বৎসর কয়েক পরে, শোকের মাত্রা একটু কমিলে, ১১৭৮ সালে নিধুবাবু পুনরায় দার-পরিগ্রহ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ পত্নীকে লইয়াও তিনি সংসার করিতে পারিলেন না। বিবাহের এক বৎসর যাইতে না যাইতে এ জীবনও মৃত্যু ঘটিল। নিধুবাবু তখন সঙ্কল্প করিলেন, আর বিবাহ করিব না। অনেক দিন পর্যাণ্ত এ সঙ্কল্প তিনি বজায় রাখিতেও পারিয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা জননীর অমুরোধ-আতিশয্যে তাঁহার সে সঙ্কল্পের বাঁধ অবশেষে ভাঙ্গিয়া যায়। সংসারে তিনি এবং তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ছাড়া আর কেহ তখন ছিলেন না। যে দুইটি পিতৃ-মাতৃহীন ভাগিনেয়কে বুকে করিয়া তিনি মানুষ করিয়াছিলেন, তাহারাও তাঁহাকে একে একে ছাড়িয়া সংসার হইতে অকালে বিদায় গ্রহণ করে। এই সব উপযুপরি শোকের আঘাতে তিনি সংসারের প্রতি একান্ত অমুরাগ-শূন্য হইয়া উঠেন। তাঁহার জন্ত তাঁহার মাতা অত্যন্ত চিন্তিতা—অত্যন্ত ভীতা হইলেন। সম্বানের মন মা যত নীড়, যত ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন, এমন বোধ করি, সংসারে আর কেহ পারেন না। নিধুবাবুর মাতাও নিধুবাবুর মন বুঝিলেন। তাঁহাকে সংসারী করিবার জন্ত বিশেষরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই চেষ্টার ফলে, ১২০১ সালে বরিশহাট চণ্ডীতলা গ্রামে হরিনারায়ণ সেন মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। এই সংসারে তাঁহার চারিটি পুত্র ও দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। নিধুবাবুর মাতার আশা ফলবতী হইয়াছিল। তিনি পুত্রকে সংসারী করিয়া, পৌত্রের মুখ দেখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন।

নিধুবাবু তেমন সুখ-স্বস্তিতে জীবন কাটাইতে পারেন নাই বটে, তবে সম্মান ও যশ জীবিতকালেই যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। বৎসর চল্লিশ বয়স হইতে তাঁহার সঙ্গীত-শক্তি সর্বসাধারণের সম্মম ও আদর আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার গান শুনিবার জন্ত সকলে উৎসুক হইত। সে গান শুনিতে পাইলে নিজেকে অনেকে কৃতার্থ মনে করিত। স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় লিখিয়া গিয়াছেন,—“তিনি ইচ্ছামত, নিজ হৃদয়ের আবেগে গীত রচনা করিতেন। কেহ তাঁহাকে গান গাইতে বলিতে সাহসীই হইত না। যিনি যত বড় মানুষই হউন না, নিধুবাবু—নিধুবাবু; নিজের ইচ্ছামত মা গাইলে, কেহ তাঁহার গান শুনিতে পাইতেন না। নিধুবাবু আখড়ার

আটচালার বসিয়া সাংকালে স্বচ্ছামত গান গাইতেন; লোকে আসিয়া তাহা শুনিত ও শিখিত। শোভা-বাজারের রাজা রাজকুমার প্রভৃতি কলিকাতার বড় বড় ধনাঢ্য লোকেরা সে গান শুনিবার জন্ত আটচালার উপস্থিত হইতেন। নিধুবাবুর গান শুনিবার জন্ত বর্দ্ধমানাধিপ মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর একবার নিধুবাবুকে বর্দ্ধমান আহ্বান করেন। নিধুবাবু শিষ্টাচার-সম্মানের সহিত সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। একপ ঘটনা বিরল ছিল না। ইহাতেই বুঝুন, নিধুবাবুর স্বভাবের এবং সঙ্গীতের স্বাধীনতা! কবি-হৃদয় আপন মনে আপন বেগেই গাইত; কখনও কাহারও মোসাহেবী করিত না; কবি কীর্তি ও স্মৃতিতির জন্ত শশব্যস্ত ছিলেন না।—কথাগুলি অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় না। ঈশ্বর গুপ্ত ও ঐ ধরনের কথাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, নিধুবাবু বর্দ্ধমান বাইতে অসম্মত হইলে, মহারাজ তেজশ্চন্দ্র মূর্শিদাবাদের মহারাজ মহানন্দ রায় বাহাদুরের কলিকাতার বাগান-বাড়ীতে একদিন বেড়াইবার ছলে আসিয়া তাঁহার গান শুনিয়া চলিয়া যান। এই সব কারণে, অনেকে অনেক সময় তাঁহাকে অহঙ্কারী বলিয়া মনে করিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি তাহা ছিলেন না। পাছে কেহ মোসাহেব মনে করে, এই ভয়ে তিনি বড় লোকদের সহিত একটু সাবধান হইয়া চলিতেন।—আত্মসম্মান-জ্ঞান তাঁহার অত্যন্ত প্রবল ছিল।

ঠাকুরদাস বাবুর উপরি-উদ্ধৃত লেখার মধ্যে যে আটচালার উল্লেখ আছে, সেইটি ছিল নিধুবাবুর এক প্রধান অভ্যাসস্থান। শোভা-বাজারের বটতলা-নিবাসী ৬ রামচন্দ্র মিত্র, যিনি ‘আমেরিকান কাণ্ডেনে’র মুচ্ছুদ্দি ছিলেন, তাঁহারই বাড়ীর উত্তরাংশে এই প্রসিদ্ধ আটচালাখানি ছিল; নিধুবাবু প্রায় প্রত্যহ রাত্রে এখানে আসিয়া গান-বাজনা করিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন যে, ‘ঐ স্থলে এই নগরস্থ প্রায় সমস্ত সৌখীন ধনী ও গুণী লোক উপস্থিত হইয়া নিধুবাবুর সুধাময় কণ্ঠ-বিনির্গত সুমধুর সঙ্গীত-স্বরে মুগ্ধ হইতেন। বাবু নারায়ণ মিশ্র মহাশয় পক্ষীর দল করিয়া এই প্রসিদ্ধ আটচালার সর্ব্বদাই উল্লাস করিতেন। পক্ষীর দলের পক্ষী সকলেই ডঙ্গ-সন্তান, পাখীর দলেরা নিধুবাবুকে কর্তা বলিয়া অত্যন্ত মান্য করিত।’

ঐ আটচালা ছাড়া, আরও একটি স্থান ছিল, যেখানে নিধুবাবু দিনান্তে একবার না বাইয়া থাকিতে পারিতেন না। সে স্থানটি—মূর্শিদাবাদের মহারাজা মহানন্দ রায় বাহাদুরের বাগান-বাড়ী। এই বাগান বাড়ীতে আসিয়াই মহারাজা তেজশ্চন্দ্র নিধুবাবুর গান শুনিয়া গিয়াছিলেন। এ বাড়ীতে মহারাজ মহানন্দের শ্রীমতী নামে এক বারাননা বাস করিত। বারাননা থাকিলেও তখনকার কালে একপ স্থানে বৈঠক করা কোনও দোষের বলিয়া পরিগণিত হইত না। চল্লিশ বৎসর পূর্বে, একজন

অশীতিবৎসর বয়সের বৃদ্ধ এ সময়ে ‘ভারতীতে’ বাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়িলেই আমাদের কথা সকলে বুঝিতে পারিবেন। তিনি প্রথম বর্ষের ‘ভারতীর’ ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন,—“তখনকার অধিকাংশ লোকেই বেঙ্গালয়ে গমন করিতেন। যাইবার কোন কদর্য্য অভিপ্রায় ছিল না। কেবল দশজন ভদ্রলোকে একত্র হইয়া গান-বাদন, ক্রীড়া বা সলাপ করা মাত্র।...কুটুম্বালেরা আফিস হইতে আসিয়া, হস্ত-পদাদি ধোত করিয়া, বৃদ্ধ ও আধ-বৃদ্ধেরা হরি-নামের কুলি লইয়া, বেঙ্গালয়ে উপস্থিত হইতেন; বয়সের তারতম্য ছিল না, সকল বয়সের লোকই সমবেত হইতেন।...হুই এক ঘণ্টা আমোদ করিয়া চলিয়া যাইতেন। তখনকার বড় মানুষেরা এই প্রকার সবাকবে আমোদ করিবার নিমিত্ত বেঙ্গা রাখিতেন। বেঙ্গার সংখ্যা তখন অত্যন্ত অল্প ছিল।”

উপরে ঐ যে দুইটি আড্ডার পরিচয় দিলাম, পাঠক উহা হইতেই আশা করি, বুঝিতে পারিতেছেন যে, তখনকার কালের বাঙ্গালী-সমাজে কতটা সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করিত। ঐ ক্ষণ আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, তাঁহারা কি বলিতেছেন, তাহা তাঁহারা নিজেরাই জানেন না, বাঁহারা নিধুবাবুকে ও কবিওয়ালাদিগকে সাহিত্যের আসর হইতে তাড়াইয়া দিবার ক্ষণ এই যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন যে, ‘বাঙ্গালাদেশ তখন অরাজকতা-পূর্ণ—তখন সাহিত্য-সৃষ্টি হইতেই পারে না।’ ঐ তর্কিকেরা বাঙ্গালা-রাজ্যের কাড়াকাড়ির ইতিহাসটুকু জানিতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালীর ইতিহাস আদৌ জানেন না। তাঁহারা রসাতলুভির সাহায্যে নিধুবাবু প্রভৃতির আলোচনা করেন না;—কেবল বিগাতী সমালোচকের বীধা কুলি কপচাইয়াই নিধুবাবু প্রভৃতিকে উড়াইয়া দিতে চাহেন!

মহারাজ মহানন্দের বাগান-বাটীর কথা এখানে আরও একটু বলিব। কারণ,—এই স্থানে নিধুবাবুর অধিকাংশ সঙ্গীতই রচিত হইয়াছিল। রবিবাবু বলিয়াছেন বটে,—

“আমায় পাবে না আমার হৃদে ও সুখে,
আমায় বেননা খুঁজো না আমার বুকে,
আমারে দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে যেখান খুঁজিছ সেখা সে নাহি রে!”

কিন্তু নিধুবাবুর পক্ষে এ কথা খাটে না। কোনও কবির পক্ষে উহা সূখ্যাতির কথা বলিয়া মনেও করি না। নিধুবাবুর সুখ-দুঃখ, বেদনা-সান্তনা সমস্তই তাঁহার কাব্যে আমরা প্রতিকলিত দেখিতে পাই। চণ্ডীদাসের কবিত্বের উৎস যেমন

রজকিনী রামীর প্রেম, নিধুবাবুর গানের উৎসও তেমনই এই বাগানবাড়ীর শ্রীমতীর প্রেম। শ্রীমতী নিধুবাবুকে বেক্লপ ভালবাসিত, নিধুবাবুও তাহাকে সেইরূপ ভালবাসিতেন। এই দু'জনের সম্বন্ধে যে দুই একটি গল্প প্রচলিত আছে, পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থের জন্য এখানে তাহা বিবৃত করিতেছি।

নিধুবাবুর উপর শ্রীমতী এমন একটা দাবী করিত যে, তিনি যদি দুই চারি দিন তাহার কাছে না যাইতেন, তাহা হইলে সেটা যেন তাঁহার এক মস্ত অপরাধ বলিয়া শ্রীমতীর মনে হইত। একবার দুই চারি দিন অনুপস্থিতির পর হঠাৎ একদিন নিধুবাবুর ইচ্ছা হইল, শ্রীমতীকে গিয়া দেখিয়া আসি। ইচ্ছা হইবামাত্র তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেই দিনই—দুপুর বেলায় শ্রীমতীর বাটীতে তিনি উপস্থিত হইলেন। এ দিকে, শ্রীমতীও তাঁহার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় নিধুবাবুকে সহসা আসিতে দেখিয়া শ্রীমতী বলিল,—“অসময়ে বড় যে, কি মনে ক’রে—দেখা দিতে নাকি?” নিধুবাবু তাহার কথার মধ্যে, কথার মূরে, তাহার দুই চোখে একটা চাপা ভৎসনা লক্ষ্য করিলেন। তিনি কোনও কথা না বলিয়া, নিকটবর্তী আসনে উপবিষ্ট হইয়া গান ধরিলেন,—

“ভালবাসিবে ব’লে ভালবাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।
শ্রীমুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
তাই দেখিবারে আসি, ‘দেখা দিতে’ আসিনে ॥”

শ্রীমতী নিধুবাবুর চাতুরী বুঝিতে পারিয়া একটু রাগ ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল,—“দেখ, আমরা অবলা, বুদ্ধিহীন।। আমাদের প্রবঞ্চনা করাটা বিশেষ বাহাদুরী নয়।”—ইহাতেও নিধুবাবু কোনও কথা না কহিয়া আবার গান ধরিলেন,—

“কে বলে ‘অবলা’ তোমার—মহাবল ধর প্রিয়ে,
ধরাধর ধর হৃদে, ঢেকেছ বসন দিগে।
স্বরহর শর সম, কটাক্ষ তব বিষম,
নিরুপমা নিঃশব্দ, নর বধ নারী হ’য়ে।”

এই গানটি শুনিবামাত্র শ্রীমতী হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—“মনে করিয়াছিলাম, তোমার সঙ্গে আজ ঝগড়া করিব। কিন্তু কি যে তোমার গানের গুণ—শুনিলেই সব ভুলিয়া যাই।” উভয়ের চক্ষে তখন প্রীতির হাসি ফুটিয়া উঠিল। নিধুবাবু পুনরায় গায়িতে আরম্ভ করিলেন,—

“এমন নয়ন-বাণ কে তোমায় করেছে দান,
দর্পণে হেরিলে আঁখি আপনি হবে সন্ধান ।
নয়ন অক্ষয় তুল, তাহে কটাক্ষ নিপুণ
বিধি যদি দিত গুণ, বধিতে অনেকেরই প্রাণ ।”

নিধুবাবুর অধিকাংশ সঙ্গীতই এই ভাবে রচিত । মনে ভাব উদয় হইলেই তিনি তাহা গানে প্রকাশ করিতেন । এ সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি গল্প প্রচলিত আছে । আমরা যাহা জানি, একে একে তাহা পাঠকবর্গকে এখানে উপঢৌকন দিতেছি ।

একদিন নিধুবাবু দুই-একটি বন্ধুর সহিত গল্পালাপ করিতেছেন, এমন সময় পাশের ঘাট হইতে তাঁহাদের কানে আসিয়া পৌছিল যে, একটি জ্বীলোক আর একটি জ্বীলোককে বলিতেছেন,—“দেখ ভাই, চোখই যতই অনর্থের মূল ।” কথাটা শুনিবামাত্র নিধুর এক বন্ধু বলিলেন, “কথাটা ঠিক বটে ।” নিধুবাবু বলিলেন,—“কথাটা খুবই ভুল ।” বন্ধু ইহার উত্তরে বলিলেন, “তবে ঠিক কথা কি শুনি !” নিধুবাবু তখন অতি চাপা কণ্ঠে বন্ধুর কানের কাছে গািলেন,—

“নয়নেরে দোষ কেন,
মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নেরে দোষ কেন !
আঁখি কি মজাতে পারে না হোলে মন-মিলন ।
আঁখিতে যে যত হেরে, সকলই কি মনে ধরে,
যে যাকে মনে করে, সেই তার মনোরঞ্জন ।”

“বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা” নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ছিল, বাজারে এখন তাহা পাওয়া যায় না, তাহারই একস্থানে নিধুবাবু-সংক্রান্ত এই গল্পটি আছে যে, “একদিন নিধুবাবু বাটীতে বসিয়া মৃদুস্বরে গান করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যারে রাম, তুই নাকি বড় গায়ক হয়েছিস্ ? আমরা সে দিন রাজবাটীতে (শোভাবাজার) কথা শুনিতে গিয়াছিলাম, কথকের গান শুনিয়া আপোষের মধ্যে বলিলাম,—কথকটি বেশ গান গায় । একটি স্তম্ভরী বউ, কাহাদের জানি না, যেন ভগবতী, আমার পানে চাহিয়া দীর্ঘ হাসিয়া বলিল—‘আপনি কি আপনার ছেলের গান কখনও শুনে নাই !’ আমি বলিলাম,—‘কৈ না ।’ সেই বউটি বলিল—‘তবে একবার শুনিবেন ।’ এমন সময় কথা সাক্ষ হইল আর সেই বউটির পরিচয় লওয়া হইল না । তা বাছা, তুই আজ একটা গান গা—আমি শুনি । নিধুবাবুর একজন প্রতিবেশিনী ঠাকরুণ-দিদি সেই সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি রহস্য করিয়া বলিলেন, “দেখ ভাই, নাত-বউএর পারে

ধরার গানটা যেন হয়।” নিধুবাবু জীবৎ হাসিয়া বলিলেন—“আপনার আচ্ছাই শিরোধার্য।”—এই বলিয়া নিম্নলিখিত গানটি গাহিলেন—

“আমি সাধ ক’রে কি ধরি তারই পায় ।
সে ধন সহজে কি পাওয়া যায় ।
সে যে অগদগুরু কল্পতরু,—মন দিতে হয় যে তারই পায়,
সে যে সাধনের ধন অমূল্য রতন, তারে সাধন বিনা কেবা পায় !
সে যে অধম-তারিণী, দুঃখ-নিস্তারিণী, তারে প্রেম বিনা বাঁধা দায় ॥”

এই পুস্তকেই আর একটি গল্প আছে যে, একদিন নিধুবাবুর কোনও এক বন্ধু তাঁহাকে রহস্য করিয়া বলেন—“নিধু! প্রেম, পীরিতি, গেয়ে-গেয়েই ত দিন কাটালে—ভাব কিছু বুঝিতে পারিলে?”—নিধুবাবু ইহার উত্তরে তখন তাঁহাকে এই গানটি শুনাইলেন,—

“প্রেম-সিকুনীরে—বহে নানা তরঙ্গ,
রসিকে পার হ’তে পারে—অরসিকের আতঙ্ক ।
চাতুরী-তরী একে, তাহে কর্ণধার অনঙ্গ,
বিচ্ছেদ প্রবল বায়ু, কখন করে কি রঙ্গ ॥”

তাঁহার সম্বন্ধে আর একটি গল্প আছে যে, একবার তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে দুঃখ করিয়া বলেন,—“নিধু, চিরকালটাই একভাবে কাটাইলে—আর ভাল দেখায় না! আড্ডা দেওয়া বন্ধ কর!”—নিধু ইহাতে হাসিয়া এই গানটি বলেন—

“কা’র দোষ দিব বল, দোষী কব কার ।
আমার মন, আমার নয়ন, আমারে মজাতে চায় ।
মন যদি হতো মনের মতন, তবে কি দুঃখ পেতাম এমন ;—
আমি মনেরে বুঝাব কত,—সতত বিপথে ধায় ॥”

নিধুবাবুর যে সঙ্গীতটি সর্কাপেক্ষা বিখ্যাত, তাঁহার সম্বন্ধেও একটি গল্প প্রচলিত আছে। সে গল্পটি এই যে, নিধুবাবু দুই দিন বাটী আসেন নাই, তৃতীয় দিবসে বাটী আসিলে তাঁহার সহধর্মিণী অভিমান করিয়া বলেন “কাল-কুৎসিত ব’লে কি আমাকে এতই ঘৃণা করিতে হয়?”—নিধুবাবু এই কথার উত্তরে তখন এই গানটি রচনা করেন,—

“তোমারই উপমা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে,
আকাশের পূর্ণশশী সেও কঁাদে কলঙ্ক-ছলে ।

সৌরভে গোরবে, কে তব তুলনা হবে,
আপনি আপন সম্ভবে,
যেমন গঙ্গা-পূজা গঙ্গাঘলে।”

উপরি-উক্ত গল্পগুলির যথার্থ্য সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিতে পারি না ; তবে কথাগুলো যখন চলিয়া আসিতেছে, তখন উহা চাপিয়া রাখাটা ঠিক মনে করি না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার আর কিছু না হউক, তাহা হইতে মানুষটা যে কেমন, তাহা বুঝা যায়। উপরের গল্পগুলিতেও আর কিছু না হউক, উহার দ্বারা কিন্তু আমরা নিধুবাবুর কবি-প্রকৃতি দেখিতে পাই।

টপ্পা ছাড়া নিধুবাবুর নিকট বাঙ্গালী আরও একটি জিনিষের জ্ঞান ঋণী।—তাহা আখড়াই। আখড়াইএর তিনি সৃষ্টিকর্তা ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারই হাতে এ জিনিষটার বিস্তর উন্নতি হইয়াছিল। কবিগুণালা ভোলা ময়ূরার এক গানে আছে—“আখড়ায়ের সৃষ্টি কোন্নে কুলুইচন্দ্র সেন।”—এই কুলুইচন্দ্র রামনিধি গুপ্তের অতি নিকট সম্পর্কীয় ভাতা ছিলেন। এক ভাতার হস্তে যাহার সৃষ্টি হইয়াছিল, অল্প ভাতার হস্তে তাহা শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্ত বলেন,—“৮রামনিধি গুপ্ত মহাশয় এই আখড়ায়ের বিস্তর শ্রীবৃদ্ধি করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং সর্বশেষে তাঁহার প্রণীত সংশোধিত পদ্ধতিই প্রচলিত হইয়াছিল।”

মোহনচাঁদের আখড়ায়ের যে নাম আমরা শুনিতে পাই, তাহা নিধুবাবুরই হাতে-গড়া জিনিস ছিল। স্বর্গীয় মোহনচাঁদ বহু নিধুবাবুর সর্কাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য ছিলেন। লোকে মোহনচাঁদকে নিধুবাবুর “খাস ভাণ্ডার” বলিত। ঈশ্বর গুপ্ত ইহার সম্বন্ধে তাঁহার ‘প্রভাকরে’ লিখিয়া গিয়াছেন,—‘বাঙ্গালীর মধ্যে এই বঙ্গদেশে তাঁহার জ্ঞান বাঙ্গালা গাহনা বিষয়ে ইদানীং সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ্য ব্যক্তি দ্বিতীয় আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। নিধুবাবু ইহাকে প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করিতেন, তাঁহার কৃত কি ‘আখড়াই’ কি ‘টপ্পা’ ইনি যখন বাহা গাহিতেন, তখন তাহাতেই মধুরষ্টি করিতেন।’

শেষ-জীবনে নিধুবাবু বাগবাজারের ৮রসিকচাঁদ গোস্বামীর বাটী ছাড়া আর কোথাও বড় একটা যাইতেন না। শোভাবাজারের রামচন্দ্র মিত্রের মৃত্যুর পর তাঁহার আট-চালার আড্ডায় নিধুবাবু বড় যাইতে চাহিতেন না;—কাজেই সে আড্ডা বন্ধ হইয়া যায়। তখন নিধুবাবুর পরমভক্ত বাগবাজার-নিবাসী দেওয়ান শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উচ্চোগে ও সাহায্যে রসিকচাঁদের বাটীতে বৈঠক বসিতে আরম্ভ হয়। নিধুবাবু প্রায় প্রত্যহই এখানে আসিতেন। গান-বাজনা, আমোদ-আহ্লাদ এখানে খুবই হইত।

নিধুবাবু এক বিষয়ে বিশেষ সুখী ছিলেন। তাঁহার যেমন স্বাস্থ্য ছিল, তেমন স্বাস্থ্য সকলে পায় না। ১২৬১ সালের ‘সংবাদ-প্রভাকরে’ লিখিত আছে যে, তিনি “শারীরিক নিদান এমন বুদ্ধিতেন যে, সময়ে স্নান, সময়ে ভোজন, সময়ে শয়ন করাতে কখনো কোনরূপ রোগ ভোগ করেন নাই। তিনি এত যে প্রাচীন হইয়াছিলেন, তথাচ চক্ষু কণ্ঠ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, এবং বুদ্ধিরও লম হয় নাই। মৃত্যুর পূর্বে কেবল এক বৎসর কাল দুর্বলতা জন্ত গতিশক্তির ব্যাঘাত হইয়াছিল। এ কারণ বাটীর বাহির হইয়া কুড়াপি গমন করিতে পারেন নাই। এই এক বৎসর যে যে মহাশয় দেখা করিতে আসিতেন, তাঁহাদিগের সহিত হস্তবদনে আলাপাদি করিয়া পরিশিষ্ট সময় ‘হস্তামল’ ‘কবীর’ ও ‘ভুলসীদাস’ রূত গ্রন্থ অথবা ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিতেন। রামনিধিবাবু ৯৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবস্থিত সুখ-সন্তোষ করণানন্তর ১২৪৫ সালের ২১শে চৈত্র দিবসে পুত্র-কন্তা পৌত্র দৌহিত্রাদি রাখিয়া জাহ্নবীতীরে নীরে জ্ঞানপূর্বক জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এতন্মায়াময় সংসার পরিহার করত যোগ্যধামে যাত্রা করেন।”

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে, নিধুবাবু নিজের গানগুলি সংগ্রহ করিয়া “গীতরত্ন” নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থখানি এক্ষণে হুম্মাপ্য। তাঁহার পুত্র জয়গোপাল গুপ্ত ১২৬৩ সালে এই পুস্তকখানি পুনরায় মুদ্রিত করেন। “গীতরত্নে”র এ সংস্করণও দুর্লভ। তবে আমাদের নিকট ইহা আছে। ইহাতে নিধুবাবুর যে একটু জীবন-কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরগুপ্ত কর্তৃক লিখিত জীবনীরই কতকটা সংকলন মাত্র। তাহাতে নিধুবাবুর জীবনী-সংক্রান্ত যে দুইটি বেশী ঘটনার উল্লেখ আছে, পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথম ঘটনাটি এই,—“১২১২ কিংবা ১৩ অব্দে নিধুবাবুর উত্তোগে এতন্নগরে দুইটি সংশোধিত সখের আখুড়াই দলের সৃষ্টি হয়, তাহার একপক্ষে বাগবাজার ও শোভা-বাজারস্থ সমুদায় ভদ্রসন্তান, এবং আর একপক্ষে মনসাতলা অথবা পাখুরিয়াঘাটা-নিবাসী ৮নৌলমণি মল্লিক মহাশয় ও তাঁহার বন্ধুবর্গ ব্রতী হইলেন। এই উভয়দলে ‘বাদী’ হইলে নিধুবাবু বাগবাজারের পক্ষ হইয়া গীত ও সুর প্রদান করিলেন; এবং মল্লিকবাবুর পক্ষে শ্রীদাম দাস এবং ৮কুনুইচন্দ্র সেনের পুত্র ৮গোকুলচন্দ্র সেন প্রভৃতি কয়েকজন গীত ও সুর প্রস্তুত করণার্থে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে শ্রীদাম দাস প্রভৃতি ভবানী-বিষয় এবং খেউড় প্রস্তুত করিলেন। প্রভাতি প্রস্তুত করিতে গোকুলচন্দ্র সেনের উপর ভারার্পণ হইল। তাহাতে তিনি এই মোহাড়া রচনা করিলেন যথা,—

‘ওইরে অরুণ আলো কামিনী দহিতে।’

কিন্তু ইহার চিতেন, পড়েন এবং অন্তরা প্রস্তুত করিতে বিলম্ব হওয়াতে নিধুবাবুকে কহিলেন, ‘খুড়া মহাশয়, এই মোহাড়া প্রস্তুত করিয়াছি। কালবিলম্ব হয়, অতএব অনুগ্রহ করিয়া ইহার চিতেন প্রভৃতি রচনা করিয়া দিউন।’ তাহাতে নিধুবাবু এই নিম্নলিখিত চিতেন, পড়েন এবং পর চিতেন রচনা করিয়া দিলেন, যথা,—

‘নিবারি শশীর শোভা কুমুদী সহিতে ।

না হ’তে স্নেহের লেশ, রজনী হইল শেব ;

চকোরী টাদের আশা তেজিল হুঃখেতে ॥’

এই সঙ্গীত-সংগ্রাম শ্রবণ ও দর্শন করত নগরস্থ সমস্ত বিশিষ্ট লোক অপরিাপ্ত আনন্দ-সাগরে অভিষিক্ত হইরাছিলেন । এইরূপ স্নেহের আখড়াই স্থাপিত হইলে ব্যবসায়ী-দিগের আখড়ায়ের দল একেবারে উঠিয়া গেল ।”

দ্বিতীয় গল্পটি এইঃ—তাঁহার “বার্দ্ধক্য সময়ে একদিবস রাজা বরদাকর্ষ রায় বাহাদুর নিধুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন—‘মহাশয়, আমি একটি টপ্পার মোহাড়া রচনা করিয়াছি, কিন্তু অনেক দিবস ইহার অবশিষ্ট অংশ কিছুই হয় নাই।’—ইহাতে নিধুবাবু কহিলেন,—‘সে মোহাড়া কি ?’ তখন রাজাকৃত মোহাড়া পাঠ হইল, যথা,—

‘মনে করি পিরীতি না করি’

নিধুবাবুর অবশিষ্ট অংশ—

‘সকল হুঃখের মূল প্রণয়ে চাতুরী ।

শ্রাম-অকর্শনে যত ব্রজপুর-নারী,

জলিত বিরহানলে দিবা-বিভাবরী ॥

বরদা বিধান এই বুঝি বিচারি

প্রেমসুখ যত হুঃখ হরি হরি হরি ॥”

নিধুবাবুর এই গানের পুস্তকে নিধুবাবুর লিখিত একটি ভূমিকাও আছে । এই ‘ভূমিকা’ পড়িয়া তাঁহার পুস্তকখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও পুস্তক-প্রকাশের উদ্দেশ্য জানিতে পারা যায় । বাঙ্গালা পুস্তকে বাঙ্গালীর লিখিত ভূমিকা—এই দেড় শত বৎসর পরেও, আধুনিক ‘ভূমিকা’ লেখকগণের প্রণিধানযোগ্য । কারণ, সে ‘ভূমিকা’ প্রকৃত ভূমিকাই বটে,—তাহাতে বিজ্ঞাপনের গন্ধ বা বিজ্ঞা-আহিরের বিকট চেঁচা দেখিতে পাওয়া যায় না । আমরা নিধু-লিখিত সেই ভূমিকাটি পাঠক-বর্গকে এখানে উপহার দিয়া তাঁহার জীবন-কথা এইখানে শেষ করিলাম । আগামী বারে তাঁহার সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য-বিস্লেষণের প্রয়াস পাইব ।

‘গীতরত্নে’র ভূমিকা ।

“এই পশ্চাতের লিপিত গীত সকল বহু দিবসাবধি সুন্দররূপে ব্যক্ত থাকিতে কোন মত প্রকারে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে আমার বাসনা ছিল না, এক্ষণে সমরক্রমে এই কারণবশতঃ সর্বসাধারণ গুণগ্রাহিগণের অবগতির জন্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইল । এই গীত সকলের অল্প অল্প অংশ অঙ্কিত করিয়া আমার অজ্ঞাতে প্রচার করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎ কাল পরে তাহা হইতেও অধিকাংশ ভূরি ভূরি বর্ণাঙ্কিত এবং অঙ্কিত পদে পূর্ণিত করিয়া প্রচার করিল, এই নিমিত্ত বিবেচনা করিলাম, মংকৃত সঙ্গীত সকল এক্ষণেও বস্ত্রপি বাস্তবিক এবং শুদ্ধরূপে প্রকাশিত না হয়, তবে হানি আছে । এই আশঙ্কা-প্রযুক্ত প্রকাশ করিলাম । এই পুস্তকাস্তর্গত গীত সকল আত্মীয়-বন্ধুগণের এবং গানে-আমোদিত ব্যক্তিদিগের তুষ্টির কারণ রচনা করিয়াছিলাম, এক্ষণে প্রচারকরণের সেই আর এক মানসও রহিল । বঙ্গভাষায় এতাদৃশ গানের পুস্তক বস্ত্রপি সম্পূর্ণরূপে অভিনব নহে, তথাপি এ ভাষায় এমনতর গ্রন্থ অন্তের পুস্তকের দৃষ্টান্তমত কথা বাইতে পারে না, এবং এই গীত সকলে আলাপচারি-দ্বারা যে সকল তান্ বসিয়াছে, তাহা কোন হিন্দু-হানি খ্যাল ও টপ্পার সুরে গীত রচনা করিয়া দেওয়া এমনতর নহে ; অথচ গান করণ-মাত্রেরই রাগ-রাগিণীর রূপ অবিকল বুঝাইতেছে । সঙ্গীত-বিজ্ঞার সমুদায় রাগ ও রাগিণী অতি বিস্তর । কালে কালে তাহার অনেক লোপ হইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে বাহা আছে, তাহাও অনেকে জ্ঞাত নহে । বাহাই হউক, এই পুস্তকে সঙ্গীতশাস্ত্রসম্মত এবং সঙ্গীতে পণ্ডিতগণের কল্পিত নানা প্রকার রাগ-রাগিণীতে গান সকল প্রকাশিত হইল, এতস্তিন্ন রাগদ্বয়ে এবং রাগিণীদ্বয়ে মিলাইয়া কতক গীত প্রকাশ করিলাম, আর নির্ঘণ্ট-পত্রিকাতে ঐ রাগ এবং রাগিণীর সমস্ত নিরূপণ করিয়া অকারাদি রীতিক্রমে শ্রেণীবদ্ধ করিলাম, অনুমান করি যে, ইহাতে পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিতে পারিবেন ।”

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় ।

ভক্তিহীনা

সবে তুলিয়ে অঙ্গুলি, করে বলাবলি
হের, ভক্তিহীনা ঐ
ওহে করে লয়ে মালা—সংসারের জ্বালা
গণিতে নিপুণা নই ।
গঠিত মুরতি বসায় আসনে
ফুল জল অরপিয়া
তুমি জ্ঞান শুধু হে আমার বঁধু
তাহে পরিতৃপ্ত নহে হিয়া ।
কোথা সে কল্পনা অন্তরে-বাহিরে
চুরিলাম পাতি পাতি
যাহে নিরমিব ও মুরতি তব
পাষাণে সুষমা গাঁথি ।
কোথায় সে গান ?—যাহা-গাহি, প্রাণ
—করিব প্রতিষ্ঠা তোর
এমনি অধম এমনি অক্ষম
—মোরে করেছ হে মন-চোর ।
সে কি মম দোষ ? কিসে পরিতোষ
—তোমাতে করিব বল ।
যা, দিয়াছ নিয়ে রহেছি বসিয়ে
অঁাধি-পাতে ভরি জল ।
তোমারি সে দান ক্ষুদ্র হৃদয়-উত্তান
দেহ' এক নিরিবিলি
তুলি বনফুল সরম আকুল
ওহে তাহা দিয়ে ভরি ডালি ।

বসি সারা বেলা গাঁথি শত মালা
পুনঃ ফেলে দিই খুলে ধুলে—
না হয় চিকণ মনের মতন
হেরে ভাসি অঁখিজলে ।
মোরে, সৃষ্টি পুষ্পনারী মানাইলে হারি
দাঁড়ায়ে অঁখির আগে
সব ভুলে যাই আপনা হারাই
বঁধু, নেহারি শ্রীঅঙ্গরাগে !
আছে বটে জবা, মন-বন-প্রভা
হৃদি রক্তরাগে ভরা !
আছে স্নকোমল-প্রেম-বিস্মদল
সুশ্রামল মনোহরা !
আছে আকুলতা-সূতে সখা গাঁথা
ভাবের প্রসূনহার ।
কিন্তু মনোমিত হয় না'ক সে ত,
কি সে দিব উপহার ।
ওহে স'বার উপর আছে মনোহর
মুগধ এ হিয়া মোর ।
তব অনুরাগে তব রূপরাগে
বাহা নিশি দিশি সদা ভোর ।
সদা সর্ববক্ষণ এ রূপে নয়ন
যদি হে ভরিয়ে রাখ ।
শুধু—হাস, সুধাহাসি হেরি রূপরাশি !—
আমি, পূজিতে পারিব না'ক ।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ।

স্বামী

(পূৰ্ণ-প্রকাশিতের পর)

হাত দিয়ে পাখটা ধ'রে ফেলে বল্‌লুম, “এ তুমি কি কর্‌চ ?”

তিনি বল্‌লেন, “কথা কইতে হবে না, বুঝোও ; ছেপে থাকলে মাথাধরা ছাড়বে না।”

আমি বল্‌লুম, “আমার মাথা ধরেছে, কে তোমাকে বল্‌লে ?”

তিনি একটু হেসে জবাব দিলেন, “কেউ বলেনি, আমি হাত গুণ্‌তে জানি। কারো মাথা ধবুলেই টের পাই।”

বল্‌লুম, “তা' হ'লে ত অল্প দিনও পেয়েছ বল ? মাথা ত শুধু আমার আজই ধরেনি।”

তিনি আবার একটু হেসে বল্‌লেন, “রোজই পেয়েছি। কিন্তু এখন একটু বুঝাবে, না, কথা কবে ?”

বল্‌লুম, “মাথা আমার ছেড়ে গেছে, আর বুঝাবো না।”

তিনি বল্‌লেন, “তবে সবুর কর, তোমার ওষুধটা কপালে লাগিয়ে দিই”, ব'লে উঠে গিয়ে কি একটা নিম্নে এসে ধীরে ধীরে আমার কপালে ঘষে দিতে লাগলেন। আমি ঠিক ইচ্ছে করেই যে কর্‌লুম, তা নয়, কিন্তু আমার ডান হাতটা কেমন ক'রে তাঁর কোলের ওপর গিয়ে পড়তেই তিনি একটা হাত দিয়ে সেটা চেপে ধ'রে রাখলেন। হয় ত, একবার একটু জোর করেও ছিলুম। কিন্তু সে জোর আপনিই কোথায় মিলিয়ে গেল। হ্রস্ব ছেলেকে মা যখন কোলে টেনে নিয়ে জোর ক'রে ধ'রে রাখেন, তখন, বাইরে থেকে হয় ত সেটাকে একটুখানি অত্যাচারের মতও দেখায়, কিন্তু সে অত্যাচারের মধ্যে শিশুর ঘুমিয়ে পড়তে বাধে না।

বাইরের লোক বাই বসুক, শিশু বোঝে, ওইটেই তার সব চেয়ে নিরাপদ স্থান। আমার এই জড়পিণ্ড হাতটায়ও বোধ করি সেই জ্ঞানই ছিল, নইলে কি কোরে সে টের পেলে, নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে প'ড়ে থাকবার এমন আশ্রয় তার আর নেই।

তার পরে তিনি আন্তে আন্তে আমার কপালে হাত বুলাতে লাগলেন, আমি চুপ ক'রে পড়ে রইলুম। আমি এর বেশী আর বোল্‌ব না। আমার সেই প্রথম রাজির আনন্দস্মৃতি—সে আমার, একেবারে আমারই থাক্‌। আমি কাউকে প্রাণ ধ'রে তার ভাগ দিতে পার্‌ব না।

কিন্তু আমি ত জানুহুম, ভালবাসার যা' কিছু, সে আমি শিখে এবং শেষ ক'রে দিয়ে খুশরবাড়ী এসেছি। কিন্তু সে শেখা যে ডাঙায় হাত-পা ছুড়ে সাঁতার শেখার মত ভুল শেখা, এই সোজা কথাটা সে দিন যদি টের পেতুম! স্বামীর কোলের ওপর থেকে আমার হাতখানা যে তার সর্কাক দিয়ে শোষণ করে, এই কথাটাই আমার বুকের ভেতর পৌছে দেবার চেষ্টা করছিল, এই খবরটা যদি সে দিন আমার কাছে ধরা পড়ত!

সকালে ঘুম ভেঙে দেখলুম, স্বামী ঘরে নেই, কখন উঠে গেছেন। হঠাৎ মনে হ'ল, স্বপন দেখিনি ত? কিন্তু চেয়ে দেখি, সেই ওষুধের শিশিটা তখনও শিয়রের কাছে রয়েছে। কি যে মনে হ'ল, এটা বার বার মাথার ঠেকিয়ে তবে কুলুঙ্গিতে তুলে রেখে বাইরে এলুম।

শাওড়ী ঠাকরণ সেই দিন থেকে আমার ওপর যে কড়া নজর রাখছিলেন, সে আমি টের পেতুম। আমিও ভেবেছিলুম, মরুক গে, আমি কোন কথার আর থাকব না। তা'ছাড়া ছদিন আস্তে-না-আস্তে স্বামীর খাওয়া-পরা নিয়ে ঝগড়া,—ছি ছি, লোকে শুনলেই বা বলবে কি?

কিন্তু কবে যে এর মধ্যেই আমার মনের ওপর দাগ প'ড়ে গিয়েছিল, কবে যে তাঁর খাওয়া-পরা নিয়ে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে উঠেছিলুম, সে আমি নিজেই জানুহুম না। তাই, দুটো দিন যেতে-না-যেতেই আবার একদিন ঝগড়া ক'রে ফেললুম।

আমার স্বামীর কে একজন আড়ংদার বন্ধু সে দিন সকালে মস্ত একটা রুইমাছ পাঠিয়েছিলেন। স্বান করতে পুকুরে যাচ্ছি, দেখি, বারান্দার ওপর সবাই জড় হয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। কাছে এসে দাঁড়ালুম। মাছ কোটা হয়ে গেছে। মেধ জা' তরকারি কুটচেন, শাওড়ী ব'লে ব'লে দিচ্ছেন;—এটা মাছের ঝোলের কুটনো, ওটা মাছের ডালনার কুটনো, ওটা মাছের অঙ্কুরের কুটনো,—এমনি সমস্তই প্রায় আঁশ রান্না। আজ একাদনী—তাঁর এবং বিধবা মেয়ের খাবার হান্নামা নেই, কিন্তু আমার স্বামীর জন্তে কোন ব্যবস্থাই দেখলুম না। তিনি বৈষ্ণব মানুষ, মাছ-মাংস ছুঁতেন না। একটু ডাল, দুটো ভাজাভুজি, একটুখানি অঙ্কুর হলেই তাঁর খাওয়া হ'ত। অথচ, ডাল খেতেও তিনি ভালবাসতেন। এক আধদিন একটু ডাল তরকারি হ'লে তাঁর আত্মাদের সীমা থাকত না, তাও দেখেছি।

বললুম, “ওঁর জন্তে কি হচ্ছে মা?”

শাওড়ী বললেন, “আজ আর সময় কৈ বউমা? তার জন্তে দুটো আলু-উচ্ছে ভাতে দিতে ব'লে দিয়েছি,—তার পরে একটু ছধ দেব'খন।”

বললুম, “সময় নেই কেন মা?”

শাশুড়ী বিরক্ত হয়ে বললেন, “দেখতেই ত পাচ্চ বউমা। এতগুলো আঁশ রান্না, হতেই ত দশটা—এগারোটা বেজে যাবে। আজ আমার অধিলের (বেজ দেবর) ছ’টার জন্ত বন্ধবান্ধব খাবে, তারা হ’ল সব অপিসার মানুষ, দশটার মধ্যে খাওয়া না হ’লে পিঠি প’ড়ে সারাদিন আর খাওয়াই হবে না। এর ওপর আবার নিরামিষ রান্না করতে গেলে ত রাঁধুনী বাঁচে না। তার প্রানটাও ত দেখতে হবে বাছা!”

রাগে সর্সাক রি-রি ক’রে জলতে লাগল। তবু কোনমতে আত্মসংবরণ ক’রে বললুম, “ওধু আনু-উচ্ছে তাতে দিয়ে কি কেউ খেতে পারে মা? একটুখানি ডাল রাঁগবারও কি সময় হ’ত না?”

তিনি আমার মুখপানে কটমট ক’রে চেয়ে বললেন, “তোমার সঙ্গে তরু করতে পারিনে বাছা, আমার কাজ আছে।”

এতক্ষণ রাগ সামলেছিলুম, আর পারলুম না। ব’লে ফেললুম, “কাজ সকলেরি আছে মা! তিনি তিরিশ টাকার কেরাগী-গিরী করেন না ব’লে কুলি-মজুর ব’লে তোমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারো, কিন্তু আমি ত পারিনে! আমি ওই দিয়ে তাঁকে খেতে দেব না। রাঁধুনী রাঁধতে না পারে, আমি বাচ্চি।”

শাশুড়ী খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আমার পানে চেয়ে থেকে বললেন, “তুমি ত কাল এলে বউমা, এতদিন তার কি ক’রে খাওয়া হ’ত শুনি?”

বললুম, “সে খোঁজে আমার দরকার নেই। কিন্তু কাল এলেও আমি কচি খুকী নই মা। এখন থেকে সে সব হ’তে দিতে পারবে না।” রান্না-ঘরে ঢুকে রাঁধুনীকে বললুম, “বড়বাবুর জন্তে নিরামিষ ডাল-ডালনা, অম্বল হবে। তুমি না পারো, একটা উনুন ছেড়ে দাও, আমি এসে রাঁধ’চি,” ব’লে আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না ক’রে স্নান করতে চ’লে গেলুম।

স্বামীর বিছানা আমি রোজ নিজের হাতেই কর্তুম। এই ধপ্পে শাদা বিছানাটির উপর ভেতরে ভেতরে আমার যে একটা লোভ জন্মাচ্ছিল, হঠাৎ, এত দিনের পর আজ বিছানা করবার সময় সে কথা জানতে পেরে নিজের কাছেই যেন লজ্জায় ম’রে গেলুম।

ঘড়ীতে বারোটা বাজতে তিনি শুতে এলেন। কেন যে এত রাত পর্যন্ত জেগে ব’সে বই পড়’ছিলুম, তাঁর পারের শব্দ সে খবর আজ এমনি স্পষ্ট ক’রে আমার কানে কানে ব’লে দিলে যে, লজ্জায় মুখ তুলে চাইতেও পারলুম না।

স্বামী বললেন, “এখনো শোওনি যে?”

আমি বই থেকে মুখ তুলে ঘড়ীর পানে তাকিয়ে যেন চমকে উঠলুম—তাইত, বারোটা বেজে গেছে!

কিন্তু, অন্তর্যামী দেখছিলেন, আমি প্রাচ মিনিট অন্তর বড়ী দেখেছি।

স্বামী শস্যায় ব'সে একটু হেসে বললেন, “আজ আবার কি হান্সামা বাধিয়েছিলে?”

বল্লুম, “কে বললে?”

তিনি বললেন, “সে দিন তোমাকে ত বলেছি, আমি হাত ঝুণ্ডে জানি।”

বল্লুম, “জানলে ভালই। কিন্তু, তোমার গোয়েন্দার নাম না বল, তিনি কি কি দোষ আমার দিলেন শুনি?”

তিনি বললেন, “গোয়েন্দা দোষ দেয়নি, আমি দিচ্ছি। আচ্ছা, জিজ্ঞেসা করি, এত অল্পে তোমার এত রাগ হয় কেন?”

বল্লুম, “অল্প? তুমি কি ভাবো, তোমাদের ভায়-অন্ডায়ের বাটখারা দিয়েই সকলের ওজন চলবে? কিন্তু তা'ও বন্ট; তুমি যে এত বন্ট, এ অত্যাচার চোখে দেখলে তোমারও রাগ হ'ত।”

তিনি আবার একটু হাসলেন; বললেন, “আমি বোষ্টম, আমার ত নিজের উপর অত্যাচারে রাগ করতে নেই। মহাপ্রভু আমাদের গাছের মত সহিষ্ণু হ'তে বলেছেন, আর, তোমাকেও এখন থেকে তাই হ'তে হবে।”

“কেন, আমার অপরাধ?”

“বৈষ্ণবের জ্ঞী, এই মাত্র তোমার অপরাধ।”

বল্লুম, “তা' হ'তে পারে, কিন্তু, গাছের মত অন্তায় সহ্য করা আমার কাজ নয়, তা সে যে প্রভুই আদেশ করুন। তা ছাড়া যে লোক ভগবান্ পর্যন্ত মানে না, তার কাছে আবার মহাপ্রভু কি?”

স্বামী হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন; বললেন, “কে ভগবান্ মানে না? তুমি?”

বল্লুম, “হাঁ, আমি।”

তিনি বললেন, “ভগবান্ মান না কেন?”

বল্লুম, “নেই ব'লে মানিনে। মিথ্যে ব'লে মানিনে।”

আমি লক্ষ্য ক'রে দেখছিলাম, আমার স্বামীর হাসিমুখখানি ধীরে ধীরে স্তান হয়ে আসছিল, এই কথার পরে সে মুখ একেবারে যেন ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল। একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললেন, “ওনেছিলুম, তোমার মামা না কি নিজেকে নাস্তিক বলতেন—”

আমি মাঝখানেই ভুল গুধরে দিয়ে বল্লুম, “না, তিনি নিজেকে নাস্তিক বলতেন না, agnostic বলতেন।”

স্বামী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেসা করলেন, “সে আবার কি?”

আমি বল্লুম, “agnostic তারা, যারা ঈশ্বর আছেন বা নেই—কোন কথাই বলে না।

কথাটা শেষ না হতেই স্বামী ব'লে উঠলেন, “থাক্ এ সব আলোচনা। আমার সামনে তুমি কোন দিন আর এ কথা মুখে এনো না।”

তবুও তর্ক করতে বাচ্ছিলুম, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মুখপানে চেয়ে আর আমার মুখে কথা যোগালো না। ভগবানের ওপর তাঁর অঙ্গা বিশ্বাস আমি জানতুম, কিন্তু, কোন মানুষ যে আর এক জনের মুখ থেকে তাঁর অস্বীকার শুনে এত ব্যথা পেতে পারে, এ ধারণাই আমার ছিল না। এই নিরে আমার বসবার ঘরে অনেক তর্ক নিজেও করেছি, অপরকেও করতে শুনেছি, রাগা-রাগি হয়ে যেতে বহুবার দেখেছি, কিন্তু এমন বেদনার বিবর্ণ হয়ে যেতে কাউকে দেখিনি। আমি নিজেও ব্যথা বড় কম পেলুম না, কিন্তু কোন তর্ক না ক’রে এ ভাবে আমার মুখ বন্ধ ক’রে দেওয়ার অপ-মানে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কিন্তু ভাবি অপমানের পালাটা এর ওপর দিয়েই কেন সে দিন শেষ হ’ল না।

যে মাহুরটা পেতে আমি নীচে শুতুম, সেটা ঘরের কোণে গুটোনো থাকত ; আজ কে যে সরিয়ে রেখেছিল, বলতে পারিনে। খুঁজে পাচ্চিনে দেখে তিনি নিজে বিছানা থেকে একটা তোষক তুলে বললেন, “আজ এইটে পেতে শোও। এত রাত্রে কোথা আর খুঁজে বেড়াবে বল!”

তাঁর কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের লেশমাত্র ছিল না। তবুও কথাটা বেন অপমা-নের শূল হয়ে আমার বুকে বিঁধল। রোজ ত আমি নীচেই শুই। সামান্য এক-খানা মাহুর পেতে যেমন তেমন ভাবে রাত্রিযাপন করাটাই ত ছিল আমার সব চেয়ে বড় গর্ব। কিন্তু স্বামীর ছোট্ট ছোট্ট কথার যে আজ আমার সেই গর্ব ঠিক তত বড় লাঞ্ছনার রূপান্তরিত হয়ে দেখা দেবে, এ কে ভেবেছিল ?

অন্তত শোবার উপকরণ স্বামীর হাত থেকেই হাত পেতে নিলুম, কিন্তু, শোবা-মাত্রই কান্নার ঢেউ বেন আমার গলা পর্যন্ত ফেনিয়ে উঠল। জানিনে, তিনি শুন্তে গিয়েছিলেন কি না। সকাল হতে না হতেই তাড়াতাড়ি বিছানা তুলে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করছি, তিনি ডেকে বললেন, “আজ এত ভোরে উঠলে যে?”

বললুম, “ঘুম ভেঙে গেল, তাই বাইরে যাচ্ছি।”

বললেন, “একটা কথা আমার শুন্বে?”

রাগে, অভিমানে সর্কান্ন ভরে গেল, বললুম, “তোমার কথা কি আমি শুনিবে?”

আমার মুখপানে চেয়ে তিনি একটু হেসে বললেন, “শোন ; আচ্ছা, তা’হলে কাছে এস, বলি।”

বললুম, “আমি ন্ত কালো নই, এখানে দাঁড়িয়েই শুন্তে পাব।”

“পাবে না গো, পাবে না,” ব’লেই তিনি হঠাৎ স্রুখে ঝুঁকে পড়ে আমার

হাতটা ধ'রে ফেললেন। আমি ছোর ক'রে ছাড়াতে গেলুম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে পারব কেন, একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে হাত দিয়ে ছোর ক'রে আমার মুখ তুলে ধ'রে বললেন, “যারা ভগবান্ মানে, তারা কি বলে জানো? তারা বলে, স্বামীর কাছে কিছুতে মিথ্যে বলতে নেই।”

আমি বললুম, “কিন্তু যারা ভগবান্ মানে না, তারা বলে, কারও কাছেই মিথ্যে বলতে নেই।”

স্বামী হেসে বললেন, “বটে! কিন্তু তাই যদি হয়, অত বড় মিথ্যে কথাটা কাল কি ক'রে মুখে আনলে বল ত? কি ক'রে বললে, ভগবান্ তুমি মানো না?”

হঠাৎ মনে হ'ল, এত আশা ক'রে বুঝি কেউ কখনো কারও সঙ্গে কথা করনি। তাই, বলতে মুখে বাধতে লাগল, কিন্তু, তবু ত পোড়া অহঙ্কার গেল না, ব'লে ফেললুম, “ভগবান্ মানি বললেই বুঝি সত্যি কথা বলা হ'ত? আমাকে আটকে রাখলে কেন? আর কোন কথা আছে?”

তিনি স্নানমুখে আস্তে আস্তে বললেন, “আর একটা কথা—মায়ের কাছে আজ মাপ চেরো।”

আমার সর্বাঙ্গ রাগে জলে উঠল; বললুম, “মাপ চাওয়াটা কি ছেলেখেলা, না, তার কোন অর্থ আছে?”

স্বামী বললেন, “অর্থ তার এই যে, সেটা তোমার কর্তব্য।”

বললুম, “তোমাদের ভগবান্ বুঝি বলেন, যে নিরপরাধ, সে গিয়ে অপরাধীর নিকট ক্ষমা চেয়ে কর্তব্য করুক?”

স্বামী আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার মুখের পানে ধানিকঙ্কণ চূপ ক'রে চেয়ে রইলেন। তার পরে ধীরে ধীরে বললেন, “ভগবানের নাম নিয়ে তামাসা করতে নেই, এ কথা ভবিষ্যতে কোন দিন আর যেন মনে ক'রে দিতে আসায় না হয়। আমি তর্ক করতে ভালবাসিনে,—মায়ের কাছে মাপ চাইতে না পারো, তাঁর সঙ্গে আর কখনও বিবাদ করতে যেরো না।”

বললুম, “কেন শুন্তে পাইনে?”

তিনি বললেন, “না। নিষেধ করা আমার কর্তব্য, তাই নিষেধ ক'রে দিলাম।” এই ব'লে তিনি বাইরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। আমি আর সইতে পারলুম না, বললুম, “কর্তব্যজ্ঞানটা তোমাদেরই যদি এত বেশী, সে কি আর কারও নেই? আমিও ত মানুষ, বাড়ীর মধ্যে আমারও ত একটা কর্তব্য আছে? তা যদি তোমাদের ভাল না লাগে, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। থাকলেই বিবাদ হবে, এ নিশ্চয় ব'লে দিচ্ছি।”

তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, “তা’হলে গুরুজনের সঙ্গে বিবাদ করাই বুঝি তোমার কর্তব্য ? সে যদি হয়, যে দিন ইচ্ছে বাপের বাড়ী যাও, আমাদের কোন আপত্তি নেই।”

স্বামী চ’লে গেলেন, আমি সেইখানেই ধপ্ ক’রে ব’নে পড়লুম। মুখ দিয়ে শুধু আমার বার হ’ল, ‘হায় রে ! বার জন্তে চুরি করি, সেই বলে চোর !’

সমস্ত সকালটা যে আমার কি ক’রে কাটল, সে আমিই জানি। কিন্তু ছপুর বেলা স্বামীর মুখ থেকেই যে কথা শুন্লুম, তাতে বিশ্বাসের আর অবধি রহিল না।

খেতে বসিয়ে শাওড়ী বললেন, “কাল তোমাকে বলিনি বাছা, কিন্তু এ বউ নিয়ে ত আর আমি ঘর করতে পারিনি ঘনশ্রাম। কালকের কাণ্ড ত শুনেচ ?”

স্বামী বললেন, “শুনেচি মা !”

শাওড়ী বললেন, “তা হ’লে যা হোক, এর একটা ব্যবস্থা কর।”

স্বামী একটুখানি হেসে বললেন, “ব্যবস্থা করার মালিক ত তুমি নিজেই মা।”

শাওড়ী বললেন, “তা কি আর পারিনি বাছা, একদিনেই পারি। এত বড় ধাড়ি মেয়ে আমার ত বিয়ে দিতেই ইচ্ছে ছিল না। শুধু—”

স্বামী বললেন, “সে কথা ভেবে আর লাভ কি মা ? আর ভালমনস্ব বাই হোক, বাড়ীর বড় বৌকে ত আর ফেলতে পারবে না ! ও চায় আমি একটু ভালো খাই-দাই। ভাল, সে ব্যবস্থাই কেন ক’রে দাও না মা !”

শাওড়ী বললেন, “অবাক্ করলি ঘনশ্রাম। আমি কি ভালমনস্ব খেতে দিতে জানিনে যে, আজ ও এসে আমাদের শিখিয়ে দেবে ? আর তোমারই বা দোষ কি বাবা ? অত বড় বৌ যে দিন ঘরে এসেচে, সেই দিনই জানতে পেরেচি, সংসার এবার ভাঙল। তা বাছা, আমার গিন্নীপনায় আর না যদি চলে, ওঁর হাতেই না হয় ভাঁড়ারের চাবি দিচ্ছি। কৈ গো, বড় বউমা, বেরিয়ে এসো গো, চাবি নিয়ে যাও —” ব’লে শাওড়ী ঝনাৎ ক’রে চাবির গোছাটা রান্নাঘরের দাওয়ার ওপর ফেলে দিলেন।

স্বামী আর একটি কথাও কইলেন না ; মুখ বুজে ভাত খেয়ে বাইরে বাবার সমর বলতে বলতে গেলেন, “সব মেয়েমানুষেরই ঐ এক রোগ, কাকেই বা কি বলি !”

আমার বুকের মধ্যে যেন আহ্লাদের জোয়ার ডেকে উঠল। আমি কেন যে ঝগড়া করেচি, তা’ উনি জানতে পেরেছেন, এই কথাটা শতবার মুখে আবৃত্তি ক’রে সহস্র রকমে মনের মধ্যে অনুভব করতে লাগলুম। সকালের সমস্ত ব্যথা আমার বেন ধুয়ে মুছে গেল।

এখন কতবার মনে হয়, ছেলেবেলা থেকে কাজের অকাজের কত বই প’ড়ে কত কথাই ত শিখেছিলুম, কিন্তু এ কথাটা কোথাও যদি শিখতে পেতুম, পৃথিবীতে তুচ্ছ

একটি কথা শুছিয়ে না বলবার দোষে, ছোট্ট একটি কথা মুখ কুটে না বলবার অপরাধে, কত শত বর-সংসারই না ছার-খার হয়ে যায়। হয় ত, তা'হলে এ কাহিনী লেখবার আজ আবশ্যকই হ'ত না।

তাই ত বলি ওরে হতভাগী! এত শিখেছিলি, এটা শুধু শিখিস্নি, মেয়েমানুষের কার মানে মান! কার হতাদরে তোদের মানের অটালিকা তাসের অটালিকার মতই এক নিমিষে একটা ফুঁয়ে ধুলিসাং হয়ে যায়!

তবে, তোর কপাল পুড়বে না ত আর পুড়বে কার! সমস্ত সন্ধ্যাবেলাটা ঘরে খিল দিয়ে যদি সাজ-সজ্জাই করি, অসময়ে ঘুমের ভান ক'রে যদি স্বামীর পালঙ্কের একধারে গিয়ে শুতেই পারি, তাঁকে একটা সাড়া দিতেই কি তোর এমন কণ্ঠরোধ হ'ল? তিনি ঘরে ঢুকে বিধায়, সন্ধ্যাে বার বার ইতস্ততঃ ক'রে যখন বেরিয়ে গেলেন, একটা হাত বাড়িয়ে তাঁর হাতটা ধ'রে ফেলতেই কি তোর হাতে পক্ষাঘাত হ'ল? সেই ত সারারাত্রি ধ'রে মাটিতে প'ড়ে প'ড়ে কাঁদলি, একবার মুখ কুটে বলতেই কি শুধু এত বাধা হ'ল যে, আচ্ছা, তুমি তোমার বিছানাতে এসে শোও, আমি আমার ভূমি-শয্যাতেই না হয় ফিরে যাচ্ছি।

অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙল, মনে হ'ল যেন অর হয়েচে। উঠে বাইরে যাচ্ছি, স্বামী এসে ঘরে ঢুকলেন। আমি মুখ নীচু ক'রে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলুম, তিনি বললেন, “তোমাদের গ্রামের নরেন বাবু এসেছেন।”

বুকের ভেতরটার ধক্ ক'রে উঠল।

স্বামী বলতে লাগলেন, “আমাদের নিখিলের তিনি কলেজের বন্ধু। চিতোর বিলে হাঁস শীকার করবার জন্তে কলকাতার থাকতে সে বৃষ্টি কবে নেমন্তন্ন ক'রে এসেছিল, তাই এসেছেন। তুমিও ত তাঁকে বেশ চেনো, না?”

উঃ—মানুষের স্পর্কার কি একটা সীমা থাকতেও নেই!

ঘাড় নেড়ে জানালুম, আছে। কিন্তু, ঘণায় লজ্জায় নখ থেকে চুল পর্যন্ত আমার তেতো হয়ে গেল।

স্বামী বললেন, “তোমার প্রতিবেশীর আদর-বন্ধের ভার তোমাকেই নিতে হবে।”

ওনে এমনি চমকে উঠলুম যে, ভয় হ'ল, হয় ত আমার চমকটা তাঁর চোখে পড়েচে। কিন্তু এদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। বললেন, “কাল রাত্রি থেকেই মায়ের ষাতটা ভয়ানক বেড়েচে। এ দিকে নিখিলও বাড়ী নেই, অখিলকেও তার আফিস করতে হবে।”

মুখ নীচু কোরে কোন মতে বললুম, “তুমি?”

“আমার কিছুতে থাকবার জো নেই। রায়গঞ্জে পাট কিনতে না গেলেই নয়।”

“কখন ফিরবে?”

“ফিরতে আবার কাল এই সময়। রাত্রিটা সেখানেই থাকতে হবে।”

“তা হ’লে আর কোথাও তাঁকে যেতে বল। আমি বউ-মামুষ, গুরবাড়ীতে তাঁর সামনে বা’র হ’তে পারব না।”

স্বামী বললেন, “ছি, তা কি হয়! আমি সমস্ত ঠিক ক’রে দিয়ে যাচ্ছি, তুমি সাম্মনে না বা’র হও, আড়াল থেকে শুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ো।” এই ব’লে তিনি বাইরে চলে গেলেন।

সেই দিন পাঁচমাস পরে আবার নরেনকে দেখলুম। ছপূরবেলা সে খেতে বসেছিল, আমি রান্নাঘরের দোরের আড়ালে ব’সে কিছুতেই চোখের কোতুল খামাতে পারলুম না। কিন্তু চাইবামাত্রই আমার সমস্ত মনটা এমন একপ্রকার বিভ্রাৎ ভরে গেল যে, সে পরকে বোঝানো শক্ত। মস্ত একটা তেঁতুলবিছে এঁকে-বঁকে চ’লে যেতে দেখলে সর্কাক্ষ যেমন কোরে ওঠে, অথচ যতক্ষণ সেটা দেখা যায়, চোখ ফিরতে পারা যায় না, ঠিক তেমনি কোরেই আমি নরেনের পানে চেয়ে রইলুম। ছি ছি, ওর ওই দেহটাকে কি কোরে বে একদিন ছুঁয়েচি, মনে পড়তেই সর্কাক্ষরীয়ে কাঁটা দিয়ে মাথার চুল পর্যন্ত আমার খাড়া হয়ে উঠল।

খেতে খেতে সে মাঝে মাঝে চোখ তুলে চারিদিকে কি খুঁজছিল, সে আমি জানি। আমাদের রাঁধুনী কি একটা তরকারি দিতে গেলে, সে হঠাৎ যেন ভারি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে, “হাঁ গা, তোমাদের বড় বো বে বড় বেকলো না?”

রাঁধুনী জানত যে, ইনি আমাদের বাপের বাড়ীর লোক—গ্রামের জমিদার। তাই বোধ করি খুশী করবার জন্তই হাসির ভঙ্গীতে একঝুড়ি মিথ্যে কথা ব’লে তার মন জোগালে। বললে, “কি জানি বাবু, বড় বোমার ভারি লজ্জা—নইলে, তিনিই ত আপনার জন্তে আজ নিজে রাঁধলেন। রান্নাঘরে ব’সে তিনিই ত আপনার সব খাবার এগিয়ে শুছিয়ে দিচ্ছেন। লজ্জা কোরে কিন্তু কম-ধম খাবেন না বাবু, তা’হলে তিনি বড় রাগ করবেন, আমাকে ব’লে দিলেন।”

মামুষের সরতানীর অস্ত নেই, ছঃসাহসেরও অবশি নেই। সে স্বচ্ছন্দে স্নেহের হাসিতে মুখখানা রান্নাঘরের দিকে তুলে চোঁচিয়ে বললে, “আমার কাছে তোঁর আবার লজ্জা কি রে সছ? আর আর, বেরিয়ে আর। অনেক দিন দেখিনি, একবার দেখি।”

কাঁঠ হয়ে সেই দরজা ধ’রে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার মেজাজটাও রান্নাঘরে ছিল, ঠাট্টা ক’রে বললে, “দিদির সবতাতেই বাড়াবাড়ি। পাড়ার লোক, ভাইয়ের মত—বিয়ের দিন পর্যন্ত সাম্মনে বেরিয়েচ, কথা কয়েচ, আর আজই যত লজ্জা? একবার দেখতে চাচ্ছেন, যাও না।”

এর আর জবাব দেব কি ?

বেলা তখন দুটো আড়াইটে, বাড়ীর সবাই বে যার ঘরে শুয়েচে, চাকরটা এসে বাইরে থেকে বললে, “বাবু পান চাইলেন মা।”

“কে বাবু ?”

“নরেন বাবু।”

“তিনি শীকার করতে যাননি ?”

“কই না, বৈঠকখানার গুয়ে আছেন বে।”

তা’হলে শীকারের ছলটাও মিথ্যে।

পান পাঠিয়ে দিয়ে জানালায় এসে বসলুম। এ বাড়ীতে আসা পর্য্যন্ত এই জানালাটিই ছিল আমার সব চেয়ে প্রিয়। নীচেই ফুল বাগান, এক ঝাড় চামেলী ফুলের গাছ দিয়ে সম্মুখটা ঢাকা; এখানে বসলে বাইরের সমস্ত দেখা যায়; কিন্তু বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না।

আমি মানুষের মনের এই বড় একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখি, যে বিপদটা হঠাৎ তার ঘাড়ের এসে পোড়ে তাকে একান্ত অস্থির ও উদ্বিগ্ন ক’রে দিয়ে যায়, অনেক সময়ে সে তাকেই একপাশে ঠেলে দিয়ে একটা তুচ্ছ কথা চিন্তা করতে ব’সে যায়। বাইরে পান পাঠিয়ে দিয়ে আমি নরেনের কথাই ভাবতে বসেছিলুম সত্যি, কিন্তু, কখন কোন্ কক্ষিকে যে আমার স্বামী এসে আমার সমস্ত মন জুড়ে ব’সে গিয়েছিলেন, সে আমি টেরও পাইনি।

আমার স্বামীকে আমি যত দেখেছিলাম, ততই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছিলুম। সব চেয়ে আশ্চর্য্য হতুম—তার ক্ষমা করবার ক্ষমতা দেখে। আগে আগে মনে হ’ত, এ তাঁর দুর্ব্বলতা, পুরুষত্বের অভাব। শাসন করবার সাধ্য নেই ব’লেই ক্ষমা করেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল, ততই টের পাচ্ছিলেম, যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি দৃঢ়। আমাকে যে তিনি ভেতরে ভেতরে কত ভালবেসেচেন, সে’ত আমি অসংশয়ে অনুভব করতে পারি, কিন্তু, সে ভালবাসার ওপর এতটুকু জোর খাটাবার সাহস আমার ত হয় না।

একদিন কথায় কথায় বলেছিলাম, “আচ্ছা, তুমিই ত বাড়ীর সর্ব্বস্ব, কিন্তু, তোমাকে যে বাড়ীতুচ্ছ সবাই অযত্ন অবহেলা করে, এমন কি, অত্যাচার করে, এ কি তুমি ইচ্ছে করলে শাসন ক’রে দিতে পার না ?” তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, “কৈ, কেউ ত অযত্ন করে না।” কিন্তু আমি নিশ্চয় জানতুম, কিছুই তাঁর অবিদিত ছিল না।

বললাম, “আচ্ছা, যত বড় দোষই হোক, তুমি কি সব মাপ করতে পারো ?”

তিনি তেমনি হাসিমুখে বললেন, “যে সত্যি ক্ষমা চায়, তাকে করতেই হবে—এ যে আমাদের মহাশত্রুর আদেশ গো।”

তাই এক একদিন চুপ ক'রে ব'সে ভাবতুম, ভগবান্ যদি সত্যিই নেই, তা'হলে এত শক্তি, এত শাস্তি ইনি পেলেন কোথায়? এই যে আমি স্ত্রীর কর্তব্য এক-দিনের জন্যে করিনে, তবু ত তিনি কোন দিন স্বামীর জোর নিয়ে আমার অমর্যাদা অপমান করেন না !

আমাদের ঘরের কুলুঙ্গিতে একটি খেত-পাথরের গোরাক্ষমূর্তি ছিল, আমি কত রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখেছি, স্বামী বিছানার উপর শুক হয়ে ব'সে একদৃষ্টে তাঁর পানে চেয়ে আছেন, আর ছচক্ষু বয়ে অশ্রুর ধারা বয়ে যাচ্ছে। সময়ে সময়ে তাঁর মুখ দেখে আমারও যেন কারা আস্ত, মনে হ'ত, অমনি ক'রে একটা দিনও কাঁদতে পারলে বুঝি মনের অর্ধেক বেদনা ক'মে যাবে। পাশের কুলুঙ্গিতে তাঁর খানকয়েক বড় আদরের বই ছিল, তাঁর দেখাদেখি আমিও মাঝে মাঝে পড়তুম। লেখাগুলো যে আমি সত্যি ব'লে বিশ্বাস করতুম, তা নয়, তবুও, এমন কত দিন হয়েছে, কখন পড়ার মন লেগে গেছে, কখন বেলা বয়ে গেছে, কখন হু ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে গালের ওপর শুকিয়ে আছে, কিছুই ঠাণ্ডর পাই নি। কত দিন হিংসে পর্যন্ত হয়েছে, তাঁর মত আমিও যদি এগুলি সমস্ত সত্যি ব'লেই ভাবতে পারতুম !

কিছু দিন থেকে আমি বেশ টের পেতুম, কি একটা ব্যথা যেন প্রতিদিনই আমার বুকের মধ্যে জমা হয়ে উঠছিল। কিন্তু কেন, কিসের জন্তে, তা' কিছুতে হাতড়ে পেতুম না। শুধু মনে হ'ত, আমার যেন কেউ কোথাও নেই। ভাবতুম, মায়ের জন্তেই বুঝি ভেতরে ভেতরে মন কেমন করে, তাই কত দিন ঠিক করেছি, কালই পাঠিয়ে দিতে বোলব, কিন্তু যাই মনে হ'ত, এই ঘরটি ছেড়ে আর কোথাও যাবি, অমনি সমস্ত সংকল্প কোথায় যে ভেসে যেত, তাঁকে মুখ ফুটে বলাও হ'ত না।

মনে করলুম, যাই, কুলুঙ্গি থেকে বইখানা এনে একটু পড়ি। আজকাল এই বইখানি হয়েছিল আমার অনেক ছুঃখের সাথিনা। কিন্তু, উঠতে গিয়ে হঠাৎ আঁচলে একটা টান পড়তেই ফিরে চেয়ে নিজের চক্ষুকেই যেন বিশ্বাস হ'ল না। দেখি, আমার আঁচল ধ'রে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে নরেন। একটু হলেই চোঁচিয়ে ফেলে-ছিলুম আর কি ! সে কখন এসেচে, কতকণ এ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কিছুই জানতে পারিনি। কিন্তু কি ক'রে যে সে দিন আপনাকে সামলে ফেলেছিলুম, আমি আজও ভেবে পাইনে। ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম, “এখানে এসেচ কেন? শীকার করতে?”

নরেন বললে, “বোস, বল্চি।”

আমি জানালার ওপর ব'সে প'ড়ে বললুম, “শীকার করতে যাওনি কেন?”

নরেন বললে, “ঘনজাম বাবুর ছকুম পাইনি। বাবার সময় ব'লে গেলেন, আমরা বৈষ্ণব, আমাদের বাড়ী থেকে জীবহত্যা করা নিষেধ।”

চক্ষুর নিমিষে স্বামি-গর্বে আমার বুকখানা ফুলে উঠল। তিনি কোন কর্তব্যই ভোলেন না, সে দিকে তাঁর একবিন্দু হ্রস্বতা নেই। মনে মনে ভাব্‌নুম, এ লোকটা দেখে থাক্, আমার স্বামী কত বড়!

বল্‌নুম, “তা হ’লে বাড়ী ফিরে গেলে না কেন?”

সে লোকটা গরাদের ফাঁক দিয়ে থপ ক’রে আমার হাতটা চেপে ধ’রে বল্লে, “সহ, টাইফয়েড করে মরতে মরতে বেঁচে উঠে যখন শুন্‌লাম, তুমি পরের হয়েচ, আর আমার নেই, তখন বার বার ক’রে বল্‌নুম, ভগবান্, আমাকে বাঁচালে কেন? তোমার কাছে আমি এইটুকু বয়সের মধ্যে এমন কি পাপ করেচি—যার শাস্তি দেবার জন্যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌লে?”

বল্‌নুম, “তুমি ভগবান্ মানো?”

নরেন থতমত খেয়ে বলতে লাগল, “না—হাঁ—না, মানিনে—কিন্তু, সে সময়ে কি জানো—”

“থাক্ গে,—তার পরে?”

নরেন বলে উঠল, “উঃ—সে আমার কি দিন, যে দিন শুন্‌নুম, তুমি আমারই আছো,—শুধু নামেই অস্তর, নইলে আমারই চিরকাল, শুধু আমারই। আজও একদিনের জন্যে আর কারও শস্যের ব্রাজি—”

“ছি ছি, চূপ করো, চূপ করো! কিন্তু, কে তোমাকে এ খবর দিলে? কার কাছে শুন্‌লে?”

“তোমাদের যে দাসী ৩৪ দিন হ’ল বাড়ী যাবার নাম ক’রে চ’লে গেছে, যে—”

“মুক্ত কি তোমার লোক ছিল?” ব’লে জোর ক’রে তাঁর হাত ছাড়াতে গেলুম, কিন্তু, এবারেও সে তেমনি সজোরে ধ’রে রাখ্‌লে। তার চোখ দিয়ে কোঁটা দুই জলও গড়িয়ে পড়ল। বল্লে, “সহ, এমনি কোরেই কি আমাদের জীবনের শেষ হবে? এমন অন্তখে না পড়্‌লে আজ কেউ ত আমাদের আলাদা ক’রে রাখতে পারত না! যে অপরাধ আমার নিজের নয়, তার জন্যে কেন এত বড় শাস্তি ভোগ কোরব? লোকে ভগবান্, ভগবান্ করে, কিন্তু, তিনি সত্যি থাক্‌লে কি বিনাদোষে এত বড় সাজা আমাদের দিতেন? কখনও না। তুমিই বা কিসের জন্যে একজন অজানা-অচেনা, মুখ্য লোকের—”

“থাক্, থাক্, ও কথা থাক্।”

নরেন চম্কে উঠে বল্লে, “আচ্ছা থাক্। কিন্তু, যদি জান্‌তুম, তুমি স্বেচ্ছা আছ, স্বধী হয়েচ, তা হ’লেও হয় ত একদিন মনকে সান্ত্বনা দিতে পার্‌তুম, কিন্তু কোন সমলই যে আমার হাতে নেই—আমি বাচ্‌ব কি কোরে?”

আবার তার চোখে জল এসে পড়ল। এবার সে আমার হাতটাই টেনে নিয়ে তার চোখের জল মুছে বললে, “এমন কোন সভ্যদেশ পৃথিবীতে আছে—যেখানে এত বড় অত্যাচার হ’তে পারত! মেয়েমানুষ ব’লে কি তার দ্রাণ নেই, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়ে এমন ক’রে তাকে সারাজীবন দগ্ধ করবার সংসারে কার অধিকার আছে? কোন দেশের মেয়েরা ইচ্ছে করলে এমন মিথ্যে বিয়ে লাগি মেয়ে ভেঙে দিয়ে যেখানে খুসী চ’লে যেতে না পারে?”

এ সব কথা আমি সমস্তই জানতুম। আমার মামার ঘরে নব্য যুগের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কোন আলোচনাই বাকি ছিল না। আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন ছলতে লাগল। বললুম, “তুমি আমাকে কি করতে বল?”

নরেন বললে, “আমি তোমাকে কোন কথাই বলব না। এইটুকু শুধু জানিয়ে যাবো যে, মরণের গ্রাস থেকে উঠে পর্যন্ত আমি এই আজকের দিনের প্রতীক্ষা করেই পথ চেয়ে ছিলাম। তার পরে হয় ত একদিন শুন্তে পাবে, যেখান থেকে উঠে এসেছি, তার কাছেই ফিরে চ’লে গেছি। কিন্তু তোমার কাছে এই আমার শেষ নিবেদন রইল, সহ, বেঁচে থাকতে যখন কিছুই পেলুম না, মরণের পরে যেন ঐ চোখের দু ফোঁটা জল পাই। আত্মা ব’লে যদি কিছু থাকে, তার তাতেই তৃপ্তি হবে।”

আমার হাতটা তার হাতের মধ্যেই রইল,—চুপ ক’রে ব’সে রইলাম। এখন ভাবি, সে দিন যদি ঘুণাগ্রেও জানতুম, মানুষের মনের দাম এই, একে একেবারে উন্টো ধারায় বইয়ে দিতে এইটুকু মাত্র সময়, এতটুকু মাত্র মাল-মসলার প্রয়োজন, তা হ’লে যেমন কোরে হোক, সে দিন তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমি জানালা বন্ধ ক’রে দিতুম, কিছুতে তার একটা কথাও কানে ঢুকতে দিতুম না। কটা কথা, ক ফোঁটা চোখের জলই বা তার খরচ হয়েছিল? কিন্তু নদীর প্রচণ্ড স্রোতে পাতা শুক শর-গাছ যেমন কোরে কাঁপতে থাকে, তেমনি কোরে আমার সমগ্র দেহটা কাঁপতে লাগল। মনে হ’তে লাগল, নরেন যেন কোন অদ্বিত কোশলে আমার পাঁচ আঙ্গুলের ভেতর দিয়ে পাঁচশ বিছাতের ধারা আমার সর্কাজে বইয়ে দিয়ে আমার পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত অবশ ক’রে আনুচে। সে দিন মাঝখানের সেই লোহার গরাদেগুলো যদি না থাকত, আর সে যদি আমাকে কোলে তুলে নিয়ে পালাতো, হয় ত আমি একবার চোঁচাতে পর্যন্ত পারতুম না—‘ওগো, কে আছ আমার রক্ষে কর।’ ছদ্মবেশে কতকণ এমন স্বর হয়ে ছিলুম জানিনে, সে হঠাৎ ব’লে উঠল, “সহ?”

“কেন?”

“তুমি ত বেশ জানো, আমাদের মিথ্যে শাস্ত্রগুলো শুধু মেয়েমানুষকে বেঁধে

রাখবার শেকল মাত্র! যেমন কোরে হোক, আটকে রেখে তাদের সেবা নেবার ফন্দি! সতীর মহিমা কেবল মেয়েমানুষের বেলা,—পুরুষের বেলায় সব ফাঁকি! আত্মা, আত্মা যে করে, সে কি মেয়েমানুষের দেহে নেই? তার কি স্বাধীন সত্তা নেই? সে কি শুধু এসেছিল পুরুষের সেবাদাসী হবার জন্তে?”

“বউমা, বলি, কথা কি তোমাদের শেষ হবে না বাছা?”

মাথার ওপর বাজ ভেঙে পড়লেও বোধ করি মানুষে এমন কোরে চমকে ওঠে না, আমরা ছুঁজনে যেমন ক’রে চমকে উঠলুম। নরেন হাত ছেড়ে দিলে ব’সে পড়ল, আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, বারান্দায় খোলা জানালার ঠিক সমুখে দাঁড়িয়ে আমার শাণ্ডী।

বললেন, “বাছা, এ পাড়ার লোকগুলো ত তেমন সভ্য-ভব্য নয়, এমন কোরে ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে কারা-কাটি করতে দেখলে হয় ত বা দোষের ভেবে নেবে। বলি, বাবুটিকে ঘরে ডেকে পাঠালেই ত দেখতে শুন্তে সব দিকে বেশ হ’ত!”

কি একটা জবাব দিতে গেলুম, কিন্তু মুখের মধ্যে জিতটা আমার আড়ষ্ট হয়ে রইল—একটা কথাও ফুটল না।

তিনি একটুখানি হেসে বললেন, “বলতে ত পারিনে, বাছা, শুধু ভেবেই মরি, বউমাটি কেন আমার এত কষ্ট সয়ে মাটিতে শুয়ে থাকেন! তা’ বেশ! বাবুটি নাকি ছুপুরবেলা চা খান। চা তৈরিও হয়েছে—একবার মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেসা কর দেখি, বউমা, চায়ের পেয়েলাটা বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দেব, না, ঐ বাগানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই থাকেন?”

উঠে দাঁড়িয়ে প্রবল চেষ্টায় তবে কথা কইতে পারলুম, বললুম, “তুমি কি রোজ এমনি কোরে আমার ঘরে আড়ি পাতিয়া যা?”

শাণ্ডী মাথা নেড়ে বললেন, “না-মা, সময় পাই কোথা? সংসারের কাজ ক’রেই ত সারতে পারিনে! এই দেখ না, বাছা, বাতে মরচি, তবু চা তৈরি করতে রান্নাঘরে ঢুকতে হয়েছিল। তা এই ঘরেই না হয় পাঠিয়ে দিচ্ছি,—বাবুটির আবার ভারি লজ্জার শরীর, আমি থাকলে হয় ত থাকেন না। তা, যাচ্ছি আমি—” ব’লে তিনি ফিক্ ক’রে একটু মুচ্কে হেসে চ’লে গেলেন। এমনি মেয়েমানুষের বিদ্বেষ! প্রতিশোধ নেবার বেলায় শাণ্ডী-বধূর মাত্র সম্বন্ধের কোন উচুনোচুর ব্যবধানই রাখলেন না।

সেইখানে মোঝের ওপর চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম—সর্বদা বয়ে বরু বরু ক’রে ঘাম ক’রে সমস্ত মাটিটা ভিজ্জে গেল।

শুধু একটা সান্ত্বনা ছিল, আজ তিনি আসবেন না,—আজকার রাত্রিটা অন্ততঃ চুপ্ ক’রে প’ড়ে থাকতে পাবো, তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।

কতবার ভাবলুম উঠে বসি, কাজকর্ম করি—যেন কিছুই হয় নি,—কিন্তু কিছুতেই পারলুম না; সমস্ত শরীর যেন থম্ থম্ করতে লাগলো।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, এ ঘরে কেউ আলো দিতে এল না।

রাত্রি তখন প্রায় আটটা, সহসা তাঁর গলা বাইরে থেকে কানে আসতেই বুকের সমস্ত রক্ত-চলাচল যেন একেবারে থেমে গেল। তিনি চাকরকে জিজ্ঞেস করছিলেন, “বন্ধু, নরেনবাবু হঠাৎ চলে গেলেন কেন রে?” চাকরের জবাব শোনা গেল না। তখন তিনি নিজেই বললেন, “খুব সম্ভব শীকার করতে বারণ করেছিলুম বলে। তা’ উপায় কি!” অন্তরে চুপেই, শাওড়ী ঠাকরণ ডেকে বললেন, “একবার আমার ঘরে এসো ত বাবা!”

তাঁর যে এক মুহূর্ত দেবী সহাবে না, সে আমি জানতুম। তিনি যখন আমার ঘরে এলেন, আমি কিসের একটা প্রচণ্ড নিষ্ঠুর আঘাত প্রতীক্ষা করেই যেন সর্বদা কাঠের মত শক্ত করে পড়ে রইলুম, কিন্তু তিনি একটা কথাও বললেন না। কাপড়-চোপড় ছেড়ে সন্ধ্যা-আলোক করতে বেরিয়ে গেলেন, যেন কিছুই হয়নি—শাওড়ী তাঁকে যেন এইমাত্র একটা কথাও বলেন নি। তার পরে যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তিনি ঘরে শুতে এলেন।

সারা-রাত্রির মধ্যে আমার সঙ্গে একটা কথাও হ’ল না। সকালবেলা সমস্ত বিধা-সঙ্কোচ প্রাণপণে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রান্নাবরে চুপেই বাচ্চি, মেজ-জা বললেন, “হেঁসেলে তোমার আর এসে কাজ নেই নিদি, আজ আমিই আছি।”

বললুম, “তুমি থাকলে কি আমাকে থাকতে নেই মেজদি?”

“কাজ কি, মা কি জন্তে বারণ করে গেলেন,” বলে তিনি যে বাড়ি ফিরিয়ে টিপে হাসতে লাগলেন, সে আমি স্পষ্ট টের পেলুম। মুখ দিয়ে আমার একটা কথাও বার হ’ল না—আড়ষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে ফিরে এলুম।

বেখলুম, বাড়ীতল সকলের মুখই ঘোর, অন্ধকার, শুধু বার মুখ সব চেয়ে অন্ধকার হবার কথা, তাঁর মুখেই কোন বিকার নেই। স্বামীর নিত্য প্রশ্ন-মুখ, আজও তেমনি প্রশ্ন।

হায় রে, শুধু একবার গিয়ে যদি বলি, প্রভু, এই পাপিষ্ঠার মুখ থেকে তার অপরাধের বিবরণ শুনে তাকে নিজের হাতে দণ্ড দাও, কিন্তু, সমস্ত লোকের এই বিচার হীন শাস্তি আর যে সহ্য হয় না! কিন্তু সে তো কোন মতেই পারলুম না। তবুও এই বাড়ীতে এই ঘরের মধ্যেই আমার দিন কাটতে লাগল।

এ কেমন কোরে আমার দ্বারা সম্ভব হ’তে পেরেছিল, তা আজ আমি জানি। যে কাল মায়ের বুক থেকে পুত্রশোকের ভার পর্যন্ত হাক করে দেয়, সে যে এই পাপি-

ঠার মাথা থেকে তার অপরাধের বোঝা লঘু ক'রে দেবে, সে আর বিচিত্র কি? যে দণ্ড একদিন মানুষ অকাতরে মাথায় তুলে নেয়, আর একদিন তাকেই সে মাথা থেকে ফেলতে পারলে বাঁচে! কালের ব্যবধানে অপরাধের খোঁচা যত অস্পষ্ট যত লঘু হয়ে আসতে থাকে, দণ্ডের ভার ততই গুরুতর, ততই অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে! এই ত মানুষের মন! এই ত তার গঠন! তাকে অনিশ্চিত সংশয়ে মরিয়া কোরে তোলে। একদিন ছুদিন ক'রে যখন সাতদিন কেটে গেল, তখন কেবলই মনে হ'তে লাগল, এতই কি দোষ করেছি যে, স্বামী একটা মুখের কথাও জিজ্ঞেস না কোরে নির্দিষ্টারে দণ্ড দিয়ে যাবেন! কিন্তু তিনি যে সকলের সঙ্গে মিলে নিঃশব্দে আমাকে পীড়ন ক'রে যাচ্ছেন, এ বুঝি যে কোথায় পেরেছিলুম, এখন তাই শুধু ভাবি।

সে দিন সকালে শুন্লুম, শাওড়ী বন্চেন, “ফিরে এলি না মুক্ত? পাঁচদিন ব'লে কত দিন দেবি করলি বন্ ত বাছা?”

সে যে কেন ফিরে এসেচে, তা মনে মনে বুঝলুম।

নাইতে যাচ্ছি, দেখা হ'ল। সে মুচুকে হেসে হাতের মধ্যে একটা কাগজ গুঁজে দিলে। হঠাৎ মনে হ'ল, সে যেন এক টুকরো জলন্ত কয়লা আমার হাতের তেলোয় টিপে ধরেচে। ইচ্ছে হ'ল, তখুঁন কুটি-কুটি কোরে ছিঁড়ে ফেলে দিই। কিন্তু সে যে নরেনের চিঠি! না পড়েই যদি ছিঁড়ে ফেলতে পারব, তা হ'লে মেয়েমানুষের মনের মধ্যে বিশ্বের সেই অফুরন্ত চিরন্তন কৌতূহল জমা হয়ে রয়েছে কিসের জন্যে? নির্জন পুকুরঘাটে জলে পা ছড়িয়ে দিয়ে চিঠি খুলে বসলুম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটা কথাও পড়তে পারলুম না। চিঠি লাল কালীতে লেখা। মনে হ'তে লাগল, তার রাঙা অক্ষর-গুলো যেন একপাল কেনোর বাচ্চার মত গায়ে গায়ে জড়িয়ে কিন্-বিন্ ক'রে ন'ড়ে ন'ড়ে বেড়াচ্ছে। তার পরে পড়লুম—একবার—দুবার—তিনবার পড়লুম। তার পরে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ে মান ক'রে ঘরে ফিরে এলুম। কি ছিল তাতে? সংসারে যা সব চেয়ে বড় অপরাধ, তাই লেখা ছিল।

ধোপা এসে বসলে, “মা ঠাকুরণ, বাবুর ময়লা কাপড় দাও।” আমার পকেটগুলো সব দে'খে দিতে গিয়ে একখানা পোষ্টকার্ড বেরিয়ে এল, হাতে তুলে দেখি, আমার চিঠি, মা লিখেচেন। তারিখ দেখলুম, পাঁচ দিন আগের, কিন্তু, আজও আমি পাইনি।

প'ড়ে দেখি সর্বনাশ! মা লিখেচেন, শুধু রাগা ঘরটি ছাড়া আর সমস্তই পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। এই ঘরটির মধ্যে কোন মতে সবাই মাথা গুঁজে আছেন।

ছটোখ জ্বালা করতে লাগল, কিন্তু এক ফোঁটা জল বেরুল না। কতক্ষণ যে এ ভাবে ব'সে ছিলুম জানিনে, ধোপার চাঁৎকারে আবার সজাগ হয়ে উঠলুম। তাড়াতাড়ি তাকে কাপড়গুলো ফেলে দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লুম। এইবার

চোখের জলে বালিস ভিক্ষে গেল। কিন্তু এই কি তাঁর ঈশ্বরপরায়ণতা! আমার মা গরীব, একাবন্দু সাহায্য করতে অসুযোগ করি, এই ভয়ে চিঠিখানা পর্য্যন্ত আমাকে দেওয়া হয়নি। এত বড় ক্ষুদ্রতা আমার নাস্তিক মানার দ্বারা কি কখনো সম্ভব হ'তে পারত!

আজ তিনি ঘরে আসতেই কথা কইলুম। বললুম, “আমাদের বাড়ী পুড়ে গেছে?”

তিনি মুখপানে চেয়ে বললেন, “কোথায় শুনে?”

গানের ওপর পোস্টকার্ডখানা ছুড়ে ফেলে নিয়ে জবাব দিলুম, “ধোপাকে কাপড় দিতে তোমারই পকেট থেকে পেলুম। দেখ, আমাকে নাস্তিক ব'লে তুমি ঘৃণা কর জানি, কিন্তু যারা লুকিয়ে পরের চিঠি পড়ে, আড়ালে গোয়েন্দাগিরি ক'রে বেড়ায়, তাদের আমরাও ঘৃণা করি। তোমার বাড়ীতুচ্ছ লোকেরই কি এই ব্যবসা?”

যে লোক নিজেকে অপরাধে মগ্ন হয়ে আছে, তার সুপের এই কথা! কিন্তু আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি, এত বড় আঘাত আমার স্বামী ছাড়া আর কেউ সহ্য করতে পারত না। মহাপ্রভুর শাসন কি অক্ষয়-কবচের মতই যে, তাঁর মনটিকে অহনিশ ঘিরে রক্ষা করত, আমার এমন তীক্ষ্ণ শূলও খান্ খান্ হয়ে চূর্ণ হয়ে প'ড়ে গেল।

একটুখানি ম্লান হেসে বললেন, “কেমন অন্তমনস্ক হয়ে প'ড়ে ফেলেছিলুম, সহ্য আমাকে মাপ কর।”

এই প্রথম তিনি আমার নাম ধ'রে ডাকলেন।

বললুম, “মিথ্যে কথা। তা' হলে আমার চিঠি আমাকে দিতে। কেন এ খবর লুকিয়েচ, তাও জানি।”

তিনি বললেন, “শুধু হুঃখ পেতে বই ত না। তাই ভেবেছিলুম, কিছুদিন পরে তোমাকে জানানো।”

বললুম, “কেমন করে তুমি হাত গোণো, সে আমার জানতে বাকি নেই। তুমিই কি বাড়ীতুচ্ছ সবাইকে আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েচ? স্পাই! ইংরেজ মহিলারা এমন স্বামীর মুখ পর্য্যন্ত দেখে না, তা জানো?”

ওরে হতভাগী! বল, বল, যা' মুখে আসে, ব'লে নে। শাস্তি তোর গেছে কোথায়, সবই যে তোলা রইল।

স্বামী স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন,—একটা কথারও জবাব দিলেন না। এখন ভাবি, এত ক্ষমা করতেও মানুষে পারে!

কিন্তু আমার ভেতরে যত মানি, যত অপমান এত দিন ধীরে ধীরে জমা হয়ে উঠেছিল, একবার মুক্তি পেয়ে তারা কোন মতেই আর কিরতে চাইলে না।

একটু থেমে আবার বললুম, “আমি হেসেলে ঢুকতে—”

তিনি একটুখানি ঘেন চম্কে উঠে মাথখানেকই ব'লে উঠলেন, “উঃ, তাই বটে ! তাই আমার খাবার ব্যবস্থাটা আবার—”

বল্লুম, “সে নালিশ আমার নয় । বাঙালীর ঘরে জন্মেছি ব'লেই যে তোমরা খুঁচে খুঁচে আমাকে তিল তিল ক'রে মারবে, সে অধিকার তোমাদের আমি কিছুতে দেব না, তা' নিশ্চয় কেনো । আমার মামার বাড়ীতে এখনো ত রান্না-বরটা বাকী আছে, আমি তার মধ্যেই আবার ফিরে যাবো । কাল আমি যাচ্ছি ।”

স্বামী অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে বল্লেন, “যাওয়াই উচিত বটে । কিন্তু, তোমার গয়নাগুলো রেখে যেয়ো ।”

তুনে অবাক হয়ে গেলুম । এত হীন, এত ছোট স্বামীর স্ত্রী আমি ! পোড়া মুখে হঠাৎ হাসি এলো । বল্লুম, “সেগুলো কেড়ে নিতে চাও তা' বেশ, আমি রেখেই যাবো ।”

ঐদীপের ক্ষীণ আলোতেও স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তাঁর মুখখানি ঘেন শাদা হয়ে গেল । বল্লেন, “না না, তোমার কিছু গয়না আমি ভিক্ষে চাচ্ছি । আমার টাকার বড় অনাটন, তাই বাঁধা দেবো ।”

কিন্তু এমনি পোড়াকপালী আমি যে, ও-মুখ দেখে ও কথাটা বিবেচন করতে পারলুম না । বল্লুম, “বাঁধা দাও, বেচে ক্যালো, যা' ইচ্ছে কোরো ; তোমাদের গয়নার ওপর আমার এতটুকু লোভ নেই ।” ব'লে, তখনি বাক্স খুলে আমার সমস্ত গয়না বিছানার ওপর ছুড়ে ফেলে দিলুম । যে ছুগাছি বালা মা দিয়েছিলেন, সেই ছুটি ছাড়া গায়ের সমস্ত গয়নাও খুলে ফেলে দিলুম । তাতেও তৃপ্তি হ'ল না, বেনারসী কাপড়, জামা প্রভৃতি যা কিছু এঁরা দিয়েছিলেন, সমস্ত বার ক'রে ফেলে দিলুম ।

স্বামী পাথরের মত স্থির নির্বাক হয়ে ব'সে রইলেন । ঘুণার বিতৃষ্ণার সমস্ত মনটা এমনি বিধিরে উঠল যে, এক ঘরের মধ্যে থাকার ঘেন অসহ্য হয়ে পড়ল । বেরিয়ে এসে অন্ধকার বারান্দার একধারে আঁচল পেতে শুয়ে পড়লুম । মনে হ'ল, ঘোরের আড়াল থেকে কে ঘেন বেরিয়ে গেল ।

কান্নায় বুক কেটে যেতে লাগল, তবু প্রাণপণে মুখে কাপড় ঝুঁজে দিয়ে মান বাঁচালুম ।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানিনে, উঠে দেখি ভোর হয় । ঘরে গিয়ে দেখি, বিছানা খালি, হ'একখানি ছাড়া প্রায় সমস্ত গয়নাই নিয়ে তিনি কখন বেরিয়ে গেছেন ।

সারাদিন তিনি বাড়ী এলেন না । রাত্রি বারোটা বেজে গেল, তাঁর দেখা নেই ।

তক্তার মধ্যেও বোধ করি সজাগ ছিলাম । রাত্রি ছটোর পর বাগানের দিকের

সেই জানালাটার গায়ে খট-খট শব্দ শুনেই বুঝলুম, এ নরেন। কেমন ক'রে যেন আমি নিশ্চয় জানতুম, আজ রাতে সে আসবে। স্বামী বলে নেই, এ খবর মুক্ত দেবেই, এবং এ সুযোগ সে কিছুতে ছাড়বে না। কোথাও কাছাকাছি সে যে আছেই, এ যেন আমি ভাবী অমঙ্গলের মত অনুভব করতুম। নরেন এত নিঃশব্দ ছিল যে, সে অনায়াসে বললে—“দেয়ি কোরো না, যেমন আছে বেরিয়ে এসো, মুক্ত খিড়কি খুলে দাঁড়িয়ে আছে।”

বাগান পার হয়ে রাস্তা দিয়ে অনেকখানি অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসলুম। মা বসুমতী! গাড়ী শুধু হতভাগীকে সে দিন গ্রাস করানি কেন!

কলকাতায় বউবাজারের একটা ছোট্ট বাসায় গিয়ে বধন উঠলুম, তখন বেলা সাড়ে আটটা। আমাকে পৌছে দিয়েই নরেন তার নিজের বাসায় কিছুক্ষণের জন্য চ'লে গেল। দাসী উপরের ঘরে বিছানা পেতে রেখেছিল, টলতে টলতে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। আশ্চর্য্য যে, যে কথা কখনও ভাবিনি, সমস্ত ভাবনা ছেয়ে সেই কথাই আমার মনে পড়তে লাগল। আমি ন'বছর বয়সে একবার জলে ডুবে যাই, অনেক বহু-চেষ্টার পরে জ্ঞান হ'লে মায়ের হাত ধ'রে ঘরের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। মা শিররে ব'সে একহাতে মাথার হাত বুলািয়ে দিয়ে, একহাতে পাখার বাতাস করেছিলেন,—মায়ের মুখ আর তাঁর সেই পাখা দিয়ে হাতনাড়াটা ছাড়া সংসারে আর যেন আমার কিছু রইল না।

দাসী এসে বললে, “বউমা, কলের জল চ'লে যাবে, উঠে চান ক'রে নাও।”

জান ক'রে এলুম, উড়ে বায়ুন ভাত দিয়ে গেল। মনে হয় কিছু খেয়েও ছিলুম, কিন্তু, উঠতে না উঠতে সমস্ত বমি হয়ে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে নিজস্বের মত বিছানায় এসে শুয়ে পড়লামাত্রই বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

স্বপ্ন দেখলুম, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করছি। তিনি তেমনি নীরবে ব'সে আছেন, আর আমি গায়ের গরনা খুলে খুলে তাঁর গায়ে ছুড়ে ফেলছি; কিন্তু সে গরনাও আর ফুরায় না, আমার ছুড়ে ফেলাও থামে না। যত ফেলি, ততই যেন কোথা থেকে গরনার সর্কাস ভরে ওঠে।

এমন ক'রে কতক্ষণ যে কেটেছিল, আর কতক্ষণ যে কাটতে পারত, বলতে পারিনে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল নিজের কান্নার শব্দে।

হাতের ভারি অনন্তটা ছুড়ে ফেলতেই সেটা সজোরে গিয়ে তাঁর কপালে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন, আর সেই কাটা কপাল থেকে রক্তের ধারা ফিন্কে দিয়ে কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকতে লাগল।

চেয়ে দেখলুম, তখনও অনেক বেলা আছে, নরেন পাশে বসে আমাকে ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙাচ্ছে।

সে বললে, “স্বপন দেখছিলে? ইস, চোখের জলে বালিস ভিক্ষে গেছে যে!” বোলে কৌটার খুঁট দিয়ে মুছিয়ে দিলে।

স্বপন? এক মুহূর্তে মনটা যেন স্বস্তিতে ভরে গেল।

চোখ রোগড়ে উঠে বসে দেখলুম, স্মৃতিতেই মস্ত একটা কাগজে মোড়া পার্শেল।

“ও কি?”

“তোমার জামা-কাপড় সব কিনে আনলুম।”

“তুমি কিনতে গেলে কেন?”

নরেন একটু হেসে বললে, “আমি ছাড়া আর কে কিনবে?”

* * * * *

“আচ্ছা, পা ছেড়ে উঠে বোস্ বোন, আমি দিবি্য কর্চি, আমরা এক মাসের পেটের ভাই বোন। তোকে আমি যত ভালই বাসিনে কেন, তবু তোকে আমি আমার কাছ থেকে চিরকাল রক্ষ করব।”

“চিরকাল! না না, তাঁর পারের ওপর আমাকে তোমরা ফেলে দিয়ে চলে এসো, নরেন দাদা, আমার অন্তঃকরণে যা হবার তা’ হোক। কাল সমস্ত রাত্রি তাঁকে চোখে দেখিনি, আজ আবার সমস্ত রাত্রি দেখতে না পেলো যে আমি ম’রে যাবো ভাই!”

দাসী ঘরে প্রদীপ দিয়ে গেল। নরেন উঠে গিরে একটা মোড়ার ওপর বসে বললে, “মুক্তর কাছে আমি সমস্তই শুনেচি। কিন্তু তাঁকে যদি এতই ভালবাস্তে, কোন দিন এক সঙ্গে ত’—”

তাড়াতাড়ি বললুম, “তুমি আমার বড় ভাই, এ সব কথা আমাকে তুমি জিজ্ঞেসা কোরো না।”

নরেন খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললে, “আমি আজই তোমাকে তোমাদের বাগানের কাছে রেখে আসতে পারি বোন, কিন্তু, তিনি কি তোমাকে নেবেন? তখন গ্রামের মধ্যে তোমার কি দুর্গতি হবে বল ত?”

বুকের ভেতরটা কে যেন ছুঁতে পাকিয়ে মুচড়ে দিলে, কিন্তু, তখুনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, “ঘরে নেবেন না, সে জানি, কিন্তু, তিনি যে আমাকে মাপ করবেন, তাতে ত কোন সন্দেহ নেই। যত বড় অপরাধ হোক, সত্যি সত্যি

মাপ চাইলে তাঁর না বলবার জো নেই, এ যে আমি তাঁর মুখেই শুনেছি, ভাই ! আমাকে তুমি তাঁর পারের তলার রেখে এসো, নরেন দা, ভগবান্ তোমাকে রাজ্যেশ্বর করবেন, আমি কায়মনে বল্চি ।”

মনে করেছিলেন, আর চোখের জল ফেলবো না, কিন্তু কিছুতে ধ’রে রাখতে পারলুম না, ঝরু ঝরু করে ঝরে পড়তে লাগল । নরেন মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বললে, “সহ, তুমি কি সত্যিই ভগবান্ মানো ?”

আজ চরম ছুঁখে মুখ দিয়ে পরম সত্য বার হয়ে গেল ; বললুম, “মানি । তিনি আছেন বলেই ত এত ক’রেও ফিরে যেতে চাইছি । নইলে, এইখানে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম, নরেন দাদা, ফিরে ঘাবার কথা মুখে আনতুম না ।”

নরেন বললে, “কিন্তু, আমি ত মানিনে ।”

তাড়াতাড়ি ব’লে উঠলুম, “আমি বল্চি, আমার মত তুমিও একদিন নিশ্চয় মানবে ।”

“সে তখন বোঝা যাবে” ব’লে নরেন গস্তীর মুখে ব’সে রইল । মনে মনে কি যেন ভাবতে বুঝতে পেরে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলুম । আমার এক মিনিট দেয়াই সইছিল না, বললুম, “আমাকে কখন রেখে আসবে নরেন দাদা ?”

নরেন মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, “সে কখনো তোমাকে নেবে না ।”

“সে চিন্তা কেন কর্চ ভাই ? নিন্ না নিন্, সে তাঁর ইচ্ছে । কিন্তু, আমাকে তিনি ক্ষমা করবেন, এ কথা নিশ্চয় বলতে পারি ।”

“ক্ষমা ! না নিলে ক্ষমা করা, না করা হুই-ই সমান । তখন তুমি কোথায় যাবে বল ত ? সমস্ত পাড়ার মধ্যে কত বড় একটা বিল্লী হৈ-চৈ গণ্ডগোল প’ড়ে যাবে, একবার ভেবে দেখ দিকি !”

ভয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললুম, “সে ভাবনা তুমি এতটুকু কোরো না নরেন দাদা ! তখন তিনিই আমার উপায় কোরে দেবেন ।”

নরেন আবার কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বললে, “আর তোমারই না হয় একটা উপায় করবেন, কিন্তু আমার ত করবেন না ! তখন ?”

এ কথার কি যে জবাব দেব, ভেবে পেলুম না । বললুম, “তাতেই বা তোমার ভয় কি ?”

নরেন স্নানমুখে জোর করে একটু হেসে বললে, “ভয় ? এমন কিছু নয়, ৫।৭ বছরের জন্তে জেল খাটতে হবে । শেষকালে এমন কোরে তুমি আমাকে ডোবাবে জানলে আমি এতে হাতই দিতুম না । মনের এতটুকু স্থির নেই, এ কি ছেলেখেলা ?”

আমি কেঁদে ফেলে বল্লুম, “তবে আমার উপায় কি হবে ভাই? আমার সমস্ত অপরাধ তাঁর পায়ে নিবেদন না কোরে ত আমি কিছুতে বাঁচব না!”

নরেন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, “তুমি শুধু নিজের কথাই ভাব্চ, আমার বিপদ ত ভাবচ না? এখন সব দিক্ না বুঝে আমি কোন কাজ করতে পারব না।”

“ও কি, তুমি কি বাসায় যাচ্চ না কি?”

“হঁ।”

রাগে, হুঃখে, হতাস্থাসে আমি মাটিতে লুটিয়ে প’ড়ে মাথা কুটে কাঁদতে লাগ্লুম, “তুমি সঙ্গে না যাও, এইখান থেকে আমার যাবার উপায় ক’রে দাও, আমি একলা ফিরে যাবো। ওগো, আমি তাঁর দিব্যি কোরে বল্চি, আমি কারুর নাম করব না—কাউকে বিপদে জড়াবো না, সমস্ত শাস্তি একা মাথা পেতে নেব। তোমার ছুটি পায়ে পড়ি নরেন দা, আমাকে আটকে রেখে আমার আর সর্বনাশ কোরো না।”

মুখ তুলে দেখি, ঘরে সে নেই—পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেছে। ছুটে গিয়ে সদর-দরজায় দেখি, তালা বন্ধ। উড়ে বাবুন বললে, “বাবু চাবি নিয়ে চ’লে গেছেন, কাল সকালে এসে খুলে দেবেন।”

ঘরে ফিরে এসে আর একবার মাটির ওপর লুটিয়ে প’ড়ে, কাঁদতে কাঁদতে বল্লুম, “ভগবান্! কখনো তোমাকে ডাকিনি, আজ ডাক্চি, তোমার এই একান্ত নিকরপায় মহাপাপিষ্ঠা সন্তানের গতি ক’রে দাও!”

আমার সে ডাক যে কত প্রচণ্ড, তার শক্তি যে কি ভূনিবার, আজ সে শুধু আমিই জানি।

তবু সাত দিন কেটে গেল। কিন্তু, কেমন কোরে যে কাটল, সে ইতিহাস বলবার আমার সামর্থ্যও নেই, ধৈর্য্যও নেই। সে যাক্।

বিকেলবেলায় আমার ওপরের ঘরের জানালায় ব’সে নীচে গলির পানে তাকিয়ে ছিলাম। আফিসের ছুটি হয়ে গেছে—সারাদিনের খাটুনির পর বাবুরা বাড়ীমুখে—হন্ হন্ কোরে চলেচে। অধিকাংশই সামান্য গৃহস্থ। তাদের বাড়ীর ছবি আমার চোখের ওপর স্পষ্ট কুটে উঠল। বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে এখন সব চেয়ে কারা যে বেশি ব্যস্ত, জলখাবার সাজাতে, চা তৈরি করতে সব চেয়ে যারা বেশি ছুটোছুটি ক’রে বেড়াচ্ছে, সেটা মনে হতেই বুকের ভেতরটা ধক্ কোরে উঠল। মনে পড়ল, তিনিও সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরে এলেন। কোথায় কাপড়, কোথায় গামছা, কোথায় জল! ডাকা-ডাকির পর কেউ হয় ত সাড়াও দিলে না। তার পরে, হয়ত, মেজ দেওয়ার খাবারের সঙ্গে তাঁরও একটুখানি জল-খাবারের জোগাড় মেজ বো ক’রে রেখেচে, না হয় ভুলেই গেছে! আমি ত আর নেই,—ভুলতে ভুলতে বা কি!

হয় ত বা শুধু এক গেলাস জল চেয়ে খেয়ে মরলা বিছানাট' কোঁটা দিয়ে একটু ঝেড়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেন ! তার পরে রাত হুপুরে ছটো শুকনো--ঝরঝরে ভাত, আর একটু ভাতে পোড়া । ও-বেলার একটুখানি ডাল হয় ত বা আছে, হয় ত বা উঠে গেছে । সকলের দিয়ে খুয়ে ছধ একটু বাঁচে ত সে পরম ভাগ্য ! নিরীহ ভাল মানুষ, কাউকে কড়া কথা বলতে পারেন না, কারো ওপর রাগ দেখাতে জানেন না—

ওরে মহাপাতকী ! এত বড় নিষ্ঠুর মহাপাপ তোর চেয়ে বেশি সংসারে কেউ কি কোন দিন করেছে ? ইচ্ছে হ'ল, এই লোহার গরাদেতে মাথাটা ছোঁচে ফেলে সমস্ত ভাবনা-চিন্তার এইখানেই শেষ ক'রে দিই ।

বোধ করি, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন দিকেই চোখ ছিল না, হঠাৎ কড়ানাড়ার শব্দে চমকে উঠে দেখি, সদর-দরজার দাঁড়িয়ে নরেন আর মুক্ত । তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে নীচের বিছানার উঠে এসে বসলুম । সেই দিন থেকে নরেন আর আসেনি । আমার সমস্ত মন বেকোয়ার প'ড়ে আছে, সে নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিল ব'লে ভয়ে ও দিক্ মাড়াত না । তার নিশ্চয় ধারণা জন্মেছিল, বিপদে পড়লে স্বামীর বিক্রমে আমি তার কোন উপকারেই লাগব না । তাই তার ভয়ও যেমন হয়েছিল, রাগও তেমনি হয়েছিল । ঘরে ঢুকে আমার দিকে চেয়েই হ'জনে একসঙ্গে চমকে উঠল, নরেন বললে—

“তোমার এত অসুখ করেছিল ত আমাকে খবর দাওনি কেন ? তোমার বামুনটা ত আমার বাসা চেনে ?”

ঝি দালানে ঝাঁট দিচ্ছিল, সে থপ্ কোরে ব'লে বসল, “অসুখ করবে কেন ? শুধু জল খেয়ে থাকলে মানুষ রোগা হবে না বাবু ? ছ'টি বেলা দেখ'চি, ভাতের থালা যেমন বাড়ী হয়, তেমনি প'ড়ে থাকে । অর্ধেক দিন ত হাতও দেন না ।” শুনে হুজনেই শুরু হয়ে আমার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল ।

সন্ধ্যার পর নরেন বাসায় চ'লে গেলে মুক্তকে বুকে টেনে নিয়ে বললুম, “কেমন আছেন তিনি ?”

মুক্ত কেঁদে ফেললে । বললে, “অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই বউ মা, নইলে এমন সোনার সোয়ামীর ঘর করতে পেলেন না ?”

“তুই ত ঘর করতে দিলিনে মুক্ত !”

মুক্ত চোখ মুছে বললে, “মনে হ'লে বুকের ভেতরটার যে কি করতে থাকে, সে আর তোমাকে কি বোলব ? বাবু ছাড়া আজও সবাই জানে, তুমি বাড়ী পোড়ার খবর পেয়ে রাত্তিরেই রাগারাগি ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে গেছ । তোমার শাওড়ী ত তাঁর হুকুম নেওয়া হয় নি ব'লে রাগ কোরে তাঁর সঙ্গে কথা-

বার্তাই বন্ধ ক'রে দিয়েচে। মাসী কি বজ্জাত, মা, কি বজ্জাত! যে কষ্টটা বাবুকে দিচ্ছে, দেখলে পাষাণের ছঃখ হয়! সাথে কি আর তুমি ঝগড়া করতে বউ মা!”

“ঝগড়া করা আমার চিরকালের জন্য বুটে গেছে!” বলতে গিয়ে সত্যি সত্যি যেন দম্ম আটকে এলো।

আজ মুক্তর কাছে শুভে পেলুম, আমাদের পোড়া বাড়ী আবার যেরামত হচ্ছে, তিনি টাকা দিয়েছেন। হয় ত সেই জন্তাই আমার গহনাগুলো হঠাৎ বাধা দেবার তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল।

বল্লুম, “বল্ মুক্ত, সব বল্। যত রকমের বুক-কাটা খবর আছে, সমস্ত আমাকে একটি একটি কোরে শোনা—এতটুকু দয়া তোরা আমাকে করিস্ নে।”

মুক্ত বললে, “এ বাড়ীর ঠিকানা তিনি জানেন—”

শিউরে উঠে বল্লুম, “কি কোরে?”

“মাসখানেক আগে যখন এ বাড়ী তোমার জন্তেই ভাড়া নেওয়া হয়, তখন আমি জানতুম।”

“তার পর?”

“একদিন নদীর ধারেনরেন বাবুর সঙ্গে আমাকে লুকিয়ে কথা কইতে তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন।”

“তার পর?”

“বামুনের পা ছুঁয়ে মিথো বলতে পার্লুম না বোমা,—চলে আসবার দিন এ বাসার ঠিকানা বলে ফেল্লুম।”

এলিয়ে মুক্তর কোলের ওপরই চোক বুজে শুয়ে পড়্লুম।

অনেকক্ষণ পরে মুক্ত বললে, “বউ মা!”

“কেন মুক্ত?”

“যদি তিনি নিজে তোমাকে কিরিয়ে নিতে এসে পড়েন?”

প্রাণপণ বলে উঠে বোমো মুক্তর মুখ চেপে ধর্লুম—“না মুক্ত, ও কথা তোকে আমি বলতে দেব না। আমার ছঃখ আমাকে সজ্ঞানে বইতে দে, পাগল কোরে দিয়ে আমার প্রাশ্চিত্তের পথ তুই বন্ধ ক'রে দিসনে—”

মুক্ত জোর ক'রে তার মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, “আমাকেও ত প্রাশ্চিত্ত করতে হবে বউ মা? টাকার সঙ্গে ত একে ওজন কোরে ঘরে তুলতে পারব না!”

এ কথার আর জবাব দিলুম না, চোখ বুজে শুয়ে পড়্লুম। মনে মনে বল্লুম, “ওরে মুক্ত, পৃথিবী এখনও পৃথিবীই আছে। আকাশ-কুসুমের কথা কানেই শোনা যায়, তাকে ফুটতে কেউ আজও চোখে দেখেনি।”

ঘণ্টাখানেক পরে মুক্ত নীচে থেকে ভাত খেয়ে যখন ফিরে এলো, তখন রাত্রি দশটা। যথেষ্ট চুকেই বললে, “মাথায় আঁচলটা তুলে দাও বউ মা, বাবু আসছেন,” বলেই বেরিয়ে গেল।

আবার এত রাত্রে? তাড়াতাড়ি কাপড় সেরে উঠে বসতেই দেখলুম, দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র নন্দ, — আমার স্বামী।

বললেন, “তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। আমি জানি, তুমি আমারই আছ। বাড়ী চল।”

মনে মনে বললুম, “ভগবান্! এত যদি দিলে, তবে আরও একটু দাও— ওই দুটি পায়ে মাথা রাখবার সময়টুকু পর্য্যন্ত আমাকে সচেতন রাখো।”

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

জয়দেব

কোন্ সে মাহেন্দ্রক্ষণে হে বৈষ্ণব কবি,
হেরি হৃদি বৃন্দাবনে রাধা-শ্যাম-ছবি,—
কোকিল-কুজিত কোন্ নিকুঞ্জে বসিয়া
তব ভাব-মন্দাকিনী আসিল নামিয়া ?
কবে গীত-গোবিন্দের সুধাপদাবলী
উঠিল ও মর্ম্মমাঝে আবেগে উথলি,—
স্বললিত ছন্দোমাঝে ভাবের লহরে,
নামিল বৈকুণ্ঠপুরী ধরণীর পরে ?
কবে বা হেরিলে কবি মানস-নয়নে
সুবিমল প্রতিভার উজ্জল কিরণে,
অম্বর মেঘুর সেই সান্ধ্র মেঘজালে
বনভূমি অন্ধকার শ্যামলভমালে,
তারি মাঝে একাকিনী মুগ্ধ রাধিকার
মদনমোহন লাগি প্রেম-অভিসার,
সুমন্দগামিনী সেই কালিন্দীর কূলে
অলিকুল-মুখরিত বকুলের গূলে,
মধুর নৃপূর-রোলে মুরগী-নিশ্বনে
বসন্ত-বিহার সেই গোপবধূসনে ?
কবে তব অসমাপ্ত কবিতা-চরণ,—
করিলেন ভগবান্ স্বহস্তে পূরণ ;
শ্রীকরে অঙ্কিত করি কবিহ চরম
চিরস্মিত “দেহি পদপল্লবমুদারম্ ?”
ওগো চিরস্মরণীয় মহাভাগ্যবান্,
কঠোর সাধনাসিক্ সাধক মহান্,
আজি বুঝি আছ তুমি, অনন্তবিশ্রামে,
রাধাশ্যাম-পদতলে শ্রীগোলোকধামে ।

শ্রীজ্ঞানানন্দ চট্টোপাধ্যায় ।

বঙ্গভাষা ও বাংলা ভাষা

সাহিত্যকে ভাবে ও ভাষায় গম্ভীর, উদাত্ত, কেবল গুণিজন বোধ্য করিয়া। তুলিবার যেমন একটি ব্যাধি আছে, ঠিক তেমনি তাহাকে সহজ, সরল, জন-সাধারণের নিকটতর উপভোগ্য বস্তু করিয়া তুলিবারও একটি ব্যাধি আছে। এই যে দুইটি আদর্শ, তাহার কোন একটিকেই অতিমাত্র করিয়া দেখা ও অপরটিকে ঘৃণা বা তুচ্ছ করাই দুষণীয়। নতুবা সাহিত্যে উভয়েরই স্থান আছে, উভয়ের সম্মিলনেই সাহিত্যের পূর্ণতর অভিব্যক্তি। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে আজ যে তথাকথিত চলিত ভাষা ও সাধুভাষার মধ্যে মল্লযুদ্ধ চলিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রতিবিন্ধিত এই দুই রকম প্রেরণারই খেলা। নবীন সাহিত্যিকগণের অনেকেই দেখিতেছি, শুধু বাংলাভাষা আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন; আমাদের প্রয়াস, তাই তাঁহাদিগকে বুঝান যে, বঙ্গভাষারও দাবী তাঁহাদের উপর আছে, বঙ্গভাষা বাঙ্গালীরই ভাষা।

বাংলার সাধুভাষাটি কুলেখকের হস্তে প্রাণহীন, আড়ম্বর, আড়ম্বরগ্রস্ত পণ্ডিতীভাষা হইয়া উঠিয়াছে। চলিত ভাষা তাই চাহিতেছে—সে ভাষাটি ভঙ্গিয়া চুরিয়া সরল, প্রাঞ্জল, জীবন্ত করিয়া তুলিতে। টোলের শুষ্ক বাদ-বিতর্কের সঙ্কীর্ণ কোটরে পাণ্ডিত্যের সাজসরঞ্জামের বশনে যাহার প্রতিষ্ঠা, তাহাকে টানিয়া বাহিরের আলোকে, বাতাসে, ধূল্যামাটিতে, জীবনের মুক্ত-প্রাঙ্গণে ছাড়িয়া দিতে। চলিত ভাষা এই আদর্শটিকে যতখানি কার্যকরী করিয়া তুলিতেছে, ততখানিই তাহার সার্থকতা। কিন্তু তাই বলিয়া শুধু চলিতভাষার ভঙ্গিমাটির মধ্যেই যদি আবার বাংলাভাষাকে পুরিয়া রাখিতে চাই, তবে তাহাকে সমৃদ্ধ না করিয়া, পঙ্গু করিয়াই ফেলিব। কোনরূপ দক্ষতা যাহার নাই, তাহার হাতে সব ভাষারই দুরবস্থা, তা চলিত ভাষাই হউক আর সাধুভাষাই হউক কিংবা অন্য কোন প্রকার ভাষাই হউক। কিন্তু এইখানে একটি কথা উঠিয়াছে যে, চলিত ভাষা—চলিত ভাষার ভঙ্গিমাই হইতেছে বাঙ্গালীর আপনার ভাষা, বাংলার স্বার্থ ভঙ্গিমা। কবিকঙ্কণ হইতে ঈশ্বর গুপ্ত অবধি দেখি, এই ভাষারই খেলা, ইহাকেই বিভিন্নরূপ

ধরিয়া তবে প্রতিভা যাহা কিছু গড়িয়া তুলিবে। বাংলা ভাষা “অল্পপ্রাণ অক্ষরবহুল,” ইহাতে শব্দের অলঙ্কারের ওজঃশক্তির গুরুভার সহিবে না। অতিপ্রাচীন inflexional ভাষায় যাহা চলিত, বর্তমান যুগের analytical ভাষায় তাহা চালাইবার চেষ্টা অতীতের প্রতি একটা নিরর্থক অন্ধভক্তির উদাহরণ মাত্র। বাংলাভাষা—বাংলার হাটে-বাটে আউলে-বাউলে ছড়ায়-কীর্ণনে যে ভাষা প্রচলিত, সাধুভাষাটি তাহার উপর এই পরধর্ম চাপাইতে চাহিয়াছিল, তাই বঙ্গীয় সাহিত্যপ্রতিভা মুক্তভাবে ফুটিতে পারে নাই। বাংলাভাষায় যদি এই শক্তি—এই গোড়ায় রীতি ধারণ করিবার সামর্থ্য নাই থাকে, তবুও ক্ষুণ্ণ হইবার কিছু নাই, ইহাতে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নাই। সব ভাষাতেই সব গুণ থাকে না, থাকিবার প্রয়োজনও নাই। যে গুণ থাকে, তাহার মধ্য দিয়াই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টি হইতে পারে।

কিন্তু এই যে ভাষার একটি বিশেষ ধর্ম নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহা যে অকাটা সনাতন, এ কথার প্রমাণ কি? সব ভাষারই একটা বিশেষ প্রকৃতি আছে, সত্য বটে; কিন্তু কয়েকটি বিশেষণের মধ্যেই কি তাহাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলা যায়, আর বিশেষতঃ যখন সে ভাষা কেবল গড়িয়া উঠিতেছে, পূর্ণাঙ্গ পরিপুষ্ট হইতে চেষ্টা করিতেছে মাত্র? চলিত ভাষা বলিয়া আমরা যে সুর বাঁধিয়া দিতেছি, তাহার মধ্যেই কি বাংলার সব ভবিষ্যৎ? আমরা তা মনে করি, এইরূপে বাংলার ভবিষ্যৎকে আমরা খর্ব করিয়া আনিতেছি, তাহার কতকগুলি possibilitiesকে বহিষ্কার করিয়া দিতেছি। বস্তুতঃ পণ্ডিতদিগের যতই দোষ থাকুক না কেন, তাঁহারা যে বাংলা ভাষার একটা সম্পূর্ণ নূতন শক্তির উৎস খুলিয়া দিয়াছেন, তাহার প্রকৃতিকে উদার ও মহনীয়ই করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন বাংলার সাহিত্যে ও ভাষায় যুগান্তর আনিয়াছেন, আমরা সকলেই বলিয়া থাকি, কিন্তু এ কথার তাৎপর্য ঠিক ঠিক যে হৃদয়ঙ্গম করি, এমন বোধ হয় না। এই নবযুগের পূর্বে বাংলা কি ছিল, তার যথার্থ প্রতিকৃতি পাই চণ্ডিদাসে, আর কি হইতে পারে, তারও চরম অভিব্যক্তি ঐ চণ্ডিদাস। তাহা হইতেছে বাঙ্গালীর “গের-স্থালী”তার পরাকাষ্ঠা। তার ভাব তার ভাষা অতিমাত্র বাঙ্গালীর, বাঙ্গালীর

প্রাণের যা বিশেষত্ব, যে নিছক স্বাতন্ত্র্যটুকু তাহারই পরিস্ফুটন। কিন্তু সেই সঙ্গেই মিশিয়া রহিয়াছে কেমন এক প্রাদেশিকতা, একটা সঙ্কীর্ণতা, একটা “ঘরমুখো” প্রকৃতির ছায়া, বিশ্বজীবনের উদার বহুতরঙ্গায়িত বৈচিত্র্যের সহিত একটা সান্ধাৎ সম্বন্ধের অভাব। তাহা সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণস্পর্শী, মাধুরিমাময় সন্দেহ নাই, কিন্তু ছায়ার কোলে বন্ধিতা লতিকার ন্যায় তাহাতে কেমন তেজের—সামর্থ্যের অভাব, যেন বিগলিতদেহা, প্রতিনিয়তই বসুধামিঙ্গনপরা।

কিন্তু ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালী যে দিন বাংলার প্রাণ ছাড়িয়া বিশ্বপ্রাণের বার্তা পাইল, শুধু নিজের ঘরের যে অনুভূতি, যে অভিজ্ঞতা, তাহা ছাড়াইয়া যে দিন সমস্ত জগতের বিপুল বিচিত্র রসের সন্ধান পাইল, সে দিন তাহার সে পূর্বতন চিরপরিচিত ভাষা ও ভঙ্গিমা এ নূতন জীবনের স্পন্দন আর ধারণ করিতে পারিল না। সে চাহিল নূতন আধার, জীবন-সঙ্গীতের নূতন মূচ্ছনার অনুরূপ তাহার ভাষার নূতন সুর—নূতন ছন্দ। আর তারই ফল বিদ্যাসাগর, মধুসূদন। মুকুন্দরাম অথবা চণ্ডিদাসের পন্থা অনুসরণ করেন নাই বলিয়া বিদ্যাসাগর-মধুসূদনকে যদি অ-বাঙ্গালী স্থির করি, তবে আমরা বাংলাভাষায় ও সাহিত্যে একটা সঙ্কীর্ণ আদর্শই খাড়া করিয়া তুলিব। হইতে পারে, এই প্রথম আচার্য্যগণ ভ্রাম্যে যে সব নূতনত্ব আনিয়াছিলেন, তাহা সব টিকিবার নয়, টিকা উচিতও নয়। কিন্তু তাঁহারা বাংলা ভাষায় যে বঙ্গসার, যে গুরুত্ব, যে একটা লাতিন প্রতিভা অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বাংলার চির-সম্পদ, তাহা শুধু অতীতের এক দ্রবিক বিকৃতি নহে; পরন্তু মহোচ্ছল ভবিষ্যতেরই পূর্বভাস।

ইংরাজী ভাষাতেও চমক ছিলেন খাঁটি ইংরাজ—“The well of English undefiled”—তাঁহার ভঙ্গিমা ছিল ইংরাজের অতি আপনার, গৃহস্থালী-ভাবেই প্রতিমা। কিন্তু এলিজাবেথের যুগে ইংরাজজাতির দৃষ্টি যখন ইংলণ্ডের সীমাটি অতিক্রম করিল, আপন গণ্ডীটি ছাড়িয়া নূতন জ্ঞানে নূতন প্রেরণায় তাহার অন্তরাত্মা ভরপুর হইয়া উঠিল, তাহার কর্মবীরগণ যখন অসীম সাগরের পারে ছুটিয়া চলিলেন, তখন সে জাতির সাহিত্য-ভাষাও ধরিল এক নূতন আকার। আদর্শ কর্মবীর রোমকের ভাষা সে সহজেই আপনার করিয়া লইল। আর তারই ফল সেক্সপীয়র মিল্টন।

তখনকার আলোড়ন-মিশ্রণের মধ্য দিয়াই উৎপন্ন হইয়াছে ইংরাজী ভাষার পূর্ণাঙ্গ দেহটি, পরবর্ত্তী যুগে কুইন আনের সময়ে তাহাই সাধারণ সাহিত্যের ভাষারূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। আর বর্ত্তমান যুগে সে ভাষার যতই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকুক না কেন, কাঠামটি এখনও সেই একই রহিয়াছে। খাঁটি অবিমিশ্রিত ইংরাজীর ধরণটি বজায় রাখিবার জন্য তখনও প্রচেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু ইংরাজের মুক্তপ্রতিভা কোনরূপ বন্ধন বা সঙ্কীর্ণ মানদণ্ডে আপনাকে আঁটিয়া রাখিতে পারে নাই। শুধু লাতিন কেন, বৈদেশিক সব ভাষা হইতেই ইংরাজ যেমন সহজে ও অকুণ্ঠিতচিত্তে উপকরণরাজী সংগ্রহ করিয়াছে, বৈদেশিক ভঙ্গিমায় আপনাকে যথেষ্ট ঢালিয়া দিয়াছে, এমন কোন জাতি তাহা পারে নাই। সাহিত্যে সব ভাষাই কেমন বর্ণসঙ্করের ভয় করিয়া আসিয়াছে, চাহিয়াছে নিজের রক্তের শুদ্ধতা বজায় রাখিতে; কিন্তু ইংরাজীভাষা তেমনটি করে নাই। তাই দেখি, ইংরাজীভাষা তাহার কবি সেক্সপীয়রের মনেই এত স্বাধীন—এত বৈচিত্র্যে ভরা, ভাবরাজ্যে এবং সেই জন্য কর্ম্মরাজ্যেও এত দূরপ্রসারী। মানুষের কণ্ঠে যত রকম ভাবের—যত রকম ভঙ্গিমার খেলা ফুটিয়া উঠিতে পারে, ইংরাজীতে যেমন তার পূর্ণ প্রকৃতিটি পাই, আর কোন ভাষায় তাহা পাই না। সত্য বটে, বিশেষ ভাষার এক বিশেষ গুণ আছে এবং সেই গুণের দিক্ দিয়া দেখিলে ইংরাজী ভাষা অন্যান্য ভাষা হইতে নিকৃষ্টতর হইতে পারে। ফরাসী ভাষার প্রাঞ্জলতা, তাহার বলয়িত গতিভঙ্গিমার তুলনা নাই। ইতালীয় ভাষার সে মধুর সঙ্গীতের মুচ্ছনা আর কোন ভাষায় অসম্ভব। কিন্তু ইংরাজী যদি এইরূপ কোন বিশেষ আদর্শ, একটা বিশেষ standard যদি না খাড়া করিয়া থাকে, তবে তাতে ক্ষতি না হইয়া বরং তার লাভই হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে বিশ্বপ্রকৃতিরই বহুরূপ। স্বাভাব্যকে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অবাধ গতি দেওয়ার ফলে তাহাতে এত বহুভঙ্গিমা, এত অশেষ সম্ভাবনীয়তা স্থান পাইয়াছে। সেই জন্যই দেখিতে পাই, বিদেশী ভাব ইংরাজীতে যেমন যথাযথ ব্যক্ত হয়, আর কোন ভাষায় তেমনটি হয় না। গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত অথবা আধুনিক কোন ভাষায় রচিত কাব্যের ইংরাজী অনুবাদ যত সহজে, নিখুঁৎভাবে, যত মূলানুযায়ী করিয়া তোলা যায়, অন্যান্য ভাষায় তাহা যায় না।

ফরাসী ভাষায় শুধু ফরাসী প্রতিভার অনুরূপ সৃষ্টি ব্যতীত বিদেশী কিছু প্রতিফলিত করা নিতান্তই কঠিন—ইংরাজীতে যেখানে সাধারণ লেখকের দক্ষতাই যথেষ্ট, ফরাসীতে সেখানে দরকার হইবে একজন *genius*.

ফরাসী ভাষার টলটল প্রাঞ্জলতায় আমরা মুগ্ধ এবং দেখাইয়া থাকি, বাংলার প্রকৃতি কতখানি ফরাসীর অনুরূপ। আর সেই জন্য বাংলাকে কেবল ফরাসীরই আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছি। কিন্তু ফরাসী ও বাংলার মধ্যে যতই মিল থাকুক না কেন, বাংলার অন্তরে যদি কিছু নূতন সম্ভাবনীয়তা থাকে বা নূতন কিছু অনুসৃত করিয়া দিতে পারি, তবে তাহাকে প্রথম হইতেই পরধর্ম্য বলিয়া নিরসরণ করিবার যথেষ্ট কারণ দেখি না। সব ভাষায় সব রকম সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ভাষার কোন একটি পদ্ধতি বা ভঙ্গিমাকে একান্ত করিয়া ধরিতে হইবে, তাহার অতিরিক্ত কিছু করিবার প্রয়োজন নাই, এমন বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের “ছিন্নপত্র” বা “ঘরে বাইরে” খুব সুন্দর—খুব মনোহারী হইতে পারে, বাংলা গদ্যের একটা নূতন দিক্ বোধ হয় তাহা খুলিয়া দিয়াছে অথবা চণ্ডিদাসের সে পূর্বতন বাংলারই সরলতা ঋজুতা সরস অন্তরঙ্গতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; কিন্তু কেবল সেইটুকুই যে বাংলার প্রাণ, তাহার চরম বিকাশ, আর যাহা কিছু, তাহা আরোপমাত্র, তাহা সংস্কৃত-ইংরাজীর জীবনশূন্য অনুবাদ, এরূপ নির্দেশ করাও দুঃসাহসই।

বাংলা ভাষায় আমরা সংস্কৃতের একটা বিশিষ্ট স্থানই দিতে চাই, তার কান্যে লাতিন প্রতিভারও ছবি পাইতে চাই—ধ্বনির পূর্ণতা, অলঙ্কারের ঐশ্বর্যকেও বহিষ্করণ করিতে চাই না—সেই জন্য যে আমাদের লক্ষ্য বাংলাকে গোড়ীয়রীতিতে গড়িয়া তুলি বা তাহার কাব্য কেবল *declamation* ভরিয়া দেওয়া, সে আশঙ্কা কেহ করিবেন না। সাধুভাষা যে সহজ সরল প্রাঞ্জল হয় না, তাহা নয়। আবার বর্ণে শব্দে আভরণে অলঙ্কারে সাজিলেই কাব্য যে *declamation* হইয়া পড়ে, তাহাও নয়। *Great poetry* সন্ন্যাসীর মত একেবারে নিরাভরণ হইতে পারে, আবার সকল রকম সাজ-পোষাকে রাজমূর্তিও ধরিতে পারে। দুই রকম সত্যের, দুই রকম ভাবের দুই রকম অভিব্যক্তি মাত্র। আমাদের মতে সাধুভাষাটি এই উভয় ছাঁচেই ঢালা যাইতে

পারে। চলিত ভাষা যদি একটিকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, তবে বলিব, সাহিত্যের আদর্শকে সে সক্ষীর্ণ করিয়া দেখিতেছে, বাংলাকে ঘরের কোণে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিতেছে।

সাহিত্যের ভাষার একটা standard স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে আর একটা কথা বলা হইয়াছে যে, কলিকাতা অঞ্চলের কথোপকথনের ভঙ্গিমা অনুসারেই বাংলাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কারণ, বাংলাভাষার স্বাভাবিক গতিই দেখিতেছি এই দিকে। আর সাহিত্যের ভাষাকে জীবন্ত রাখিতে হইলে এইরূপ একটা চলিত বা দৈনন্দিন মৌখিক আলাপনের ভাষারই অনুরূপ করিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু কোন দেশের একটা dialect বিশেষই যে সে দেশের সর্বসাধারণের সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিবে, এমন কোন অকাট্য নিয়ম কিছু নাই। দাস্তে তসকানের (Tuscan) প্রাদেশিক ভাষাকে ইতালীয় সাহিত্যের ভাষা করিয়া তুলিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সব দেশে এমন ঘটে নাই বা ঘটতে বাধ্য নয়। ইংলণ্ডে সাহিত্যের ভাষা King's English কোন প্রাদেশিক ভাষার গড়নে গঠিত হয় নাই। দেশের নানা দিক্ হইতে ফরাসী প্রভাবগ্রস্ত রাজপরিষদে যে নানান ভাষাভাষীর মিশ্রণ হইয়াছিল, সেই আংগ্লোসাক্সনের নানা dialect ও নর্মাণভাষার মধ্য হইতে উঠিয়াছে ইংরাজী। ফরাসীকে বলা হয় বটে Isle de France এর ভাষা, কিন্তু সে ভাষা কত পরিবর্তিত; পরিবর্তনের ফলে, অন্যান্য dialect এর কত মিশ্রণের ফলে, পণ্ডিতদিগের কত কারসাজীর (scholasticism) পরে তবে সাধারণের সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। প্যারীসগরে যে ধরণে কথোপকথন চলে, তাহার সহিত এখন এই সাহিত্যের ভাষার সাদৃশ্য খুব অল্পই। আর প্রাচীন গ্রীসে যখন একটা সাহিত্যের সর্বসাধারণ ভাষা গড়িয়া উঠিল, তখন সেই attic ভাষা যে অতিমাত্র আথেন্সেরই গৃহস্থালীর সুরের অনুরূপ হইয়াছিল, তাহাও ঠিক নয়। পূর্বতন প্রধান তিনটি প্রাদেশিক ভাষা হইতেই প্লেটো তাঁহার ভাষার গড়ন পাইয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা মনে করি, ইহাই অধিকতর সত্য যে, সাহিত্যের ভাষার উপর বিশেষ কোন dialect এর যতই প্রভাব থাকুক না কেন, সব dialect হইতেই ন্যূনাত্মক পরিমাণে সে উপকরণাদি সংগ্রহ করে, কোন একটা প্রাদেশিকতা সে

অনুসরণ করিয়া চলে না, যেখান হইতে যাহা লইবার যোগ্য, যাহা লইতে পারে, তাহা লইয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিকে আপন পথ করিয়াই সে চলিয়াছে। আর এইরূপেই সাহিত্যের ভাষা পুষ্ট, সমৃদ্ধ, একটা বিশিষ্টতায় মণ্ডিত হইয়া উঠে।

বঙ্গভাষা কোন বিশেষ dialectকে ধরিয়া গঠিত হয় নাই। রাঢ়দেশের প্রভাব তাহার উপর যতই থাকুক না কেন, রাঢ়দেশের ভঙ্গিমা বা স্বরকেই সে একান্ত করিয়া লয় নাই। আর সে-জন্যই যে সে জড় মৃতবৎ হইয়াছে বা হইয়া উঠিবে, তাহা কিছু নয়। এ কথাটি মানিয়া লইতে আমরা ইতস্ততঃ করিবই যে, সাহিত্যকে জীবন্ত রাখিতে হইলে মৌখিক ভাষায় অর্থাৎ কথাবার্তায় যে শব্দ যে ভঙ্গিমা ব্যবহার করি না, বা করিতে পারি না, তাহা সব বিসর্জন দিতে হইবে। বঙ্গভাষা পণ্ডিতগণের গড়া ভাষা, ইহা স্বীকার করিলেও আমরা দেখিতেছি, এ ভাষা বাঙ্গালীর সাহিত্যের প্রাণের ভাষাই হইয়া উঠিয়াছে—দৈনন্দিন জীবনকে ছবছ অনুকরণ না করিয়া চলিলেও তাহাতে জীবনেরই অভিব্যক্তি হইয়াছে ও হইতে পারে। সে জীবন একটু ভিন্নপ্রকার, এই যা পার্থক্য।

কিন্তু থিওরি হিসাবে সাধুপন্থী ও চলিতপন্থীদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে দেখিতেছি, সব প্রভেদ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামগুলি ও আর দুই চারিটি কথা লইয়া। সাধুপন্থীদের মধ্যে যেমন সংস্কৃতশব্দ, সংস্কৃত syntax অথবা ইংরাজীভঙ্গিমা দেখা যায়, চলিতপন্থীদের মধ্যে যে তাহার নিতান্ত অভাব, এমন বলা যায় না। কলহ কেবল “করিতেছি”, “হইয়া” “ইহারা” “নহে” লিখিব, না লিখিব, “কচ্ছি”, “হয়ে”, “এরা”, “নয়”। “কচ্ছি” “হয়ে” প্রভৃতি যদি সাহিত্যে স্থান পায়, তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু সে-জন্য সাধু কথাগুলি যে অবাংলা বলিয়া নির্বাসন করিতে হইবে, এমন প্রয়োজন দেখি না। মুখে আমরা “করিতেছি” “হইয়া” বলি না বটে, কিন্তু মুখে “নূতন”ও বলা হয় না, “চলিতও” বলা হয় না—বলা হয় “নতুন” “চলতি”। তবুও ত চলিতপন্থীদের লেখায় এ সব “অ-মৌখিক” শব্দ যথাতথ্য দেখিতে পাই। আর “নূতন” বা “চলিত” লিখিলে ভাষার যে জীবনহানি হয়, এমনও তাঁহারা

স্বীকার করেন না। স্মৃতরাং “করিতেছি”, “ইহারা” লিখিলেই যে সব যজ্ঞ পণ্ড হইবে, এমন আশঙ্কা করিবার কিছু নাই। ছন্দের জগৎ যদি কোথাও লিখিতে পারি “নূতন”, কোথাও লিখিতে পারি “নতুন”, তবে শুধু ছন্দ নয় ভাবের—অর্থের একটা বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিবার জগৎই লিখিতে পারি “করিতেছি”, “হইয়া”, “ইহারা”, “নহে”।

সে যাহাই হউক, বঙ্গভাষা ও বাংলাভাষার একটিকে মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করা ও অপরটিকে বিদেশী বলিয়া বিতাড়িত করা সমীচীন হইবে না। বাংলার হৃদয়ে এতখানি উদারতা বোধ হয় আছে—যাহাতে দুইটিই সেখানে স্থান পায়। অবশ্য, কোন ভঙ্গিমার সামর্থ্য কতখানি ও কোন দিকে সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার নিরসন তর্কে হইবে না। সে সমগ্র-পূরণ হইবে সৃজনের দ্বারা, সাহিত্য-রচনার দ্বারা। চলিতপন্থীরা যে সত্যটুকুকে কার্যে পরিণত করিতে চাহিতেছেন, তাহা যে আমরা দেখিতেছি না, তাহা নয়। সেটা হইতেছে আধুনিক যুগের ধর্ম। বর্তমান যুগের গতি হইতেছে বিশ্লেষণের দিকে, জিনিষকে কাটিয়া ভাঙ্গিয়া পৃথক পৃথক করিয়া দেখান। সকল ভাষাতেও দেখি, এই বিশ্লেষণময়ী প্রকৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। সে চায় ভাবকে, অর্থকে, কথাকে টুকরা টুকরা করিয়া, সরল সহজ মিহি করিয়া, বলয়িত ভঙ্গিমায় সাজাইয়া তুলে। বাংলার চলিতভঙ্গিমা এই আদর্শটিকে কতখানি প্রতিফলিত করিতেছে বা করিতে পারে, সে প্রশ্ন আমরা করিব না। কিন্তু এই আদর্শ একটা পদ্ধতিমাত্র। ইহারই মধ্যে যে সাহিত্যিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ বা চরম পরিণতি, তাহা কে বলিতে পারে? আর বর্তমান যুগেও আর কোন ভঙ্গিমার খেলা হইতে পারে না, এমন নিয়মই বা কে করিয়া দিতে পারে?

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

বুদ্ধিমানের কন্ম

আঠার উনিশ বৎসর পূর্বে লণ্ডন সহরের পূর্বভাগে একবার জল যোগাইতে একটু গোল হয়। চব্বিশ ঘণ্টা জলের কলে জল চলিত না। আমি তখন বিলাতে। প্রথমে ছ'চারদিন এই বিষয়ে খবরের কাগজে লেখালেখি চলিল। তার পর এক-দিন শুনিলাম যে, যে-কোম্পানীর উপরে জল যোগাইবার ভার, একদল লোকে তাহাদের আফিসে যাইয়া, চড়াও করিয়া, সে বাড়ীর জানালা দরজা ভাঙ্গিয়া দিয়া আসিয়াছে। পরের দিন খবরের কাগজ খুলিয়াই দেখি, পূর্বলণ্ডনের জলাভাব দূর করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

এটা ইংরাজের প্রকৃতি। বাহা তাগার প্রাপ্য, ভালয় ভালয় না পাইলে জোর করিয়া তাহা আদায় করিয়া লয়। চব্বিশ ঘণ্টা কলে জল না চলিলে ইংরাজের জীবন যাত্রা নির্মাহ নিতান্ত দুর্ভাগ হইয়া উঠে না। স্নানটা ইংরাজের নিত্যকন্ম নয়, পানের জন্তও জল না হইলে যে চলে না, এমন নয়। তিন চার চিলিমিচি জল হইলেই বাহাদের দেহ-শুদ্ধি হয়; পান করে যারা খেনো বা বীয়ার, স্নান করে যারা পাব্লিক বাতে বা সাধারণ স্নানাগারে, তাদের ঘরের কলে চব্বিশ ঘণ্টা জল না চলিলে তেমন কিছু আসিয়া যায় না।

আমাদের খাইতে, ভুইতে, বসিতে সর্বদাই জলের প্রয়োজন। অথচ আমরা এই সহরে বহুদিন চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ীর কলে জল পাই নাই। কাগজে-কলমে এখন পাইবার কথা, কিন্তু পাই কি না, মা গঙ্গাই জানেন। ইংরাজের কলে চব্বিশ ঘণ্টা জল চলার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইংরাজ সে কথা ভাবে না। ইংরাজ বুঝে, জলের ট্যাক্স যখন বোল আনা আদায় করিয়া লও, সময়মত ট্যাক্স না পাইলে বল কাটিয়া যাও, তখন সর্বমত আমার ঘরের কলে জল যোগাইবে না কেন? জলের ট্যাক্স যে দেয়, জল যোগাইতে সে বাধ্য। আর যদি সে না দেয়, তবে বাহাতে সে দেয়, তার উপায় করিতে আমিও বাধ্য। ইহা আমার সিভিক ধর্ম। কথায় যদি সে সোজা হয় ভাল, না হইলে মূর্থস্ত লাঠৌষধি।

আমরা ইহা বুঝি না। আমরা জানি, আমাদের বাহা দেয়, আমরা তাহাই দিতে বাধ্য। অপরের বাহা করণীয়, সে যদি তাহা না করে, সে দায় তার, আমাদের নহে। আমরা জলের ট্যাক্স দিতে বাধ্য। না দিলে বা না দিতে পারিলে, ঘটি-বাটিটা ক্রোক করিয়া সেই ট্যাক্স আদায় করিয়া লইতে পারে।

সুতরাং জল পাই আর না পাই, ঘটিবাটিটা বাঁচাইবার জন্ত কিস্তি-মাফিক টাকুন দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কর্ম। জল যোগান ত আমার কর্ম নয়। যার কর্ম, সে যদি তাহা না করে, আমি তার কি করিব? কলে যদি জল না চলে, ঘড়া কাঁধে করিয়া, বা ভারী ডাকিয়া গঙ্গাজল আনিতেই হইবে। জলের প্রয়োজন প্রাণের জন্ত; প্রাণের প্রয়োজন জলের জন্ত ত নয়। যাহার উপরে জল যোগাইবার ভার, সে জল যোগায় না বলিয়া, তার সঙ্গে নারামারি করিতে যাইয়া, পৈতৃক প্রাণটা হারাইতে যাই কেন?

জীবনের সাড়ে চৌদ্দ আনা পথে খেয়ার কড়ি দিয়া সাঁতারিয়া নদী পার হওয়াটা আমাদের স্বভাব। খেয়ার কর্তা আমি নই, খেয়ানী। খেয়ার নৌকা পারাপারে গতাগতি করে, খেয়ানীর ইচ্ছায়। তিন ঘণ্টা তীরে দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিলেও যদি ও-পারের নৌকা এ-পারে না লাগে, তাহা হইলে আমি কি খেয়ানীর সঙ্গে, তারই ঘাটে, তার আপনার ঘরের মাঝখানে, একটা লড়াই বাধাইয়া লাক্তিত হইতে যাইব? সুখের চাইতে আমার স্বেচ্ছাশ্রিত্যই ভাল। আমার প্রয়োজনেই আমি ও-পারে যাইতে চাই, খেয়ানীর প্রয়োজনে নয়। খেয়ার নৌকা যখন এ-ঘাটে আসিয়া লাগিল না, তখন ছুঁগা! ছুঁগা! বলিয়া সাঁতার দিয়া নদী পার হইয়া, ও-পারে যাইয়া, ভাল মানুষটির মতন, খেয়ানীকে খেয়ার কড়িটা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ইংরাজ ঘটে এত বুদ্ধি নাই। ইংরাজ নিজের কর্ম পণ্ড করিয়াও অপরকে ছোর করিয়া তার কর্তব্য কর্মে নিযুক্ত রাখে। এইরূপে নিজের কর্ম পণ্ড করাকে ইংরাজ সিভিক ধর্ম কহে।

মহাভারতে একটা কাহিনী আছে। রাজা ও রাজধর্মের উৎপত্তি কখন, কিরূপে হইল বুঝিবার এই প্রশ্ন করিলে, ভীষ্ম কহিলেন, আদিতে রাজাও ছিল না; রাজধর্মও ছিল না। প্রজারা নিজেই আপনাপন কর্তব্য পালন করিয়া সমাজস্থিতি রক্ষা করিত। কালক্রমে কতকগুলি লোক আলমুপরাষণ হইয়া নিজের কর্তব্য-কর্মে অবহেলা করিতে লাগিল। তখন অপরে তাদের সেই অকৃত কর্মের ভার নিজেদের হাতে তুলিয়া লইল। কর্ম যে করে, সে-ই কর্তা হয়। কর্তা হইলে কর্তব্য করিতেই সে ছাড়িবে কেন? সমাজের কর্ম করিতে যাইয়া দশজনের উপরে কর্তব্য করিতে আরম্ভ করিলেই মেজাজটাও আপনা হইতে বিগড়াইয়া যায়। সমাজ-কর্তাদের মেজাজ বিগড়াইলে, সমাজ-শাসন নিষ্পেষণ হইয়া উঠে। নিষ্পেষণের মাত্রা বাড়িলেই নিষ্পেষিতের মনে জিঘাংসার উৎপত্তি হয়। ইহার ফলে মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হইয়া সমাজে অরাজকতা উপস্থিত হয়। অরাজকতা যখন উপস্থিত হইল, তখন অধর্মের তার সহিতে না পারিয়া বিশ্বমাতা বসুন্ধরা স্বয়ং

নারায়ণের দরবারে যাইয়া মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। নারায়ণ পৃথিবীর চুপের কথা শুনিয়া, ধ্যানস্থ হইয়া প্রথমে একটা সমাজবিধি রচনা করিলেন। পরে সমাজকে সেই বিধি-অনুযায়ী চালাইবার জন্ত একজন মানস-পুত্রের সৃষ্টি করিয়া, তাঁহার উপরে সমাজ-শাসনের সকল ভার অর্পণ করিলেন। এইরূপেই আদিরাজ্যের উৎপত্তি হয়।

প্রজাগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য গাণন করিয়া সমাজ-শৃঙ্খলা ও সমাজ-স্থিতি রক্ষা করিবে, ইহাই সনাতন রাষ্ট্রধর্ম। আর যেখানে কোন লোকে আপনার এই কর্তব্য-পালনে পরাশ্রয় হয়, সেখানে সে কৰ্মটা কেবল তারই নয়, আমারও; তার কৰ্মাকর্মের ফলভাগী আনাকেও হইতে হয়; সে যখন তার কর্তব্য-পালন না করে, তাহাতে সে নিজেই অক্ষম হইয়া পড়ে, তাহা নহে, সমাজও দুর্বল হয়; সমাজের দুর্বলতা-বৃদ্ধিতে অরাজকতার সূত্রপাত হয়;—এ সকল বুঝিয়া ও ভাবিয়া রাজাপ্রজা সকলকে নিজ নিজ কর্তব্যসাধনে নিযুক্ত রাখা, সমাজের প্রত্যেক লোকের কৰ্ম। এ কৰ্ম না করিলে আমরা সমাজ স্থিতি-ভঙ্গের সহায়তা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তাগী হই। ইহাই ইংরাজের সিভিক ধর্ম।

পাড়ার পাহারা দেওয়া পুলিশের কাজ, আমার নয়; ইহা সত্য। কিন্তু পুলিশ যদি পাহারা না দিয়া, কেবল গরুর গাড়ীর নির্দোষ গাড়ওয়ানদের তাড়া করিয়া বেড়ায় এবং কিসে তাদের নিকট হইতে দু'পয়সা কাড়িয়া লইতে পারে, তারই চেষ্টা দেখে; তাহা হইলে সেই পুলিশকে শাসন করা আমারও কাজ। সমাজে শাস্তি-রক্ষার জন্তই পুলিশ মাহিনা খায়, শাস্তি ভাজিবার জন্ত নহে। আর প্রত্যেক কনেষ্টবলকে দিয়া যথাবিধি পাড়ার পাহারা দেওয়াইবার জন্ত। সঙ্গে সঙ্গে একজন হেড্ কনেষ্টবল, এবং হেড্ কনেষ্টবল যাতে কনেষ্টবলের উপরিপাওয়ার উপরে চৌথ না বসায়, তাহা দেখিবার জন্ত একজন সর্ব-ইনিস্পেক্টর—এইরূপে প্রত্যেক গলির মোড়ে চব্বিশ ঘণ্টা গোটা থানাটা ত আনিয়া দাঁড় করিয়া রাখা যায় না। এইজন্ত কনেষ্টবল তার কর্তব্য করিতেছে কিনা, এটা দেখা পাড়ার লোকেরই কৰ্ম। ইংরাজ বলে, এইটাই সিভিক ধর্ম।

আমরা সংবাদপত্রে ও সভাসম্মেলনে দিনরাত পুলিশের গালিনিন্দা করি। পাড়ার পাহারাওয়াল লোকের উপরে অত্যাচার করিলে, অদৃষ্ট থাকিয়া, বেনামী চিঠি ছাপাইয়া উপরওয়ালাদের উপরে খুব তর্জি করিয়া থাকি। কিন্তু একথাটা ভাবিয়া দেখি না যে, পাড়ার লোকে যদি কনেষ্টবলের ভয়ে দিনরাত জুজু হইয়া থাকে, তাদের চ'খের সামনে যখন বে-আইনী কাজ হয়, তখন যদি তার প্রতিবাদ না করে, কচিং কোন নিকোঁধ লোকে তার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া যদি বিপদে পড়ে,

পাড়ার লোকে যদি তখন সত্যকথা বলিবার জন্ত তদন্তের সময় সাক্ষী দিতে পর্যাশ্র না দাঁড়ায়, তাহা হইলে থানার কর্তাদের ত কপাই নাই, খোদ লাট সাহেবেরও সাধ্য নাই যে, পুলিশের উৎপীড়ন হইতে লোককে রক্ষা করেন।

ইংরাজের নিজের দেশে এরূপ উৎপীড়ন হয় না, হইতে পারে না; এইজন্য যে সেখানে দেশে মিলিয়া দেশের পুলিশ-প্রহরীদের সর্বদা সায়েস্তা রাখে। বে-আইনী কাজ দেখিলেই তার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া কাহারও সঙ্গে পুলিশের বিবাদ বাধিলে পাড়ার লোকে, দেশের লোকে সে বিবাদটা নিজের করিয়া লয়। সত্য ঘটনা কি যারা জানে, নিজেদের সুখস্বোয়াস্তি বিসর্জন দিয়া তারা আদালতে সাক্ষ্য দিতে দাঁড়ায়। নিতান্ত অপরিচিত পথের লোকেও সে দেশে, এ সকল ঘটনায়, প্রয়োজন হইলে, সাক্ষ্য দিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া, নিজের নাম-ধাম লিখাইয়া দিয়া যায়। এইটা ইংরাজের সিভিক ধর্ম।

আমাদের মধ্যে এই সিভিক ধর্মের প্রচার হইয়াছিল কিনা জানি না। কিন্তু এখন যে তার চিহ্নমাত্র নাই, ইহা দেখিতেছি। এই সিভিক ধর্ম আমাদের নাই বলিয়াই আমরা জীবনের সাড়ে চৌদ্দ আনা বিষয়ে, কর্তার ইচ্ছার কর্ম বলিয়া হাত উন্টাইয়া নিশ্চিন্ত হই।

কেহ কেহ বলেন, এই নিশ্চেষ্টতার জন্ত আমাদের ধর্ম ও সমাজ দায়ী। নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পরের ঘাড়ে চাপাইয়া চলা, ভারতবর্ষের ধর্মের, সমাজনীতির, চিরদিনের আভাস। ধর্ম আমরা শাস্ত্রের উপরে সত্যাসত্য-নির্দ্ধারণের ভার দিয়া, ধর্মমীমাংসায় নিজের বিচারবুদ্ধি-প্রয়োগের দায় হইতে মুক্ত হই। কর্ম আমরা দেশাচারের উপরে কর্মাকর্ম-নির্দ্ধারণের ভার দিয়া, ভাল-মন্দ-বিচারের দায় হইতে মুক্ত হই। এইরূপে জীবনের সকল বিষয়ে ও সকল বিভাগেই আমরা নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্বকে চাপিয়া রাখিয়া পরমতানুবর্তন ও পরের শাসন মানিয়া চলি। এই জন্তই আমাদের মধ্যে এই সিভিক ধর্মটা গড়িয়া উঠিতেছে না। ইংরাজ সকল বিষয়েই আপনার উপরে নির্ভর করিয়া চলে ও চলিতে চাহে। এই জন্ত ইংরাজের সমাজে ও রাষ্ট্রে সর্বত্রই জনগণের স্বত্ব-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

এ সকল কথা নূতন নহে। এই সকল কথার মধ্যে যে কোনই সত্য নাই, তাহাও নহে। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র এ সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু নহে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, নানাবিধ কর্মের ভিতর দিয়া যেমন একই অর্থও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়, সমষ্টিগত সমাজ-জীবনেও সেইরূপ, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের নানাবিধ সাধন ও শাসনের ভিতর দিয়া একই সমাজচরিত্রের বা সমাজ-জীবনের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। আমাদের এই দেহের মধ্যে, দেহের

বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রাদির পরস্পরের সঙ্গে যেমন একটা অঙ্গাদ্বী সম্বন্ধ (বা organic relation) আছে, শরীরের একটি অঙ্গের বা শরীরের ভিতরকার একটি যন্ত্রের বিকারে বা দুর্বলতায় যেমন অগ্ৰাণ অঙ্গকে ও সমুদায় দেহকে দুর্বল এবং স্বল্পবেণী বিকৃত করিয়া তোলে, সমাজ-দেহেও তাহাই ঘটে। সমাজেও ধর্ম-তন্ত্র, রাষ্ট্র-তন্ত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য-তন্ত্র, পারিবারিক গঠন, এ সকলের মধ্যে একটা অঙ্গাদ্বী সম্বন্ধ আছে। অতএব ধর্ম যদি দুর্বল বা বিকৃত হয়, রাষ্ট্র তখন সবল ও সুস্থ থাকিতে পারে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্বন্ধে যদি জ্ঞান ও সত্যের প্রতিষ্ঠা না হয় বা না থাকে, তাহা হইলে পরিবারেও জ্ঞান এবং সত্যরক্ষা সম্ভব হয় না। সমাজ-জীবনের কোন বিভাগে দুর্বলতা প্রবেশ করিলেই, সকল বিভাগ দুর্বল হইয়া পড়ে। সমাজ-জীবনের কোন অঙ্গে বিকার ঘটিলে ক্রমশঃ অপর অঙ্গেরও বিকৃতি ঘটে। এ সকল কথা অস্বীকার করা অসম্ভব।

কিন্তু প্রশ্ন এই,—আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় অবস্থার জন্ত আমাদের ধর্ম ও সমাজই দায়ী, অর্থাৎ আমাদের ধর্মে ও সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার অভ্যাস ও অবসর নাই বলিয়াই কি আমরা রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রজামত ও প্রজাস্বত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছি না,—কিংবা বহুদিন হইতে আমরা রাষ্ট্রীয় জীবনে পরাধীন হইয়া আছি বলিয়াই ধর্মে ও কর্মে আমাদের এই শাস্ত্রানুগত্য ও আচারবশ্ততা আসিয়াছে? এইরূপে এই প্রশ্নটা তুলিলেই, বোধ হয়, মূল ইস্যুটা পরিষ্কার হইয়া উঠে।

বিদেশীয় সমালোচকেরা চিরদিন কহিয়া আসিতেছেন যে, আমাদের ধর্ম ও সমাজ-নীতিই আমাদের রাষ্ট্রীয় অক্ষমতার নিদান। স্বদেশের সমাজ-সংস্কারকেরাও অনেক দিন হইতে পাকে-প্রকারে এ সকল কথা কহিয়াছেন। জ্ঞান সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ধর্ম-প্রচারক নন, কিন্তু সমাজ-সংস্কারক। আর দুই বৎসর পূর্বে কংগ্রেসের বঙ্গমঞ্চ হইতে তিনি এই কথাই কহিয়াছেন। স্বারাজ্য লাভের উপায় আলোচনা করিতে যাইয়া, সিংহ-সাহেব কহিয়াছেন :—

“We can obtain the priceless treasure of Self-Government only by means of such possessive improvement; in our mental, moral, and material condition, as will, on the one hand, render us worthy of it, and, on the other, impossible for our rulers to withhold it.”

অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে যখন আমরা একরূপ মানসিক, সামাজিক ও বৈষয়িক বা আর্থিক উন্নতিলাভ করিব, যাহাতে আমাদের স্বারাজ্য-সন্তোষের অধিকার জন্মিবে, তখনই আমাদের বর্তমান রাজপুরুষদিগের পক্ষে আমাদেরকে এই স্বারাজ্য হইতে বঞ্চিত রাখা অসাধ্য হইবে।

সিংহ-সাহেবের মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির লক্ষণা ও মাপকাঠিটা যে কি, তাহা তিনি খুলিয়া বলেন নাই। ইংরাজ স্বারাজ্য ভোগ করিতেছে। অতএব যে মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক উন্নতিলাভে স্বারাজ্যের অধিকার জন্মে, ইংরাজের তাহা অবশ্যই আছে। এই অনুমানখণ্ডে সিংহ-সাহেবের উপদেশের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইংরাজের মতন বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইলে, এবং ইংরাজ-সমাজের আর্থিক অবস্থানান্ত করিতে পারিলেই স্বারাজ্যলাভে আমাদের সত্য অধিকার জন্মিবে। এই জন্তই সিংহ-সাহেব কহিয়াছেন—এখনও ভারতে স্বারাজ্য-প্রতিষ্ঠার সময় আইসে নাই। তার জন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাক।

আনরা আগে স্বভাবে ও প্রভাবে ইংরাজ হইয়া পরে স্বরাজ পাইবার শক্তি ও যোগ্যতা লাভ করিব, রবীন্দ্রনাথ এমন কথা কোনও দিন বলেন নাই। সিংহ-সাহেব বিলাতী সভ্যতাকে যে চক্ষে দেখেন, রবীন্দ্রনাথ কোন দিন সে চক্ষে দেখেন নাই। সিংহ-সাহেব যে ভাবে, অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত স্বারাজ্যের অপেক্ষায় আমাদেরকে প্রতীক্ষা করিতে বলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাও বলেন না। অথচ সে দিন রামমোহন লাইব্রেরীর হলে “কর্তার ইচ্ছায় কন্ম” নান দিয়া যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, আমাদের ধর্ম ও সমাজনীতিকেই যে তিনি আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় দুর্গতির জন্ত দায়ী করিয়াছেন, ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না। ধর্ম আনরা নিতান্ত শাস্ত্রানুগত্যকে ও কন্মে একান্ত আচারবশ্ততাকে আশ্রয় করিয়া সর্বদা চলি বলিয়াই, রাষ্ট্রে আমরা যথাযোগ্য আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছি না। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়াই সে দিন এই কথা কহিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশ-প্রচলিত ধর্মের ও আচারবস্ত সমাজের যে সকল ত্রুটি দেখাইয়াছেন, তার অনেক কথাই সত্য। গতানুগতিক ধর্ম যে ভাবে শাস্ত্র মানিয়া চলে, তাহাতে ধর্মোচরণ সম্ভব হইলেও, ধর্মসাধন সম্ভব নয়; এ কথা শতমুখে স্বীকার করি। তবে এই শাস্ত্রানুগত্যের আলোচনা করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ ইহা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের দেশের জনসাধারণে যে ভাবেই শাস্ত্রানুগত হইয়া চলুক না কেন, সাধকেরা কোনও দিন, তিনি যে শাস্ত্রানুগত্যের অনিষ্টকারিতার উল্লেখ করিয়াছেন, সে ভাবে শাস্ত্র মানিয়া চলেন নাই। যারা এ দেশে ধর্মসাধন করেন, কেবল ধর্মোচরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন না, তাঁরা সর্বদাই সত্যবস্তকে ও তত্ত্ববস্তকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন; কেবল শাস্ত্র বা গুরুমুখে তার কথা শুনিয়া কোনও দিন তৃপ্ত রহেন নাই। তাঁরা সাধন-পথে যাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া সত্য বলিয়া বরণ করেন, অনেক সময় তার সঙ্গে বিস্তর কলন। মিশাইয়া থাকিতে পারে। আর মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, আমাদের এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গেও, সর্বদাই

বিস্তর কল্পনা মিশাইয়া থাকে। আমরা যতটুকু দেখি-শুনি, সৰ্বদাই তার চাইতে বিস্তর বেশী দেখিতেছি বা শুনিতেছি, এরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের সঙ্গেই যখন এত প্রকারের কল্পনা মিশাইয়া রহে, মানসপ্রত্যক্ষের সঙ্গে তাহা মিশিয়া যাইবে, ইহা আর তবে বিচিত্র কি! কিন্তু এ সম্বন্ধে এ দেশের ধৰ্মসাধনের মূল লক্ষ্য চিরদিনই দেবতার প্রত্যক্ষলাভ।

“তদেতৎ শ্রোতব্যং, দ্রষ্টব্যং, নিদিধ্যাসিতব্যম্”

পরম-তত্ত্বকে প্রথমে শ্রবণের বিষয় করিবে। অর্থাৎ শাস্ত্র-গুরুমুখে প্রথমে তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিবে। তার পর পরম তত্ত্বকে দর্শনের বিষয় করিবে। অর্থাৎ অপরেরা অনুভব দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবে। তার পর বারংবার তাঁহার ধ্যান করিবে। তাঁহাকে জীবনের সকল জ্ঞান, সকল ভাব ও সকল কৰ্মের সঙ্গে জড়াইয়া রাখিবে—এই উপদেশ আর কোনও ধৰ্ম-শাস্ত্রে নাই।

আর এই জন্তই আমাদের দেশের প্রচলিত ধৰ্মে ও শাস্ত্র নিজে নিজের প্রমাণ নহে। শাস্ত্রের প্রমাণ গুরু। যিনি সাধনবলে আপনার মধ্যে শাস্ত্রার্থের সত্য সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনিই গুরু-পদের অধিকারী; অন্যের এ অধিকার নাই। শাস্ত্রের প্রমাণ যেমন গুরু, সেইরূপ গুরুবাক্যের প্রমাণ শিষ্যের অপরোক্ষ অনুভব। যতক্ষণ শিষ্যের এই অপরোক্ষ অনুভব না হইয়াছে, ততক্ষণ গুরুর বাক্য অগ্রাহ্য হইবে না সত্য, কিন্তু তাহার প্রামাণ্যও প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই জন্তই বাহারা এ দেশে গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া ভজনা করেন, তাঁহারা পর্যন্ত সাধনের রাজ্যে, যতক্ষণ না কোন তত্ত্বের প্রত্যক্ষলাভ হইয়াছে, ততক্ষণ গুরুর কথা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন না—গ্রহণ করা নিষেধ। তাঁরাও বলেন—

যাহা না দেখ আপন নয়নে

তাহা না মান গুরুর বচনে।

ইহা শিষ্যের সংকল্প নয়, শাস্ত্রগুরুবর্জিত ধৰ্মের প্রচারকেরও প্রতিবাদ নহে। ইহা যে স্বয়ং গুরুরই উপদেশ।

ফলতঃ আমাদের ধৰ্ম শাস্ত্রের প্রভাব যত অল্প, জগতের আর কোনও প্রাচীন ধৰ্মে অত অল্প নহে। ইহার প্রমাণ - আমাদের ধৰ্মশাস্ত্র এক নহে, অনেক। অপরাপর ধৰ্ম-শাস্ত্র কালবিশেষে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের সকল শাস্ত্রের মূল যে বেদ, তাহাকে লোকে নিত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। বৈদিক যাজ্ঞিকেরা বেদ-মন্ত্র নিত্য, অনাদি, সৃষ্টির সঙ্গে এ সকল মন্ত্রের প্রকাশ হইয়াছে; এ সকলের কোনও রচয়িতা ছিলেন না, এরূপ বিশ্বাস করিতেন। তাঁরা মন্ত্রশক্তি বা ম্যাজিকে আস্থাবান ছিলেন।

অন্তপক্ষে জ্ঞানমার্গের সাধকেরা যে-বেদকে নিত্য কহিয়াছেন, তাহা মন্ত্র নহে, সে বেদ ঋগ্বেদাদি নহে। উপনিষদ এই ঋগ্বেদাদিকে অপরা বা নিকৃষ্ট বিদ্যা কহিয়াছেন, আর বাহ্যর দ্বারা “সেই অক্ষর বস্তুকে জানা যায়”—‘যস্মা তদক্ষরং অধিগম্যতে’—তাহাকেই পরা বিদ্যা কহিয়াছেন। আর উপনিষদ ইহাও কহিয়াছেন যে, শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের দ্বারা, যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা, ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মের দ্বারা, পঞ্চতপ প্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা,—এ সকলের কোন কিছুই দ্বারা সেই অক্ষরবস্তুকে জানিতে পারা যায় না। কেবল জ্ঞানের দ্বারাই সেই অক্ষরবস্তু লাভ হয়। “জ্ঞানেনৈবমাপ্নুয়াৎ।” আর—“অনুভূতিপর্যাস্তং জ্ঞানম্”—অপরোক্ষ অনুভবে যাহা প্রতিষ্ঠিত হয়, আমাদের পুরাতন মনীষিগণ তাহাকেই কেবল জ্ঞান বলিতেন;—শোনা-জ্ঞানকে তাঁহারা জ্ঞানই কহিতেন না। সূতরাং সাধকের অর্তাল্লিঙ্গ, অপরোক্ষ অনুভবেতে যাহা প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই পরা-বিদ্যা। আর তাহাই সেই বেদ—প্রাচীনেরা বাহ্যকে নিত্য, অপৌরুষেয় প্রভৃতি বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়াছেন।

আর বেদের এই নিত্যত্বের যেকোন ব্যাখ্যাই হউক না কেন, ধর্ম্মশাস্ত্রকে নিত্য বলিয়া বিশ্বাস করার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। সত্য প্রকাশ করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। আর প্রকাশ করাই যে-বস্তুর ধর্ম্ম, সে-বস্তু যদি নিত্য হয়, তবে এই প্রকাশের বিরাম ত কদাপি সম্ভব হয় না। এই জন্য হিন্দুর শাস্ত্র প্রকৃত-পক্ষে কোনও গৃহ-বিশেষ নহে। কিন্তু সত্যের ও তত্ত্বের একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশধারা মাত্র।

এই প্রকাশ-ধারাকে আশ্রয় করিয়া, প্রথমে ঋগ্বেদাদি বেদ-চতুষ্টয়ের প্রচার হয়। তার পর উপনিষদের, উপনিষদের পরে ব্রহ্মসূত্রের; ক্রমে পুরাণ-তন্ত্রাদির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এইরূপে আমাদের দেশে যুগে যুগে কত শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই।

সত্যের আঠার শত বৎসর ধরিয়া খৃষ্টীয়ানদিগের মধ্যে সেই একই বাইবেল একমাত্র অল্লাহ শাস্ত্র হইয়া আছে। এই বাইবেলের অনেক টীকা-টিপ্পনী রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তার এক পংক্তিও প্রামাণ্য-মর্যাদা প্রাপ্ত হয় নাই। আর আমাদের দেশে যুগে যুগে সাধক ও সিদ্ধমহাপুরুষেরা আপনাদের অস্ত্রের প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ও সেই আত্মপ্রত্যক্ষের অভিধানের সাহায্যে শাস্ত্রবাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়মধ্যে পূর্ব্বতন শাস্ত্রের সমান মর্যাদা ও অধিকার পাইয়াছে। এইরূপে প্রথমে ছিল বেদ-চতুষ্টয়; তার পর মহাভারত পঞ্চম বেদ হইয়া উঠিল। অন্তপক্ষে সাধন-পন্থার বিভাগ হইয়া, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদগীতা জ্ঞানসাধকের প্রস্থানত্রয় হইল। ভক্তিপন্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতসম্প্রদায়মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত কার্য্যতঃ বেদের সমকক্ষ হইয়া উঠিল। আর

সেই ধারাতেই ক্রমে এই সানাত্ত পাঁচশত বৎসরের মধ্যে গোড়ীয় বৈক্যবনওলীতে ত্রীত্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ভাগবতের সমান মর্যাদা পাইয়াছে। আর এই যে নব নব শাস্ত্রপ্রকাশের অবসর আমাদের ধর্ম্মে আছে, তাহাতে আমাদের দেশে শাস্ত্রানুগত্য যে প্রকৃত পক্ষে মানুষের আত্মার স্বাধীন বিকাশের কোনও অন্তরায় হয় নাই, ইহাই প্রমাণ হয়।

ফলতঃ রবীন্দ্রনাথ আমাদের শাস্ত্রকে বেক্রপ স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী রাজার বেশে সাজাইয়া সেদিন আসরে নামাইয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে ভারতের শাস্ত্র কোন দিন সেক্রপ ছিল না, এখনও সেক্রপ নাই। একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখিতে পাই যে, মানুষকে স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ করাই আমাদের সমাজ-তত্ত্ব ও ধর্ম্ম-তত্ত্ব উভয়ের চরম লক্ষ্য এই জ্ঞাতই আমাদের সমাজ-তত্ত্বে গার্হস্থ্যশ্রমে যেমন অশেষ প্রকারের আচার-নিয়মের বন্ধন আছে, সেইরূপ বানপ্রস্থে এ সকল বন্ধন অনেকটা আলগা ও সন্ন্যাসে কোনও বিধি-বন্ধনেরই বস্তুতা নাই। এই সন্ন্যাসাশ্রমই সকল আশ্রমের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সংঘর্ষে, সাম্যে ও মৈত্রীতে যে চরম স্বাধীনতার গোড়া-পত্তন, গার্হস্থ্য-শ্রমের বিধিবন্ধনের মধ্যে যার শুদ্ধিলাভ, বানপ্রস্থের ধ্যানচিন্তনে যার তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, সন্ন্যাসের চূড়া শিখরে তারই পূর্ণ প্রকাশ। এই স্বাধীনতাই জীবের পরম পুরুষার্থ। আর শাস্ত্র বল, গুরু বল, সনাজ বল, রাষ্ট্র বল, সকলই এই পরমপুরুষার্থসাধনের যন্ত্র, এই বৈকুণ্ঠলাভের সোপান।

এটা কেবল একটা প্রাচীন পুঁথিগত আদর্শ নহে। পুরাতন আশ্রম-ধর্ম্ম সমাজে কখনও পূর্ণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল কিনা, জানি না; এখন যে সেক্রপ আশ্রম-বিভাগ নাই, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। কিন্তু বর্তমানে ব্রহ্মচর্য্য এবং বানপ্রস্থই কার্য্যতঃ লোপ পাইয়াছে; গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস লুপ্ত হয় নাই। আর গার্হস্থ্যের বিধিবন্ধন বতাই কঠোর হউক না কেন, সন্ন্যাসে যে এখনও প্রকৃতপক্ষে তেমন কোনও বিধিবন্ধন নাই, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। আর আমাদের সমাজের ও ধর্ম্মের সকল বিধিবন্ধন বাহিরের কৰ্ম্মাকৰ্ম্মকেই কেবল নিয়মিত করিতে চাহে; অন্তরের মতামতকে বাধিয়া রাখিতে চাহে না। হিন্দুর ধর্ম্মই আচারগত, অনুষ্ঠানগত; খৃষ্টিয়ান বা ইসলাম ধর্ম্মের মতন মত-বদ্ধ নহে। আমাদের ধর্ম্মে যার বেক্রপ ইচ্ছা, সেইরূপ সিদ্ধান্তই সে গ্রহণ করিতে পারে। আমাদের শাস্ত্র এই জ্ঞাত, কোনও দিন লোকের চিন্তার স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করে নাই। দেহ-তত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বর-তত্ত্ব, কোনও তত্ত্ব-বিচারে গবেষণার গতিরোধ করে নাই। যে স্বাধীন হইতে চাহে, আমাদের শাস্ত্র তাহাকে চিরদিন সে অধিকার দিয়া আসিয়াছে, এখনও দিতেছে।

লোকের চিন্তাকে শাস্ত্র দিয়া বাধিয়া রাখিতে চাহে নাই বলিয়াই, আমাদের

দেশে প্রত্যেক শাস্ত্রের সঙ্গেই তার মীমাংসাও সেই শাস্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। বেদের জ্ঞানকাণ্ডের শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মসূত্র বা উত্তরমীমাংসা বহুদিন যুক্ত হইয়া আছে। কৰ্ম্মকাণ্ডের শাস্ত্রের সঙ্গে পূৰ্ব্ব-মীমাংসা সেইরূপ জড়াইয়া আছে। আর শাস্ত্রের সত্য অর্থনির্ণয়ে লোকের মনে যে স্বাভাবিক সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এ সকল মীমাংসার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শাস্ত্র, সন্দেহ, বিচার, সঙ্গতি, সমন্বয়,—অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহাই মীমাংসার ক্রম হইয়া আছে। আমাদের সাধনে সন্দেহকে পাপ বলিয়া বর্জন করে নাই; সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভবগতের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে; বিচারের দ্বারা, criticism-এর দ্বারা সন্দেহকে নিরস্ত করিতেই চাহিয়াছে। ছনিয়ার আর কোন শাস্ত্র ত সন্দেহকে এতটা মর্যাদা দান করে নাই। সন্দেহের এই মর্যাদাই আমাদের ধর্ম্ম স্বাধীন-চিন্তার মর্যাদার প্রমাণ।

ফলতঃ হিন্দু কি বিশ্বাস করিবে বা না করিবে, এ বিষয়ে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। এই বিশ্বাস যদি ধর্ম্ম-বিশ্বাস হয় এবং তার সঙ্গে যদি সামাজিক রীতিনীতির বা প্রচলিত বিধিব্যবস্থার গুরুতর বিরোধ হয়; তাহা হইলে সমাজ ছাড়িয়া, অত্যাশ্রমী হইয়া, সকল সামাজিক বিধিব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া, স্বাধীনভাবে জীবনপথে চলিবার অধিকারও হিন্দুকে তাহার শাস্ত্রশাসনই দিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বতন যুগে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রমত্রয়কে যথাবিধি অতিক্রম না করিয়া কেহ সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু ক্রমে পরবর্ত্তী যুগে সে নিয়মও উঠিয়া গেল। এখন, যখন-তখন, যে-সে দণ্ডধারণ করিয়া বা ভেক লইয়া সন্ন্যাসী বা বৈরাগী হইয়া সকল সমাজ-বন্ধনের অতীত হইতে পারে। এ ব্যবস্থা ত ছনিয়ার আর কুত্ৰাপি খুঁজিয়া পাই না।

কেবল তাহাই নহে। সমসাধকে মিলিয়া সাধকগোষ্ঠী গড়িয়া, নিজ নিজ সাধনের অনুকূল পারিবারিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা করিয়া লইবার অধিকারও এ দেশে চিরদিন ছিল, এখনও আছে। এইরূপেই আমাদের বাঙ্গালাদেশে, মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবেরা নিজেদের একটা বৈষ্ণব-স্বৃতি রচনা করিয়া লইয়াছেন। শাস্ত্র বা সমাজ তাঁহাদের এই স্বাধীনতা হরণ করে নাই। প্রাচীন স্বৃতির অনুগত হিন্দুগণ নূতন বৈষ্ণব-সমাজের সঙ্গে আদান-প্রদান বন্ধ করিলেন; কিন্তু, এই বৈষ্ণব-দিগের মধ্যে বিশেষ বিশেষ সিদ্ধ মহাপুরুষ বা সাধক দেখিতে পাইলে, তাঁহাদিগকে নিজেদের দীক্ষাগুরু করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। প্রাচীন সমাজের সমাজপতিগণ প্রথম প্রথম ইহাতে আপত্তি করিলেন বটে, কিন্তু এ আপত্তি টিকিল না। এইরূপে কত ব্রাহ্মণের বৈষ্ণব মহাজন শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণের গুরু হইলেন। এখনও

সেই সকল মহাজনের সন্তানেরা ঐ ব্রাহ্মগণের সন্ততিদিগের গুরু হইয়া আছেন। আজিও সাধনরাত্রে হিন্দুদিগের মধ্যে এই স্বাধীনতাটুকু দেখিতে পাওয়া যায়।

ফলতঃ শাস্ত্র ও আচার, শাস্ত্রানুগত্য ও আচারবশততা যে কেবল এই আমাদের হতভাগ্য দেশেরই বিশেষত্ব, তাহা নহে। কোন না কোন আকারে এ সকল পৃথিবীর সর্বত্রই আছে। এই বস্তুটা বিশ্বব্যাপী। বিশ্বের সর্বত্র ছইটা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির খেলা চলিয়াছে। একটা স্থিতির শক্তি, আর অপরটাকে গতির শক্তি বলিতে পারা যায়। জড়ের রাজ্যে একটিতে শক্তির ওজন ঠিক রাখে, অপরটিকে তার রূপান্তর ঘটায়। ইংরাজীতে একটিকে conservation of energy আর অপরটিকে transmutability of force কহে। ভৌব-বিজ্ঞানে এই স্থিতির শক্তিকে বীজ-শক্তি বা heredity কহে। ইহাই প্রত্যেক জীবকে তাহার পূর্বপুরুষদিগের সঙ্গে বাধিয়া রাখে এবং এই পূর্ব-সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া তবে তাহাকে নূতন অবস্থার নূতন ব্যবস্থা করিয়া আত্মরক্ষার ও আত্মচরিতার্থতার জন্য জীবন-সংগ্রামে ছাড়িয়া দেয়। সমাজ-বিজ্ঞানে এই স্থিতির শক্তিটাই, শাস্ত্র ও আচারকে আপনার বাহন করিয়া, সামাজিক জীবনের পরিবর্তন-প্রবাহের মধ্যে পূর্বাগের যোগ বাধিয়া রাখিয়া, এ সকল পরিবর্তনের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন সমাজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। যেখানে জড়, সেখানেই যেমন conservation of energy'র চেষ্টা ও প্রতিষ্ঠা, যেখানে জীব, সেখানেই যেমন হেরিডিটি heredity বা বৈজ্ঞিক শক্তির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা; সেইরূপ যেখানেই সমাজ, সেখানেই শাস্ত্র এবং আচার আছে। লিখিত গ্রন্থবদ্ধ শাস্ত্র না থাকুক, মৌখিক শাস্ত্র আছে; ভটিল স্বতিবদ্ধ আচার না থাকুক, কতকগুলি রীতিনীতি এমন আছেই, যাহাকে সমাজ মাথায় করিয়া চলে। যাযাবরদিগের মধ্যেও আছে; সভ্যতম, সুসংবদ্ধ সমাজেও আছে।

রবীন্দ্রনাথ কিছু দিন হইতে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বা individualismএর পুরোহিত হইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভিমানকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। আমরা পুরাতন শাস্ত্র, প্রচলিত আচার, কোন কিছুই ঐকান্তিক বশত্যা স্বীকার করি না। অথচ, আমাদের মধ্যেই কি কোন শাস্ত্র বিধি, কোন আচার-নিয়ম নাই? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্র উভয়েই গুরু স্বাভিমত্যের উপরে নিজেদের ধর্মমত ও ধর্মসাধন গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। আবার ইঁহারা উভয়েই পরে নিজ নিজ শাস্ত্রসংহিতাও প্রচার করেন। মহর্ষি তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থকে ব্রাহ্মসমাজের সত্য-শাস্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে সঙ্ক-চিত হন নাই। কেশবচন্দ্র তাঁহার “নবসংহিতাকে” নববিধান মণ্ডলীর নবসংহিতারূপেই প্রচার করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থকে স্বরচিত বলিয়া মনে করিতেন না। ঈশ্বর-প্রেরণার তাঁহার অন্তরে যে সকল সত্য প্রকাশিত হইয়াছিল,

তাহাই এই ব্রাহ্মধর্ম নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ, মহর্ষি এইরূপই মনে করিতেন। আর পূর্ক্বজন শাস্ত্র সকলও এই প্রণালীতেই প্রকাশিত হইয়াছিল, সকল দেশের শিক্ষিত শাস্ত্রবাদীরাই এ কথা বলেন। সুতরাং সত্যের প্রামাণ্যরূপে শাস্ত্র পূর্ক্বও ছিল, এখনও আছে, চিরদিনই থাকিবে।

তবে, সকল শাস্ত্রবাদী একই ভাবে শাস্ত্র মানিয়া চলেন না। অল্প লোকে শাস্ত্রের শব্দকে আশ্রয় করিয়াই চলে। জ্ঞানিগণ তাহার অর্থের অনুসরণ করেন। প্রাকৃত জ্ঞানে প্রাকৃত শব্দকোষের দ্বারা শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করে। সাধকেরা নিজ নিজ অন্তরের সাধনাভিজ্ঞতার দ্বারা শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য নিরূপণ করেন। মনীষিগণ বর্তমানের অনুভব দিয়া প্রাচীনকালের অভিজ্ঞতাকে পরীক্ষা করিয়া, সেই প্রাচীন অভিজ্ঞতার বাহিরের উপমান অনুমানাদি হইতে ভিতরের নিভাঁজ প্রত্যক্ষকে পৃথক্ করিয়া, শাস্ত্রের দেহকে উপেক্ষা করিয়া, তাহার প্রাণবস্তুকেই গ্রহণ করেন। এইরূপে যাহারা শাস্ত্র-প্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যেও সাধকে ও অসাধকে, জ্ঞানীতে ও অজ্ঞানীতে, সাত্বিকে ও তামসিকে, বিস্তর প্রভেদ আছে। তামসিকে, অজ্ঞানীতে, অসাধকে, জড়তা বা কার্পণ্য বশতঃ সচরাচর যে ভাবে শাস্ত্রের প্রামাণ্য মানিয়া থাকে, তাহাকেই শাস্ত্রানুগত্যের এতৈক্য রূপ বা শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বলিয়া ধরিলে চলিবে কেন? গ্যাডেট্টোন্, ডীন্ ফেরার কিংবা বিশপ গোরে যে ভাবে খৃষ্টিয়ান্ শাস্ত্রের প্রামাণ্য মানিতেন, আমাদের কেওরা-পুকুরের কাটাকিষ্টও কি সেই ভাবেই বাইবেল বুকে, না মানে? ভগবান্ ভাষ্যকার, রাজা রামমোহন কিংবা চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার যে ভাবে হিন্দুশাস্ত্র প্রামাণ্য মানিতেন, জগন্নাথঘাটে যে সকল দেবল ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়াইয়া জীবিকা উপার্জন করে, তারাও কি সে ভাবে বেদপুরাণাদি বুকে, না মানে?

সকল দেশেই এমন সকল লোক আছে ও চিরদিন থাকিবে, যাহারা গতানুগতিকভাবেই শাস্ত্রের শাসন মানিয়া চলে ও চলিবে। ধর্ম-বস্তুকে যাহারা নিজের জ্ঞান দিয়া ধরিতে চাহে না, বিচার-বুদ্ধি দিয়া কষিয়া নিতে জানে না, নিজের প্রত্যক্ষ অনুভব ও অভিজ্ঞতার উপরে ধর্মজীবন গড়িয়া তুলিতে পারে না, যাহারা গড্ডলিকা-প্রবাহের মতন ধর্মের পথে চলে, এমন লোক সর্বত্রই আছে; ইউরোপেও আছে, ভারতবর্ষেও আছে; আমাদের দেশের শাস্ত্রানুগত হিন্দুসমাজেও আছে, শাস্ত্রগুরু-বর্জিত ব্রাহ্মসমাজেও আছে। আর সর্বত্রই এ সকল লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী।

গতানুগতিক হিন্দু দেবতার বিশ্বাস করেন, কারণ, শাস্ত্র দেবতার কথা বলে। কিন্তু দেবতা বস্তুটি কি, কেন যে দেবতার বিশ্বাস করা কর্তব্য, দেবতার শক্তিসাধ্য কি, বিচারবুদ্ধি দিয়া এ সকল কথার মীমাংসা করেন না।

গতানুগতিক খৃষ্টিয়ান ও সেইরূপ বৌদ্ধধর্মকে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, কারণ, বাইবেলে সে কথা লিপিত আছে। ঈশ্বর কে, ঈশ্বরের স্বরূপ কি, ঈশ্বরের পুত্র কিরূপ,—বিচারযুক্তি দিয়া এ সকল কথার মীমাংসা করেন না। বাঙ্গলাদেশের গতানুগতিক হিন্দু বসন্তের প্রারম্ভে হইলে শীতলার পূজা দেন। ইউরোপের খৃষ্টিয়ান মহামারী উপস্থিত হইলে, গীর্জায় যাইয়া বীণুর নিকটে প্রার্থনা করেন। জ্ঞানের নিকৃতিতে ওজন করিলে, দুইজনের মধ্যে বেশ-কমটা কি ও কোথায়, বুঝিতে পারি না। গতানুগতিক হিন্দু রোগের ঔষধ পাইবার জন্য তারকেশ্বরে বাইয়া হত্যা দেন; আর জ্ঞানী ও বিশ্বাসী জর্জ মুলার ক্ষুধার অগ্নের জন্য দরজা বন্ধ করিয়া বীণুর নিকটে প্রার্থনা করিতেন। ইহাদের মধ্যে প্রভেদ কি, বুঝিয়া ওঠা ভার। দুইজনেই প্রাকৃত বিজ্ঞানের আশ্রয় না লইয়া, অতি-প্রাকৃত শক্তির শরণাগত হইয়া আপনার প্রাকৃত অভাব-মোচনের চেষ্টা করেন। হিন্দুর অতিপ্রাকৃত শক্তির একটা প্রত্যক্ষ প্রতীক আছে। জর্জ মুলারের অতি-প্রাকৃত শক্তির এরূপ কোন চাক্ষুষ প্রতীক ছিল না, কেবল একটা মানসপ্রতিমা ছিল—দু'জনার মধ্যে এই ত প্রভেদ। প্রাণের আকুল আর্তনাদ দু'জনারই সমান হইতে পারে। ভক্তেরা বলেন, এই আর্তনাদই আসল বস্তু। কিন্তু যে যুক্তিতর্ক দ্বারা রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের গতানুগতিক ধর্মের ভ্রম-কুসংস্কার দূর করিতে চাহেন, সেই যুক্তিতর্কের দাড়িপাল্লায় ওজন করিলে ইংরাজ জর্জ মুলারের বীণতে এবং আমাদের গ্রামের মদন বাগদীর শীতলাতে কোন আত্যন্তিক প্রভেদ পাওয়া যায় কি? অতি-প্রাকৃত বীণতে অতি-বিশ্বাসী ইংরাজ যদি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, অতি-প্রাকৃত শীতলার আশ্রিত হিন্দু পারিবে না কেন?

এ দেশের প্রাচীনত্বের হিন্দুগণ শাস্ত্র মানেন। আমরা নবীনত্বের ব্রাহ্ম, আমরা কোন শাস্ত্র মানি না। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যেই কেবল গতানুগতিক লোক আছেন, আমাদের মধ্যে কি নাই? হিন্দু, শাস্ত্রের কথায় ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন; ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মসমাজের কথায় ঈশ্বর আছেন, ইহা মানেন। কেন যে ঈশ্বর আছেন, এই ঈশ্বর কিরূপ, হিন্দু তার বিচার করেন না। অধিকাংশ হিন্দুই নিজের অনুভব দিয়া এই ঈশ্বরকে বুঝিবার ও ধরিবার ক্রেশ স্বীকার করিতে রাজী নহেন। ঈশ্বরের স্বরূপ কি; কেন যে ঈশ্বর সাকার হইতে পারেন না, নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ মাত্র; নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ বস্তু কি, অনুভবে এ বস্তুকে কি ভাবে ধরিতে পারা যায়, এ সকল প্রশ্ন লইয়া কল্পজন ব্রাহ্মই বা মাথা ঘামাইয়া থাকেন? বরঞ্চ ব্রাহ্মসমাজের সাংখ্যিক সাধুগণ পর্য্যন্ত এ সকল প্রশ্নকে "চেকির কচকি" বলিয়া, সাধনের অন্তরায় বোধে, দূরে পরিহার করেন। ঐ গতানুগতিক শাস্ত্রবাদী হিন্দুতে আর এই গতানুগতিক শাস্ত্রবিরোধী ব্রাহ্মতে কোনও সত্য প্রভেদ আছে কি?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনঃ হইতে — “আমি বাহা বুঝি, আমি বাহা বিশ্বাস করি, তাহাই সত্য; তোমরা তাহাতেই বিশ্বাসস্থাপন করিবে” — সকল ব্রাহ্ম আচার্য্যই ত এই কথা কহিয়া আসিয়াছেন। “আমি বাহা বলিতেছি, তাহা পরখ করিয়া দেখিও, বিচার করিয়া গ্রহণ করিও, সত্যবোধ হইলে গ্রহণ করিও, অসত্যবোধ হইলে বর্জন করিও, বিনা প্রমাণে মানিও না, পরের মুখে ঝাল খাইও না, শাস্ত্রের মুখেও নয়, আমার মুখেও নয়” — শাস্ত্র গুরুবিরোধী ব্রাহ্ম প্রচারকের মুখে ত কোন দিন অনন কথা শুনি নাই। যিনি সদ্গুরু, স্মশাস্ত্র ও স্বামুভূতির একবাক্যতার উপরে ধর্মের প্রামাণ্য পাইয়াছিলেন, কেবল তাঁরই মুখে ইহার অমুরূপ কথা শুনিয়াছি।

আধ্যাত্মিক ও মানসিক স্বাধীনতার কথা মুখে বলা সহজ, চরিত্রে লাভ করা বড়ই কঠিন। যে এ বস্তু পাইয়াছে, তার সকল বন্ধন মোচন হয়। সে নিজে সত্যভাবে স্বাধীন হইয়াছে বলিয়া, অপরের স্বাধীনতারও যথাযোগ্য মর্যাদা করিতে জানে। শাস্ত্রগুরু বর্জন করিয়াও এ বস্তু লাভ না হইতে পারে; শাস্ত্রগুরু বর্জন না করিয়াও ভাগ্যবলে কেহ এই পরমবস্তু লাভ করিতে পারেন। আমরা ত শাস্ত্রগুরু কিছুই নানি না। কিন্তু এই পরমবস্তু লাভ হইয়াছে কি?

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র “কর্তার ইচ্ছার কর্ম” বলিয়া যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মত ও আদেশ মানিয়া চলিতে নারাজ হইলেন, মহর্ষির প্রভুতার প্রতিকূলে আপনার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেন, শাস্ত্রগুরুবর্জিত ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয় ত তখন কেশবচন্দ্রের ও তাঁহার ধর্মবন্ধুগণের স্বাভাবিক স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিলেন না! কালক্রমে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি যখন নিজেদের ধর্মবুদ্ধির দ্বারা প্রেরিত হইয়া, কেশবচন্দ্রের মতের ও কর্মের প্রতিবাদ করিয়া, নিজেদের স্বাধীন মত প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেন, কেশবচন্দ্রও ত তখন বিরোধীদলের স্বাধীনতার মর্যাদা করিতে পারিলেন না! নাস্তিক, যুক্তিবাদী, জড়বাদী, অবিশ্বাসী বলিয়া জগতে তাঁহাদের নিন্দাবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ যখন আপনার সাধন অভিজ্ঞতাতে এমন কোন অপূর্ণ বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন, বাহা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির জ্ঞানগোচর হয় নাই, তখন এই বেশী দেখারই বিষম পাপটা তাঁর পূর্বতন ধর্মবন্ধুগণ ত কিছুতেই সহিতে পারিলেন না; স্পেনের শাস্ত্রবাদী পাদ্রিগণ যেমন তাঁহাদের জ্ঞানের অগোচর একটা বিরাট মহাদেশ আছে, এই কথা বলিবার অপরাধে কলহসকে সমাজচ্যুত করিতে চাহিয়াছিলেন, সেইরূপ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মনেতৃবর্গ গোস্থানী মহাশয়কে ব্রাহ্মসমাজের বাহির করিয়া দিলেন! বাহারা শাস্ত্রশাসন ছাড়িয়াছেন, তাঁরাও নিজের মতের সংকোচ গভী

ছাড়াইতে পারেন নাই। জগতে স্বাধীন চিন্তার ধ্বজা তুলিতে দাঁড়াইয়াও অপরের চিন্তার স্বাধীনতা সহিতে পারেন নাই।

সুতরাং শাস্ত্রগুরু না মানিলেই যে মানুষ স্বাধীনতার সম্মান করিতে শিখে, অথবা রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রজামতের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, কিংবা স্বারাজ্যের যোগ্যতা লাভ করে, কিছুতেই এমন কথা বলা যায় না।

আমাদের বর্তমান ব্রাহ্মসমাজে ত কোনও প্রকারের শাস্ত্রানুগত্য এবং আচারবশ্ততা নাই। আর্য্যসমাজেও গতানুগতিক হিন্দুসমাজ অপেক্ষা শাস্ত্রানুগত্য অল্প, আচার-বশ্ততাও বিস্তর কম। কিন্তু তথাপি ইহারাও ত রাষ্ট্রীয় স্বব্বস্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠার আপদ-বালাই হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে নিজেদের দূরে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কর্ম বলিয়া মনে করেন।

(ক্রমশঃ)

ঐবিপিনচন্দ্র পাল।

কমলের দুঃখ

দ্বিতীয় স্তবক

অধার আসে চোখের পরে জড়িয়ে আসে পাখা,
অন্ধকারে চিকুর হানে যার না চোখে দেখা ;
বুকের ভারে চলে না রি বুক ফেটে গান গান,
নিব্বার ধারা শুকিয়ে গেছে উঠছে হা হা তান ।

(ইন্দু—শৈল)

ঠাকুরঝি,

আমার সব ফুরিয়ে খেল—চার বছর ধ'রে থাকে বুকের ভেতর ক'রে রাখলাম—
সে এমন ক'রে কোথায় চ'লে গেল ! আমার আর কি নিষি ছিল—কে নিলে ঠাকুরঝি
—সে বড় মিষ্টর, বড় নিষ্ঠুর। আমি ত কখন কারো মনে কষ্ট দিই নি—তবে কেন
আমি এমন কষ্ট পেলুম ? আমি যারে বুকের ভেতর ক'রে রাখলাম—সে আমার
বুকের হাড় খসিয়ে চ'লে গেল—আমি কি করব ঠাকুরঝি—আমার কি হ'ল !
আমার যে আর দিন কাটে না—কখন সূর্য্য গুঠে, কখন ডুবে যায়, আমার কিছুই
মনে হয় না—আমার মিহির কোথায় গেল, কেউ আমার ব'লে দিতে পার, সে
কোথায়, সে আমার কোথায় ? দিন যে কাটে না আর, কি ক'রে দিন কাটাব
ঠাকুরঝি ! কি এক যাতনার ব্যথার সমস্ত বুক ভ'রে উঠছে, যেই নিশ্বাস পড়ছে—
বুকটা যেন একেবারে খালি হয়ে যাচ্ছে—যেন জগতে কিছুই নেই ! চোখ দিয়ে,
মুখ দিয়ে, সমস্ত শরীর দিয়ে যেন কাকে ধ'রে রাখতে বাই—কই, শুধু খালি ব'লে মনে
হয় । ঠাকুরঝি ! আমি যে চারিদিক্ অন্ধকার দেখছি, কি নিয়ে থাকব ভাই,
কি নিয়ে থাকব—আর ত আমার কিছু নেই, আমার সকল আশার ভরসা ম'রে
গেল, কেন এমন হ'ল, কেন এমন হ'ল, আমি ত কারো কিছু করি নি—আমার কেন
এমন হ'ল ! আর তাকে দেখতে পাব না, আর তার মা বলা শুন্তে পাব না,
আর তার বাণী বাজান স্বর আমার কানে আসবে না, আর ত সে 'বুঝাবনে
বনে বনে দেখু চলাব' গাইবে না—কেন এমন হয় ভাই—কেন এমন হয় ? কত

দিন ধ'রে সুখের স্বপ্ন গাঁথি—কত সাধ ক'রে কত খেলায় খেলে বেড়াই—কোথা থেকে একটা মুহূর্ত আসে, সব ভেঙ্গে যায়, কেন যায়, কার জন্তে যায়, কেন গেল, কে আমার এমন করলে, আমি ত তার কিছু করি নি। উঃ, মা গো, কেমন ক'রে থাকব! আর যে দিন কাটে না।

এক এক ক'রে সব আমার মনে জাগছে। দিন তখন কেমন কেটেছে—কত কাজ, আছ আর কাজও নেই, দিনও কাটে না। কি অদ্ভুত পরিবর্তন! জগতের কি ভীষণ নিয়ম! ঠাকুরঝি, কেন এমন বদল হয় বলতে পার? এক এক ক'রে এই কটা বছর কি ক'রে কেটেছে, তাই কেবল মনে পড়ছে, ঘুরে ফিরে তারি দিকে মন ছুটেছে। একটি একটি দিন ছবির মত আমার চোখের উপর ভেসে উঠছে—তাই ভাবি—অমনি তার পর আর একটা দিন, আবার তার পর মাথার ভেতর কি রকম ক'রে ওঠে, তার পর সব ছবিগুলো জড়িয়ে একটা কি হয়ে যায়, কিছু মনে থাকে না, যেন সব কি রকম ভুলে যাই—বুকটা যেন ভেঙে যেতে চায় অথচ ভাঙে না—শুধু পাথরের মত ভারী হয়ে ওঠে—আবার যেই নিশ্বাস পড়ে—অমনি যেন ফেটে ছ'খানা হয়ে যায়—এমনি ক'রে দিন কাটে অথচ কাটে না। এমন ক'রে আর কটা দিন যাবে—তাই ভাবছি! ওগো, তোমরা আমার বলতে পার, কোথায় যাই? তাই, কেবলই আমার সেই বছরের কথাটা মনে পড়ছে, সেই প্রথমে একদিন ঘরে শুয়ে আছি—উনি শুয়ে শুয়ে বই পড়ছেন—ছপুরবেলা, বসন্ত কালের আলোর সমস্ত ঘর ভ'রে গেছে—দূরে জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে—হু-একখানা শাদা মেঘ যেন শাদা পাল ভুলে নীল আকাশে ভেসে চলেছে—চারিদিক থেকে কচি আঁবের গন্ধের সঙ্গে বেলের গন্ধ ভেসে আসছে, জানালার ধারে একটা অশোক-ফুলের গাছ অশোক-ফুলে ভ'রে গেছে, নিম-ফুলের গন্ধও কেমন মিশিয়ে যাচ্ছে—অশোক-ফুলের গাছের ডালে ব'সে একটা পাখী 'খোকা হ'ক, খোকা হ'ক' বলে যেমনি ডেকে উঠেছে, হঠাৎ আমার দেহের মধ্যে যেন কার সাড়া পেলাম, সে কি সুখ, সে কি হৃৎক, সে কি আনন্দের ব্যথা ও আগ্রহ, আমি—উঃ! ব'লে তার ছোটো পা হাত দিয়ে চেপে ধরেছিলুম—তিনি আমার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হ'ল?' আমি হেসে ফেললাম, সেই আমার প্রথম ব্যথা ও আগ্রহ, ঠাকুরঝি, আমি আনন্দ, কান্না ও হাসির মাঝে কোথায় ডুবে গেলাম, মনে হ'ল, মা হয়েছি, মনের ভিতরে ইচ্ছা কোথায় কেমন ক'রে নুকিয়ে ছিল, কেমন ধীরে ধীরে কেমন ফুটে উঠল, কোথায় নুকিয়েছিল, কেমন যেন কি ক'রে সাড়া দিলে, তার পর জীবন্ত হয়ে সে ইচ্ছা আমার জগতের সব সুখের মাঝে ফুটিয়ে তুললে। তার পর দিন গেল—যেমন ফলে ভরা গাছ নিজেকে সামলাতে পারে

না, মুইয়ে পড়ে, যেমন খোলো-ভরা আঙ্গুরের লতা—ভারে লুটিয়ে পড়তে চায়, তেমনি মুইয়ে পড়লাম, চলতে যাই, মাঝে মাঝে মাটিতে হাত দিয়ে যেন ব'সে পড়ি। গভীর রাতে একদিন বড় গরম ব'লে ছাদের হাওয়ার শুয়ে রয়েছি, স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনী নদীর মত ছাড়াপথ এ ধার হ'তে ও ধার পর্যন্ত চ'লে গেছে, হঠাৎ এক ঝাঁক পাখী সুর ক'রে ডাকতে ডাকতে দক্ষিণদিক হ'তে উত্তরদিকে উড়ে গেল—ছাড়াপথটি ঢেকে আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। দিদিমার কাছে শুয়েছিলাম, এই পাখী—“পোয়াতী পাশ, পোয়াতী পাশ” ব'লে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায়, সে সময় খোলা ছাদে থাকতে নেই, তাদের চোখের মধ্যে পড়তে নেই—যত দিন না ওই পাখীরা ফিরে আসে, তত দিন ছেলে হয় না। পাখী উড়ে যাওয়া দেখে মনে ভয় হ'ল, তবে কি হবে, নিজের পেটে হাত দিয়ে দেখলাম—সাদা পাই কি না; বুকে হাত দিয়ে দেখি, বুকটা যেন টিপ্ টিপ্ করছে, তার পর থেকে আশঙ্কায় উষ্মেগে দিন-রাত কাটতে লাগল; আবার একদিন রাতে দেখি, তারা উত্তরদিক হ'তে দক্ষিণে তেমনি ক'রে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল—আমার বকের তার ক'মে গেল, তার পরদিন তুলসীতলার হরির লুট দিলাম। কত মাথা খুঁড়লাম। এমনি ক'রে আশা ও উষ্মেগে দিন কেটে যেতে লাগল, ছেঁড়া কাপড়গুলো কত ক'রে শুছিয়ে রাখতে লাগলাম। যে যা বলে, তাই করি, কেউ একগাছা রাঙা সূতো বেঁধে দিয়ে গেল, কেউ একটা মাহুলী দিয়ে গেল—যে যা বলে, তাই করি। উনি রকম দেখেন আর হাসেন; আমিও হাসি।

দিন যেতে লাগল, তার পর সেই ভয়ানক দিন এল, সে কুদিন কি সুদিন, তা বুঝতে পারছি নি; ব্যথা হ'ল, আমি ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে যেতে লাগলাম—যাই মাপি আমার মাথার চুলগুলো নিরে মুখের মধ্যে গুঁজে দিতে লাগল—আর সমস্ত শরীর তোলপাড় ক'রে ঝাকার আসতে লাগল। ওদিকে ব্যথা বাড়ল, যত যাতনা হয়, ততই মনের ভেতর আনন্দ হয়, আবার ম'রে যাবার ভয় হয়, যত যাতনা ও ব্যথা খুব জোর ক'রে হ'তে লাগল, ততই যেন প্রাণের ভেতর আশা ও সঙ্গে সঙ্গে মরণের বিতীষিকা দেখতে লাগলাম। শেষ—সেই শেষ মুহূর্তে এমন ভয়ানক যাতনা হ'ল যে, আমি চীৎকার ক'রে উঠলাম। তার পর মনে হ'ল, আর কিছু নেই—আর আমি ম'রে গেছি, তার পর যখন জ্ঞান হ'ল, দেখি—আমার সামনে ভূমি ব'সে—তোমার কোলে এক রাশি গোলাপফুল জড় করার মত—এক রাশি শাদা মল্লিকাকুল জড় করার মত এক নতুন জিনিস, এক মাথা কাল কাল চুল, বড় বড় পদ্মর পাপড়ির মত লালচে আভা দেওয়া ফুটফুট কচু ছখানি চোখ—ঠিক যেন পদ্মর ও পলার মত ছখানি ঠোট। ভূমি বললে, ‘এই দেখ্ কেমন ছেলে!’ আমার

চোখ দিয়ে ছ ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল—যেই তাকে আমার কোলে দিলে, আমি আছলামে অধীর হয়ে তাকে বুকে চেপে ধরলাম—সে একেবারে চিলের মত চেঁচিয়ে উঠল। তুমি বললে, “পোড়ারমুখি—রাক্ষসী—ছেলে কি অমনি ক’রে চট্‌কায়?” আমি তোমার কোলে দিয়ে হাসি ও কান্নার মাঝে দেখলাম, সে কেমন হাসছে। তার পর চার দিনের দিন যখন মাই ধরাতে গেলুম—সে এক অপূর্ণ ভাব আমার মনের ভেতর জেগে উঠল, যেই মাই টানে, আর ভয়ানক ব্যথা মনে হয়—অথচ সে ব্যথা ভাল লাগে, আর ইচ্ছা হয়, সমস্ত নিঙ্ড়ে রস তার মুখের মধ্যে ঢেলে দিই। যত মাই টানে, তত লাগে, তত হাসি, সে এক অদ্ভুত। তখন মনে হ’ল—এইবার আমি সত্যি মা হয়েছি। সেই সময়ে উনি এসে দাঁড়ালেন দরজার গোড়ায়, আমিও হেসে ফেললাম। দিদিমার মুখে শুনেছিলাম, যেটেরা পূজোর দিন বিধাতা এসে কপালে সব লিখে দিয়ে যায়; সমস্ত রাত উষ্মেগে দরজা বন্ধ ক’রে ব’সে রইলুম, ধাই মাগী পার তলার প’ড়ে প’ড়ে ঘুমুতে লাগল, আমি তাকিয়ে ব’সে রইলুম, কখন বিধেতাপুরুষ আসে—কি লেখে দেখব! রাত প্রায় ভোর হয়ে এল, তখনও কই কেউ ত এল না; কি আশঙ্কায় কি উষ্মেগে যে রাত কাটতে লাগল—তা আর বলতে পারি নে, ভাবলাম, আমার ছেলের কপালে কি বিধেতা কিছু লিখবেন না—সবারই ত লেখেন। দুর্বল শরীর—ভাবতে ভাবতে বোকার দিকে তাকিয়ে দেখি, সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে—আমি ধীরে ধীরে সেই ফুটন্ত ফুলের মত ঘুমন্ত জ্যোৎস্নার হাসির ওপর প্রথম চুমু দিলাম, প্রাণ যেন কি ক’রে উঠল—সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল; তার পর কখন তুমি এয়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছি, দরজার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো এসে পড়েছে,—পল্লীতে লোকের সোরগোল শোনা যাচ্ছে। ভাবলুম, কেন ঘুমিয়ে পড়লাম, বিধেতাপুরুষ ফাঁকি দিয়ে কখন এসে কি লিখে দিয়ে গেল? সকালবেলার আলোর তার কপালটা টেনে দেখতে গেলাম, কি লেখা হয়েছে, দেখলাম, কিছুই বোঝা যায় না, কেবল ছ একটা লাইনের মত কি—তাও অফুট—বোঝা যায় না, এ রকম। দিনে দিনে এমনিতর সে আশা ও আশঙ্কার মাঝে বাড়তে লাগল। চাঁদ দেখত—হাঁ ক’রে তাকিয়ে থাকত, ছোট ছোট হাত দুখানি বাড়িয়ে হাঁ ক’রে—আনন্দে ধরবে ব’লে ছুটে যেত। আমি হাসতাম, সেও হাসত—একবার আমার মুখের পানে চেয়ে আবার ফিরে চাঁদের পানে চাইত, একবার হাত দিয়ে আমার মুখখানি ধরত, আর একবার সেই ছোট হাত চাঁদের কাছে বাড়িয়ে দিত—আমার মুখ ধ’রে হাসত, চাঁদ পেত না ব’লে কাঁদত। আগে এত এ সব মনে পড়ত না। আজ কেবল সেই সব এক এক ক’রে মনে পড়ছে—আর প্রাণটা যেন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কি পরিবর্তন! যে দিন খুব মেঘ

ক'রে বর্ষা ঝরঝর ক'রে আস্ত, ছুটে ছুটে ভিজতে যেত, বাজ পড়ত, বিদ্যায় চমকাত, প্রথমটা চোখ কেমন ক'রে উঠে তার পর হাততালি দিয়ে নাচত—সে তার কি আনন্দ—কত ব'লে, ধ'রে, নেবে তবে তাকে বুস গাড়াই—তবে সে থুসত। বর্ষার গান তার বড় ভাল লাগত, তাই বুঝি সে বর্ষায় চ'লে গেল—আমার যে ঠাকুরঝি, তার সেই গান গাওয়া মনে পড়ছে।

সে গান গাইত আর নাচত—কত রকম করত, তুলসীমঞ্চ যেমন ঝারা বিন্দু বিন্দু ক'রে পড়ে, তেমনি আমার হৃদয়-তুলসী মিহিরকে আমি আমার প্রাণের অক্ষয় স্নেহধারা দিয়ে তাকে প্রাণ ত'রে রেখেছিলাম, তবু আমার প্রাণের মাঝে থেকেও সে তুলসী শুকিয়ে গেল। আমি কি করব! আমি কি করব! কেবলই আমার সেই সব কথা মনে পড়ে—আর যেন কি হয়ে যায়! আলোর আলোর এসেছিল, অঁধারে অঁধারে চ'লে গেল। ঠাকুরঝি, বলতে পার, কোথায় যায়, সেখানে ত তার মা নেই, সে যে আমার হৃদয় ছেলে, সে যে আমার কাছ-ছাড়া একদণ্ড থাকতে পারত না—মায়ার কোলে থাকত, কিন্তু আমাকে কাছে ব'সে থাকতে হ'ত—সে যে আমার মেরে চুল ছিঁড়ে ছোট ছোট হাতে কীল মেরে শেষে কেঁদে গলা জড়িয়ে ধরত, সে কার কাছে আর এমন করবে—আমার ত সে ডেকে নিয়ে গেল না, সেখানে ত তার মা নেই, তাকে কে দেখবে ঠাকুরঝি, সে কি সেখানে থাকতে পারবে, সে কোথায় কোন্ মেঘের রাজ্য, পরীর দেশ, তার ত ডানা নেই, সে ত তাদের মত উড়তে পারবে না। না, সেখানে গেলে বুঝি ওই সব ছবির মত সোন্দর ছেলেদের সঙ্গে থাকলে, আলোর ছটার মত ডানা বেরিয়ে উড়ে উড়ে খেলা করে। আমার মনে হচ্ছে, যেন আমার তন্ত্রার মত এল, আর মায়ার কোল থেকে কে যেন তাকে তুলে নিয়ে গেল। আহা—হা—হা—সে আমার কোথায় গেল গো, কোথায় গেল! বাবা! কোথা গেলি বাবা, একদিন ছেড়ে যে থাকতে পারত না—একবার চোখের আড় কর্তে প্রাণ বেরিয়ে যেত, আজ যে কদিন কেটে গেল—ঠাকুরঝি, সত্যি আমি পাবানী, নইলে মিহির ছেড়ে এখন বেঁচে আছি? আমার ডেকে নে বাবা, ডেকে নে—আর যে তোমার সেখানে কেউ নেই বাবা। ঠাকুরঝি! এক একবার ভাবি, আমি কি পাগল হব—না হয়েছি, কিছুই বুঝতে পারি নি কেন। চুপ ক'রে ব'সে আছি, যেমন মেঘ ডেকে উঠল, অমনি যেন বুকের মাঝে কাকে জড়িয়ে ধরতে বাই। আহা! সে যে মেঘের ডাক শুনেই আমাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরত—যত শন শন ক'রে বাতাস বইছে, তত যেন মনে হচ্ছে, সে আমার ডাকছে—এ কি! ওই যে মা—মা,—মা—ব'লে ডাকছে ঠাকুরঝি! ওই যে গো তোমরা শুনতে পাচ্ছ না—ওই যে

ডাকছে, ওই শোন না, বাতাসের ভেতর কান পেতে শোন, ঢেউয়ের মত হেলে ফুলে আসছে, ওই ডাকছে, কেন ডাকছে, সে ত জানে, আমি এখন যেতে পারিনি, ওই চাঁদখানা যেন কটমট ক'রে তাকিয়ে রয়েছে, —আমি কি ক'রে যাই, সব যে শূন্য, পথও নেই, শূন্যের মাঝে কোথায় হাতড়াব। না—না, এ সব বুঝি আমার মাথার খেয়াল, সব ভুল, কেমন হয়েছে, ও সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। এটা কি গাছ ও মানুষটার নাম, ওখানা কি কিছুই মনে করতে পারছি নি—মনে পড়ছে, আবার তখনি ভুল হয়ে যাচ্ছে। আমার যেন কিসের, কোন স্মৃতির খেই হারিয়ে ফেলেছি, কাকেও আর টানতে পারছি নি—একলা ব'সে আছি, আকাশের মত ফাঁকা কিছু নেই—খালি সব যেন খালি হ'য়ে গেছে।

ঠাকুরঝি! আমার মনে হ'চ্ছে যেন, আমি নরক থেকে উঠে এলাম, আমার নইলে এত সাহস যে, মুখে এমন ক'রে এই সব বলতে পাচ্ছি। যত দিন না কেউ মা হয়, তত দিন এ জালা কেউ জানে না, বলতেও পারে না। এ যে কি মজার মজার তার ভেতর পর্য্যন্ত পুড়িয়ে ছাই করে, তা জানে না। মনে হয়, বুঝি বাদেই ছেলে হয়নি, তারা বেশ আছে—তা নয়, তুমি আমার ভুল বুঝতে পাচ্ছ, অথচ একটা ছেলের অভাবে সংসার ধুলো হয়ে উড়ে যায়। কি জানি, কি ভাবি, কি যে বলি, তার কিছুই ঠিক নেই। উনি যখন এসে বিজ্ঞাসা করবেন, খোকা কোথা, যখন খোকা খোকা ব'লে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডাকতে ডাকতে আসবেন, তখন কে তাঁরে উত্তর দেবে? আর আমি হতভাগীই তাঁরে কি উত্তর দেব, তিনি যে আমার কোলে তাঁর প্রাণের স্বরূপকে দিয়েছিলেন, তা আমি কোন্ অগাধ জলে হেলান হারালাম! আমি রান্ধসী, আমি তাকে খেয়ে ব'সে রইলাম! ভাবছি, ঠেকে কে দেখবে, আমারও এই অবস্থা, উঃ, আমার বাছাকে কে কেড়ে নিয়ে গেল? ভাই, উঃ, প্রাণটা যেন কি হয়ে গেছে, কি করব, কি যে হবে, কি যে হ'ল, এ সব আর মনে থাকে না—আহা-হা-হা! জুড়তে চাই, কিন্তু কোথায় গেলে যে জুড়ন পাই, বলতে পার? কে এমন আছে যে, এ জালা আমার ভুলিয়ে দিতে পারে—যে মৃত্যু আমার এ জালা দিয়েছে, সেই এ জালা নিবুতে পারে। কি যে লিখছি, কি যে বলছি, কেনই যে এ বললাম, তাও মনে কেমন হচ্ছে—কি করি ঠাকুরঝি! আমি ত তবু তোমার বলতে পারছি, মায়ী কেবল প'ড়ে প'ড়ে 'বাপ' রে আমার' ক'রে চোঁচাচ্ছে। আহা, ছুঁড়ী এল জুড়তে, আর আমার ভাঙ্গা কপাল—তার অলুনি বাড়ল। আমি এমনি হতভাগী যে, আমি বেশ চুপ ক'রে সব ত সহিছি। কেবল ভাবছি—সে দিন কেমন ছিল, আজ এ কেমন। সে দিন যে দিকে চাইতাম, সেই দিকে হাসি—আজ যে দিকে চাই, সে দিকে কান্না। এমনি বদল! কত দিনে এ জালা ভুলব,

কত দিনে এ সমস্ত ফেলে দিয়ে চোখ বুজ্ব! কত দিনে! উঃ—কত দিনে! কাল কারো কথা শুন্তে চায় না, সে বড় নিষ্ঠুর, সে মা'র চোখের জল মানে না—কিন্তু কমল কি ক'রে এমন নিষ্ঠুর হ'ল, কি ক'রে সে মা'র কোল থেকে—আমার—আমার—আমার—আমার তাকে কেড়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, একটু কি মা'র হ'ল না তার! ঠাকুরঝি, কোথায় বাই—আর যেন কারকে মুখ দেখাতে ইচ্ছে হয় না—স্বাধীন পানে সকালবেলা আর তাকাতে পারিনে তুলসীতলার দীপ দিতে যেতে পারি নি—সে এইখানে 'নমঃ' কর্ত্ত; ঘরের মধ্যে শুতে যেতে পারিনি, সব জিনিষে তার ছায়া দেখি, খাবার সময় ছোট গেলাসটি দেখে খাওয়া ভুলে বাই, প্রাণ কেমন ক'রে উঠে, মা'র এমন হয়ে পড়েছে—তাকে আমার দেখতে হয়—আহা, সে ওই ছেলটাকে বুকে ক'রে দিন কাটাতে শিখছিল—সে এমন যে তাকেও কাঁদিয়ে চ'লে গেল। ঠাকুরঝি! তোমায় ওরা জানায় নি, আমি যে না জানিয়ে থাকতে পারলাম না, তোমার চিঠি পেয়ে কি লিখ্ব, কি উত্তর দেব, ভাবতে ভাবতে কতই লিখে ফেললাম, জানি না, লোকের এ সংসারের সাধ কেন হয়—বড় জালা গো বড় জালা—মা হওয়া বড় জালা! কত পাপ করেছিলুম যে, এত নূতন স্বপ্নের তারার আলোর দীপ জ্বলে—তাতে আশা বাড়িয়ে তখনি তখনি নিরাশ করলে। বড় আশা ক'রে তার মুখ চেয়ে ছিলাম, অন্ধকার—আমার চোখের ওপর—অঁধার কালি ঢেলে দিয়ে সে মুখখানি মুছে গেল। আজ যেন সমস্ত জীবনটাই আমার এ স্বপ্নের মত লাগছে, কবে তার ক্ষাগরণ হবে, তা জানিনে। কেবল মনে হচ্ছে, তাঁকে আমি কি উত্তর দিব, তাঁকে আমি কি ক'রে বুঝাব, তাঁর প্রাণের আঘাত আমি আর কেমন ক'রে মুছতে পারব। বুঝতে পারি নে, কি হবে—কি করব। আর যেন সব ভেঙে শরীর-মন কোথায় যেন মিশিয়ে যেতে চায়। কি করব তাই !!!

(মা'র—শৈল)

বড়দি! বড়দি! আর পারি নি—এ পোড়া শনির মত বেধানে বাই, যার দিকে তাকাই, অমনি তার মাথা উড়ে যায়। সেখানেই এক অনর্থ ঘটে। আমি যে কুটোটা ধ'রে জীবনকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, সেই কুটোটাই ভেসে যায়। কি হ'ল বড়দি, আমি কেন এমন কপাল নিয়ে জন্মালাম, আমার কেন আগে মরণ হ'ল না? আমিই না হয় মরি, ম'লে যদি নিজের ও পরের সকলের যত্নটা নিতে যায়। কি করব, কি করব! তুমি একবার এলে না কেন—একবার কি আসতে নেই—কি হয়ে গেল, —আমি এলাম আর এই ক'মাসের মধ্যে কি হয়ে গেল—আমিই সব অমঙ্গলের কেতু—বেধানে বাই, সেখানেই মাথা-কাটার ছায়া পড়ে, সব ধোঁয়া হয়ে উড়ে যায়! দিদি,

কেন তোমরা আমার এত আদর করতে, কেন তোমরা আমার রূপের কথা বলে এত স্তুতি করতে—এত গর্ব এ পোড়ারমুখী রাক্ষুসীর কেন বাড়িয়েছিলে—তাই তার আজ এই দুর্দশা। তখন কেন দূর করলে না—এ অমঙ্গলের ছায়া আর কার ঘরে এমন ক'রে পড়ত না। যেখানে বাই, সেখানেই মহামারীর বিষ ছড়াতে ছড়াতে বাই; কেবল মৃত্যু আর অশান্তি এনে দিই—আমার জীবনে ষি, এমন জীবনে কি কাজ,—যদি কখন কিছু হ'ল না। যদি কখন কোন শান্তি নিজের মনে বা পরের মনে আশা হ'তে হ'ল না, তবে আবার আমার এমন জীবনে কিসের কাজ—দিন-রাত তিল তিল ক'রে তুঁতের আগুন বুকের ভিতর ভ'রে রেখে, আপনার আগুনে আপনি জলে জলে দিন কাটাব। পলে পলে দিনে সহস্রবার মরণ ছড়িয়ে—নিজে পেতিনীর মত এলোচুলে শ্মশান জাগিয়ে ব'সে থাকব। ওগো! এ যাতনা আমি কোথায় তুলে রাখব গো, আমার মিহির কেন গেল—কেন গেল—তোমরা আমার বলে দাও, কেন, আমার কি দোষ, আমি কেন এই মৃত্যুর ছায়া হয়ে রইলাম! আহা, সে কেন আমার বাতাসে উড়ে গেল—আমার মিহির কেন গেল, কেন গেল? বড়দি, আমার চেয়ে হৃৎক কে আছে দিদি! মানুষ জন্মে কত সাধ করে, আমার কোন্ সাধটা পূর্ণ হ'ল বল। আমার এই কুড়ি বছর বয়সে কি পাপে এমন দুর্দশা হ'ল বলতে পার? যা চাইলাম, তা পেলাম না, যা পেলাম, সে তীব্র বিষ। একটা মানিক আঁচলে গেরো দিতে গেলাম, আলগা গেরোর সে মানিক জলে গড়িয়ে পড়ল। পরের ধন কারো হয় না; কিন্তু তার কেন গেল, আমি ছুঁয়েছিলাম বলে—এর চেয়ে আর কি হৃৎক দিদি! তোমার ঠাকুর আছে, দেবতা আছে, বামুন আছে, সংসারে অরপূর্ণ হয়ে আছে; আমার কি আছে?—কিছু নেই। পরের আনন্দের একটা কোঁটা বা তাদের উপছে পাত্র থেকে প'ড়ে যাচ্ছিল, তাই লোলুপ হয়ে আগ্রহে এ মকর তুষা মিটাতে গিয়েছিলুম, পাত্র শুকু উন্টে গেল, মকরভূঁয়ে সব রস নিমেষে হরণ করলে—আমার নিখাসে সব ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেল। এ কি কম হৃৎক? ফুলটা বুকে ক'রে ক'রে বেড়ালাম, এমনি নিখাসের তাপ, ঝলসে পুড়ে ছাই হয়ে গেল; এ কি কম হৃৎক? অদৃষ্টকে যে দেখতে পাই নি, তা হ'লে বলতাম, তোমার সব দান ফিরিয়ে নাও, আমার শুধু মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও! কে জানে, মানুষ নিজের অদৃষ্ট নিয়ে গড়ে কি না—আমার এ ভাঙা কপাল কি জোড়া লাগে। তাই যেখানে বাই, তাদেরও কপাল ভেঙে যায়। কিন্তু সে আমার অদৃষ্ট—সে আমার কপাল ভেঙে দিয়ে এখন কথা শেখা শিখতে চায়। সেই ত আমার কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে গেল—নইলে যম আমার না নিয়ে আমার কোল থেকে তাকে নিয়ে যেতে পারত না। পাঁচটি দিন—আহা, পাঁচটি দিন আমার বাছার অর হয়েছিল গো; এই পাঁচটি দিনে সব নিঃশেষ হয়ে সবাইকে অধৈর্যে জলে ফেলে চ'লে গেল!

উঃ, সে কি গায়ে তপ, সে কি ধনুষ্টিকার, সমস্ত শরীরটা যেন বঁকে তেউড়ে নীল হয়ে যেতে লাগল; এমন ষাটনা কখন দেখিনি; ছদিন ছরাত অবিরত অমনি হয়ে কেটেছে। ডাক্তারগুলোই মেরে ফেলে; ওরাই ত মানে; কেবল সর্কালে বিষ ভ'রে ভ'রে দিতে লাগল, শেষদিনে সকালে কেবল যেন সব কমে এল, সে সব ভাব পরিষ্কার হয়ে গেল, মুখের ভাব যেন ফিরে গেল, হঠাৎ যখন সন্ধ্যা হ'ল, তখন কেবল 'কমল মামা, কমল মামা' করতে লাগল। তার পর কি করম হ'ল, অর যেন ক'মে এসে হাঁপাতে লাগল। আমি ভাবলাম, দুর্বল হ'য়েছে, দুধ দিতে গেলাম—কস বেয়ে প'ড়ে গেল। আমি কি জানি—কৈদে উঠলাম। তার পর ডাক্তার এল, আবার সেই কি ফুঁড়ে ওষুধ দিলে, তার পরই যেন ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল। তার পর দেখি, নিশ্বেস পড়ছে না—সব যেন হিম বরফ—আমি আছড়ে পড়লাম বুকে জড়িয়ে। ডাক্তার চোখে ক্রমাল চাপা দিয়ে চ'লে গেল, কঠাটা তখনও একটু গরম; ভাবলাম, তবে কি প্রাণ এখনো আছে? তখন বাড়ীতে কেউ নেই, অমরও ডাক্তারের বাড়ী ফের ছুটেছে। তার পর যখন ডাক্তার এল; তখন বললে, “ওঃ! হয়ে গেছে।” আমারই কোলে গেল, আমি রাকুসী ব'সে ব'সে তাই দেখলাম। দেখ বড়দি, যখন বড় ভয়ানক হয়ে ওঠে, বুকের ভেতর কেমন করে, তখন খুব চোঁচাই—চোঁচিয়ে যেন একটু ভার নেবে যায়—আবার চোঁচ মুছে উঠে দেখি, দরজার কোলে হাঁ ক'রে আকাশপানে চেয়ে ব'সে আছে। সাড়া নেই, শব্দ নেই—ডাকলে উত্তর নেই, যেন পাথর-গায়ে হাত দিলে একটা নিশ্বাস কেলে বলে—“এঁা”—আমি জড়িয়ে ধ'রে খুব কাঁদি, সে তখন আমার কত বোঝায়, কত রকমে চুপ করায়—বলে—‘গেছে তা গেছে’—অঁচল দিয়ে আমার চোঁচ মুছে বুকের ভেতর ক'রে নেয়; এমন মার মতন বোনের আমার কি হ'ল—এমন দিদি আর আমি কোথায় পাব! এমন শোকও মানুষ সামলাতে পারে!

মিহিরকে বুকে ক'রে আমার যেন আর সব ছঃখ ভুলতে শিখেছিলুম। জলবিষের উপরে কত রকম রঙে অঁকার মত আমার কাছে সে এল, তার পর হাওয়া হয়ে উবে গেল—কোথাও তাকে আর খুঁজে পাই নে। আমি ত অমনি বাই না—এই আশ্চর্য্য। দিদিকে দেখে প্রাণ তুকিরে যাচ্ছে, কি হবে দিদি, তুমি কি একবার আসবে না? আর যেন ভাবতেও পারি না। কাল দেখি—তোমার চিঠি লিখতে লিখতে অজ্ঞান হয়ে যেজের প'ড়ে আছে। কলমটা হাতের কাছে প'ড়ে হাতের একপাশে ছুটে গেছে—সাড়াও নেই, শব্দও নেই—সংজ্ঞাও নেই। কতক্ষণ পরে জলের ঝাপটা দিতে দিতে তবে জ্ঞান হ'ল—সঙ্গে সঙ্গে চোঁচিয়ে উঠল—‘বাবা, আবার আমার ডাকছ কেন বাবা?’ তার পর আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ল। আজ দেখছি, কেবলই হাসছে—কে

জানে কি হবে। শেষ এতও আমাদের অদৃষ্টে ছিল! স্বধীর এখনও আসেন নি, তাঁকেও এ খবর দেওয়া হয় নি। কি করতে কি হবে, তা বুঝতে পারি না। তুমি কি একবার আসবে না? তুমি একবারও এলে না কেন? এত হয়ে গেল, তুমি কি একবারও আসতে পারলে না?

কমল সেই রাস্তিরের পর থেকে আর আসে নি—আসে নি কেন, তাও আমি বুঝেছি, আমিই তার কারণ। যে যেখানে শান্তি আনে, সে আমাকে দেখলেই দূরে পালায়। খুব ভাল যাদের দেখলে, যাদের কথা শুনে, যারা একটু আশা পায়, একটু প্রাণে এ ছঃখের অপার সাগরে কুল পায়,—তারাও আর দেখা দিতে চায় না। এমন সাপিনীর নিশ্বাস যে, কেউ সে বিষাক্ত বাতাসের কাছে আসতে পারে না।

ভাবছি কেবল, যেমন একটা সাপ—কালনাগিনী—দেখলে লোকের চোখ জুড়িয়ে যায়, আবার প্রাণ কেঁপে ওঠে—আমি ঠিক তেমনি! লোকে আদর ক’রে প্রাণ ধ’রে আমার তাদের সকল সুখ—সকল আনন্দ ঢেলে দিতে চায়—আমি এমনি যে, তাদের অমনি বিষ ঢেলে দিই। তারা জ’রে ছারখার হয়ে যায়। হায়! কি ক’রে এমন ক’রে জীবনকে বয়ে নিয়ে বেড়াব! কমল একদিন বলেছিল, ‘তুমি যেখান দিগে যাও, সব পোড়াতে পোড়াতে যাও,’ আজ তার কথার মানে বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করব! প্রাণের এ আবেগ রোধ করা জলপ্রপাতকে বাঁধ দিতে যাওয়ার মত হবে;—গ’র্জ্জ শিলাগুলো গুঁড় করে, আরো উচু হয়ে ছাপিয়ে জল ছুটবে। তাই বুঝি এমন হ’ল। তাই সে আর দেখে না। কে জানে, আরো এ কপালে কি লেখা আছে। আরো কত না জানি—কত ঘরে অমঙ্গলের হাওয়া হিম-বরফের মত অসাড় ক’রে ঢেলে দেব। ভাবলাম, সব জালা থেকে জুড়ব—আর সহিতে পারিনে, এইখানে এসে একটু জুড়ই—তা হ’ল না—আরো তাদের জালা বাড়িয়ে নিজের আগুনে নূতন ইন্ধন যোগালুম। কিন্তু তাই কি—আমার জন্তেই কি সে গেল—সত্যি কি আমি বিবফোড়ার মত সব বিষে ভরিয়ে দিলাম—সত্যি কি প্লেগের মত—ঘোর মহামারীর মত যেখান দিগে যাচ্ছি, সেখানে কান্নার রোল উঠছে—কে জানে, নিজেকে বুঝতে পাচ্ছি নি, কি যেন দারুণ অভিশাপ মাথায় বয়ে ফিরছি, বুঝতে পাচ্ছি নি, কোথায় এ পসরার ভার রাখি, কোথায় এ তীব্র জ্বালার অভিশাপ কোন্ সাগরের বারি দিগে নির্ক্ষাণ করি। এ যেন রাশীকৃত অগ্নি আমার মধ্যে জ্বলে উঠেছে, আমি তার দাহনে তাপিত হয়ে ছুটে যাচ্ছি—যেখান দিগে যাচ্ছি, বনে দাবানল জ্বলে উঠছে—আর সবাই সত্তরে সত্তরে পালিয়ে যাচ্ছে! ঠিক যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে কাপড়ে আঁচলে চুলে আগুন লেগেছে—আমি তা ফেলে সেই আগুন থেকে পালাতে যাই—আমার আগুন আমার সঙ্গে যায়।

শ্রীমত্যেত্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

গান

প্রাণের মাঝে ডাকে বাঁশী
ওই যে, বাজে, ওই শোন না,
(আমার) সকল রসে মজল যে মন
লাজের বাধা আর মানে না।

মন-বনের গহন কোণে
কে বাজায় আর কেবা শোনে,
এ দেহ হল ত্রাজের মাটি—
নয়ন ধারে বয় যমুনা।

শ্রীমন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত।



নারায়ণ

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

তৃতীয় বর্ষ,

দ্বিতীয় খণ্ড,

পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা,

আশ্বিন ও কাশিক, ১৩২৪ সাল

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। আগমনী	... রামপ্রসাদ সেন	৮১৫
২। বুদ্ধিমানের কন্ঠ	... শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	৮১৬
৩। চিরসঙ্গী (কবিতা)	... শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	৮৪১
৪। কণ্ঠের কঠোর মূর্তি	... শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৮৪২
৫। সে আসিল না (কবিতা)	... শ্রীসুধাময়ী সেন	৮৫২
৬। কমলের ছঃখ	... শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	৮৫১
৭। মায়ের ডাক (কবিতা)	... শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ	৮৬৭
৮। ভূতের বেগার	... শ্রীনারায়ণচন্দ্রভট্টাচার্য	৮৬২
৯। শিশির বিন্দু (কবিতা)	... শ্রীহেরম্বনাথ পণ্ডিত	৮৮২
১০। প্রাচীন রাজগৃহ	... শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদার	৮৮৩
১১। বিজয়া (কবিতা)	... শ্রীমানিক ভট্টাচার্য্য বি, এ,	৮৯২
১২। বেদনার বৈচিত্র্য	... শ্রীজগদম্বা দেবী	৮৯৩
১৩। চার ইয়ারী কথা	... শ্রীসত্যীশচন্দ্র ঘটক	৮৯৬
১৪। পাহের প্রতি	... শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী	৯০১
১৫। নির্লোকসার চিন্তামণি	... শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	৯০৩
১৬। শেষ বেলায়	... শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	৯০৮
১৭। ছেঁড়া ফুল	... শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	৯১০
১৮। জীবন ও জীবনের ধর্ম	... শ্রীঅশালতা সেন	৯১৫
১৯। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	... শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী	৯২২
২০। মহীশূর ভ্রমণ	... শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	৯৩১
২১। সামর্থ্য (কবিতা)	... শ্রীবহুবল্লভ গোস্বামী	৯৪২
২২। শকুন্তলার মা	... শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৯৪৪
২৩। বিজয়া	... রামপ্রসাদ সেন	৯৫০



কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট,
'বসুমতী প্রেসে' অম্বীপূর্ণচন্দ্র মূখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

নারায়ণ

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

[আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৪]

আগমনী

পিলু-বাহার—যৎ ।

গিরি এবার আমার উমা এলে,
আর উমা পাঠাব না ।

বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনবো না ॥

যদি আসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে বিয়ে করবো ঝগড়া

জামাই ব'লে মানবো না ।

দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,

শিব শ্মশানে মশানে ফিরে,

ঘরের ভাবনা ভাবে না ।

রামপ্রসাদ সেন ।

বুদ্ধিমানের কৰ্ম্ম

(২)

(ভাদ্রের নারায়ণের ৮০৩ পৃষ্ঠার অন্তর্ভুক্তি)

ফলতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব,—এ সকল ঘটকণা না প্রত্যক্ষ হইয়াছে, ততক্ষণ সত্য ধর্ম্মলাভ হইল, ধারা একরূপ মনে করেন না ; শাস্ত্রের উপদেশে বা গুরুর কথায় ঈশ্বর আছেন, কেবল এইমাত্র শুনিয়া কিছুতেই ধারা জীবনে শান্তি ও সাধনা লাভ করেন না ও করিতে পারেন না ; এমন লোক সংসারে অতি বিরল,—শাস্ত্রানুগত ধর্ম্মেও অতি বিরল, শাস্ত্রবর্জিত ধর্ম্মেও অতি বিরল—লাঞ্চে না মিলয়ে এক । এ সকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষেরাই কেবল পদে পদে শাস্ত্র-গুরু-উপদেশকে আপনার অন্তরের প্রত্যক্ষ অনুভব দিয়া পরীক্ষা করিয়া তবে ধর্ম্মপথে ও কৰ্ম্মপথে চলিয়া থাকেন । বাকি নিরনন্দেরই হাজার নয়শত নিরনন্দেরই জনই জীবনে পরমতা-সুবর্তন ও পরমুৎপাদকেই হইয়া যা-কিছু ধর্ম্মকৰ্ম্ম সাধন করিতে চেষ্টা করেন । কেহ বা প্রাচীন সংস্কার মানিয়া চলেন, কেহ বা নবীন সংস্কার মানিয়া চলেন । গতানু-গতিক হিন্দু তিন হাজার বৎসরের সংস্কারের দাস । আমরা, গতানুগতিক ব্রাহ্ম, ত্রিশ বৎসরের সংস্কারের দাস । সংস্কারের দাস নয় কে ? সত্যের প্রত্যক্ষলাভ হইলেই কেবল সর্বসংস্কার-মোচন হয় । কিন্তু সত্যের অপরোক্ষ অনুভবলাভ ক'য় জনার ভাগ্যে ঘটে ?

কোনও সংস্কার মানিব না, তিন হাজার বৎসরেরও নহে, ত্রিশ বৎসরেরও নহে—বেশ কথা । অন্তরে যে কর্ত্তাপুরুষ আছেন, কেবল তাঁহাকেই মানিয়া চলিব, বাহিরের কোনও কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে থাকিব না,—শাস্ত্রেরও নহে, গুরুরও নহে ; এক জন রামমোহনেরও নহে, বারজন রামারও নহে ; স্মৃতিরও নহে, সমিতিরও নহে ;—অতি উত্তম কথা । এই সংকল্প লইয়া যে জীবনপথে ও সাধনপথে দাঁড়াইতে পারে এবং জীবনের সকল বিষয়ে বিশ্বের প্রতি যথাসাধ্য উদাসীন হইয়া, কেবল নিজের কাছে খাঁটি থাকিতে চাহে, তাঁহাকে মাথায় করিয়া লই ।

কিন্তু এ যে করিতে পারে, আমরা বাহা মানি, সে যে তাহাও মানিয়া চলিবে, তার ত কোনও স্থিরতা নাই । সে ঈশ্বর মানিতেও পারে, নাও বা মানিতে পারে । ঈশ্বর সাকার, সে ইহাও মানিতে পারে ; ঈশ্বর নিরাকার, ইহাও মানিতে পারে । তার নিজের বিচার-বুদ্ধিতে বাহা সত্য বলিয়া বোধ হইবে, সে ত কেবল তাহাই

মানিবে। সে পরকাল মানিতেও পারে, নাও বা মানিতে পারে। সে জাতিভেদ ভালও বলিতে পারে, মনও বলিতে পারে। যে সকল মত স্বীকার করিয়া আমরা ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হই, সে তার সবকটাই মানিতে পারে, একটাও না মানিতে পারে। এমন কি, আমরা আজকাল যাহাকে নীতি বলি, খৃষ্টীয়ানেরা যাহাকে দণ্ডাজ্ঞার বেড়া দিয়া ঘেরিয়া রাখিয়াছে, ইংরাজ যাহাকে মর্যালিট বলে, আমাদের প্রাচীনেরা যাহাকে ধর্ম্য কহিতেন,—সে তাহাও মানিতে পারে, নাও বা মানিতে পারে। সংস্কারের প্রভু যদি নষ্ট করিতে হয়, তবে এতটা বুকের পাটা থাকা চাই যে, যে ঈশ্বর মানিবে না, পরকাল মানিবে না, নীতি মানিবে না, ধর্ম্য মানিবে না,—কেবল নিজের নিকটে খাঁটি থাকিয়া জীবনপথে চলিবে এবং নিজের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া অপরের স্বাধীনতা নষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করিবে না, এইটুকু মাত্র মানিয়া চলিবে,—তাহাকেও মাথায় করিয়া লইতে হইবে।

এরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে কেহ কেহ অরাজকতা বলিতে পারেন। কিন্তু এ অরাজকতা প্রাকৃতজনের সমাজদ্রোহী অরাজকতা নহে। ইউরোপে ইহাকেই দার্শনিক অরাজকতা বা Philosophic Anarchism বলে। আর রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল হইতে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে আশ্রয় করিয়া আত্মমত প্রচার করিতেছেন, এই দার্শনিক অরাজকতাই তার শেষ কথা ও অপরিহার্য্য পরিণাম। এই দার্শনিক অরাজকতা বা Philosophic Anarchism হেয় বস্তু নহে। যেখানে এবস্তু বাহিরের আমদানী নহ, কিন্তু ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেখানে তাহাকে প্রজ্ঞাতরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি।

কিন্তু এই তত্ত্বে কেবল পুরাতন শাস্ত্রবিধিরই নহে, বাহিরের কোনবিধ শাসনেরই তিলান্বিত স্থান নাই। এই তত্ত্বে পূর্ণ সাম্য, পূর্ণ স্বাধীনতা, পূর্ণ মৈত্রীর হীরক-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। এ পথে লৌকিক নাস্তিকের ভিতর দিয়াই সত্য আন্তিকের, লৌকিক অধর্ম্মের ভিতর দিয়াই সত্য ধর্ম্মের, লৌকিক অনাচারের মধ্য দিয়াই সত্য আচারের এবং লোকে যাহাকে স্বেচ্ছাচার বলিবে, তাহার ভিতর দিয়াই সত্য স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয় না।

আর ইহার কারণ এই যে আন্তিক্য, ধর্ম্ম, আচার, স্বাধীনতা, এ সকল বস্তু কেহ কোনও দিন সত্যভাবে বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে পারে না। প্রত্যেকের ভিতর হইতেই এ সকল ফুটিয়া উঠে। এ সকল বস্তু মানুষের প্রকৃতিগত। প্রত্যেক লোক যদি সত্যভাবে আপনার প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া চলে ও চলিতে পারে, তবে ঝড়ুকুটিল যে পথেই হউক না কেন, সে সেই প্রকৃতির অভিব্যক্তির সঙ্গে

সঙ্গেই তার সত্যধর্মকেও প্রাপ্ত হইবে। এই ধর্মই তার স্ব-ধর্ম। এই ধর্মেই তার জীবনের চরম সার্থকতালভ সম্ভব। এই জন্যই আমাদের প্রাচীনেরা এই প্রকৃতি-গত ধর্মবস্তুকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন—

“ধর্মঃ চর, ধর্মঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধু।”

এই ধর্মকে লক্ষ্য করিয়াই গীতা কহিয়াছেন—

“স্বধর্মো নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।”

এই প্রকৃতিগত ধর্মকে আশ্রয় করিতে যাইয়া যদি মৃত্যুও হয়, তাহাও শ্রেয়স্কর। কিন্তু অপরে বাহির হইতে ও উপর হইতে ধর্ম বলিয়া যাহা লোকের ঘাড়ে চাপাইতে আইসে, তাহা অতিশয় ভয়াবহ বস্তু। সে পরধর্মে জীবকে তরোতেই কেবল অভিভূত করে, কদাপি সত্য অভয়দান করিতে পারে না। কিন্তু সত্যভাবে এই মতবাদ গ্রহণ করা, কিংবা নির্ভীকসহকারে ইহা প্রতিপালন করা, যার-তার কর্ম নয়। কণাটা গুনিয়া পরধর্মের পাণ্ডাগণ অঁৎকাইয়া উঠিতে পারেন, কিন্তু আমাদের দেশের তাত্ত্বিক সাধনের “বীরাচার” এবং বৈষ্ণবসাধনের “সহজিয়া” সত্যভাবে কেবল এই তত্ত্বেই সম্ভব।

যে দেশের ও যে সমাজের শাস্ত্র ও আচারের অত্যাচার দেখিয়া জনগণের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালভ রবীন্দ্রনাথ ছঃসাধ্য মনে করিতেছেন, অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা এই যে, সেই দেশে ও সেই সমাজেই বহু প্রাচীন কাল হইতে এই Philosophic Anarchism বা ব্যক্তিস্বাভাব্যবাদ ধর্মের ও সাধনের কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে।

ভারতের প্রাচীন ঈশ্বর-তত্ত্ব ও জীব-তত্ত্বের উপরেই আমাদের এই ব্যক্তিস্বাভাব্যতার প্রতিষ্ঠা। বাহিরের যাবতীয় ধর্মাধর্ম উপেক্ষা করিয়া, তোমার অন্তরে যে কর্তাপুরুষ আছেন, কেবল তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তিনিই তোমাকে সমুদায় পাপ হইতে রক্ষা করিবেন—এই উপদেশ কেবল আমাদের ধর্মেই পাই।

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েহর্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যজ্ঞাক্রুতানি মায়য়া।

স্বমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ॥”

হে ভারত, জীবের অন্তরতমদেশে ঈশ্বর বিরাজিত। তিনিই আপনার মাত্রাপ্রভাবে যাবতীয় জীবকে সংসারচক্রে ঘুরাইতেছেন। সর্বভাবেই তাঁহারই শরণাপন্ন হও। তিনিই তোমাকে সকল দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবেন। এই উপদেশ আর কোথাও শুনি নাই। এই ঈশ্বরকেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের অন্তরের অন্তরতম কর্তাপুরুষ বলিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহাকে পাইব কোথায়? তিনি আমার অন্তরেই আছেন, এই কথা বলিলেই ত তাঁর পরিচয় বা সাক্ষাৎকার পাই না। ফলতঃ আমার অন্তরে ত সকল সময় আমি একজন কর্তাপুরুষকে খুঁজিয়া পাই না। রবীন্দ্রনাথই গাহিয়াছেন—

“বাসনার বশে মন অবিরত
ধায় দশদিশে পাগলের মত —”

এই পাগলা-গারদে “স্থির অঁখি যার জাগিছে নিয়ত,”—তাঁহাকে ত আমি চোক মেজিয়াই দেখিতে পাই না। ডাক দিলেই ত প্রাণের ভিতর সে কর্তাপুরুষের সাড়া পাই না। এই কর্তাপুরুষের দোহাই দিয়া সংসারে কত লোকে, এদেশে ও বিদেশে, কত বিগর্হিত কৰ্ম করিতেছে, ইহাও ত দেখিতেছি। মুসলমান গাজি খোদার নামে, তাঁর প্রেরণায় দোহাই দিয়া, নিরপরাধ কাকেরের শিরোচ্ছেদন করিয়া আপনার স্বর্গের পথ পরিষ্কার করে। তান্ত্রিক কাপালিক শুদ্ধদেহ কুমারীর কোমর হরণ করিয়া আপনার মুক্তির আয়োজন করে। খৃষ্টীয়ান মরমন্ সধবার শয্যা অস্বীকার করিয়া আপনার ধর্ম বিস্তার করে। এরা সকলেই ঈশ্বরের নামে, ধর্মের দোহাই দিয়া, অন্তরের কর্তাপুরুষের উপরে নিজেদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার দায়াদায় অর্পণ করিয়া চলে। ইহার মধ্যে ঈশ্বরের প্রেরণা কোন্টা, তার মীমাংসা করিবে কে?

ফলতঃ আমাদের ভিতরে একজন মাত্র কর্তাপুরুষই যে আছেন, তারই বা প্রমাণ কি? আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, প্রত্যেক মানুষের ভিতরে একাধিক ভূত বাস করে। ইহাদের মধ্যে কখনও একটা আর কখনও বা অল্পটা প্রবল হইয়া তার দেহমনকে লইয়া খেলা করে। একই ব্যক্তি কখনও বা মিষ্টার জেকিল, কখনও বা ডাক্তার হাইড্ হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের অভিনয় করে। অথচ এ সম্বন্ধে আমাদের যে একটা মৌলিক একত্বও আছে, ইহাও অস্বীকার করা সম্ভব নয়। নানাবাসনাবিক্ষুব্ধ, নানাকৰ্মবিক্ষিপ্ত, নানাতাবোন্মত্ত চরিত্রের অন্তরালে এমন একটা কেন্দ্রস্থান আছে, যেখানে বাইলে আমি যে আমি'ই, অন্য কেহ নহি, ইহা বুঝিতে পারি। ঐ কেন্দ্রস্থানেই জীবনের মৌলিক একত্বের ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠা। ঐখানেই জীবনের সকল বিরোধের নিষ্পত্তি, সকল স্বপ্নের মীমাংসা, সকল সম্বন্ধের নিরসন ও সকল দাওদাদাবীর শেষ সম্বন্ধ হইয়া থাকে। আর সেই মহামহিমাবিত মামাতীত পরব্যোমেই, আমাদের অন্তরের অন্তর্যামী কর্তাপুরুষ বসিয়া আছেন,—সাধুমহাপুরুষেরা এই কথাই কহিয়াছেন। প্রাচীন উপনিষদ এই পরব্যোম-

কেই গুহা করিয়াছেন। এই অন্তরের অন্তরতম গীঠস্থানকে লক্ষ্য করিয়াই মহাভারত “ধর্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং” বলিয়াছেন। অর্থাৎ এই অন্তরের অন্তর-তম কর্তাপুরুষকেই

“গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং”—

বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন।

এই অন্তরের অন্তরতম কর্তাপুরুষকে জানিতে হইলে অনেক কাঠখড় পুড়াইতে হয়। সকলের আগে এই দেহটাকে আপনার প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যিক। এই কর্তাপুরুষ এই দেহের মধ্যেই ত আছেন; কিন্তু দেহটা ত সর্বদা আপনার ভাবে থাকে না। বৈদিক প্রভাবে, আবারো শিক্ষা ও সংসর্গ বশতঃ, এই দেহটা বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। দেহের যন্ত্রসকল বিকৃত হইয়া মানুষের সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে বিকৃত করিয়া তোলে। ততক্ষণ দেহের এই বিকৃত অবস্থা থাকে, ততক্ষণ দেহাভ্যন্তরস্থ কর্তাপুরুষ এই দেহযন্ত্রকে আপনার ইচ্ছামত চালাইতে পারেন না। ততক্ষণ দেহের বিকৃত ক্ষুংপিপাসাদির মধ্য দিয়া এই কর্তাপুরুষের শুদ্ধ ও সত্য প্রেরণা আসে না। ততক্ষণ এই দেহটা তাঁহাকে প্রকাশ না করিয়া কেবল ঢাকিয়াই রাখে। সুতরাং দেহাভ্যন্তরস্থ এই কর্তাপুরুষকে জানিতে হইলে, সকলের আগে এই দেহকে তার নিজের বিশুদ্ধ প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যে সাধনের দ্বারা এটি হয়, আমাদের প্রাচীনেরা তাহাকেই দেহশুদ্ধি বা ভূতশুদ্ধি কহিতেন।

তার পর চিত্ত-শুদ্ধি। চিত্তবৃত্তি সকলকে নিজ নিজ স্বরূপে বা প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত করারই নাম চিত্তশুদ্ধি। অসংযত মন ও উদ্দাম ইন্দ্রিয়গ্রামই চিত্তের বিক্ষেপ উৎপাদন করে। অতএব চিত্তকে বশীভূত, স্থির ও প্রকৃতিস্থ রাখিতে হইলে, ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত ও মনকে সংযত করা প্রয়োজন। তার পর আত্মশুদ্ধি, অর্থাৎ আত্মা যে দেহ নহে, আত্মা যে সংসার নহে, এই বিবেক জাগাইতে হইবে। তারপর সকল বিষয়ে ফলকামনাবর্জন করিতে হইবে। এই ফলকামনাবর্জনেই প্রাচীনেরা বৈরাগ্য কহিয়াছেন। আর এই দেহশুদ্ধি, এই চিত্তশুদ্ধি, এই বিবেক ও বৈরাগ্য,—এসকলই সেই অন্তরের অন্তরতম কর্তাপুরুষকে পাইবার উপায়। যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধি আমাদের দেশে প্রাচীনতম কাল হইতে ধর্মের ও কর্মের চিরন্তন লক্ষ্য হইয়া আছে, এ সকলই তার সাধন। এই সাধনের দ্বারাই এ রাজ্যে সাধকের প্রতিষ্ঠালাভ হয়।

এই প্রতিষ্ঠালাভ হইলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সকল বিপদ কাটিয়া যায়, ব্যষ্টিতে-সমষ্টিতে সকল বিরোধের নিঃশেষ নিম্পত্তি হয়। কারণ, দেহ যার নিজের সত্য প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়াছে, বিশ্ববিধানে এই দেহের স্থান ও কর্ম যে কি, সে ইহাও

বুঝিয়াছে এবং ইহা বুঝিয়াছে বলিয়াই বিশ্বের সঙ্গে দেহ-সম্বন্ধে তার সকল বিবাদ মিটিয়াছে। তার এই বিশিষ্ট দেহই তখন বিশ্বদেহের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। চিত্ত তার শুদ্ধ, অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়, তার সকল ইন্দ্রিয় বিশ্ববস্ত্রের মধ্যে আপনার স্থান ও অধিকার প্রাপ্ত হয়, ইন্দ্রিয়ের সংগ্রাম তার ঘুচিয়া যায়। সৰ্ব্বফলকামনা তার নিঃশেষ নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়, বিশ্বকামনাই তখন তার আত্মকামনা হইয়া পড়ে। এই সাধনে তার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, আপনার ব্যক্তিত্বের বা personality'র সত্য বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার দ্বারা সে বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হইয়া যায়। তার individualismই তখন সত্য ও সাকার, real এবং concrete universalism হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষ এইরূপেই এই ঐকান্তিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পথে বিশ্বাত্মকত্ব সাধন করিয়াছিল। ভারতবর্ষ সাধনপথে চলিয়া যে অপূৰ্ণ সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, খৃষ্টবর্ষ কেবল মানসরথে চড়িয়া সে সমন্বয়লাভ করিবে কেমনে?

এই ক্ষণেই আমাদের প্রাচীনেরা কহিয়াছেন, এ পথে সকলের অধিকার নাই। দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, বিবেকবৈরাগ্যসিদ্ধি যার হয় নাই, এই ঐকান্তিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যধর্মের তার সত্য অধিকার জন্মে না। কিন্তু ইংরাজ বাহাকে রাইট বলে, আমাদের প্রাচীনেরা তাহাকে অধিকার কহেন নাই। আমাদের অধিকার অর্থ স্বত্ব নহে,—সামর্থ্য। যে কাজ করিবার যার অধিকার, অর্থাৎ সামর্থ্য নাই, সে যদি সে কাজে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে কৰ্ম্মও পণ্ড হয়, কৰ্ম্মারও অমঙ্গলের আশঙ্কা জন্মে। সকল কৰ্ম্মেরই কতকগুলি পূৰ্ণ-সাধন আছে। ব্যাকরণ ও শব্দকোষ অধ্যয়ন সাহিত্যচর্চার পূৰ্ণ-সাধন। পাটীগণিত অধ্যয়ন বীজগণিত আলোচনার পূৰ্ণসাধন। এই পূৰ্ণসাধন যার আছে, সে'ই সাহিত্য বা বীজগণিত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতে পারে, সে'ই এ বিষয়ে অধিকারী। এই অর্থেই ধর্ম্মও অধিকারী-অনধিকারীর কথা ব্যবহৃত হয়।

আমাদের সমাজে গতানুগতিক ধর্ম্মচিন্তায় ও ধর্ম্মতত্ত্বে ধর্ম্মের এই অধিকারিভেদকে প্রকৃতিগত ও সাধনগত না রাখিয়া জাতি-জন্মগত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা জানি। কিন্তু ইহা অধিকারিভেদের অপব্যবহার মাত্র। এই অপব্যবহার দেখিয়া অধিকারিভেদের সত্য অর্থকে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে কেন?

আর ধর্ম্মের এই অধিকারিভেদটা জাতি ও জন্মগত হইয়াই আমাদের দেশে লৌকিক ধর্ম্মের বা সামাজিক ধর্ম্মের এবং সাধন-ধর্ম্মের বা মোক্ষধর্ম্মের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। পরমপুরুষার্থসিদ্ধিই মোক্ষধর্ম্মের বা সাধনধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এই পুরুষার্থলাভেই মানুষের মুক্তি হয়। এই মুক্তি-বস্তুটা জন্ম-বস্তু নহে, কোনও প্রকারের ক্রিয়াকর্ম্মের দ্বারা ইহাকে উৎপন্ন করা যায়

না। এই মুক্তি নিত্যসিদ্ধ বস্তু। আপনার সত্য স্বরূপেতে মানুষমাত্রেই নিত্য-মুক্ত রহিয়াছে। এই জন্তই ব্রাহ্মণ-সম্ভাবনাকালে বলেন—

“অহং দেবো ন চাত্তোহস্মি ব্রহ্মাস্মি ন চ শোকভাক্।

সচ্চিদানন্দরূপোহস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥”

অর্থাৎ আমি দেবতা, অস্ত্র কেহ নই; আমি ব্রহ্ম, শোকভোক্তা নই; আমি সচ্চিদানন্দরূপ, আমি নিত্যমুক্তস্বভাববান্। নিত্যকাল যে মুক্ত, তাহাকে কোনও ক্রিয়ার দ্বারা মুক্ত করা অনাবশ্যক। কিন্তু অজ্ঞানতা-বশতঃ, অবिवেক প্রযুক্ত, এই নিত্যমুক্তস্বভাব যে আত্মাপুরুষ, সে দেহাদিতে আবদ্ধ অধ্যাস করিয়া, আপনাকে বদ্ধ ভাবিয়া অশেষ দুঃখবিস্ময় ভোগ করে। এই অবিজ্ঞা নষ্ট করিয়া আত্মাপুরুষের এই স্বতঃসিদ্ধ স্বাধীনতাকে জ্ঞানগম্য করাই সাধনধর্মের উদ্দেশ্য। এই জন্ত এই সাধন-ধর্মের গতি সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার প্রতি। এই জন্ত সাধনধর্ম বলে—ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গরু, হাতী, কুকুর ইহাদের মধ্যে কোনও পারমার্থিক ভেদ নাই। কিন্তু সাধন-ধর্ম যেমন এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার পথে চলে, লৌকিক বা সামাজিক ধর্ম সেইরূপ বৈষম্য, প্রতিযোগিতা এবং বন্ধনকে স্বীকার করিয়াই প্রতিষ্ঠালাভ করে।

এই সাধনধর্ম আমাদের সাধনারই একটা বিশেষত্ব। জগতের আর কোনও ধর্ম ঠিক এই বস্তুটি নাই। খ্রীষ্টীয়ান যাহাকে practical religion বলেন, যে ধর্ম লোকেবুর্ কর্মে ও চরিত্রে প্রকট হয়, আমরা তাহাকে লৌকিক ধর্মই বলি, সাধন-ধর্ম বলি না। জগতের আর কোনও ধর্ম আমাদের এই সাধন-ধর্মের মতন কোনও কিছু নাই। নাই এই জন্ত, যে জগতের আর কোনও ধর্ম মানুষকে নিত্য-মুক্ত-স্বভাববান্ বলিয়া ধরিতে পারে নাই। মুক্তি যে মানুষের নিত্যসিদ্ধ বা eternally realised বস্তু, অস্ত্র কোনও ধর্ম এ কথা বলে না। এই জন্য সে-সকল ধর্ম মুক্তি একটা জন্ত-বস্তু, অর্থাৎ কর্মের দ্বারা, সাধনের দ্বারা, এই মুক্তির অবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর সমাজ ব্যতীত কর্ম সম্ভব হয় না। মানুষ-সমাজই আমাদের একমাত্র সত্য কর্মভূমি। সুতরাং সমাজ-ধর্মের দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়। অতএব সমাজধর্ম এক আর সাধন-ধর্ম বা মোক্ষধর্ম আর এক, জগতের অপর কোনও ধর্ম এরূপ একটা ভাগাভাগি দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশে বহুকাল হইতেই সন্ন্যাসের আদর্শ প্রবল হইয়া, সাধন-ধর্মের ও সমাজধর্মের মধ্যে একটা বিরাত্ পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বিশিষ্ট সাধু-মহাপুরুষ-দিগের জীবনে কচিৎ সাধনধর্ম ও সমাজধর্মের মধ্যে একটা সত্য ও গভীর সমন্বয় সাধিত হইলেও, জনসাধারণের চিন্তা ও কর্মে এই সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সাধারণ লোকে

সাধন-ধৰ্মের ও সমাজধৰ্মের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করিয়া একটা গোঁজা-মিল দিয়া রাখিয়াছে। এই জন্তই সাধনধৰ্মটা গৃহ ও সমাজধৰ্মটা বাহ্য হইয়া পড়িয়াছে ; এবং লোকের মধ্যে লোকাচার সদৃশকর সঙ্গে সদাচার, সাধক-সমাজে এই নীতি প্রবল হইয়া আছে।

সাধনধৰ্মে ও সমাজধৰ্মে একরূপ ভাগভাগিটা কিছুতেই ভাল নয়। ইহাতে লোক-চরিত্রের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দেয়। ধৰ্মের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ও গভীরতম প্রেরণাকে জন-গণের দৈনন্দিন কৰ্মজীবন ও সমাজের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ও কর্তব্যাকর্তব্য হইতে অতি দূরে রাখিয়া, ধৰ্মকে একান্ত অন্তর্মুখীন বা subjective এবং কৰ্মকে নিতান্ত বহির্মুখীন বা external করিয়া তোলে। ইহার ফলে ধৰ্মবস্তুটা নিতান্ত বিমানচাষী ও ভাবপ্রবণ হইয়া উঠে ; আর জীবনের কৰ্মসকল অত্যন্ত প্রাণহীন ও তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ধৰ্ম প্রতিদিনের কৰ্মের মধ্যে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে পারে না ; কৰ্ম ও পৃথিবীর ধূলিজাল হইতে মুক্ত হইয়া ধৰ্মের দিব্য আলোকে মণ্ডিত হইয়া উঠে না। ইহার ফলে লোকচিত্ত কৰ্মের বেলায় একান্তভাবে ইহসৰ্বস্ব ও ধৰ্মের বেলায় আত্মত্যাগ-রূপে পরলোক-সৰ্বস্ব হইয়া পড়ে। ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে, অনাত্মা ও আত্মার মধ্যে, জগৎ ও ব্রহ্ম এবং জীব ও শিবের মধ্যে একটা সত্য সম্বন্ধ সাধন করিতে না পারিয়া, লোকচিত্তা ক্রমে এ-লোককে অনিত্য এবং ও-লোককে নিত্য ; জগৎকে অসত্য ও ব্রহ্মকে সত্য ; সংসারকে কল্লনা ও পরমার্থকে বস্তু বলিয়া ধরিতে বাইরা,— এই লোক সত্য নহে, ইহার কোন পারমার্থিক মূল্য ও মর্যাদা নাই ; সংসারটা অতিনয় অকিঞ্চিংকর, সংসারের সম্বন্ধ সকল ক্ষণিক ও মায়িক, জীবনের ধৰ্মাধৰ্ম পর্যন্ত “অবিজ্ঞাবদ্বিষয়ানি”—এই ভাবটাকে গিয়া আঁকড়াইয়া ধরে। আর—

“তুমি কার, কে তোমার, কারে বল রে আপন,
মহামায়া-নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন !”

ইহাই জীবনের শেষ কথা ও সার কথা হইয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, ইহাই সাধনের মূলমন্ত্র হইয়া উঠে।

শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু এই বাঙ্গালাদেশে যে বৈষ্ণব-গিদ্ধান্তের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে এই বৈদান্তিক বা তাত্ত্বিক মার্যাবাদের স্থান নাই। তিনি স্পষ্টভাবে ভগবান্ ভাষ্যকারের বিবর্তবাদ খণ্ডন করিয়া পরিণামবাদ স্থাপন করেন। এই পরিণামবাদে জগৎ ও জীবকে পরিণামী নিত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা করে। অথচ মহাপ্রভুর প্রবর্তিত গোড়ীর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও সংসারজীবনে এই মার্যাস্বক মার্যার হাত এড়াইতে পারিলেন না।

লোকে বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা লইল, বৈষ্ণব গুরু করিল, বৈষ্ণব শাস্ত্র পড়িল ; কিন্তু এই জগৎকে ও জগতের বিবিধ সম্বন্ধকে সত্যবোধে, ধর্মের প্রেরণায়, মুক্তিকামনায়, পরমার্থ-দৃষ্টিতে দেখিয়া, আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিল না । ইহারা ভগবান্ মানিল ; ভাগবতী লীলার কথা কহিতে লাগিল ; ক্ষণজন্মা সাধু-মহাজনেরা ভাগবতী-তত্ত্ব লাভ করিয়া ইহজীবনে ও ইহলোকেই সেই নিত্য ভাগবতী লীলার অনুসরণ করিতে পারেন, ইহাও বিশ্বাস করিল ; ভাগবতী-তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, এমন সিদ্ধ মহাপুরুষের সঙ্গ পর্য্যন্ত করিল ; কিন্তু তথাপি এই সংসারের প্রত্যক্ষ সেবার, প্রেমের, রসের সম্বন্ধের মধ্যেই যে দেশকালের রঙ্গমঞ্চে ভগবানের নিত্যলীলার নিত্য অভিনয় হইতেছে, এ সংসারের দাস্ত, সখা, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যের সম্বন্ধসকল যে সেই নিত্যরসলীলার নিত্য রস-সম্বন্ধের আদর্শই প্রকাশিত হইতেছে, ভগবানের এই জাগতিক লীলার আমরা প্রত্যেকে যে তাঁর লীলা-পরিকর—এ সকল কথা ধরিতে ও বুঝিতে পারিল না । ইহারাও ভগবানের প্রত্যক্ষ জাগতিক লীলাকে মায়িক ও অলৌক বলিয়া বর্জন করিয়া, সংসারের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ-সকলের প্রতি উদাসীন হইয়া, “অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে” তাঁর “অপ্রাকৃত লীলা” ধ্যান ও কীর্তন করিতে লাগিল । এইরূপে এই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত তত্ত্বকে সংসার ও পরমার্থের মধ্যে একটা অপূর্ণ সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধন করিয়াও, সাধনাদে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল না । বৈদান্তিকের কৈবল্যধামের স্থানে বৈষ্ণবের ব্রজধামের প্রতিষ্ঠা হইল বটে, কিন্তু মায়াবাদী বৈদান্তিক যে ভাবে এই সংসারকে মায়িক ও অলৌক বলিয়া উপেক্ষা করিতেছিলেন, ভক্তবাদী বৈষ্ণবও তাহা করিতে লাগিল ।

এমন কেন হইল ?

ব্রহ্মজ্ঞানাধের প্রবন্ধের বিচারে যে মূল ইষুটা ধার্য্য হইয়াছে, অর্থাৎ আমাদের ধর্মের ও সমাজের সংস্কার ও শাসনই কি আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় জীবনের হীনতার কারণ, না দীর্ঘকালব্যাপী রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাই আমাদের ধর্মের ও সমাজের সর্ব-প্রকারের বন্ধন-হেতু, সেই মূল ইষুর মীমাংসা এই প্রশ্নের সহজত্ত্বের উপর নির্ভর করে ।

মহাপ্রভু-প্রবর্তিত গোড়ার বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের বধন প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার বহুদিন পূর্বে হইতেই বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজ মুসলমান শাসনের অধীনে আসিয়াছে । রাষ্ট্রীয় জীবনে তখন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে । ধর্মসাধনেও হিন্দুর পরাধীনতা সঙ্কচিত হইয়াছে । নবদ্বীপের মুসলমান কাজি, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অল্প দিন পূর্বে, ভক্তরাজ হরিদাসকে হরিনাম সাধন করিবার অপরাধে বাইশ বাজারে ঘুরাইয়া বেত মারিয়াছে । এই পাশব অত্যাচারের প্রতিবাদ করে, বাঙ্গালাদেশে

তখন এমন লোক ছিল না। হরিন্দাস সমাধিহ হইয়া আপনাকে এই নিৰ্যাতন ও অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। অতি-প্রাকৃত উপায়ে কাজির প্রাণে ভীতি-সঞ্চার করিয়া এই অত্যাচার বন্ধ করিতে পারিলেন। কাজি মহাপ্রভুর কীৰ্ত্তনও ভাঙিতে চাহিয়াছিল। যে জগাই-মাধাই ধনীর ধন হরণ করিত, সতীর সতীত্বনাশ করিত, সমাজের শাস্তিভঙ্গ করিত, বাহাদের ভয়ে গৃহস্থেরা সৰ্ব্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া দিন কাটাইত, কাজি সাহেব সেই জগাই-মাধাইয়ের শাসন করিতে পারিতেন না বা চাহিতেন না। কিন্তু নিরীহ বৈষ্ণবেরা যখন দলে একটু ভাঙ্গি হইয়া উঠিল, ভক্তগোষ্ঠী মিলিয়া হরিনাম দিয়া লোককে মাতাইতে আরম্ভ করিল, এবং ভগবদ্গুণানুকীৰ্ত্তন করিয়া একটু আনন্দ করিতে লাগিল, তখন কাজি সাহেব তাহার বাধী হইলেন। মহাপ্রভুর অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে কাজি সাহেব চৈতন্যচরণাশ্রয় লইলেন, চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গল এ কথা লিখিয়াছেন বটে। আর এ কথা যে অসত্য, এক্ষণ মনে করিবারও কোনও হেতু নাই। তবে এই আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রয়োগে সাময়িক কার্যসিদ্ধি হইল বটে, কিন্তু সমাজের শক্তিবৃদ্ধি হইল না, ইহাও সত্য। সকল বৈষ্ণবই ত আর মহাপ্রভুর মতন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন না। সুতরাং তাঁহারা ধর্মেকর্মে, সংসারের দৈনন্দিন ব্যাপারে, ‘যথা পূর্বং তথা পরং’—কাজির ভয় এড়াইতে পারিলেন না। আর ভয় যেখানে সংসারের প্রভু হইয়া বসে, আনন্দ সেখান হইতে পলায়ন করে। অথচ আনন্দ না হইলে জীবের জীবনচেষ্টাই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

“কো হেবাত্মাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেব আকাশো আনন্দো ন জ্ঞাৎ।”

এই আকাশে যদি আনন্দ প্রসবণ নিয়ত বিদ্যমান না থাকে, তবে কেই বা জীবনচেষ্টা, কেই বা প্রাণধারণ করিতে পারে? এই জন্ত মানুষ যখন সংসারের প্রত্যক্ষ-ব্যাপারে নিয়ত ভয়বিভীষিকার মধ্যে বাস করিতে বাধ্য হয়, ইহলোকে যখন তার জীবনের যথাযোগ্য পার্থক্যতার ও আনন্দের সম্ভাবনা কমিয়া যায়, তখন সে স্বভাবতঃই ইহলোকের সত্য হুঃখ-যাতনাকে ‘নাই’ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া, পরলোকে আপনার জীপ্সিত স্বর্গরাজ্য নির্মাণ করিয়া, এ লোকে বাহা তার অপ্রাপ্য হয়, সেই কল্পিত স্বর্গলোকে তাহা পাইবার আশায় মনকে প্রবোধ দিয়া বসিয়া থাকে।

এইরূপে সংসারের অভ্যাদয়লোপে, লোকের ধর্মের আদর্শের সঙ্গে জীবনের প্রত্যক্ষ কর্মাকর্মের একটা বিশাল পার্থক্য দাঁড়াইয়া যায়। ধর্মের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ও সাধন একান্তভাবে অন্তর্মুখীন বা subjective হইয়া উঠে; এবং ধর্মের ভাব বা ইমোষণ, ভাবুকতার বা সেন্টিমেন্টেলিজমে পরিণত হয়। বাহিরের প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া লোকের ধর্মভাব জীবনের প্রত্যক্ষ কর্মের মধ্যে আপনাকে ফুটাইয়া ও গড়িয়া তুলিতে পারে না। যখনই যে দেশের সাংসারিক অভ্যাদয়ের পথ বন্ধ হইয়া

গিয়াছে, তখনই সে দেশের ধর্ম ও আত্যন্তিক পারলৌকিকতা ও শূন্যগর্ভ ভাবুকতার প্রভাব বুঝি পাইয়া, জনমণ্ডলীকে কৃপণ ও স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে। যেমন বাগালার বৈষ্ণবধর্মের, সেইরূপ ইহুদীর খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসও এই সত্যের সাক্ষ্য-দান করে।

ইহুদীজাতির সাংসারিক অভ্যাদয় যখন একেবারে লোপ পাইয়াছে, জিহোভার আসনে যখন রোমের শাসন প্রতিষ্ঠিত, সেই যুগেই যিশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব হয়। যিশুর অলোকসামান্য শক্তি ও অসাধারণ প্রভাব দেখিয়া ইহুদীরা প্রথমে ভাবিয়াছিল, বুঝি বা তিনি তাহাদের বহুদিনের আশার আশ্রয়-স্বরূপ জিহোভার সেই পূর্ব-প্রত্যাশিষ্ট দেবদূত, বাহ্যিক আগমনে পৃথিবীতে পুনরায় ইহুদীর পুরাতন দৈবতন্ত্রের বা থিওক্রেসির (Theocracy'র) প্রতিষ্ঠা হইবে। এতকাল পরে বুঝি বা যিশুর নেতৃত্বে ইহুদীর বিদেশীয় ও বিজাতীয় দাসত্ব ঘুচিবে। যিশু যখন স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে লাগিলেন, দেশভক্ত ইহুদীরা ভাবিতে লাগিল, তিনি বুঝি তাহাদের হত, নৃপ্ত স্বর্গরাজ্যের কথাই কহিতেছেন। এইরূপ ভাবিয়াই দলে দলে লোক তাঁহার সঙ্গ লইল। কিন্তু ক্রমে যখন ইহারা বুঝিল, যিশু যে স্বর্গরাজ্যের কথা কহিতেছেন, তাহা তাহাদের স্বর্গরাজ্য নহে; এই স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠার দেশে রোমকতন্ত্র নষ্ট হইয়া ইহুদীর স্বাভাব্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না; যিশুর স্বর্গরাজ্য এ লোকের নহে, কিন্তু পরলোকের; এই পৃথিবীর নহে, কিন্তু ঐ আকাশের; জনসমাজে ইহার প্রতিষ্ঠা নাই, জনগণের নিজ নিজ চিত্তেতেই কেবল এই স্বর্গরাজ্য গড়িয়া উঠিবে, তখনই নিরাশাবিক্ষিপ্ত হইয়া তাহারা যিশুর বিরোধী হইয়া উঠিল। এইরূপেই বাহারা প্রথমে যিশুকে জিহোভার দূত বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল, তাহারা পরে তাঁহাকে সমাজদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহী বলিয়া হত্যা করিল।

“সীমরের প্রাপ্য সীমরকে দাও, সীমরের প্রাপ্য সীমরকে দাও”—যিশু যে দিন এ কথা বলিলেন, সেদিনই স্বর্গরাজ্য-লুক ইহুদীর প্রাণে যে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা নিঃশেষ বিলোপ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু যিশুর এই কথা শুনিয়া স্বর্গরাজ্যলুক ইহুদীর দল যেমন ক্ষেপিয়া উঠিল, সেইরূপ আর এক দল হাঁপ ছাড়িয়াও বাঁচিল। সীমরে ও সীমরে যখন একটা ভাগবাটোয়ারা হইয়া গেল, তখন ইহাদের হুকুলরক্ষার একটা উপায় জুটিল। বাহারা সাম্বিকতার বহিরাবরণের মধ্যে ঘোরতর ভাসমিকতাকে আশ্রয় করিয়া, নিতান্ত ভালমানুষের মতন, একান্ত নির্বিকারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার জ্ঞান ব্যর্থ ছিল, তাহারা যিশুর ঐ আকাশের স্বর্গরাজ্যটা পাইয়া, এই পৃথিবীতে স্বজাতির স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠার দায় হইতে মুক্তিলাভ করিল। তখন হইতে যিশুর শিষ্যেরা ইহলোকের অভ্যাস-অবিচার, উৎপীড়ন-অত্যাচার, হিংসা-দারিদ্র্য, সংসারের সকল প্রকারের যন্ত্রণার

ঔষধস্বরূপ ঐ আকাশের স্বর্গরাজ্যটাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। অজ্ঞেরা উপরের আকাশের স্বর্গরাজ্যে বাইরা মরণান্তে জীবনের সকল সাধ মিটাইবার আশায় বসিয়া রহিল। বিজ্ঞেরা নিজেদের অন্তরেই সেই স্বর্গরাজ্যে রহিয়াছে জানিয়া আপনাপন অন্তরকে শুদ্ধ করিবার জন্য ঐকান্তিকভাবে চিন্তাশুদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে নানা লোকে নানা দিক্ দিয়া, যিশুখ্রীষ্ট-প্রচারিত ধর্ম সংসার ও পরমার্থের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করিল। সেই হুইতে যিশুখ্রীষ্টের ধর্মের ঝোঁকটা বহুশতাব্দী ধরিয়া পরলোকের উপরেই পড়িয়া রহিল; এ লোকে স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃকপাতও করিল না। আর ইহার প্রধান কারণ এই যে, যে-কালে, যে-সমাজে যিশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব হয়, সে-কালে সে-সমাজের সাংসারিক অভ্যুদয় একেবারে লোপ পাইয়াছিল। ইহলোকে জনগণের আরাম, শান্তি ও আনন্দের অবসর নিতান্ত কমিয়া গিয়াছিল। ঘরে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ, বাহিরে বিদেশীর শাসন, নেউলে পুরোহিতের প্রভুত্ব, দরবারে রাজার দাসত্ব, এ সকলে মিলিয়া জীবনটা দুঃখময় করিয়া তুলিয়াছিল। এই জন্যই ইহসংসারে জীবনের যে সার্থকতার ও আনন্দের অবকাশ ছিল না, পরলোকে তাহা পাইবার আশায় মানুষের লুপ্ত চিন্তা, সেখানে একটা স্বর্গরাজ্য কল্পনা করিয়া, সেই দিকে মুখ রাখিয়া, যন্ত্রাঙ্গের মতন সংসারপথে বিচরণ করিতে লাগিল।

ইহুদার সীমা অতিক্রম করিয়া যিশুখ্রীষ্টের ধর্ম ক্রমে গ্রীশ ও রোমে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু খৃষ্ট-শিষ্যেরা গ্রীশ ও রোমের অভ্যুদয়ের অংশীদার হওয়া দূরে থাকুক, গ্রীশী ও রোমক সমাজপতি এবং রাষ্ট্রপতিদিগের নিকটে অসহ্য লাঞ্ছনা ভোগ করিতে লাগিলেন। সেকালের খৃষ্টীয়ানকে চোরের মতন মাটির নীচে বাস করিতে হইত, ধরা পড়িলে আপনার ধর্মবিশ্বাসের জন্য রাজসরকারের পোষা সিংহের কবলে প্রাণত্যাগ করিতে হইত। এ অবস্থার খৃষ্টীয় ধর্মের ঝোঁকটা যে অতিমাত্রায় পরলোকের উপরে বাইরা পড়িবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? কালক্রমে এ সকল অত্যাচার থামিয়া গেল, খৃষ্টধর্ম ইউরোপের জনসাধারণের ধর্ম হইয়া উঠিল। কিন্তু খৃষ্টীয়ান জনমণ্ডলীর ব্যক্তিগত স্বত্বস্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হইল না। রোমকদিগের রোম গেল, কিন্তু খৃষ্টীয়ান-সম্ভবর অধিপতি পোপ রোমক সম্রাটের শূন্য সিংহাসনে বাইরা বসিয়া, পূর্ববৎই স্বৈচ্ছামত লোকশাসন করিতে লাগিলেন। রাজা-প্রজা সকলে পোপের পদানত হইয়া রহিল। অত্যাচারীর পরিবর্তন হইল, অত্যাচারের রূপও বদলাইল না, পেষণেরও প্রশমন হইল না। রাজা বাহুবলে লোককে পদানত করিয়া রাখিতেন, পোপ ধর্মের বিভীষিকা জাগাইয়া, ভীকাতর দাসত্বশৃঙ্খল দিয়া জনমণ্ডলীর দেহ, মন, প্রাণ, আত্মাকে পর্য্যস্ত বাধিতে লাগিলেন। এইরূপে খৃষ্টীয় ধর্মের তস্কারে ও সাধনাজে একটা আত্যাতিিক পারলৌকিকতা বা other-worldliness এর অন্তর্ভুক্ততা বা subiecti-

vity'র এবং অতিলৌকিকতা বা superntauralism'এর প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হইল। এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠার কথা, খৃষ্টীয়ানমণ্ডলীর উপাসনাপদ্ধতিতে থাকিলেও, তাহাদের কল্পনা হইতে দূর হইয়া গেল। একদিকে ইউরোপের স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজত্ববর্গ, অন্যদিকে খৃষ্টীয়ান-সম্মত বা Catholic Church এই দুইদলে মিলিয়া বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া ইউরোপের অন্তর ও বাহির উভয়দেশে দুঃশ্চেষ্ট বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিল। ধর্ম ও কর্ম, জীবনের কোনও বিভাগে, আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক পরিমাণ ভূমিও রহিল না। এই দীর্ঘকালকেই আধুনিক ইতিহাস ইউরোপের মধ্যযুগ (Mediaeval ages) বা তামসযুগ (Dark ages) कहিয়া থাকে।

আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অবসর না পাইলে, যুগপৎ মানুষের সাংসারিক ও পারমার্থিক জীবনে কত যে দুর্গতি ঘটে, ইউরোপের এই মধ্যযুগের ইতিহাস তার সাক্ষী। মধ্যযুগে ইউরোপের যে মানসিক ও সামাজিক দুর্গতি ঘটিয়াছিল, কেবল ক্যাথলিক সম্মত পোপ ও পোরোহিত্যের প্রভাবই তার জন্য দায়ী ছিলেন না। স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজ-শক্তি এই অতিপ্রাকৃত পোরোহিত্যের সঙ্গে মিলিয়া ইউরোপকে সকল দিকে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিয়াছিল। জীবনের কোনও ক্ষেত্রে লোকের স্বাধীন ও সহজভাবে আত্মচরিতার্থতা অব্যবহারের অবসর ছিল না। আর এই জন্যই মধ্যযুগের ইউরোপের এই দুর্গতি ঘটিয়াছিল। ক্রমে ইউরোপের খৃষ্টীয়ান সমাজ পোপ ও পোরোহিত্যের বন্ধন কাটাইয়া বাহির হইল, ধর্মচিন্তার ও ধর্মসাধনে মার্টিন লুথারের পর হইতে স্বাভিমতের বা private judgement'এর মর্যাদা ও অধিকার অনেকটা প্রতিষ্ঠালাভ করিল। কিন্তু রাষ্ট্রতন্ত্রে প্রজামতের প্রতিষ্ঠা হইল না। এই জন্য ধর্মবন্ধন কতকটা আলাগা হইলেও, রবীন্দ্রনাথ যে ব্যক্তিস্বাভিত্ত্যের আদর্শ প্রচার করিতে যাইয়া, আমাদের দেশের শাস্ত্রানুগত্য ও আচারবশতাকেই আমাদের পরমতানুষ্ঠিতা ও পরমুখাপেক্ষিতার জন্য বিশেষভাবে দায়ী করিতেছেন, সেই শাস্ত্রানুগত্য ও আচারবশতাই নষ্ট হইল না। আমরা এখন যেমন “কর্তার ইচ্ছায় কর্ম” বলিয়া, সকল বিষয়ে পরের কর্তৃত্ব সহিয়া থাকি, বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টীয়ান সমাজ সেইরূপ তামসিকতা ও কার্পণ্য দ্বারা অভিভূত হইয়া ছিল। করানী বিপ্লবের পর হইতেই রাষ্ট্রে গণতন্ত্রতার প্রভাব-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ইউরোপে ধর্ম ও কর্ম, জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানুষ মানুষের মতন হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আগে ধর্মের কুসংস্কার ও সমাজের বৈষম্য দূর করিয়া ইউরোপ রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রজামত ও প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করে নাই; বরঞ্চ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আগে লাভ করিয়াই, ক্রমে ক্রমে জীবনের অপরাপর বিভাগে জন মণ্ডলীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুলিয়া দিয়াছে।

মানিয়ার, সাংসারিক অভ্যুদয় না থাকিলে ধর্ম সত্য ও বাস্তব হয় না, নিতান্ত

অন্তর্দ্বীন ও ভাবুকতা-প্রবণ হইয়া উঠে। কিন্তু সাংসারিক অভ্যাস বৃদ্ধিতেই যে ধর্মের জীবৃদ্ধি হইবে, ইতিহাস তা এ কথা বলে না। ইউরোপের অভ্যাস তা খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছে; তার ধর্মেরও প্রভাব সেরূপ বাড়িয়াছে কি? ইউরোপের বর্তমান অভ্যাস সত্ত্বেও ইউরোপের ধর্মসাধন ও সমাজনীতি কতটা পরিমাণে যে হীন হইয়া পড়িয়া আছে, রবীন্দ্রনাথ নিজেরই তার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

কিন্তু আমরা যে-ইউরোপের অভ্যাস দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতেছি, সে-ইউরোপ মুষ্টিমেয় ধনীরই ইউরোপ, ইউরোপের বিরাট প্রকৃতিপুঞ্জের ইউরোপ নহে। এই অভ্যাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের জ্ঞান এবং কলাকুশলতাও বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু এই জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত ও কলাকুশলতাসম্পন্ন ইউরোপও মুষ্টিমেয় মনীষীদিগেরই ইউরোপ, জনমণ্ডলীর ইউরোপ নহে। সাংসারিক অভ্যাসের অভাবে যেমন, সেইরূপ এই অসম অভ্যাসের অতিবৃদ্ধিতেও জনমণ্ডলীর মনুষ্যত্বকে চাপিয়া রাখে।

ইউরোপে আমাদের হিন্দুসমাজের মতন কোন জাতিভেদ নাই, সত্য; কিন্তু বিষম শ্রেণীভেদ আছে। আমাদের এই জাতিভেদ যে ভাল, এমন কথা বলি না। মনু আওড়াইয়া, অথবা মনুর সঙ্গে মেণ্ডেল-উইস্ম্যানকে মিশাইয়া, যুগপৎ প্রাচীন স্মৃতি ও আধুনিক বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া এই জাতিভেদটাকে সমাজে রাখিতেই হইবে, এমন আদারও করি না। কিন্তু আমাদের এই বিষম জাতিভেদ সত্ত্বেও আমাদের দেশে যে সামাজিক সহায়ভূতি ও সাহচর্য আছে, জাতিভেদ-হীন ইংলণ্ডে তার শতাংশের একাংশ নাই, এ কথা শতবার যুক্তকণ্ঠে কহিব। আমাদের জাতিভেদ, বিশেষতঃ এই বাঙ্গালদেশে এবং সমগ্র উত্তরভারতে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে পংক্তিবোজনই নিবেদন করে, কিন্তু পরস্পরের সামাজিক সাহচর্য নষ্ট করে না। ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণের বর্ণের অন্নই কেবল গ্রহণ করেন না, কিন্তু বিবাহের আসরে, শ্রাদ্ধবাসরে, নানাবিধ পূজা-পার্বণোপলক্ষে, যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি সামাজিক সম্মিলনে, গ্রাম্যদের সঙ্গে একাসনে বসেন না, এমন তা নয়। অগ্ন্যজ বর্ণ বাহাদিগকে বলে, তাঁহারাও, অন্ততঃ এই বাঙ্গালা দেশে, সামাজিক ক্রিয়াকলাপে যখন সভা হয়, তখন সেই সভায় ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর বর্ণের সঙ্গে, একাসনে নহে, পৃথগাসনে কিন্তু একই আসরে বসিয়া পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা ও ভাব-বিনিময় করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের চতুর্পাঠিতে অধ্যাপক যখন ব্যাকরণ বা শাস্ত্রের সূত্র অধ্যাপনা করান, তখনও গ্রামের তথাকথিত ইতরলোকেরা সেখানে ঘাইয়া, কেহ বা ঘরে, কেহ বা দাওয়ার কেহ বা উঠানে বসিয়া, তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে গ্রাম্যকথা কহে, আর সারাক্ষণ তাঁর সেই অধ্যাপনা নীরবে, প্রছাভরে, নিবিষ্টচিত্তে শুনিয়া থাকে। রামময় বিদ্যালঙ্কার

মহাশয়কে রামা বাগ্গী 'দাদা মহাশয়' বলিয়া প্রণাম করে। এই রামা বাগ্গীর সঙ্গে পথে দেখা হইলে, বিজ্ঞানদ্বার মহাশয় ছদ্মগু দাঁড়াইয়া কথাবার্তা কহিতে কিছুই সঙ্কোচ বোধ করেন না; আরাধে-ব্যারামে তার বাড়ীতে যাইয়া, তার খবরাখবর লইয়া থাকেন। ইউরোপের সাম্যবাদী খ্রীষ্টীয়ান সমাজে এটি হয় না। হওয়া এখনও সম্ভব নয়। আর ইউরোপের সমাজের উচ্চতর স্তরের সঙ্গে নিম্নতর স্তরের এই বিশাল ব্যবধান আছে বলিয়া ইউরোপের বর্তমান অদ্ভুত অভ্যুদয় একাংশকেই মাত্র উন্নত করিয়া তুলিয়াছে, ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানও সমাজের সামান্ত ভাগকেই আত্ম অধিকার করিয়া আছে। ইউরোপের বর্তমান অভ্যুদয় এখনও ব্যক্তিগত হইয়াই আছে, সত্যভাবে সামাজিক হইয়া উঠে নাই। একদিকে বিপুল বিভব, অন্যদিকে ভীষণ দারিদ্র্য; একদিকে সভ্যতার উজ্জল গুহ্র আভা, অন্যদিকে বর্ষরতার কৃষ্ণচ্ছায়া; একদিকে মনুষ্যত্বের মোহন রূপ, আর অন্যদিকে পশুত্বের বিকটরূপি—ইহাই ত বর্তমান ইউরোপের সত্য আলোকচিত্র। আর ইউরোপের সাংসারিক অভ্যুদয়বৃত্তিতে ধর্মের ও মনুষ্যত্বের প্রভাব যে বাড়িতেছে না, বরং দিন দিন যেন আরও ম্লান হইয়া পড়িতেছে, ইউরোপের সাংসারিক অভ্যুদয় নহে, কিন্তু ইউরোপীয় সমাজের এই বিষম বৈষম্যই তাহার মূল কারণ।

আমাদের সমাজেও বহুদিন হইতে জাতিতে জাতিতে একটা বিশাল বৈষম্য রহিয়াছে। কিন্তু এ বৈষম্যটা জন্মগত। আর জন্মের উপরে ত মানুষের কোনও হাত নাই। মানুষ জীবনের আর সকল অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারে, কিন্তু জন্মটা কচিং লুকাইতে চেষ্টা করিলেও বদলাইতে পারে না। এই কারণে আমাদের সমাজের এই পুরাতন বৈষম্যটা দূর করিবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কেউ কোনও চেষ্টা করে না, করিতে পারে না। যখন যখন এই চেষ্টা হইয়াছে, তখন হয় সর্বপ্রকারের ব্যক্তিগত স্বার্থবাসনা-বিমুক্ত ধর্মাত্মা মহাপুরুষেরাই লোকহিতকল্পে এ কাজে হাত দিয়াছেন, আর না হয়, সংস্কারকেরা দল বাধিয়া এই বৈষম্য নষ্ট করিতে গিয়াছেন। পুরাণে শোনা যায়, এক বিশ্বামিত্রই ব্যক্তিগতভাবে আপনার অসাধারণ তপঃপ্রভাবে জন্মে ক্ষত্রিয় হইয়াও কশ্মে ব্রাহ্মণত্বলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের পরেও—এমন কি, আত্মি পর্যন্ত, অনেক বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাধু মহাত্মা অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিগাভে জাতিজন্মের সকল সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া, জনগণের গুরু ও ধর্মোপদেষ্টা হইয়া, প্রকৃত ব্রাহ্মণের গুণকর্মলাভে ব্রাহ্মণ্যের মর্যাদা পাইয়াছেন। ইউরোপে শ্রেণীবিভাগ আছে, আমাদের দেশে জাতিভেদ আছে। ইউরোপে নিম্নতর শ্রেণীর লোকেরা গুণকর্মের দ্বারা উচ্চতর শ্রেণীতে যাইয়া উঠিতে পারে, আমাদের সমাজেও নিম্নজাতির লোকে আপনার গুণকর্মের দ্বারা একেবারেই যে উচ্চতর জাতির পদ ও মর্যাদা পায় নাই, বা পাইতে পারে না,

তাহাও নহে। তবে ইউরোপের শ্রেণীবিভেদের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা যত সহজ, ভারতের জাতিভেদের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা তত সহজ নহে। ইউরোপে টাকার জোরে নিম্নতর শ্রেণীর লোকে উচ্চতর শ্রেণীতে বাইরা প্রবেশ করিতে পারে। ভারতে টাকার দ্বারা অত্রাঙ্গণ ত্রাঙ্গণ হইতে পারিত না। ইংলণ্ডে আজ যে ওড়ি, কাল সে নাট; আজ যে ব্রুয়ার (brewer) কাল সে পীয়ার হইতে পারে। টাকা জমাইতে ও একটু বুদ্ধি খাটাইয়া সেই টাকার কিয়দংশ লোক-হিতে কিংবা রাষ্ট্রকর্মে ব্যয় করিতে পারিলেই যে-সে দেশে আভিজাত্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। এ দেশের জাতির গণ্ডীটা সোনারূপা দিয়া ভাঙিতে পারা যায় না—কেবল তপঃপ্রভাবে ও ভক্তির বলেই ভাঙিতে পারা যায়। প্রবৃত্তির পথে নয়, নিবৃত্তির পথে;—সংসারের পথে নয়, কেবল পরমার্থের পথেই আমাদের সমাজে, জাতি-জন্মের বৈষম্য নষ্ট হইয়াছে। এ পথ বড় কঠিন, বড় সংকীর্ণ; ও পথ অপেক্ষাকৃত সহজ ও প্রশস্ত। এ পথের প্রলোভন অল্প; ও পথে অসংখ্য। ত্যাগের সংকল্প লইয়া এ পথে পদক্ষেপ করিতে হয়; ভোগের বাসনা প্রদীপ্ত করিয়া ও পথে চলিতে হয়। ইংরাজের শ্রেণীভেদ ও ভারতের জাতিভেদের কথা লইয়া বিচার-আলোচনার সময়, উভয়ের এই মূল প্রভেদটা মনে রাখা মন্দ নয়।

হিন্দুর জাতির সীমা অতিক্রম করা অসাধ্য নহে; কিন্তু অত্যন্ত দুঃসাধ্য। ইংরাজের শ্রেণীর সীমা অতিক্রম করা অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য। অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য বলিয়া সকলেই যে অতিক্রম করিতে পারে, তাহা নহে; কিন্তু অতিক্রম করিবার লোভটা সকলেরই হয়। টাকার জোরেই যখন নিম্নশ্রেণীর লোকে উচ্চশ্রেণীতে বাইরা বসিতে পারে, তখন এই টাকা উপার্জনের জন্য সমাজে একটা বিকট কাড়াকাড়ি লাগিয়া যায়। সকলেই আপনার দল ছাড়িয়া উপরের দলে উঠিবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করে। এই বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতা-নিবন্ধন, নিজেকে সমাজে উঁচু করিয়া তোলাই জীবনের মুখ্য কৰ্ম হইয়া উঠে। একরূপ অবস্থার জনগণের চিন্তাতে ও ভাবনার সংসারটাই প্রবল ও পরমার্থ দুর্বল হইয়া পড়িবেই পড়িবে,—ইহা আর বিচিত্র কি?

এই জন্যই ইউরোপ সাম্যের নামে প্রতিযোগিতার,—যুদ্ধের দোহাই দিয়া সংগ্রামের প্রতিষ্ঠা করিতেছে। কিন্তু এই প্রতিযোগিতা এবং সংগ্রামই ইউরোপীয় সভ্যতারও শেষ কথা নহে। আমরা যেমন একদিন ত্যাগের পথে বিশ্বাত্মকত্বসাধনের দিকে বাইতেছিলাম, ইউরোপ আজ ভোগের পথে, অজ্ঞাতসারে সেই দিকেই যে চলিয়াছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাসে দেখিতে পাই, যাহারা দল বাধিয়া প্রথমে প্রতিবেশীর ধনসম্পদ কাড়িয়া লইতে আসিয়া, তাহার সঙ্গে লড়াই বাধাইয়া দেয়; তাহারাই ক্রমে সংগ্রাম-অস্ত্রে সন্ধি করিয়া, আপোষে একসঙ্গে বসবাস করিতে

আরম্ভ করে। এইরূপেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী মিলিয়া বড় বড় জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। ক্ষুদ্রতর স্বার্থের প্রেরণায় মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মারামারি কাটাকাটি করিতে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু এই মারামারি কাটাকাটি করিতে বাইরাই, মারামারি কাটাকাটিটা যে কত আশ্চর্য্যাতী ব্যাপার, ইহা বুঝিতে পারিয়া, বৃহত্তর স্বার্থের প্রেরণায়, ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বিসর্জন দিয়া, কাল যে শত্রু ছিল, আজ তাহারই সঙ্গে মিত্রতা করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠে। এইরূপে মানুষের স্বার্থের গণ্ডীটা ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে, “মিশে নদী জল-ধিতে যেমন একাকার” হইয়া যায়, সেইরূপ স্বার্থটাই বড় হইতে হইতে, ক্রমে পরার্থে ও পরিণামে পরমার্থে যাইয়া মিশিয়া যায়। ইউরোপ ব্যক্তিগত স্বার্থের সন্ধানে বাইরাই, ক্রমে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সুখস্বার্থকে আপনার শ্রেণীর বৃহত্তর সুখস্বার্থের মধ্যে ডুবাইয়া দিতেছে। আগে ছিল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতি-যোগিতা, এখন দাঁড়াইয়াছে শ্রেণীতে শ্রেণীতে প্রতিযোগিতা। ইউরোপের সকল দেশেই কিছুদিন হইতে দুইটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি গড়িয়া উঠিতেছিল। একটা জনশক্তি, আর একটা ধনশক্তি। একটা বারা পরের কলকারখানার জন খাটিয়া খায়, তাদের সংহত শক্তি। আর একটা ঐ সকল কলকারখানার বারা ধন জোগায়, তাদের সংহত শক্তি। একদিন জনে জনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, ধনীতে ধনীতেও রেযারেবি ছিল। বারা জন খাটিয়া খায়, তারা একে অন্যের মজুরী লইয়া কাড়াকাড়ি করিত। বারা ধন খাটাইয়া খায়, তারাও অন্য ধনীর সঙ্গে ব্যবসায়ের মুনাকা লইয়া রেযারেবি করিত। ক্রমে জন বুঝিল, তার প্রকৃত শত্রু ধনী। আর ঐ প্রবল শত্রুর সঙ্গে লড়াই করিতে হইলে, জনের শক্তিকে দলবদ্ধ ও সংহত করা আবশ্যক। তখন জনে জনে, শ্রমজীবীতে শ্রমজীবীতে লড়াই ধামিয়া বাইতে লাগিল। শ্রমজীবীরা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থকে সকলের স্বার্থ করিয়া লইল। ভিন্ন ভিন্ন শ্রমজীবী আপনার দলের স্বার্থসাধনের জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন করিতে শিখিল। তারা দেখিল, ক্ষুদ্র স্বার্থের বিসর্জন ব্যতীত বৃহত্তর স্বার্থের প্রতিষ্ঠা হয় না। পরার্থের প্রেরণায় নচে, শুদ্ধ স্বার্থের খাতিরে, ইউরোপের বৃত্তান্ত জনমণ্ডলী এইরূপে ত্যাগের ও বিসর্জনের শক্তি অর্জন করিতে লাগিল। জন যখন আপনার শক্তিকে সংহত করিতে আরম্ভ করিল, জনে জনে মজুরীর জন্য যে কাড়াকাড়ি হইত, তাহা বধন ধামিয়া বাইতে লাগিল, একজন শ্রমজীবী ধনীর অত্যাচারে কাজ ছাড়িতে বাধ্য হইল, অন্য শ্রমজীবী বধন আর সে কাজে আসিল না, বরঞ্চ তার সঙ্গে সহায়ত্ব দেখাইবার জন্য আরও দশজন বধন ধর্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিতে লাগিল; ধনীতে ধনীতে তখন পূর্বকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগাইয়া রাখা, নিজ নিজ স্বার্থের খাতিরেই, অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন ধন-শক্তিও সম্মিলিত এবং সংহত হইতে আরম্ভ করিল। এইরূপে

ইউরোপীয় সমাজে একদিকে জনশক্তি ও অল্পদিকে ধনশক্তি এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বি-
শক্তি মুখোমুখি হইয়া ছাউনি গাড়িয়া বসিল।

ধন ও জন এই দুই মিলিয়া পণ্য উৎপাদন করে। কিন্তু বিপণি না হইলে পণ্য
উৎপাদন নিষ্ফল হইয়া যায়। এ-রাজ্যে প্রয়োজনের পরিমাণে আয়োজন করিতে হয়,
demand'এর হিসাবে supply করিতে হয়। প্রয়োজনবৃদ্ধি অর্থাৎ কিনিবার
লোক বা বেচিবার বাজার বাড়াইতে না পারিলে, পণ্যের আয়োজন বৃথা হইয়া যায়।
উৎপন্ন পণ্য ঘরে রাখিয়া পচাইতে হয়। ইহাতে ধনীর লোকসান, আর ধনীর ধনক্ষয়ে
জনের মজুরীও কমিয়া যায়। সুতরাং ছনিয়ার বিপণিগুলি দখল করা বা দখলে
রাখা, ধন ও জন উভয়েরই পক্ষে অত্যাৱশ্যক হইল। প্রত্যেক সমাজের ভিতরে
যেমন ধনে ও জনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগিয়া উঠিয়া, ধনশক্তি ও জনশক্তিকে সংহত
করিয়া একে অন্তের প্রতিকূলে প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সমাজের
মধ্যেও ছনিয়ার বিপণিগুলি দখল করিবার জন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধিয়া উঠিল।
জনে ও ধনে প্রতিযোগিতা জাগিয়া উঠিলে যেমন যারা জন খাটিয়া ও যারা ধন খাটা-
ইয়া যায়, উভয় দলের লোকেই আপনাদের দলের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য নিজ নিজ
ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেইরূপ যখন ও যে
পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ছনিয়ার বিপণি দখল করিবার জন্য মারাত্মক সংগ্রাম
বাধিয়া গেল, তখন জাতির বৃহত্তর স্বার্থের নিকটে, জাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী
বা শক্তিসমূহ সকলে, নিজ নিজ শ্রেণীর বা সমূহের স্বার্থ বিসর্জন দিতে আরম্ভ
করিল। এইরূপে ইউরোপের লোক ও ইউরোপীয় সমাজ সংসারের ক্ষুদ্রতম স্বার্থকে
তদপেক্ষা একটু বড় স্বার্থের নিকটে, আবার সেই বড় স্বার্থকে তার চাইতে আরও
বৃহত্তর স্বার্থের নিকটে, ক্রমে ক্রমে আরও বৃহত্তর স্বার্থের আছানে সেই বড় স্বার্থ-
টাকেও বিসর্জন দিতে দিতে চলিয়াছে।

প্রথমে ছিল শুদ্ধ সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ। তার পর সেই ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র
স্বার্থসাধন করিতে বাইরাই দেখা গেল, বৃহত্তর পারিবারিক স্বার্থের অধীন হইয়া না
চলিলে, ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনও সম্ভব হয় না। ক্রমে দেখা গেল, এই পারি-
বারিক স্বার্থকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের অনুকূল ও অধীন করিয়া না রাখিলে, পারিবারিক
জীবনে শক্তি ও সার্থকতাসিদ্ধি অসম্ভব হয়। ক্রমে আরও দেখা গেল যে, এই সাম্প্র-
দায়িক স্বার্থকে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের অনুকূল ও অধীন করিয়া না রাখিলে সাম্প্র-
দায়ের শক্তি ও সার্থকতাসিদ্ধি অসাধ্য হয়। এইরূপে সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে
সঙ্গে, প্রবৃত্তির পথেই মানুষের স্বার্থের পরিধি উত্তরোত্তর বিস্তৃত হইয়া, তাহাকে বৃহৎ
হইতে বৃহত্তর স্ৰব্ধে আবদ্ধ করিয়া, পরার্থের ও পরমার্থের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়।

স্বার্থ বিসর্জন দিতে হইলেই সংঘম শিক্ষা করিতে হয়। মানুষ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া, পশুধর্মমূলত ঐকান্তিক একাকিত্বের মধ্যে যদি বাস করে, তার কোনই সংঘমের প্রয়োজন হয় না, সংঘম-শিক্ষার অবসর এবং ক্ষেত্রও তার মিলে না। তার পাঁচটা ইন্দ্রিয় এবং জিহ্বা ও উপস্থ যে দিকে লইয়া যায়, সেই দিকেই সে অবাধে চলিতে পারে। কিন্তু পরিবারে, আর পাঁচজনের সঙ্গে একত্র বাস করিতে গেলেই, মানুষকে কিয়ৎপরিমাণে আপনার নিরঙ্কুশ ব্যক্তিত্বকে স্বল্পবিস্তর সঙ্কুচিত করিয়া চলিতে হয়। আপনার প্রবৃত্তি সকলকে সংযত, এবং পরের সুখসুবিধার মুখ চাহিয়া নিজের সুখসুবিধাকে কিয়ৎপরিমাণে বিসর্জন করিতেই হয়। এইরূপে নিবৃত্তির বা ত্যাগের বা বৈরাগ্যের পথে না বাইয়াও, প্রবৃত্তির এবং ভোগের পথ অবলম্বন করিয়াও, সংসারের সার্থকতা অন্বেষণ করিতে বাইয়া, নিজের স্বার্থের প্রয়োজনেই ক্ষুদ্রতর স্বার্থকে পদে পদে বৃহত্তর স্বার্থের নিকটে বিসর্জন দিয়া, মানুষ সংঘমের ও ত্যাগের শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। এইরূপে একদিন যে ব্যক্তি অপরে যেখানে মজুরী খাটিয়া চারি আনা উপার্জন করিতেছে, সেখানে নিজে দুই আনা সে সেই খাটুনী মাথা পাতিয়া লইবার জন্য ধনীর ঘারে ঘারে ঘুরিয়া বেড়াইত, আজ সে নিজের দলের স্বার্থ বা ইচ্ছা বজায় রাখিবার জন্য, ধর্মঘট করিয়া এক টাকার রোজিয়ানা ছাড়িয়া ঘরে বসিয়া থাকিতেছে। ক্ষুধায় অন্ন নাই, শীতে আগুন জ্বালাইবার কয়লা নাই, পরিবারের হাতে একটা পরসা, পুত্রকন্যাদের মুখে এক টুকরা কুটি দিবার সংস্থান নাই—অন্যদিকে একটু হাঁ করিলেই মুনিবে আদর করিয়া ডাকিয়া নিয়া টাকা টাকা হিসাবে রোজিয়ানা দেয়,—কিন্তু তথাপি নড়ে চড়ে না। নিজের দলের, শ্রেণীর, সম্ভব, সকলের মুখ চাহিয়া, ঐ দলের সমষ্টিভূত স্বার্থের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষা অসম্ভব জানিয়া, তাহারা এ সকল অসহ্য ক্লেশ, যাতনা, ক্ষতি সহিতেছে। নিজেকে নিজের দলের মধ্যে মিশাইয়া দিয়া নিজের শ্রেণীর, নিজের সম্প্রদায়ের সঙ্গে একাত্মতাসাধন করিয়া, দলের বা শ্রেণীর স্বার্থের খাতিরে নিজের সর্বপ্রকারের ক্ষতি সহ্য করিয়া, মানুষ আপনার স্বভাবগত কার্পণ্যকে দূর করিতে শিক্ষা করে। যে স্বল্পপরিমাণে আপনার ক্ষতি সহিতে পারে না, আমা-দের প্রাচীনেরা তাহাকেই কৃপণ कहিতেন। স্বল্পপরিমাণেও নিজের ক্ষতি সহিবার যে অক্ষমতা, তাহাই কার্পণ্য। এই কার্পণ্যবৃত্তির সঙ্গে ত্যাগের শক্তিনাশ ও এই কার্পণ্যভ্রাসের সঙ্গে ত্যাগের শক্তিবৃদ্ধি হয়। ইউরোপ ক্ষুদ্রতর স্বার্থকে বৃহত্তর স্বার্থের দ্বারা, ক্ষুদ্রতর সুখভোগকে বৃহত্তর সুখ ও ভোগের দ্বারা, ক্ষুদ্রতর কর্মকে বৃহত্তর কর্ম দ্বারা, জীবনের ক্ষুদ্রতর সম্বন্ধ সকলকে বৃহত্তর সম্বন্ধের দ্বারা আচ্ছন্ন ও অতিক্রান্ত করিয়াই, সমাজ-জীবনে ও জাতীয় জীবনে এই কার্পণ্যকে নষ্ট করিয়াছে ও করিতেছে।

ইউরোপের অতি বড় বীরপুরুষ দ্বারা, তাঁরাও আমাদের দেশের মহাপুরুষদিগের

মতন, অচ্যুত অভয়পদ প্রাপ্ত হন নাই। ইউরোপের বড় বড় ধার্মিকদিগেরও দেহাত্মাধ্যাস নষ্ট হয় নাই, শমদমাদি বটসম্পত্তি লাভ হয় নাই, বিবেক জাগ্রত হয় নাই, বৈরাগ্যাসিদ্ধি হয় নাই। আমরা খেতাজ দেখিলে আতকে পালাই, কিন্তু বসন্তবিসৃটিকাক্রান্ত আত্মীয়স্বজনকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া, বেতনভোগী গুহাবাকারী নিবৃত্ত করিয়া, আত্মরক্ষা করি না। আমরা মানুষের মতন বাঁচিয়া থাকিতে জানি না, কিন্তু বীরের মতন মরিতে পারি। এ বাহাদুরী আমাদের আছে। কিন্তু জীবনের দাম যে জানে না, মরণে তার কোনই কৃতিত্ব নাই। ইংরেজ জীবনের দাম জানে। জীবনটা তার প্রিয়। এই জন্ত সে যখন সাধ করিয়া, কোমর বাঁধিয়া নিজের দলের বা নিজের জাতির বা মানবসমাজের হিত-কল্পে মরণের সম্মুখীন হয়, তার সে মরণাভিসারের মূল্য বিস্তর বেশী। প্রতিদিনের দৈনন্দিন জীবনে হোক না কেন সে ভোগী, বিরাগী নহে; হোক না কেন সে লোভী, বিবেকী নহে; হোক না কেন সে ইন্দ্রিয়ের দাস, জিতেন্দ্রিয় নহে; কিন্তু আমাদের পুরাণপুথিগত পর্কতপ্রমাণ বৈরাগ্যের, বিবেকের, শমদমাদি বটসম্পত্তির উপদেশ অপেক্ষা, তার নিজের দলের জন্ত, নিজের দেশের জন্ত, বিশ্বমঙ্গলের জন্ত মরণ আলিঙ্গন করিবার এই সংকল্প ও শক্তি কোটীগুণে বেশী মূল্যবান।

বহুকাল ধরিয়া আমরা যে পথে দেহভুক্তি, চিন্তভুক্তি, বিবেক ও বৈরাগ্যাদি লাভ করিয়া, বিশ্বাত্মকত্ব ও ব্রহ্মাত্মকত্বসাধনের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি, সে পথে সকলের অধিকার নাই, শাস্ত্রকারেরাই এ কথা কহিয়া গিয়াছেন। সে পথে সকলের সিদ্ধিলাভও সাধ্যায়ত্ত নহে। ধারা এ পথে সত্য সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তাঁরা মানবতার উচ্চতম চূড়ানিধরে অধিরোহন করেন, শতকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিব। শিবরাত্রির সলিতার মতন ইহারাই আমাদের জাতীয় জীবনের আশার আশ্রয় হইয়া আছেন। মাঝে মাঝে ইহাদের দেখা পাই বলিয়াই, এত দুঃখ, এত দারিদ্র্য, এত হীনতার মধ্যেও আমরা যে মানুষ, ছনিয়ার কোনও মানুষের চাইতে খাট নই, এই বোধটা অন্তরে এখনও জাগিয়া আছে। এই কার্পন্যোপহত, এই নিকরীয়া, এই নিশ্চেষ্ট, এই কৃমি-স্বভাবাপন্ন, ঘোরতরসাজ্জর জাতির মধ্যে কি যে বীৰ্য্য, কি যে শক্তি, কি যে প্রাণতা লুকাইয়া আছে, এ সকল সিদ্ধ মহাপুরুষ ও মহাভাগবতদিগকে দেখিলেই প্রাণের মধ্যে তাহার প্রেরণা জাগিয়া উঠে।

কিন্তু সাধারণ মাঝখানে মাঝে মাঝে, বিস্তৃত ব্যবধানের অন্তরে ছুঁচাটি ওসিস বা জলশম্পপূর্ণ ভূখণ্ড আছে বলিয়া, সে মরুভূমি যেমন বাসযোগ্য হয় না, সেইরূপ ভারতের এই বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে, কালে ভদ্রে ছুঁদশজন সিদ্ধমহাপুরুষ কিংবা মহাভাগবত মাথা তুলিয়া উঠেন বলিয়া, সত্যভাবে সমগ্র জাতিটাই যে

বড় আছে বা বড় হইতেছে, এরূপ করনা করা যায় না। সমগ্র জাতিটাকে যদি বড় করিয়া তুলিতে হয়, তবে সকলে যাহাতে এই শ্রেষ্ঠতম আদর্শ আয়ত্ত করিতে পারে, তাঁর আয়োজন করিতে হইবে।

আর এই আয়োজন করিতে বসিয়া সকলের আগে ইহা বুঝিতে হইবে যে, ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে মানবতার উচ্চতম অবস্থায় উন্নত করিতে হইলে, বিবেক, বৈরাগ্য, শমদম প্রভৃতি প্রাচীন সাধনমার্গই প্রশস্ত হইলেও, সমষ্টিগত সমাজকে মনুষ্য-জ্ঞের উচ্চতর স্তরে তুলিয়া লইতে হইলে, সমাজে সেই প্রয়োজনসাধনের উপযোগী কার্যবাহু গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমাদের দেশে নিজে নিজে, আপনাপন আন্তরিক সাধনবলে, অসীম শক্তিতে পথ কখনও বন্ধ হয় নাই। এই জন্তই এই যুগেও আমরা স্বামী দয়ালদাস, বাবা অর্জুনদাস কিংবা পরমহংস মহাশয়ের মতন সাধু ও সিন্ধু মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার পাইয়াছি। ইহারা সকলেই নিজ নিজ জীবনে আপনাদের অন্তরতম কর্তাপুরুষকে অন্তরের রত্নবেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বিশ্বাত্মকত্বলাভ ও বিশ্বমৈত্রী-সাধন করিয়াছিলেন। বাবা অর্জুনদাসের চক্ষে ব্রাহ্মণচণ্ডাল এক ছিল, সকলের মধ্যেই তিনি তাঁর প্রাণারাম রামকে দেখিয়া, অপূর্ব প্রেমভরে, পরিচিত অপরিচিত বেই হউক না কেন, মানুষ দেখিলেই ‘আ মেরা রাম! আ মেরা রাম!’ বলিয়া আদর করিয়া আরাতি করিতেন। স্বামী দয়ালদাস, সাধু-অসাধু-নির্কিশেবে ক্ষুধিতেরে অন্ন দিয়া আপনার ইষ্টপূজা করিতেন। এমন বিশ্বাত্মকসিদ্ধি, সর্বজীবে এমন শিববুদ্ধি, দেবতাজ্ঞানে প্রাকৃত জনের এমন আরাতি, ইষ্টমূর্তিবোধে মানুষের প্রতি এমন ভক্তি—ছনিয়ার আর কোথাও দেখি নাই; এরূপ ভক্তির কাহিনীও আর কোথাও শুনি নাই। কিন্তু ইহারা নিজ নিজ সাধন-কালেই এই অপূর্ব চরিত্রলাভ করিয়াছেন, সামাজিক রীতিনীতিকে উপেক্ষা করিয়াই এই বিশ্বমৈত্রী সাধন করিয়াছেন, সংসারে থাকিয়া, সংসারধর্ম পালন করিয়া, এ সিদ্ধিলাভ করেন নাই। আমাদের সমাজ এ সাধনার ব্যাঘাত দেয় না, কিন্তু জনগণকে এ পথে লইয়া বাইবার অশুকুল ব্যবস্থাও আমাদের সমাজে নাই।

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিয়াছি, কলিযুগের পথ আর সত্যযুগের পথ এক নয়। কলির মানুষ অতটা সংযমসাধনে অপারগ। তপস্তার ক্রেশ কলির মানুষের সহ হয় না। এই জন্ত কলির পথ কঠোর নিবৃত্তির পথ নহে, কিন্তু কোমল প্রবৃত্তির পথ। কলির জীব অন্তান্ত দেশে এই প্রবৃত্তির পথে চলিয়াই অজ্ঞাতসারে পরমার্থের দিকে অগ্রসর হইতেছে; কিন্তু ভারতের লোক পারিতেছে না কেন? আমাদের সামাজিক বিধিব্যবস্থা, আমাদের সমাজের কার্যবাহু ইহার অশুকুল নহে বলিয়াই আমাদের এই দুর্দশা।

কতকগুলি ধারকরা ভাবের প্রেক্ষার একটা মনগড়া সামাজিক ব্যবহার দ্বারা সমাজের এই কার্যবাহ রচিত হইবে না। ইউরোপের আমদানী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লগুড় দিয়া ভারতের পরিবার-তন্ত্র বা সমাজ-তন্ত্রকে ভাঙিয়া, মাফেটোরের কাপড়ের উপরে কলের বুননী দিয়া, সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার নথ্যপত্রকে চড়াইয়া, সেই ভগ্ন পরিবারতন্ত্রের ও সমাজতন্ত্রের উপরে, আধুনিকতার বা modernism'এর ধ্বজা উড়াইলেই, সমাজের নূতন কার্যবাহ গড়িয়া উঠিবে না। সমাজও যে জীব। প্রত্যেক সমাজের একটা সমষ্টিগত জীবনীশক্তি আছে। আধুনিক ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রও এ কথা বলে। সমাজও একটা organism—তারও একটা বিশিষ্ট স্বরূপ ও সেই স্বরূপের প্রকাশোপযোগী বিশিষ্ট রূপ আছে। সমাজের একটা নিজস্ব প্রাণতা, ও সেই প্রাণতার সার্থকতাসিদ্ধির জন্য উপযোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। প্রত্যেক জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি তাহার অন্তর্নিহিত প্রাণের প্রেরণায়, সেই প্রাণকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ও সেই প্রাণের বধ্যাযোগ্য অভিব্যক্তির প্রয়োজনেই তিলে তিলে গড়িয়া উঠে, বাহির হইতে ও উপর হইতে তাহার ঘাড়ে আসিয়া চড়িয়া বসে না। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানে এ সকল অতি জানা ও অতি মোটা কথা। সমাজজীবের আত্মপ্রয়োজনবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার নব নব কার্যবাহ রচিত হইয়া থাকে, কথায় এ সকল গড়ে না। মানুষকে লইয়াই ত সমাজ। মানুষের জীবনে বাহ্য কিছু প্রয়োজন হয়, সমষ্টিগত সমাজ-জীবনেও সেই সকল প্রয়োজন উপস্থিত হইয়া, সমাজের বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির প্রতিষ্ঠা করিয়া তার কার্যবাহ রচনা করে। মানুষকে একগতে পদে পদে আপনাকে বাঁচাইয়া চলিতে হয়। এই জন্যই মানুষের ইঞ্জিয়সকলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। হস্তপদাদি কর্ম্মজিয় এবং চক্ষুশ্রোত্রাদি জ্ঞানেজিয় এ সকল মানুষকে কেবল জগতের রূপরসাদি ভোগ করাইবার জন্যই সৃষ্ট হয় নাই, মানুষের জীবনের রক্ষী ও গ্রহণরূপেও এই ইঞ্জিয়গ্রাম সর্বদা তাহার আত্ম-রক্ষার সহায়তা করিয়া থাকে। সমষ্টিগত মানব-সমাজকেও সেইরূপ সর্বদাই প্রতি-বেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের আততায়িতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হয়। সমাজের এই আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই ক্ষাত্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়। সেইরূপ সমাজের অন্নবস্ত্রাদির সংস্থানের জন্য বৈশ্ববৃত্তি এবং তাহার জ্ঞানবিজ্ঞানাদি সাধনের জন্য ব্রাহ্মণ্যবৃত্তির সুরণ হইয়া থাকে। এইরূপে সমাজ আপনার প্রয়োজনেই দেশের শাসনসংরক্ষণের, কৃষি-বাণিজ্যরক্ষার, ধর্ম্মশিক্ষার ও পারমার্থিক তত্ত্বের অনুশীলনের জন্য এ সকল কার্যসাধনের উপযোগী রাষ্ট্রীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা political institutions, ব্যবসাবাণিজ্যসম্বন্ধীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিংবা economic এবং industrial institutions, এবং ধর্ম্ম ও পরমার্থ-সম্বন্ধীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিংবা religious এবং spiritual institutions এই সকল গড়িয়া তুলে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমাবেশে ও

সমবায়েরই প্রত্যেক সমাজের কার্যবাহ বা social structure'এর প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়।

সমাজ আশ্রয়প্রয়োজনেই এই সকল অগ্রপ্রত্যঙ্গ গড়িয়া এই বিচিত্র কার্যবাহ রচনা করে। কিন্তু কোনও কারণ বশতঃ সমাজের ক্ষান্তবৃত্তি লোপ পাইলে, সমাজের লোকের মধ্যে সমগ্র সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণ-ধান ও সেই অকল্যাণকে প্রতিহত করিয়া কল্যাণকে প্রবৃদ্ধ করিবার জন্য আবশ্যকীয় কৰ্ম সাধন করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি হু'ই হ্রাস হইতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে সমাজের লোকের দৃষ্টি সমগ্র সমাজ হইতে সরিয়া আসিয়া আপনা হইতেই আপনাপন ক্ষুদ্রতর সম্প্রদায় বা জাতি-গোষ্ঠীর উপরে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এইরূপে কোনও সমাজে সমাজের বৈশ্ববৃত্তিও যদি অন্য সমাজের লোকের আয়ত্তাধীন হইয়া পড়ে, অন্য সমাজের লোক আসিয়া যদি সেই সমাজের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দখল করিয়া বসে, তারাই যদি ধনী হইয়া, সমাজের লোকদিগকে জন খাটাইয়া দেশের পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে, কৃষিবাণিজ্যাদি রক্ষা করা ও তার উন্নতিবিধান করিবার দায় হইতে সমাজের লোকে মুক্তিলাভ করে। বৈশ্ববৃত্তির অনুশীলনে সমাজের ভিতরে ও সমাজের বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন বিপণির উপরে বাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল, বাহারা নিজের মাথা খাটাইয়া সমাজের ধনবৃদ্ধি করিতে গিয়া, একদিকে জড়প্রকৃতির সঙ্গে, অন্যদিকে অপর প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের বৈশ্বশক্তির সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনার শক্তিসাধাকে বিশালতর ক্ষেত্রে নিয়োজিত করিত, ক্রমে সে দায় হইতে মুক্ত হইয়া, তারা ক্ষুদ্রতর স্বার্থের বন্ধনে জড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করে।

এইরূপে সমাজের ক্ষান্তশক্তি ও ক্ষান্তকৰ্ম—বাহাকে আমরা আজিকালি রাষ্ট্র-শক্তি ও রাষ্ট্রকৰ্ম বলিয়া থাকি—দেশের শাসনসংরক্ষণ যার অধিকার; এবং বৈশ্বশক্তি ও বৈশ্বকৰ্ম—দেশের কৃষিবাণিজ্যাদির ব্যবস্থা করা যার লক্ষ্য—যে ক্ষান্তশক্তি ও ক্ষান্তকৰ্ম এবং বৈশ্বশক্তি ও বৈশ্বকৰ্মকে অবলম্বন করিয়া, মানুষ সর্বদাই আপনার জীবনের ব্যক্তিগত স্বার্থকে অতিক্রম ও উপেক্ষা করিয়া বৃহত্তর জাতিগত স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবৃত্ত হয়—এ সকল শক্তি ও কৰ্ম যখন দেশের লোকের হাত হইতে চলিয়া যায়, তখন মানুষের মন স্বভাবতঃই ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। একদিন যে স্বরাষ্ট্র-রক্ষার জন্য অগ্নানবদনে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারিত, সে ক্রমে সেই বিশালতর স্বার্থের প্রেরণা হারাইয়া, ক্ষুদ্রতর স্বার্থে জড়িত হইয়া, সংকীর্ণচেতা, ভীক এবং কুপণ হইয়া পড়ে।

মানুষ একটা-না-একটা জায়গায় আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেই চাহে। রাষ্ট্রীয় কৰ্মক্ষেত্রে যখন আশ্রয়প্রতিষ্ঠার কোনও সম্ভাবনা ও অবসর না থাকে, সংসারের

বিশালতর কর্মজীবনে প্রবেশ করা যখন তাহার অসাধ্য হইয়া পড়ে, তখন মানুষ আপনার প্রকৃতির প্রেরণাশতই ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের সংকীর্ণতর স্বার্থে জড়াইয়া পড়ে । এবং এইরূপে মানুষের স্বার্থের, কর্মের, চিন্তার এবং ভাবনার গণ্ডী যত ছোট হইয়া আসে, ততই তার ত্যাগের শক্তিও হ্রাস হইতে থাকে । ত্যাগের শক্তি যে পরিমাণে হ্রাস হয়, সেই পরিমাণে তার কার্পণ্যও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । কার্পণ্য বৃদ্ধি পাইলে, সে সকল বিষয়েই কেবল আপনাকে বাঁচাইয়া চলিবার জন্য ব্যস্ত হয় । তখন সে

“আত্মানং সততং রক্ষণং দারৈরপি ধনৈরপি”

এই নীতি অবলম্বন করিয়া, ত্রীকে বিসর্জন দিয়াই হউক, আর ধন বিসর্জন করিয়াই হউক, সর্বদা আপনার ক্ষুদ্র সুখস্বোয়াস্তিতাকে রক্ষা করিতে বাধ্য হয় ।

চিৎপুর যে চিৎ হইয়া সকল সহিয়া থাকে, তাহা তার শাস্ত্রানুগত্যের জন্তও নহে, আচারবশতের জন্তও নহে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র কৃপণতার জন্ত । আমরা কোনও বিষয়ে নিজের ক্ষতি সহিতে শিখি না ও সহিতে পারি না বলিয়াই, ইংরাজ বাহাকে সিদ্ধিক ধর্ম বলে, আমাদের মধ্যে তার প্রতিষ্ঠা হয় নাই ।

আর প্রয়োজন হইলে যে আমরা শাস্ত্র ও আচারকে পারে ঠেলিয়া চলিতে পারি না, এমনও নয় । হয় ত বা মহাভারতের সময়ে ভারত-সমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল । কিন্তু সেকালেও দেখি, দ্রোণ ও কৃপ ব্রাহ্মণ হইয়াও অস্ত্র-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন । সমাজ-রক্ষার জন্ত যখন প্রয়োজন হইল, তখন পরশুরাম ব্রাহ্মণ হইয়াও, ক্ষত্রবৃন্তি গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়দিগের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । দুই শত আড়াই শত বৎসর পূর্বে বর্ণাশ্রমশৃঙ্খল-বদ্ধ মহারাষ্ট্রে যখন হিন্দুরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন উপস্থিত হইল, তখন যে কেবল ক্ষত্রিয়েরাই লড়াই করিয়াছিল, তাহা নহে । পেশবাদিগের সময়ে অম্পৃশ্য-চণ্ডাল পেশবা-সৈন্তের গোলন্দাজ-বিভাগের প্রধান সেনানী ছিলেন ; এবং সম্রাটনে চিৎপাবন পেশবার তাঁবুর অব্যবহিত পরেই এই চণ্ডাল গোলন্দাজ-সেনাপতির তাঁবু সন্নিবিষ্ট হইত । দক্ষিণাঞ্চলে যে চণ্ডালের মুখ-দর্শনে ব্রাহ্মণকে স্নান করিতে হয়, সেই চণ্ডাল পেশবার তাঁবুর পার্শ্বে স্বর্ণ সমভিবাহারে আপনার তাঁবু স্থাপন করিতেন,—এই অসাধ্যসাধন করিল কে ? সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মনগড়া বা ধারকরা আদর্শের প্রেরণায় এই সামাজিক বিপ্লব ঘটে নাই, ঘটিয়াছে সমাজের আত্মপ্রয়োজনে ।

আর আজ যদি আমাদের হাতে আবার আমাদের ক্ষাত্রকর্ম কিরিয়া আইসে, আমাদেরকে যদি আজ স্বদেশের শাসন-সংরক্ষণের ভার নিজের হাতে লইতে হয়, তাহা হইলে ভারতের ব্রাহ্মণ কি ছোঁৎমার্গ আশ্রয় করিয়া, দেশ-রক্ষার ভারটা তথাকথিত হীনজাতি—বাঙ্গালার নমঃশূদ্র, কিংবা তৈলঙ্গের রেড্ডি, নায়েডু, অথবা তামিলদেশের

পারিসাদেব উপরে ছাড়িয়া নিশ্চিত হইবেন ? নৌসেনা গড়িয়া ও সমরপোত নির্মাণ করিয়া ভারতসাগরকে আততায়ীর অভিযান হইতে রক্ষা করিতে হইলে, হিন্দু কি বলিবেন,—“না, কলিতে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ”—সুতরাং ওকশ্বটা চট্টগ্রামের খালানীদিগেরই একচেটিয়া করিয়া দেওয়া হউক ? অথবা সমরক্ষেত্রে বাইরা, সাড়ে তিন শত ব্রাহ্মণে পাঁচ শত পাকশালা নির্মাণ করিয়া নিজেদের কুলরক্ষা করিয়া, পরে দেশরক্ষার জন্য অগ্রসর হইবেন ? না—দেশরক্ষাটা কুল ও জাতিরক্ষা অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া, বৃহত্তর স্বার্থের জন্য অবলীলাক্রমে ক্ষুদ্রতর আচারবিচার ত্যাগিয়া চলিবেন ? আজ যদি বিশ্ববিপণিতে স্বদেশের পণ্য প্রতিষ্ঠা করিবার কর্ম দেশের লোকের হাতে আসিয়া পড়ে, তবে কি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কূলে যারা জন্মিয়াছে, তারা বৈজ্ঞানিক অবলম্বন করিবে না ? না পণ্য-সম্বন্ধেবাহের জাহাজ নির্মাণ করিতে বাইরা, ব্রাহ্মণ-সওদাগরের জাহাজে কেবল ব্রাহ্মণই খালানী ও পরিচারক হইবে ? এ সকল বৃহত্তর কর্মভার যদি আমাদের মস্তকে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে, আমরা কি আততায়ীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার সময়, অথবা শত্রুপক্ষের উপরে চড়াও করিবার আগে, পঞ্জিকা খুলিয়া, দিনক্ষণ গুণিয়া কাজ করিব, না করা সম্ভব হইবে ?

এখন আমাদের বড় কাজ নাই বলিয়াই, ছোট কাজের খুঁচিনাটি লইয়া এত ঝগড়া-ঝাঁটি করি। বড় কাজ আশ্রুক, ছোট বিচারবিবেচনা আপনি সরিয়া বাইবে। বৃহত্তর স্বার্থের প্রেরণা জাগুক, ক্ষুদ্রতর স্বার্থ আপনি লজ্জা পাইয়া দূরে বাইরা মুখ লুকাইবে। দেশমাতার ডাক পড়ুক—তখন জাতিবর্ণের ভেদ ভুলিয়া লোকে এক হইয়া তাঁর পাদ-প্রান্তে বাইরা সার দিয়া দাঁড়াইবে, কে ব্রাহ্মণ, কে শূদ্র, এ কথা মনে জাগিবে না। রাষ্ট্রের শক্তি জাগুক, শাস্ত্রের শাসন আপনি তার পথ করিয়া দিবে।

ঐবিগিনচন্দ্র পাল।

চির-সঙ্গী

সান্ত্র-নিবিড় জ্যোৎস্না-মাঝে

তোমার বৃষ্টি বংশী বাজে

তোমার বৃষ্টি পায়ের বাজে শিঞ্জিনী,

দখিণ হ'তে বাতাস ছুটে

তোমার তমুর গন্ধ লুটে

তাইতে কোটি ভ্রমর উঠে গুঞ্জনি' ।

তোমার চোখের দৃষ্টি লাগে

তাইতে বৃষ্টি হাস্য জাগে

অসীম নভের দৃষ্টিহারি অনন্তে,

তোমার বৃষ্টি আঁচল দোলে

গন্ধে ছাওয়া কানন-কোলে

স্নিগ্ধ বায়ে শীতল-করা বসন্তে ।

আমার বৃষ্টি হিয়ার ভাগে

তোমার চরণ-চিহ্ন জাগে

তাইতে সেখা মুগ্ধে প্রণয়-শতদল,

আমার কোটি জন্ম-ব্যাপী

রঙ্গ তোমার পড়ছে ছাপি'

তাইতে উঠে দুঃখ-সুখ অবিরল ।

আমার সকল আশার মাঝে

তোমার বৃষ্টি হাসি বাজে

আমার সকল ব্যথায় তোমার রঙ্গ গৈ,

আমার আলোয় অন্ধকারে

এই পারে কি ওই পারে

সত্য মানি তোমার চির-সঙ্গ গো ।

শ্রীশ্রীশ্রী চক্রবর্তী ।

কথের কঠোর মূর্তি

কথের নিজের মূর্তি কুটস্থ ব্রহ্মের ন্যায়, কোমল ও কঠোর দু'এক এক। কঠোর ভাবটা কোমলতায় মিশাইয়া গিয়াছে। তিনি যে কঠোর, তাহা বুঝাই যায় না। কিন্তু তাঁহার কঠোর মূর্তিও আছে, তাহার মধ্যে একটি শাস্ত্র'রব। কালিদাস বাছিয়া বাছিয়া নামটিও দিয়াছিলেন শাস্ত্র'রব। শাস্ত্র' বলিতে শিংএর তৈয়ারী ধনুক বুঝায়। সে কালে মহিষের শিং দিয়া ধনুক তৈয়ারী হইত। সে ধনুক টানা খুব কঠিন। এক অর্জুনের শাস্ত্র'-ধনুক ছিল। রামচন্দ্রের শাস্ত্র'-ধনুক ছিল। তাহার শব্দ খুব কঠোর ছিল, টং টং করিয়া বাজিত। আমাদের শাস্ত্র'রবের স্বর বা রবও তেমনি কর্কশ, তাঁহার বোল বেশ কাটা কাটা। তিনি ঝগড়া করিতে--কটুকথা বলিতে বড়ই মজবুত। তাঁহার এক সঙ্গী আছেন, নাম শারদ্বত। শরৎ শব্দের উত্তর বৎ প্রত্যয় করিয়া শরদ্বৎ শব্দ হয়; শরৎকালের মত, গম্ভীর, পরিষ্কার। তাঁহারই পুত্র শারদ্বত অথবা শরদ্বান্ ও শারদ্বত একই। স্বার্থে প্রত্যয় হইয়াছে। তিনি গম্ভীর অথচ পরিষ্কার, কথা খুব কম কহেন। কিন্তু যা কহেন, তাহা একেবারে কাটা-ছাঁটা। তাহার উপর আর কাহারও কথা চলে না। তাঁহার স্বরও গম্ভীর, টং টং করে না। তিনি দুচারিটি কথা কন, তাহাতে অনেক কথার, অনেক ঝগড়ার, নিষ্পত্তি হইয়া যায়।

যখন প্রিয়ংবদা কুল তুলিতেছেন, অননুয়া মাদ্রল্যদ্রব্য-সংগ্রহের জন্ত গিয়াছেন, তখন নেপথ্যে শুনা গেল, "গৌতমি, শাস্ত্র'রবকে বল, শকুন্তলাকে আনুক।" তাহাতেই প্রিয়ংবদা বুঝিলেন যে, এরা এখনই হস্তিনাপুরে যাইবে। সে অমনি অননুয়াকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "শীঘ্র আর, শীঘ্র আর, এদের যাবার সময় হ'ল।" স্মৃতরাং শাস্ত্র'রব আশ্রমের সকলের কাছেই পরিচিত, ডাকা-বুকা লোক, চালাক-চটপটে, বলিতে কহিতে মজবুত, সকল কাজেই মজবুত, সকল কাজেই অগ্রসর। শকুন্তলার আশীর্বাদ হইয়া গেল, কণ্ঠমুনিও ঋগ্বেদের ছন্দে তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। তার পর কণ্ঠমুনি বলিলেন, "শাস্ত্র'রব কোথায়?" স্মৃতরাং শাস্ত্র'রবই যে, যারা হস্তিনা যাইতেছে, তাদের কর্তা হইয়া যাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্র'রব উপস্থিত হইলে, কণ্ঠ বলিলেন, "তোমার ভগিনীকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাও।" শাস্ত্র'রবও বলিলেন, "এই দিকে এস, এই দিকে এস।" সকলে চলিতে লাগিল। কোন কাজের ভার পাইলে যুবকেরা কাজটা যত শীঘ্র পারে, শেষ করিবার জন্ত ব্যস্ত হয়, শাস্ত্র'রবেরও ত তাই। খানিক দূর গিয়া একটি পুকুর দেখিতে পাইয়া শাস্ত্র'রব গুরুকে বলিলেন, "জলের ধার পর্য্যন্তই আশ্রয়-স্বত্বেরা

যাইয়া থাকেন, এই ত পুকুর, এইখানে যা কিছু বলার বলিয়া আপনি ফিরিয়া যান।”
কথ বাহা বলিয়া দিলেন, সবই খুব মিষ্ট, খুব কোমল। কিন্তু তাহার প্রত্যেক অক্ষরে
ছুরি আছে, “মহারাজ মনে মনে জানিবেন, সংসমই আমাদের ধন। মনে জানিবেন,
আপনার কুল বড় উচ্চ। শকুন্তলার প্রতি আপনার স্নেহের কথাও মনে করিবেন।
সে স্নেহে বন্ধু-বান্ধবের কোনও হাতই ছিল না, এবং এখনও নাই। এই সকল কথা
মনে রাখিয়া অনেক পরিবারমধ্যে একটি বলিয়া আমার এই কল্যাণটিকে লইবেন। ইহার
পর বাহা কিছু, তাহা শকুন্তলার অন্তঃকরণে। আমরা তাহা বলিতে পারি না।” আপনি
সংসমী ঋষিদের আশ্রমে আসিয়া অত্যন্ত অসংসমের কাজ করিয়া গিয়াছেন, আপনি বড়
বংশের লোক বলিয়া সব মানাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার এই কল্যাণটি গ্রহণ করিলে
আর কোন কথাই থাকিবে না। আমরা উহাকে পাটরাণী করিতে বলিতেছি না!
অনেক রাণীর মধ্যে একটি করিয়া লইবেন। তাহার পর উহার ভাগ্য; আপনি লইতেও
পারেন, না লইতেও পারেন, লইয়া বড়রাণীও করিতে পারেন। আমরা সে কথা
বলিতে চাহি না।

কথমুনির কঠোরমূর্তি শাস্ত্রীর এই “ধরনের” কি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা
পরে প্রকাশ হইবে। কিন্তু মূল এই, ইহার উপর অনেক টীকা-টিপ্পনী চড়িবে;
অনেক ভাষা-বার্ত্তিক হইবে। শাস্ত্রীর কথের কথা শুনিয়া বলিলেন, “হাঁ, আমি বেশ
করিয়া বুঝিয়া লইলাম।” এই যে “বেশ করিয়া” বলিলেন, তাহার অর্থ পরে
প্রকাশ হইবে। কথ তাহার পর বলিলেন, “রাজাকে ত অনেক উপদেশ দিলাম।
শকুন্তলাকে এখন ছ-চারিটা কথা বলিয়া দেওয়া উচিত। আমরা বনবাসী হইলেও
সংসারের ব্যাপার একটু একটু বুঝি।” তাহাতে শাস্ত্রীর বলিলেন, “বাহাদুরের বুঝি
আছে, তাহাদের কিছুই এড়ায় না।” তাহার পর বেলাটা বেশী হইতেছে দেখিয়া
শাস্ত্রীর শকুন্তলাকে নীচ নীচ কথাটা সারিয়া লইতে বলিলেন; তিনি ত আর কথ
মুনিকে বলিতে পারেন না—“মহারাজ, আর কেন, চের হইয়াছে, এখন ফিরুন।” কারণ,
তিনি যে ঋষির শিষ্য, ঋষি যে তাঁহার দেবতা। একালকার শিষ্য ত নয় যে, গুরুমারী
বিদ্ভা হইবে। গুরুর মুখের উপর যা-তা বলিবে? বাহা শাস্ত্রীর বলিতে পারিল না,
তাহা ভগিনী গৌতমী বলিয়া দিলেন, “শকুন্তলা থাকিবে না, তুমিই দাদা থাম।”

রাজবাড়ী উপস্থিত হইয়া যখন ঋষিরা সকলে কঙ্কুর সঙ্কে রাজার কাছে
দেখা করিতে বাইতেছেন, তখন অনেক লোকজন দেখিয়া শাস্ত্রীর মনে কি ভাব
হইতেছে, দেখা যাউক। এইখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, মহাভারতের শকুন্তলো-
পাখ্যানের ঋষিরা নগরের মধ্যেই আসেন নাই। তাঁহাদের আকারপ্রকার
দেখিয়া লোকে নানারূপ ঠাট্টা-বিজ্ঞপ করায় তাঁহারা নগরের গেটের কাছ হইতেই

আশ্রমে কিরীয়া গিয়াছিলেন ; শকুন্তলা ও তাঁহার ছেলে—বরুণ বার বছর,—ছজনেই নগরদ্বার হইতে রাজসভা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কালিদাসের শকুন্তলা রাজবাড়ী যাইবার সময় গর্ভবতী, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে শার্ঙ্গরব, শারদত, গৌতমী এবং আরও অনেকে ছিলেন। শার্ঙ্গরব বলিলেন, “রাজ্যটি ত ভাল, ভাগ্যবান, কখন অভ্যাস করেন না। নিতান্ত ছোট লোকেও অপথে যার না, কিন্তু আমার নির্জনে থাকা অভ্যাস কি না, তাই এই জনাকীর্ণ জায়গাটা ঠিক যেন আশুন-লাগা ঘরের মত বোধ হইতেছে। আশ্রমে ত আশুন না লাগিলে এত লোক কখন জমা হয় না।” “নিতান্ত ছোট লোকেও অপথে চলে না”, এই কথাটা পড়িলে মহাত্মার তে ছোট লোকে ঋষিদের উপর যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল, সেটা মনে পড়ে।

পুরোহিত যখন রাজার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, “দেখ, এত বড় রাজা তোমাদের অত্যাধিকার জন্ত আগেই আসন ছাড়িয়া অপেক্ষা করিতেছেন”, তখন শার্ঙ্গরব মুকুট-রানা সুরে বলিলেন, “এটা প্রশংসার কথা বটে, কিন্তু আমরা এটা একটা খুব বড় কথা বলিয়া মনে করি না। কারণ, গাছগুলো ফল হইলেই সুইয়া পড়ে। নূতন জলের সময় মেঘগুলো অনেক নামিয়া আসে। সংস্কৃতেরা সমৃদ্ধির সময়েই নম্র হয়। পরোপকারকের স্বভাবই এই।” যখন শিষ্টাচারের পর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার তপস্তায় ত কোন বিষ হয় নাই?” রাজা মনে করিয়াছিলেন, তপস্তায় বিষ হইয়াছে বলিয়াই হয় ত ঋষিরা আসিয়াছেন। তখন ঋষিরা সকলে একসুরে বলিলেন, “আপনি যখন ব্রহ্মা করিতেছেন, তখন তপস্তায় বিষ কিরূপে হইবে? সূর্য্য প্রকাশ থাকিতে কি অন্ধকার আসিতে পারে?” রাজা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “কথমুনির কুশল?” তখন আবার একষাক্যে উত্তর হইল, “ঈহারা সিদ্ধপুরুষ, কুশল ত তাঁহাদের আপনাদেরই হাতে। তিনি আপনাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া এই কথাটি বলিয়াছেন।” রাজা “কি বলিয়াছেন?” তখন শার্ঙ্গরব বলিলেন, “আপনি গান্ধার্ববিধানে পরম্পরে নিরম করিয়া আমার এই কন্যাটিকে বিবাহ করিয়াছেন। তাহাতে আমি খুসী হইয়াছি এবং আপনার এই কাজের পোষকতা করিতেছি। আপনি বড়লোকের অগ্রগণ্য, শকুন্তলা সংকার্যের মূর্তি। অনেক দিনের পর সমানে সমানে বর ও কনে মিল করাইয়া দিয়া বিধাতা নিন্দার হাত হইতে এড়াইয়াছেন। ইনি এখন গর্ভবতী, ইহাকে আপনার স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করুন, আর ইহার সঙ্গে ধর্ম্মকর্ম্ম করুন।” তনিয়া রাজা বলিলেন, “এ আবার কি কথা?” শার্ঙ্গরব বলিলেন, “এ কি? কখন কি করিতে হয়, আপনারাই জানেন। স্ত্রীলোক বিবাহের পর যদি জাতিকুলেই থাকে, লোকে নানা রকম আশঙ্কা করে। সেই জন্তই বহুবাহুবে স্বামী ভাল না বাসিলেও, তাহাকে স্বামীর কাছেই পাঠাইয়া দেয়।” রাজা যখন বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া মনেই

করিতে পারিলেন না, তখন শাক্ত'রব রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন, “কি যে কাজটা করা হইয়াছে, তাহা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া রাজার কি উচিত, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেওয়া?” “আমি অসৎ অভিপ্রায়ে এ কথা বলিতেছি, আপনি মনে করিলেন কিসে?” তখন শাক্ত'রব অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “যারা ঐশ্বর্য্যে মত্ত, তাদেরই কেবল এই রকম বিকার হয়।” অর্থাৎ একবার করে, পরে বলে “না”, রাজা বলিলেন, “আপনারা আমাকে বড়ই তিরস্কার করিতেছেন।” এই সময়ে গৌতমী ঘোমটা খুলিয়া শকুন্তলার মুখ দেখাইলে অনেক অনেক রকম ভাবিতে লাগিল। কেহই কথা কহে না। শাক্ত'রবের দেয়ী সহে না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, “কি মহারাজ, চুপ করিয়া রহিলেন যে।” রাজা তখনও মনে করিয়া উঠিতে পারিলেন না, বলিলেন, “আমার ত কিছুই মনে হয় না, তখন এই গর্ভবতীকে কেমন করিয়া ‘দ্রৌ’ বলিয়া গ্রহণ করি?” তখন শাক্ত'রব একেবারে অগ্নিশর্মা। “তুমি ত ঋষির উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছ। তথাপি ঋষি তোমার কার্য্যে দোষ দেখেন নাই। তুমি ছুকার্য্য করিলেও তিনি তোমার অমুকুলেই মত দিয়াছেন। এখন কি না তুমিই তাঁহাকে অপমান করিতে বসিলে। তুমি তাঁহার বাড়ীতে ডাকাতি করিয়াছ। তিনি চোরাই মাল তোমার হাতে সঁপিরা দিতেছেন। তাহার পর তোমার এই ব্যবহার।”

শকুন্তলা যখন নানা উপায়ে চেষ্টা করিয়াও রাজার বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলেন না এবং ‘হায়, আমি পুরুষবংশের রাজা বলিয়া এই কপটাচারীকে বিশ্বাস করিয়া এখন কি না ঐশ্বর্য্যী, স্বৈচ্ছাচারিণী, বেত্তা হইলাম’ বলিয়া কাদিতে লাগিলেন, তখন শাক্ত'রব আর শকুন্তলার প্রতি কোমল ভাব দেখাইতে পারিলেন না, উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, “নিজে ছুকার্য্য করিয়াছ, এখন তাহার ফল পাইলে। এই জন্তই লোকে বলে, গোপনে প্রেম করিতে গেলে বিশেষ দেখিয়া শুনিয়া করিতে হয়। বাহার মনেঃ ভাব জানি না, তাহার সঙ্গে ভাব করা ত নয়, শত্রুতা ডাকিয়া আনা।” শুনিয়া রাজা বলিলেন, “তোমরা ত বেশ, তোমরা উহাকেই বিশ্বাস করিতেছ, আর আমার উপরই সব দোষ চাপাইতেছ।” তাহাতে আরও রাগিয়া, আরও চটিয়া শাক্ত'রব বলিলেন, “শুনিলেন, আপনারা শুনিলেন, কি জঘন্য উত্তর হইল, শুনিলেন; যে লোক শঠতা কাহাকে বলে জানে না, তাহার কথার আমরা বিশ্বাস করিব না, আর বাহার পরকে ঠকান ‘বিত্তা’ বলিয়া অভ্যাস করে, তারই কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইব?”

রাজা যখন বলিলেন, “অহে সত্যবাদি! মানিয়া লইলাম, আমরা ঠকান বিত্তাই শিখিয়াছি, কিন্তু বল দেখি, এই বালিকাটিকে ঠকাইয়া আমার কি লাভ হইবে?”

“লাভ নিপাত।”

“পৌরবে নিপাত যার, এ কথাটা কেহই শ্রদ্ধা করিবে না।” ক্রমে যখন শকুন্তলাকে রাজার কাছে রাখিয়া আশ্রমে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির হইল, তখন শকুন্তলা অসহায় হইয়া তাঁহাদের পিছনে পিছনে ঘাইতে লাগিলেন। তখন গৌতমী শার্ঙ্গ’রবকে বলিলেন, “শকুন্তলা যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। রাজা যখন নিলেনই না, তখন বেচারা কিই বা করে।”

তখন শার্ঙ্গ’রব বেগে ফিরিয়া আসিল এবং বড়ই রাগ করিয়া বলিল, “অরে হুঁচা-রিণি, তুই আবার আপনার ইচ্ছামত কাজ করিতেছিস্। রাজা যাহা বলিতেছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে তুই ত কুলটা, তোকে নিয়ে তোর বাবা কি করিবে? আর তোর মন যদি জানে, তুই খাঁটী, তবে পতিগৃহে তোর দাস্ত করাই ঠিক।” এইবার কঠোরতার চরম হইল।

এই ত গেল শার্ঙ্গ’রবের কথা। তাঁহার আর যে সঙ্গীটি আছেন শারদ্বত, তিনি ত কথাই কন না। তিনি আপনাকে বড়ই পবিত্র ও শুদ্ধ বলিয়া মনে করেন। রাজার বাড়ীতে আসিয়া মেলা লোকজন দেখিয়া শার্ঙ্গ’রব যখন রাজবাড়ীটাকে আশুন-লাগা ঘরের মত মনে করিতেছিলেন, শারদ্বত তখন বলিলেন, “নগরে আসিয়া তুমি ত এইরূপ হইয়া গিয়াছ, কিন্তু আমার আর এক রকম ধারণা। শ্রান করিয়া উঠিলে তেলমাখা লোককে যেমন অপবিত্র মনে হয়; বাহারা শুচি, তাহারা অশুচিকে যেমন অপবিত্র বলিয়া মনে করে; যে জাগিয়াছে, সে ঘুমন্তকে যেমন মনে করে; যে স্বচ্ছন্দে বেড়াইতেছে, সে কয়েদীকে যেমন মনে করে; আমি সুখে আসক্ত এই নগরবাসী লোককে তেমনই দেখিতেছি।” তিনি সত্যই আপনাকে এ সকলের উপরে বলিয়া মনে করেন, আর অনাসক্তভাবে ইহাদের কার্যকলাপ দেখেন। দেখেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার চক্ষে কেন কিছুই নয়। ইহার পর তিনি হুইবার কথা কহিয়াছিলেন। যখন শার্ঙ্গ’রব রাজাকে চোর ডাকাত প্রভৃতি বলিয়া গালাগালি করিতেছিলেন, তখন শারদ্বত তাঁহাকে বলিলেন, “তুমি থাম, শকুন্তলা, আমাদের যাহা বলিবার, বলিলাম। রাজা এইরকম বলিতেছেন, এখন তুমিই উত্তর দাও, উঁহার যাহাতে বিশ্বাস হয়, তাহা কর।” এই কথাগুলিতে অনেক কথার মৌমাংসা হইয়া গেল। মিছা ঝগড়া করিয়া আমরাই বা কি করিব, শার্ঙ্গ’রবই বা কি বলিবে, এ সময় একজনমাত্র কথা কহিতে পারে, সে শকুন্তলা। তাহাকে তিনি বলিলেন, রাজার যাহাতে বিশ্বাস হয়, তুমি তাহা কর। এই কথার পর শার্ঙ্গ’রব অনেকক্ষণ আর কথা কহেন নাই। শকুন্তলা যাহা বলিবার, বলিল; যাহা মনে করিয়া দিবার, দিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাজা শকুন্তলাকে যাহা ইচ্ছা তাই বলিলেন, শার্ঙ্গ’রব আবার মুখ ধরিল; শকুন্তলাকে গালি দিল। রাজাকে নিপাত দিল। তখন শারদ্বত রাজাকে বলিলেন, “আমরা শুদ্ধ

আজ্ঞা পালন করিতে আসিয়াছিলাম, পালন করিলাম ; এখন আমরা কিরিয়া যাই। ইনি তোমার পত্নী, তা তুমি ত্যাগই কর, আর ঘরেই লও। বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সম্পূর্ণ ঐভূত্ব, গোঁতমি, চল।” শকুন্তলার বিবাহে শারদ্বতের সন্দেশই নাই। কারণ, গুরুর উপর তাঁহার অচলা ভক্তি ; গুরু মিথ্যা কখনই বলিবেন না। শাক্যবৈবের সন্দেশ একটু ছিল, তাই তিনি শেষ বলিয়া ফেলিলেন, “যদি রাজা বা হা বলিলেন, তাহা সত্য হয়, তুমি কুলটা, পিতা তোমায় লইয়া কি করিবেন ?” তাঁহার ‘যদি’ আছে। শারদ্বতের ‘যদি’ নাই। তিনি রাজাকে বলিলেন, “ইনিই তোমার পত্নী” ইত্যাদি। শারদ্বত কথের দৃঢ়তার মূর্তি, শাক্যবৈব তাঁহার কঠোরতার মূর্তি।

মহাভারতে একা শকুন্তলাই সব করিয়াছিলেন ; রাজার পরিচয় লইয়াছিলেন, নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন। গান্ধর্ববিধানে পুত্র ডাকাইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। কারণ, বিবাহ বিধিযত না হইলে সন্তান ভাল হয় না। পিতার কাছে বিবাহের কথা আপনিই বলিয়াছিলেন ; পিতার বাহাতে রাজার উপর রাগ না হয়, সে ক্ষণ তাঁহার নিকট বর চাহিয়াছিলেন। নিজেই পুত্রের সঙ্গে রাজবাটী গিয়াছিলেন ; রাজার সহিত সদর্পে কথা কহিয়াছিলেন। রাজা কটু কথা কহিলে তাহার উপযুক্ত কটু উত্তর দিয়াছিলেন। পুত্রের হাত ধরিয়া রাজসভা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। শেষ যখন দৈববাণী হইল, তখন রাজা আপনার ঘোষ স্বীকার করিলেন ; বলিলেন, “লোকে বিশ্বাস করিবে কেন বলিয়া আমি জানিয়াও তোমার বিবাহ স্বীকার করিতে পারি নাই। এখন দেবতার লোকের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন, আমি স্বীকার করিলাম। তুমি আমার কটুকথা বলিয়াছ, তাহা আমি ক্ষমা করিলাম। আমার অপরাধও তুমি ক্ষমা কর।” তাহার পর মিলন হইল। পুত্রও সুবরাজ হইলেন।

অভিজ্ঞান শকুন্তলার সেই একজনের জায়গায় শকুন্তলাকে লইয়া ছয় জন হইল কেন ? ছয় জনের কম হইলে কি হইত না ? দুজন তিন জনে হইত না ? মহাভারতে বারবছরের ছেলে লইয়া শকুন্তলা রাজবাড়ী গেলেন। অভিজ্ঞান-শকুন্তলার গর্ভাবস্থায়। মহাভারতে দৈববাণী হইল রাজা ত্যাগ করার পর, আর এখানে দৈববাণী হইল, কথমুনির আসার দিন। মহাভারতে ছেলে হলে দেবতার বর দিলেন, এই ছেলে শত অশ্বমেধ করিবে, সারা পৃথিবীর রাজা হইবে। এখানে মিলনের সময় মারোচ ঐ বর দিলেন। পুরাণ গল্পটি এত বদল করা হইল কেন ?

ইহার কারণ এই যে, মহাভারতে শকুন্তলার গল্পটি উপাখ্যানগল্প মাত্র, সব গল্পই কিছু নাটকে সাজে না, খাপ খায় না। তাই গল্পটিকে নাটকের মত করিয়া সাজাইয়া লইতে হয়। তাহার উপর আবার মহাভারত-রচনার সময় সমাজে একরকম অবস্থা ছিল, কালিদাসের সময় আর একরকম হইয়া গিয়াছে। এখন স্ত্রীলোকের

অতটা বাচালতা সাজে না। মন্ত্রতন্ত্রের উপর আস্থাও বোধ হয় একটু কমিয়া গিয়াছে; গান্ধীবিধানে বিবাহেও পুরুষ ডাকিতে হয়, সে কথা বোধ হয় লোকে ততটা পছন্দ করে না। তার পর কাব্যের রীতিপদ্ধতিও অনেক বদলাইয়া গিয়াছে; এখন বাঁধনী গান্ধনীর উপর লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কোন্টার পর কোন্টা লিখিলে ভাল শোনার, ভাল দেখার, সে বিষয়ে লোকের বেশ নজর আছে, এখন সামাজিক অর্থাৎ সমাজদার বলিয়া একদল লোকের জালায় কবিতা আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। এখন তাহারাই প্রবল; কবিকে তাহাদের খাতির করিয়া চলিতে হয়। নেহাত বৈষ্ণব কবিদের মতও নয় যে বলিবে, “যে আমার কবিতায় দোষ দিবে, তাহার মাথায় সাত কুতো।” অথবা এখনকার কবিদের মতও নয় যে বলিবে, “যে আমার কবিতায় দোষ দিবে, সে মূর্খ” বলিয়া গাল দিয়াই জিতিয়া যাইবেন। সামাজিকের ভয়ে তখন কবি অস্থির, তাই কালিদাস যদিও মহাভারত অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিয়াছেন, মহাভারতের সব ঘটনাও রাখিয়াছেন, তবুও সেগুলি নাটকের মত করিয়া লইয়াছেন, সময়ের মত করিয়া লইয়াছেন। সামাজিকদের মনঃপুত হইবার মত করিয়া লইয়াছেন।

মহাভারতে শকুন্তলা আপনিই রাজার পরিচয় লইয়াছেন ও আপনার পরিচয় দিয়াছেন। এটা কালিদাস ক্রটিবিরুদ্ধ মনে করিয়াছিলেন, তাই অননুসার সৃষ্টি। অননুসার যেন শকুন্তলার ডাট বা চারণ। শকুন্তলা লইয়াই তিনি থাকেন। শকুন্তলা ধান, শকুন্তলা জ্ঞান। ভোরে উঠিয়া শকুন্তলার ভাবনা। শকুন্তলার জন্ত বকুলমালা রাখিয়া রাখা, শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতাদের পূজা করা ইত্যাদি। তিনি শুধু শকুন্তলা লইয়াই থাকেন। আবার দেখুন, মহাভারতে আজ্য, হবি, লাজ, সিকতা, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বিবাহের বত কাজ, সবই শকুন্তলা করিয়াছেন। এসব কালিদাসের সময়ে শকুন্তলা যদি করেন, তবে তাঁহার নিন্দা করিবে; স্মরণ্য ও সকলের জন্ত প্রিয়ংবদার সৃষ্টি হইয়াছে। কেন, অননুসাকে দিয়া চলিত নাকি? না, চলিত না। কোনরূপ চিন্তা আসিয়া পড়িলে অননুসার গুটাইয়া যান, মনের মধ্যে মন রাখিয়া কেবল ভাবেন, তাঁহার স্মৃতি থাকে না। তাই স্মৃতিওলা একটি মেয়ে চাই। সেটি কালিদাদের প্রিয়ংবদা—বেশ ঢালাক চটপটে। মহাভারতে গান্ধী বিবাহের উত্তোগ—আজ্য, হবি, লাজ, সিকতা, ব্রাহ্মণ। নাটকে তাহার উত্তোগ—মদন লেখ, পদ্মপত্র নখের আঁচড়ে লেখা, নির্মাল্য বাবে রাজার আশীর্বাদে জন্ত, তার সঙ্গে সেই পদ্মপাতাখানি দেওয়া, ছকলসী জল ধারে বলিয়া শকুন্তলাকে বাইতে না দেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই উত্তোগপর্বের জন্য প্রিয়ংবদা চাই। গৌতমীকেও চাই। নহিলে লতাগৃহ হইতে শকুন্তলাকে কে উঠাইয়া আনিবে? অননুসার পারে না, প্রিয়ংবদা পারে না, স্মরণ্য একটা বুড়ী চাই। দাদাকে ডুমুরতলা থেকে বিদায় করা চাই। শাক্তরব পারিল

না, আর কেহ পারিল না, গৌতমী কিরাইলেন। রাজবাটিতে রাজা যখন শকুন্তলাকে চিনিতে চাহেন না, তখন শকুন্তলার ঘোমটা খুলিয়া কে মুখ দেখাইবে? শাস্ত্রব পারেন না, শাস্ত্রব পারেন না, তাই গৌতমীর সৃষ্টি। এ তিনটির কোনটিই উপেক্ষিতা নহে; সকলেরই একটা না একটা কাজ আছে। সে কাজ শেষ হইল, অমনি সে সরিয়া গেল। ইহাকে যদি উপেক্ষিতা বলা হয়, তাহা হইলে অগতের সকলেই উপেক্ষিতা নয় কি?

মহাতারতে শকুন্তলা নিজেই রাজার সঙ্গে ঝগড়া করিলেন, তর্ক করিলেন, রাগ করিলেন। কিন্তু কালিদাস শকুন্তলার মুখে ও সকল দিতে রাজী নন, তাই সঙ্গে দুটি শিষ্য পাঠাইলেন। একটি ঝগড়া করিবে, আর একটি মিটাইয়া দিবে। এইরূপে একটির জায়গায় কালিদাসকে পাঁচটি ছয়টি করিতে হইয়াছে। কোনটি নহিলেই নাটক চলিত না। আর একটির জায়গায় ছয়টি করিয়া কালিদাস শকুন্তলাখানিকে একখানি উৎকৃষ্ট নাটক করিয়া তুলিয়াছেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সে আসিল না

তাঁরে বরণ করিয়া লইব ব'লে
ছেলেছিঁষু ক্ষীণ প্রদীপ-শিখা ;
জলিয়া জলিয়া প্রদীপ নিভিল
আসিল না মোর জীবন-সখা ।

তাঁরে পরাইব ব'লে নিভুতে বসিয়া
গেঁথেছিঁষু, এই ফুলহার ;
ফুলগুলি সব ঝরিয়া পড়িল
আসিল না দেবতা আমার ।

তাঁহার চরণে দিতে পুষ্পাঞ্জলি
কত ফুল রেখেছিঁষু তুলে ;
ফুলগুলি সব শুকায়ে গেল,
আরাধ্য-দেবতা আসিল না ভুলে ।

শ্রীস্বধাময়ী সেন ।

কমলের দুঃখ

(হেনা—নগেন)

আবার কেন আমার লোক পাঠিয়ে আলাতন,—নিজে এসে রাতে এত কাণ্ড করা। আমি ত বলেছি, তুমি আমার এখানে আর এস না। আমার মনের অবস্থা ভাল নয়, আমার উপরেও তোমার সে মন নেই। মিথ্যা কোন দিন কি নিয়ে একটা কেলেকারী করার চেয়ে ও সব মিটিয়ে নেওয়াই ভাল। তোমরা সুখের পায়রা। যেখানে সুখ পাবে, সেইখানে যাও। পায়রামটির গলায় পূরে বক্বকম্ করা তোমাদের ভাল লাগে। তোমাদের তাই স্বভাব—আমরা ও সব ভাল বুঝিনি। আমার আর কি ; সুখের বে পথ ধরে চলেছ—সেই পথে চলে যাও,—তোমার রাসমঞ্চ যেখানে বাঁধবার ইচ্ছে, সেইখানে বাঁধ। হীরের কুঞ্জেই যাও, অথবা পীরের কাবায় যাও, আমার কাছে ছই সমান। আমার আর ও সব ভাল লাগছে না—আর এখানে এস না,—এ পথ আমার আর ভাল লাগছে না। আমিও খুব সুখ পেয়েছি, সুখ আর আমার ধরছে না। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সুখের আলায় জলে মরছি—তা না হলে তোমারও চিঠির উত্তর দিতাম—তোগাদের সম্পর্ক আমি আর সহ্য করতে পারছি। তুমি বুঝতে পারছ না যে, তোমাদের মত সখের প্রাণে—সুখের আবেশে আমি আর ডুবতে পারছি না, আমার সে ক্রটি মার্জনা কর। আর এই দেহের বিনিময়ে যে অর্থ, যে মণিমুক্ত আমার দিয়েছ, আমি বাজরা ক'রে সাজিয়েছি—ফেরত নিয়ে যাও, দেহপণে যে সুখ কিনেছি—তাও নিয়ে যাও। আর আমার ভাল লাগে না। তুমি কি বুঝবে, কেন হেনা বেস্তা হয়ে—আজ তার চিরদিনের আদরের—আশার—আকাঙ্ক্ষার মণিহার ফিরিয়ে দিচ্ছে ? সুখমত্ত, প্রাণহীন, পাষণ-বিগ্রহ—তুমি কি বুঝবে, কেন হেনা পাষণ হয়ে—সেই পাথরে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্তে আগুন খুঁজে বেড়াচ্ছে ? তুমি কি বুঝবে, যে চিরদিন গরল গলায় ঢেলে এসেছে, সে কেন, কেন—এ মৃত্যুর হাত থেকে অমর হবার জন্তে ছুটেছে ? তুমি কি বুঝবে, কেন নারী বেস্তা হয়, আবার সেই মহাপঙ্কলেপ মুছে ফেলবার জন্তে—প্রাণান্ত করে ? কেন ভোগের সব উঁচু শিখরে দাঁড়িয়ে,—ভোগ ত্যাগ করতে চায়—সে তুমি বোঝ নি, সে তুমি বুঝবে না—ওধু মনে রেখ, সবই বদল হয়। আমার আর ভাল লাগে না—আর আমার ভাল লাগে না।

ইতি হেনা।

(নগেন—হেনা)

এতদিন পরে তুমি আমার বললে, ভাল লাগে না,—এতদিন পরে কেন বললে। হেনা, তুমি কি মানুষী না রাক্ষসী! তোমার এ কথা বলতে একটু মার হ'ল না? বেশ, যেতে বারণ কর, আর যাব না—তোমার ওপর আমার কিসের জোর! কিন্তু জেনো, তুমি যেমন আমার মনঃকষ্ট দিলে, তেমনি হাজার গুণ বেশী মনঃকষ্ট তোমার পেতে হবে। আমি তোমার জন্ত সব কল্যাম—তোমার জন্ত সব নষ্ট হ'ল—তুমি আজ বললে এস না,—এই কি তোমার ধর্ম হ'ল, না এই রকমই তোমাদের ধর্ম! আগে পরে সব সমান, আগেও তারা এমনি ফিরছে, আবার আমিও ফিরলাম। যে প্রাণপাত ক'রে তোমার জন্তে ম'ল, তার দিকে ফিরে তাকালে যে অধর্ম হ'বে! সে কাজ কি করতে আছে! যারা এমন ক'রে ক'রে মরে, তাদের দিকে ফিরে শুধু একটু হেসে চাইলে—বস, সব ধর্ম ওইখানেই শেষ হয়ে গেল! সব নিয়ে শেষে বললে ফুরিয়ে গেছে যাঃ—মানুষের মনও কি তোমাদের নেই? চোখের চামড়া বোধ হয় তোমাদের পাখরের মত কোন জিনিস,—মানুষ রাগ ক'রে কত কি বলে, তাই তোমার অমন চিঠি লিখেছিলুম। তার পর তোমার দোরে গিয়ে মাথা-খুঁড়লাম, দেখা করলে না, দরজা খুলে দিলে না—কথার একটা উত্তর দিলে না, এর অবশ্য কারণ ছিল,—সে কারণও আমার বেশ ভাল লাগে, তোমার ভাল লাগে—আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে!

হায় হেনা! আমার মানিক! সংসারে অদ্ভুত স্থান্য, অতুল রূপ, অগাধ অর্থ, আত্মীয়ের অবাচিত প্রাণচালা মেহ, তোমার চরণে ঢেলে দিয়েছি। বিস্তার গৌরব, স্বাস্থ্যের বল, পরিণীত অঙ্গুরীর মত লক্ষী স্ত্রীর প্রেমের আশা সমস্ত তোমার ওই মুখ চেয়ে নষ্ট করেছি; পাখানের মত নিজের ভাই কমলের সঙ্গে ব্যবহার করেছি—বে ভাই আমার—শির কেটে তার শিরার রক্ত দিয়ে রোগ হ'তে বাঁচিয়েছিল,—বে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে, আমাকে বাঁচাবার জন্যে সেই মৃত্যুকে ফিরিয়েছিল। তোমার মুখ চেয়ে যারা সত্যি বন্ধু—যারা আপনার ক'রে ছেলেবেলা থেকে বুকে ক'রে খেলা ক'রে এসেছে—তাদের ত্যাগ ক'রে—হাক্ক মাষ্টারের মত লোককে প্রাণের ইয়ার করেছি। যখন তোমার যা দরকার হয়েছে,—তাই তোমার মুখের কথা পাবার অপেক্ষা না ক'রে যুগিয়েছি, তার ফল তুমি আমার ত্যাগ করলে—করতে পারলে কি ক'রে? বলবে করেছে, তোমার নিজের মুখের জন্ত—তুমি বিকিয়েছ দরে, আমিও কিনেছি দরে! বাজার বাজার—হাটে হাটে, আদান প্রদান হাতে হাতে নগদ—ধর্ম করতে বসিনি। হায়! কি তুমি, যে

তোমার ক্ষণে আমার সব গেল ! উঃ, স্নান গেল, স্বাস্থ্য গেল, প্রাণের যে শান্তি তা গেল ! কিসের ক্ষণ, যা যায়, তা আর ফিরে না—আর কবে তা ফিরবে, দিন চ'লে গেছে, আর ফিরবে না—আর ফিরতে পারে না। রোজই ভোর হবে, আমি কিন্তু সে আলোর অবসাদ ছাড়া আনন্দ পাব না। উঃ, মাণিক, এই সংসার ! বুকের রক্ত দিয়ে তাকে পুষ্ট কর, তবু একবার সে ফিরে চাবে না। আজ কেবল মনে পড়ছে, সেই দোলের দিন। কেবল মনে পড়ছে, সেই বসন্তের পাতার পাতার লাল লেখার খেলা, সেই ফাল্গুনের দিনে ফুলে ফুলে আমোদ করা। বাতাসের মাঝে তোমার গান, আর হোলির কুসুমবৃষ্টি, সে আনন্দ আমার জীবনে কখন ভুল হবে না। তাই কেবল মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, গাছপালা, পাখী, ফুল, লতা-পাতা সব লালে লাল, আর বকুলের গন্ধ যেন ঢেউ তুলে চলেছে, তার মাঝে তোমার সেই গান—চারিদিকে আঁবের বোঁলে গন্ধ আর মোমাছীদের তন্তনানি, তারি সঙ্গে মিশিয়ে তোমার গান—

“ফাল্গুনের হাওয়া লাগে গায়
সখি লো প্রাণ যে যায়, কেমনে দিব তার।
দিতে পারি মতিহার
নিতে পারি সোহাগ তার
যা সে চায় সেই দিতে সে পারি তার
এ বোবন রাখা তবু দায়—
সখি লো প্রাণ যে যায়
কেমনে রাখি তার।

এ গানের প্রতি ছত্র আমার কানে সেই ভরপুর সুরের মাদকতার সিক্ত। হৃৎকের দিনে সুরের স্মৃতি হৃৎকে বাড়িয়ে দেয় বটে, তবু সে বড় মিষ্ট ; সেই তুমি আমার এই বুকের ওপর মাথা রেখে কেঁদেছিলে। তুমি কি সেই ? হায় ! সুরের পানে চেরে চেরে রাত কেটে যেত, তখন কি ছিল। ভালবাসি না, খুব ভালবাসি ? এই সব মনে পড়ছে। সেই তুমি সকারিণী লতার মত হাত ছুঁখানি দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিতে—আজ যেন স্বপ্নের মত সব ভেঙে গেল ; যাক, সূখ অগতের ক্ষণ নয়, সবই ক্ষণিক, সবই ছুদিন পরে চ'লে যায়। যেমন নেশা করা, নেশা কাটে আর যত প্রাণের যাতনা সব আবার জেগে ওঠে। আমার মনে হ'চ্ছে না যে, এ চিঠি তোমার সত্যি ! যাক, সংসার যেমন চ'লে যায়, তেমনি চ'লে যাবে, কেবল তোমার আমার বদল হয়ে গেল। যখন বারণ করেছ, যখন বাড়ী থেকে ফিরিয়ে দিয়েছ, তখন আবার কেন যাব—তা যাব না। বুকেছি, অগতে কাম কামনার সার্থকতা হয় না। এই আমার অভুল

ঐখ্যা, অটুট স্বাস্থ্য, মান-সম্মান, তোমারই জন্তে নষ্ট হ'ল, তুমি তাই যেমন ছেঁড়া কাপড় লোকে ত্যাগ করে, তেমনি ক'রে ফেলে দিলে। ভাল, এর ফল কিন্তু তোমার এক দিন পেতে হবে। আমিও তোমার সহজে হাত পিছনে চ'লে যেতে দেব না, যতক্ষণ আমার এক কপর্দক থাকবে, ততক্ষণ আমি বাধা দিতে কসুর করব না কেনো। লিখেছ, ফিরে নিয়ে যাও; থু থু, ফেলে কেউ সে থু থু মুখে ক'রে তোলে না। যখন তোমার সঙ্গে কেনা-বেচার সম্পর্ক, যখন বুঝেছি, এ বিকিকিনির হাতে আগার ঠকিয়েছ, তখন আমিও তোমার পরিশোধ করব। অমন ঢের টাকা খরচ করেছি, অমন টাকার জন্তে কখন মরিনি—কখন মরবও না।

আমি তোমার বেষ্টার মত মনে করিনি। প্রাণের মত সোহাগের জিনিস ব'লে প্রাণে ধরতুম, তোমার প্রাণের কি জালা, আমার কখন বলও নি, আমিও তার কোন সন্ধান করিনি। যে মনিহার লাভ করবার জন্তে এত রকম, আজ খুব মুখে সে হার ত্যাগের কথা শোনাতে এসেছে; তাই ওই হারের জন্ত অভিমানে তিনদিন কথা কওনি। ঢের দেখলাম, সবাই অমন দিতে পারে, সবাই অমন নিতে পারে, আবার সবাই অমন ফিরিয়ে দিতে পারে—হ্যাঁ, ঢের দেখেছি! মাষ্টার তাই ঠিক বলে,—

‘অমন রসূকে সবাই বদ্ধ অমনতর সবাই,
কসূকে গেলে সবাই অমন করে সে জবাই।’

দেখব হেনা, কার কত দোড়—আমিও দেখাব—দেখাব—দেখাব!

ইতি “ন”।

(হেনা—নগেন)

না, তোমার ও মায়া-কারা দেখতে হবে না। ও সব কারা-রান্না আমি ঢের দেখেছি, ও অমন চোখে আতর দিয়ে জল দেখান, অনেকদিনই শিখেছি, ও আমি বেশ জানি, তুমি আর নতুন কি দেখাবে। আমার আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? আমার কোন ধর্ম্ম নেই;—রূপ বেচতে যে বসেছে, সে কি ধর্ম্ম করতে বসেছে না কি?—আমার জন্তে নষ্ট করলে, কেন করলে? তুমি একা নও গো একা নও,—অমন ঢের সুন্দর আমার জন্তে অন্তর ছেড়ে, ‘এই আঁচলের ছায়ায় ঘুর ঘুর ক'রে বেড়িয়েছে। আমার জন্তে অমন অনেকে ভিখিরী হয়েছে, এ সবাই জানে। আমি ত কাকেও ডাকতে বাইনি। সবাই ত আপনি পতঙ্গের মত কাঁপ দেয়, পুড়ে মরে। আমি কি তোমার সেধে ডাকতে গিয়েছিলাম? উপড় হয়ে পড়ে পা জড়িয়ে ধরেছিলুম? চুপুক লোহাকে আকর্ষণ করে, সেই তার ধর্ম্ম, তা লোহা আসে কেন ছুটে? আমার রূপের ঢেউ

বয়ে যাচ্ছে, উঠছে, তোমরা এসে অমন ঝাঁপ দিয়ে পড় কেন? আমি ত বলি নি।

তোমার আর আমার এখানে আসা হবে না। আমিও তের টাকা দেখেছি, মনে করলে ও রকম টাকা শুধু এই চোখের চাওনিতে টেনে আনতে পারি—তোমার টাকা ফিরিয়ে দেবার শক্তি আছে কি না দেখো। আর আমার কোন চিঠিপত্র লিখো না। তোমার কাপড়গুলো সব পাঠিয়ে দিলেম। আমার এখানে কেউ আসে, এ আমি চাইনে। আমার আর কাউকে ভাল লাগছে না। কারও আসবার দরকার নেই, সবাই স্বার্থপর! সুখের পারসাদার জন্তে যে বোম, আর ধোপ তৈরিরি করেছিলুম—সে ভেঙে ফেলেছি। সব পারসাদা এখন ভালগোলা চরে বেড়িয়ে বেড়াক। আমার এখানে আর কারও জায়গা নেই—কেউ নয়—যাও! তোমাদের সে ভালবাসা ও মোছলমানের মুরগী পোষা—কেবল দেহের রস রক্ত হাড় মাংসের জন্তে, ও আমি বেশ বুঝেছি। ও সব কিছু নয়। তোমাদের ক্ষুধা নিয়ে কাজ, যেখানে ক্ষুধা পাবে, সেখানে যাও। তের আছে সন্ধানের ফের, অনেক পাবে। মাষ্টার আছে, অনেক শেখা শেখাবে। টাকা দিলে, গাড়ী দিলে, মুক্ত হীরে জহরাং দিলে, যদি ভালবাসা হ'ত, তা হ'লে আর ভাবনা হ'ত না গো! অত সোজা জিনিস ভালবাসা নয়, তা হ'লে আর অমন হ'ত না। এত সহজে ভালবাসা হ'লে এ আসনাইয়ের বাজারের রোসনাই অনেক দিন নিবে যেত, তা হ'লে আর এমন ক'রে রূপের বাজারে রূপ বেচবার ছড়াছড়ি পড়ে যেত না। তা হ'লে আর আরব্য-উপন্যাসের সিরাজ সহরের হাটের মত, রক্তের মত লাল সিরাজীভরা পানপাত্র হাতে ক'রে গলার ফোটা ফুলের মালা পরে, রূপ প্রেম একহাটে বেচত না। এত সহজে প্রেম-মিলে অনেক দিন হাট উঠে যেত। চোখে মুরমা—গালে আলতা,—মুখে চূণের দেয়ালে কাপড়ের ছুটি ঘসে মুখের আঁচড়, চোখের কালি ঢাকা, আর গায়ে পচা আতরের গন্ধ মেখে দাঁড়াত না। তা হ'লে অমন হিমের দিনে, শীতের রাতে ছেঁছতলার দাঁড়িয়ে ছ চার পরসার জন্যে দেহ বেচতে যেত না, তা হ'লে আর বাজার করা চলত না।

বলতে পার, 'কেন, আমি কি তোমার ভালবাসিনি'—হ্যাঁ, বেসেছিলে, তাই এ রূপের ডেউ সামলাতে পারলে না, টাল খেয়ে পড়ে ঘূর্ণি খেলে, সত্যি বেসেছিলে, সে আমাকে নয়—নাগর, আমাকে নয়, আমার ভিতরে যে আছে, তাকে নয়, আমার এই দেহ, এই রূপ, আমার ঠোঁটের নিঙড়োন সোহাগ। আমার এই বুকের ফুলের আবেশ, আমার এই এই, আর কত বলব, আমায় ভালবেসেছিলে! হাঃ, হাঃ! সবাই ভালবাসে গো—সবাই অমন ভালবাসে। কিন্তু কখন এমন হয়েছ যে—বাকে ভালবাসি, তাকে দেখে বুক পেতে দিতে পার—পাছে তার পায় একটা কাঁটা ফোটে—তার

অন্যে বুক পেতে দিতে পার, নিজের প্রাণ দিতে পার। তোমার ভাই তোমার রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছিল, সে ভালবাসতে জানে, তাই জগৎ তাকে ভালবাসে ; তুমি যদি জানতে, তা হ'লে তার পারের তলে লুটিয়ে থাকতে। তুমি তোমার অমন ভাইকে ভালবাসতে পার নি। তুমি তোমার অমন সুন্দরী স্ত্রীকে কখন ভালবাসতে পার নি—তুমি আমার ভালবেসেছ শুনলে হাসি আসে।

ঘরকে করলে পর বন্ধু, পরকে করলে ঘর

ঘরকে যে পর করে, তার পরও ঘর হয় না। নিজেকে পর করলে কি কখন ঘর হয়? তা হয় না। তা হয় না—নাগর,—তা হয় না! অনেক গুণের সাগর না হ'লে নাগর হয়ে উঠা যায় না—বুঝলে? এ ছনিয়ার রাজস্বে প্রাণের নাম প্রাণ; প্রাণের নাম টাকা নয়। টাকার কথা—মুক্তোর মালার কাহিনী আর আমার শোনাবার দরকার নেই। তবে তোমার অনেক খেয়েছি, নৈমকহারামী করব না—আর বেশার প্রেমের জন্তে ঘুরে বেড়িয়ে না, আর সুখ খুঁজে বেড়িয়ে না। সংসারী হও, ভদ্র হও, ইতর-সংসর্গ তাপ কর। আমাদের ভগবান্ মেরেছে, কাউকে যে ভালবাসব, কারু যে আপনার হব, তাতে বিধাতার অভিপাত আছে! সে দিন আর এ জগতে হবে না! তোমার সত্য বলছি, আমাদের এ সব অনেকই ভাণ; সুখের জন্তে—টাকার জন্তে এ সব করি, হয় ত আবারও তাই করব,—তবু জেনো, এ ভাণ করবার যে প্রাণ, সে সত্যিই খোঁজে, সে ভাণ চায় না। তাই তোমাদের ও ক্ষুতির ধ্বজা তোলা ছুঁচোর কেউন আর আমার ভাল লাগে না; তাই, বলেছি এস না। সুখ ত আমার কাছে অনেক নিষেহ, কিন্তু কখন হুঃখ নিয়েছ কি? জান, কি অন্তর্জালয় জন্তে জন্তে বেষ্ঠা পরকে তার দেহ বিক্রয় করে? জান, কি দাঁতে দাঁত দিয়ে চেপে নিজের সুখের প্রবৃত্তিকে তোমাদের কাছে নে বিকায়? জান, কি ভীষণ যাতনার ব্যথা চেপে তোমাদের কাছে হাসতে হয়। যদি সে এক ফোঁটাও এ হুঃখ বুঝতে, তবে বুঝতাম, তোমার প্রাণ আছে—আমার নেই! প্রাণ নেই বলেই মৃতকে জীবনের ভাবে নিয়েছিলে। তোমরা যদি সুখটুকু নেবার জন্তে এত সাঙ্গ-সজ্জা করতে পার, এত টাকা বাজিরে জাঁক দেখাতে পার, আমরা তার বদলে সাঙ্গ-সজ্জা দেখিয়ে তেমনি সুখের সন্ধান করব না কেন? কিন্তু গোড়ায় ভুগ যে,—নেওয়ার সুখ নেই, দেওয়ার সুখ। তুমি দিতে আসনি, নিতে এসেছিলে, তাই আজ তোমার আমার ভাল লাগে না। তুমিও দাও নি, আমিও দিই নি। সব মিটে গেছে! আবার কেন? তুমি নিজে বুঝে দেখ, আমার জন্তে তোমার নষ্ট হয় নি—তোমার নিজের জন্তে তোমার সব গেছে। যাক্ অত কথার আমারই বা কি কাজ! তবে বললুম কেন, তুমি অনেক শুনিয়েছ ব'লে। তোমাতে

আমাদের এই পর্য্যন্ত। আর নয়। তুমি আমার মুখ চেয়ে কোন কাজটা করেছ—
একটিও না। যা আমার করেছ, তাও তোমার মুখ চেয়ে। তোমার জুড়ির বাহার
তোমার নিজের জন্তে; তোমার পাঁচটা ইয়ার গাথা মোসাহেব, সে তোমার ফুর্তির রস
যোগাবে ব'লে; আমার রেখেছিলে তোমার সুখের তারার রস যোগাব ব'লে। আমার
মুখ চেয়ে তুমি কি করেছ,—কিছুই নয়! তোমার বুকের উপর মাথা রেখে কেঁদে-
ছিলুম, কেন কেঁদেছিলুম শুনবে?—মনে হয়েছিল, এ দেহকে কেমন ক'রে পরের সুখের
জন্তে দুখানা খোলামকুচি নিয়ে বিক্রী করছি। মনে হয়েছিল, কি সুখ নষ্ট করে
পেটের জন্তে তোমার সুখ যোগাচ্ছি। মনে হয়েছিল, ভগবান্ এ প্রাণহীন দেহের মধ্যে
কেন তবে প্রাণ দিয়েছিলেন। মনে হয়েছিল, দু'মুঠো ভাত আর পরণের একখানা কাপড়
হলে যার চলে যায়, সে কেন এতর জন্তে এমন সুখ নষ্ট করে। তাই এমন কেঁদে-
ছিলুম, নইলে তোমার পেরে সেই ভালবাসার সুখে ডুবে, ভাবের ঘোরে কাঁদিনি।
তোমার জন্তে কাঁদিনি, কোন মানুষের জন্তে কাঁদিনি, নিজের জন্তে কেঁদেছিলুম, অত
সহজে—ভাবের নেশায়—এ পাখরকুচির প্রাণ কেটে জল বেরোয় না।

কেউ কাকে ঠকাতে পারে না—নিজে নিজেই ঠকে; আমিও অনেক ঠকেছি।
দুখানা চকচকের বদলে অনেক ঠকুতে হয়েছে। ঠকে থাক, শোধ নিয়ে যত পারো।
জান, আজ এতদিনের যা আশার উল্লাসের ছিল, গরবের মনে হ'ত, সে মণিহার পরতে
আজ বিষের জ্বালা উপভোগ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এ সব আমার পাপের চিহ্ন, এ সব
আমার পীক-মাথা কাজের ফল—এখন যেটা ছুঁচ্ছি, সেটাতেই যেন ছুঁচ বিধছে! যেমন
এক জায়গায় কতকগুলো রং জড় করলে চোখে কেমন জ্বালা ধরে, তেমনি তোমার
দেওয়া ও অন্তের দেওয়া এই সব রংকরা সুখের শয্যা দেখছি, আর গায়ে আগুন
লাগছে।—আর আমার এ পাপের সহায়, আর আমার এ নুতন রঙ-করা ঘর ভাল
লাগছে না; সব ফিরিয়ে দিচ্ছি—তোমার টাকা ও মণিহার ফিরিয়ে দিলাম,—দেহপণে
প্রাণের মাঝে যে পাপ কিনেছি, দেখি কিসে তাকে ধোয়া যায়! এতদিন আমার সুখের
সুখের দিকে চেয়েছিলাম, এখন অন্তের দিকে চেয়ে দেখি, তার এ পাপ ধোয়া যায় কি
না? কিসে হয়, তাই দেখব। জিজ্ঞাসা করেছিলে, কেন সুখীরাবাবুর বাড়ী গিয়ে-
ছিলাম—কিন্তু তার ঠিক উত্তর যদি দিই, তবে তুমি তা শুনে কি চূপ
ক'রে থাকতে পারবে—তোমার কি তোমার ভারের মত অত বড় বুকের
জোর আছে যে, সহিতে পারবে; পারবে না—তাই বলি নি—কিন্তু আজ
সে সত্য বলতে—আর আমার নিজের প্রাণের মধ্যে যে লুকোন সত্য আছে—
তা বলতেও সঙ্কুচিত হব না, কেন না, ভাণের পোষাকটা আমি আমার
গা থেকে খুলে ফেলতে চাই। গিছিলাম ঝাঁটার শোধ তুলতে—দেখে এলাম,

পূজো করে এলাম।—কেন করলাম জান? যার ধ্যানে বেষ্ঠার বেষ্ঠা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যার ধ্যানে প্রাণে নতুন আলো আসছে, তারি মূর্তির সামনে—তারি প্রতিকৃতির সামনে, দেখলাম, তোমার স্ত্রী হাঁটু গেড়ে পূজো করছে—এক রাত্রিতে আমি প্রেম ও প্রতিশোধ বুকের মধ্যে পূরেছিলাম;—এক নিমিষে দেখলাম,—প্রেম প্রতিশোধের জন্তে নয়—নিম্নে প্রেম হয় না—দিতে হয়। সর্বস্ব তাকে দিতে হয়—তাই আজ সব ফেলে তাকে পাবার জন্তে ছুটেছি। তুমি পাষণ্ড প্রাচীর! তুমি কেবল রোদের তাপে তপ্ত হতে পার,—যে তোমার কাছে যাবে, তাকে তাপে জলিয়ে দিতে পার;—কিন্তু তুমি এর কি বুঝবে। তুমি শোধ নিতে চাও, শোধ নিয়ে—তাতে আর ভয় করি নি, আর সুখের পাখী হয়ে খাঁচার ভেতরে পড়া বুলি বন্টার জন্যে—ননী-ছানা খেতে চাই নে। অনেক দেখেছি, অনেক ভেবেছি, অনেক জালা এ জীবনে ভোগ করেছি;—সুখের জালাই সব চেয়ে জালা—সুখ সওয়া যায় না, দুঃখ সওয়া যায়। আজ যদি তাকে রক্ষা করবার জন্যে এ কলুষিত দেহের সার রক্ত প্রাণ দিতে হয়—অবহেলে তার মুখ চাইতে চাইতে দিতে পারি। আমার আর কি দেখাবে নাগর! আমি আগোড় ভেঙে বাইরে এসে পড়েছি, আর দেখাদেখির ভয় রাখি নে। আর সে প্রাণের দরদ নেই গো দরদিয়া! হেনা গাছ থেকে ছিঁড়লেই নেতিয়ে পড়ে—গন্ধ যায়, আমি নিজেকে ছিঁড়ে ফেলেছি, আর কিসের ভয়, আর কিসের ভাবনা? সকল রকমের দুঃখকে আমি বরণ করেছি। হেনা মরেছে, এখন সে মাটির।

হেনা।

(মারা—শৈল)

বড় দি !

আজ কুশী এসেছিল, বললে, “বাবু কাঁদচে—তুমি না গেলে কি হয় বৌদি! এ কি গা, সোয়ামী ইটিগুরু, তাঁর মনে কষ্ট দেওয়া! আমরা বৌদি ছোট নোক—অত শত বুঝি নি—এ যে অকল্যাণ হয়। চল, তুমি হলে ঘরের লক্ষ্মী!”—বড় দি ! সত্যি তিনি ভাল হয়েছেন, ভাল হয়েছেন ফিরেছেন। তাই হোক। কিন্তু আমি কি করব—আমি কি করব! আমার তাতে কি আসে যায়, আমি আর যাব না; জান ত সকল কথাই। এ মন নিয়ে আবার কি কোরে সেখানে যাব,—কি ক’রে ঘিচারিণী হব। তিনি ভাল হয়েছেন ভাল,—আমার তাঁর সঙ্গে কিসের সম্পর্ক, একটা ফুল ফেলার—সে আমি মানি নি। ভাল হয়ে থাকেন, তাঁরই ভাল, আমার আর কি? আমার ও সকল শোনাবারও ত কোন প্রয়োজন নেই। কল্যাণ অকল্যাণ ভাল মন্দ আর কিছুই নেই।

ইন্দু দিদির শরীর একেবারে ভেঙে গেছে, আমাদের দুই বোনের করুণকাহিনী কত আর বলব। দিন যায়, রাত হয়, ভোর হয়, যা হয় ক'রে কেটে যায়, সে ত আর কারো হাত ধরা নয়। দেখতে দেখতে দু মাস হতে চলল—সেই আবার আমরা উঠছি, ঘরের কাজকর্ম করছি, খাই দাই সবই করি। শোক এমনই দাঁড়িয়ে যায়। তবে সে মনে আর এ মনে কত তফাৎ। তখন ভাবতুম এক, এখন হ'ল এক। আজ কালো, কাল লাল—আবার পরে পরে কত রঙ।

তুমি ত আর এলেই না, ভাল; সবাই এখন আমাদের ফেলে দিয়েছে। যারা যারা দেখত, কেউ তারা আর আসতে চায় না। সুধীর আজ কয়দিন আসেন নি। কি যে তিনি হয়ে গেছেন,—তার দিকে আর তাকান যায় না। মুখ যেন কালিতে ঢেলে দিয়েছে। তার উপরে ভনিছি নাকি মদ ধ'রেছে। কোথা থেকে কি হ'য়ে যায়। কি ছিল, আমাদের কি হ'ল।

তুমি কি সত্যিই আর আমাদের এখানে আসবে না? গহনার বাজের চাবি আল-মারিতে দেখো—সে গহনার আমার প্রয়োজন নেই, যার দেওয়া গহনা, তাকেই ফিরিয়ে দিও—আমার প্রণাম নিও।

ইতি যারা।

(নগেন—যারা)

প্রিয়তমে,

কলঙ্কের বোঝা মাথায় ক'রে তোমার কাছে আবার আমি ফিরে এসেছি—তুমি কি এ হতভাগ্যকে ফিরে দেখবে? আজ আমার সকল অপরাধ, সকল ছর্কলতার বোঝা—সমস্ত হৃদয়ের ক্ষত জালা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি, তুমি কি পূর্ব-সব ভুলে আমার হাত ধ'রে ভুলে নেবে? লক্ষ্যহীন, প্রাণহীন আপাতঃমধুর সুখের আবেশকে চরম লক্ষ্য ক'রে, যেখানে ছুটেছিলাম, সে ভুল আজ আমার ভেঙেছে,—আমি আজ তা বেশ বুঝেছি। তুমি আমার সে সব কলঙ্কের পঙ্কজপ মুছে, ভুলে নেবে কি? তুমি ত আগে অনেক বুঝিয়েছ, আজ এই ঘোর নিদারুণ অবস্থায় এসো সাধনা দিবে কি? এসো—ফিরে এস—জীবনের এ মুমূর্ষু মুহূর্তে একবার এসো প্রিয়া—আমি আমার ভুল বুঝেছি, তাই আমার ফেলে দিয়ে চ'লে গেছি। আজ এই

সংসারের কীটার পথে তোমার হাত ধরতে চাই—প্রিয়া আমার, আমার সমস্ত সম্ভাপ
নিবারণ ক'রে এস প্রিয়া ।

ইতি—‘ন’

(মায়ী—নগেন)

মায়ী—হা হা—কিসের—যে নরকের আগুন জ্বলছে, সে তাতেই পুড়ে মরবে
এই তার ঠিক বিচার—বলেছিলে না যে, আমার হৃৎপিণ্ডের শোণিতে এর শান্তি হবে—
তবে আবার কেন ? আমি ত তোমার নই—তবে কেন এ ডাক পাড়াপাড়ি । বহুদিন—
বহুদিন পূর্বে যে অকস্মৎ অন্ধকার গহ্বরে পড়ে গিয়েছিলেম, তা হ'তে অনেক ক্ষুধার
পর নিজেকে তুলেছি—আর ফিরে কে সাধ ক'রে অন্ধকারে নিজেকে নিরে বাবে ?
কে তোমার প্রিয়া—কে তোমার প্রিয়া ? উন্মাদ পথিক ! পথে চ'লে যেতে এতই ভুল
—একবার এ—একবার সে—দেখ কোথায়—আবার খোঁজ, নিজের ভাষাকে সংযত
কর—প্রিয়া সকলে হয় না । আবার কেন এ জ্বালাতন করা !...

ইতি—‘ম’ ।

(নগেন—মায়ী)

বাঃ বাঃ ! এ বেশ চমৎকার অহুভূতি । কিছু বলবার নেই, খুব সত্য, এ সত্যের
চেহ্নে খাঁচী সত্য আর নেই । আমার বিবাহিতা স্ত্রী অন্যের ; বাঃ ! খুব ভাল ! আমি
আমার সমস্ত দোষ সমস্ত কালি মুছিয়ে হাত ধুয়ে তুলে নেবার জন্তে এত সাধলাম—
পায়ে ক্রীতদাসের মত মাথা নুটিয়ে দিলাম, আমার যে স্ত্রী—সে বললে—আমি তোমার
স্ত্রী নয়, ভাষা সংযত কর—যে আগুন জ্বলছে, সেই আগুনে পুড়ে মরে । যখন
ভালবাসায় ভাষা সংযত হয়ে আসে, তবে তখন প্রিয়াকে চুষনে আকুল করে, আর
যখন ঘৃণায় ভাষা বন্ধ হয়ে আসে, তখন তার কি প্রকাশ হয় জান—জান না, এইবার
জানবে । আমি যখন মিশতে চাই দেহে মনে—তখন দেখি, জগতে দেহ মন কিছুই
আমার অধিকারে নয়—তখন দেহ মন নষ্ট করতে মায়ী কিসের ! দিন কেটেছে, দিন
কাটবে—আমি এর মূল হ'তে উৎপাটন করব । এতে যদি সন্তানের আশ্রয়
গ্রহণ করতে হয়, এতে যদি ভবিষ্যতে জীবনের রক্ত ঢেলে দিতে হয়, তাও করব ।
ওই ঘোর ক'রে মেঘের অন্ধকারে বজ্রের গর্জন, অমনি ঘোর ঘর্ঘর ভীষণ উদগ্র
অশনির মত যদি এ সমাজের মাঝে না পড়ি, যদি তোমার ওই স্ত্রের, আকাজকার,
উন্মাদের, গর্বের প্রদীপ না নিভাতে পারি, তবে আমার মনুষ্যজন্মই বৃথা ! আজ

সব ভাল ক'রে বুঝেছি—কার জন্তে আমার এ সংসারে এত হৃৎক—আজ থেকে তার মূল উচ্ছেদ করতে যত্নবান হব। আমি এত দিন বিশ্বাস করি নি হেনার কথা, আমি এতদিন বিশ্বাস করি নি কুশীর কথা, মনে মাঝে মাঝে কত আঁধারের ছায়া জেগে উঠত ; আগে ভেবেছিলাম, আমার দোষে তুমি আমার ত্যাগ করলে, আজ দেখছি তা নয়, তোমারই দোষে আমার এই অবস্থা। তোমার দোষের মূলে আমার যে আছে, তাও আজ বুঝেছি ; জীবনের পথে অনেক কাঁটা—এবার সেই কাঁটার সমস্ত নষ্ট করতে হবে, অন্ধকার নিশির শেষ মুহূর্তে যখন সারানিশার সুখজাগরণের পর বাড়ী ফিরেছি, নিশুর নিশির ঘুম-জড়ান-ভাব তখন তাও অথবা ভাঙেনি—দেখেছি কি যেন লতার পাতায় ঘেরা জানলার ধারে অলস নরন, ক্লান্ত তরু জড়াতে জড়াতে কার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে ; সম্মুখে পদছায়া, দূরে পদশব্দ, সম্মুখে পিছনে অন্ধকার, দূরে উষার একটুখানি রেখা টানা—তার মাঝে শালতমালের মত অন্ধকার দীর্ঘছায়া : আজ বুঝতে পেরেছি, সে ছায়ার অর্থ কি ? ছায়া—ছায়া—ছায়ার পিছনে জীবন মনে ক'রে ছুটেছি—আজ ছায়া স'রে যাচ্ছে, চোখের ওপর থেকে সে যবনিকা আমার স'রে যাচ্ছে। নেশার ঘোর মনে ক'রে তখন ভুলে যেতাম, এক একবার পদছায়া বেধে সেই দীর্ঘছায়াকে জীবনের প্রত্যক্ষ মনে ক'রে ছুটে গিয়েছি—দেখেছি—আমার প্রাণের ভাই—যে আমার তার শিরার রক্তে জীবন দান করেছিল। নেশা—নেশার ভুল-দেখা মনে ক'রে সঙ্কচিত হলে স'রে গিয়েছি—কিন্তু আজ বুঝেছি ! তখন সেই দেখেছি—সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে, যেই সে পারের দাগে চেরেছি—পারের তলা থেকে যেন পৃথিবী খসে যেতে যেতে টলমল করেছে—তখন ভেবেছি, নেশার ; আজ বুঝেছি সে নেশার নয়। দীর্ঘদিনের হৃৎকপ্লের আজ অবসান হয়েছে—স্বপ্ন নয়—আর এখন এ স্বপ্ন নয় ; সত্যি সব সত্যি। হো ! হো ! সুরা ! সুরা ! যে সুরা একদিন মাদকতার টলটলায়মান করেছিল—আজ সেই সুরা আমার বল এনে ছিচ্ছে, অবস্থাবিভেদে মস্তিষ্কের এত প্রভেদ হয়—সমস্ত স্নায়ু আজ আমার বহুপরিকর করেছে, সিংহের মত শত বজ্র আর এ কৈপে উঠছে না। জেনো—সুরা ! সুরা ! হো ! হো ! যাতে টলটল দলমল করে, আজ তাই আমার বহুদূর ক'রে তুলেছে—আজ আর হাত কাঁপবে না—ছায়া—ছায়া—অন্ধকারের ভেতর অন্ধকারেরই ছায়া—অন্ধকার দীর্ঘ ক'রে সে ছায়ায়কে ধরতীর অন্ধকারে ঠেঁকে রেখে দিতে হবে—যেখানে সূর্যালোক কখন প্রবেশ করে না, যেখানে এ হৃদয়ের স্পন্দন পৃথিবীর নাড়ীতে গোপা যায় না, যেখানে এ বুকের রক্ত শিরায় শিরায় চলাচল করে না, যেখানে উত্তাপে—গুধু গলিত গরুর তরল অগ্নি প্রস্রবণে অণুপরমাণুকণার স্তরে স্তরে বয়ে যায়—যেখানে অগ্নির সমস্ত আলারানি এক জাগরায় জড় হয়ে

থাকে—দীর্ণ ক'রে বের হ'তে চায়—পারে না, সেই জালায় ভেতরে প্রেরণ করব। যেখানে এই পদচ্ছায়া অন্ধনের শক্তি রাখে না—যেখানে পদশব্দ দূর-শ্রুত স্মৃতিরও আভাস দেয় না—সেইখানে—নারী! নারী! সেইখানে অনন্ত সূর্য্যরদাহে ওই সেই হৃৎপিণ্ড উপড়ে সেইখানে আঁধার গহ্বরে রেখে আসব। আর সান্ত্বনা চাই নে, যন্ত্রণাই আমার মহাসুখ। সুরা! সুরা! কি মনোরম, কি গরম, কি এ অগ্নির লেলিহান শিখাই জালাতে পার! বালকে যেমন টুকটুকে গোলাপের পাপড়ি হু হাতে দিয়ে ছিঁড়ে মাটিতে রগড়ায় আর হাসে, এমনি ক'রে এ ফুল ছেঁড়ার তৃপ্তি লাভ ক'রে হাসব। সোনার কোটার শুকনো ফুলের রাশি আগুনে দিয়ে দেখব—কেমন ভস্ম হয়—সেই ভস্ম উড়ুরে হাওয়ার উড়িয়ে দিয়ে দেখব, গাছের পাতা-ঝরার সঙ্গে কেমন মানায়। কে চায় তোমারে, কে আর তোমারে চায়—আছে সুরা, আছে প্রাণ—চাল্ চাল্ প্রাণ, অগ্নিতে অগ্নি চাল্, সমস্ত বিশ্ব জ্বলে যাক! গ্রহ তারকা সূর্য্য চন্দ্র নভ হ'তে ধসে যাক, মহাপ্রলয়ের একাকার আশুক, সেই একাকারে তোমার ও বরাদ্দ ছিন্ন-ছিন্ন ক'রে বায়ুতে মিলায়ে দিই! নারী! পাপ রচনা করেছ—পাপের জালা গ্রহণ করেছ—বিশ্বের বিশ্বাসিত উপরে এক মহা জিনিস ছিল ক্ষমা—তা দান করতে পারতাম—তা হবে না, রক্ত—রক্ত—আপনার রক্ত আপনি চাই। রক্ত-মাংসের শরীর—রক্ত-মাংসের সম্পর্ক—রক্ত-মাংসের ঝঞ্ঝনায় বাজিয়ে—এ গানের শেষ করব। রক্তের তৃষ্ণা জেগেছে—শোণিত পান করবেই—চাই চাই—নিবৃত্তি চাই—তুষার শাস্তি চাই! হো! হো! সুরা! সুরা! চাল্ চাল্—ভেঙে ফেল এ হৃৎপিণ্ড। সৃষ্টি কর লোপ! ভাবছ এ সব মাদকতার উন্মাদ প্রলাপ।—না?—হা! হা! প্রলাপই প্রলয়ের সখা—মাস্তিকের মাঝে যা প্রলাপ, তাই সৃষ্টির পথে প্রকৃতির প্রলয়। একই কথা!

ওঃ, অসহ! অসহ! ভাই! ভাই! এই শিরায় তারি রক্তে বেঁচে রয়েছি। প্রাণ দিয়েছে—ভাই! ভাই! অসহ—অসহ এ নারী! প্রলয় ও প্রলাপ দুই সখা বড় ও ছোট ভাই। রক্ত নিশ্বাসে সমস্ত হৃদয়টাকে—হিরণ্যকশিপুর বিদীর্ণ হৃদয়ের মত রক্ত পান করতে হৃদয়টাকে দীর্ণ করতে ইচ্ছা হচ্ছে! অসহনীয়! অসহনীয়! হে অন্ধকার, তুমি আমার সহায় হও। হে প্রলয়ঙ্করী ভীমা নিশা, তুমি আমার অন্ধকারে সেই অন্ধকারের ছায়া দেখিয়ে নিয়ে চল। দেখি—আমার এ উন্মাদ প্রলাপ প্রলয় করতে পারে কি না। শোন নারী—ভাই ভাই নয়, স্ত্রী স্ত্রী নয়। প্রলাপ কাকে বলে—প্রলয় কাকে বলে—ওই দূর তারকার অলস্ত পদধ্বনি শুনে পাচ্ছি। বলছে, ওই মেঘে যে এমনি ক'রে আগুনের খেলা খেলে যা। চিরে চিরে বজ্রের মত বজ্রের জালা দিয়ে! কি মধুর! কি মনোরম! কি গরম এই সুরা! চাল্ চাল্, আগুন জমিয়ে নিয়ে

আমি। বড় তাজা আগুন জ্বলছে। প্রাণ এইবার ভাল করে আগুনের খেলা খেলুক। অনেক দিন অনেক সুখের আশায় ছুটেছি, এ আজ এ নূতন সুখ। এ আজ এক রক্তের নূতন আনন্দ—এ আর বন্ধ মানতে চায় না।—সুখ বড় মিঠা—তার যদি রক্তের রাঙা ছিটা থাকে—সকেন জ্বাকারসে যদি এক ফোঁটা রক্তের—বুকের রক্তের সংমিশ্রণ থাকে—তবে সে কি আনন্দ, কি মনোরম, কি মধুর, কি গরম এই সুখের স্রোত। দেখেছি, তার পায়ে শিরীষ ফুল ঝরে পড়েছে, সে পা সরিয়ে নিয়েছে, আমি নেশার ঘোরে মাড়িয়ে গিয়েছি—আজ বুঝেছি, ফুল কেন জানালা থেকে ঝরে পড়ে। আজ তাই আকাশের তারা-ফুলও ওপড়াতে চাই—ব্রহ্মাও একাকার করতে হবে! প্রলাপ এসেছে; নারী, তোমার জন্তে প্রলয় সৃষ্টি হবে কেন! তুমি এই প্রলাপ এনেছ, আমি সেই প্রলয় সৃষ্টি করব। দূর-দূরান্তরের জ্যোতিষ্ক—দূর-দূরান্তরের মানব—এ প্রলয়ের ভয়ে দূরে লুকাবে—অঁধার অঁধারের উপর রোল ক’রে গড়িয়ে যাবে। শুন্তে পাবে, অন্ধকারের পদশব্দ আলোকের উপর—অন্ধকার তোমায় মহা-তমাক্রকারে গ্রাস ক’রে নেবে। তখন বুঝবে, জীবনের যন্ত্রণা কেমন; তখন বুঝবে নারী—পুরুষের মন। ওহো! সুখ! সুখ! কি জ্ঞানই এনে দিয়েছে—অতীতের সমস্ত ছবিগুলো একখানার পর একখানা ক’রে ধ’রে দিচ্ছে—জলন্ত জীবন্ত! তাই বিষের পর অত হাসির মাঝে দেখেছিলাম তার, দুই ফোঁটা চোখের জল। তাই গভীর নিশীথে বাতি-নিভান অন্ধকার ঘরে জানালা হ’তে আকাশের পানে উদাসভাবে চাওয়া—সেখানে তারা পানে চেয়ে দুই ফোঁটা চোখের জল। তুমি চোখ দিয়ে চোখের জল কিনেছ, আমি রক্ত দিয়ে চোখের জল কিনেছি—কার দাম বেশী। মানুষের রক্ত-মাংসের শরীরে এ জলন্ত মনের হাটে কার দাম বেশী? চোখের জলের, না রক্তের জলের? সমস্ত ছিনিয়েই যখন আদান-প্রদান, তখন দাম চাই! হেনা বলেছে কি জ্ঞান, প্রাণের দাম প্রাণ, আচ্ছা; তাই চাই, তাই হবে। আজ এই চার বছর ধ’রে যে বই প্রকৃতি লিখেছিল, অকস্মাৎ তার একখানা পাতায় অনেক লেখা পড়া গেল—দেখলাম, যেন আগুন দিয়ে সব আগুনের মত জ্বলছে। প্রত্যেক পাতাটা প্রতি ফুলে—প্রতি ধূলিকণায় বলে দিচ্ছে, সংহার—সংহার! সংহারই মানুষের ধর্ম! সেই আমার এখন মূলমন্ত্র! জগৎ আমার ঠকিয়েছে—আমি পূর্ণনাজায় তার শোধ নেব। প্রকৃতি লিখেছে নারী কামনার ফাঁস। মর্মে শুধু মরণের ইকন সংগ্রহ ক’রে দেয়, কেবল প্রলাপ রচনা করে; সৃষ্টি নষ্ট করাই,—সংহারই পুরুষের ধর্ম। বাঃ বাঃ! এত দিন এ পাতাখানা কেন খুলিনি—দেখিনি বাঃ!

(কমল—সুখী)

অনেক দিন পরে তোমায় চিঠি লিখছি। তোমাকে সাশ্বনা দেবার তাই আমার আর কি আছে—দিলেই বা প্রাণ বুঝবে কেন? তবু বলতে হয়, যে গেছে, সে ত

আর কিবুবে না—তার জন্তে কীদি কেন, কেঁদে ত আর তাকে পাব না ; তবে কেঁদে কি হবে ? সে যখন স্বর্গে গেছে, তখন সে এ ধরার চির-নিরমের বীথার মাঝখান থেকে মুক্ত হ'তে পেরেছে, তার হৃৎকের নিবৃত্তি হয়েছে, তবে কীদি কেন ?—যার প্রাণ বোঝে না তাই কীদে । কীদলে যদি তাকে ফিরে পাওয়া যেত, তবে প্রাণ ভরে জন্মভোর কীদতায়—একবার তাকে ফিরে দেখবার আশায় । সে আশা কারো মেটে না—কেঁদে আর কি করুব । তবে নাড়ীর টান—এ কি কখন ছেঁড়া যায় গো !

ইন্দু দিদি বড়ই শোকাক্ত হয়ে পড়েছেন, পুত্রশোক, কার প্রাণে না শেল বাজে ? তবে বুক পেতে বাজ না নিতে পারলে আর কি হ'ল । জন্ম হ'লেই মরে—তবে কেউ বলে, সময় অসময় আছে । ওর আর সময় অসময় কি, সে লুকিয়ে চুপি চুপি আসে, জানিয়ে আসেও না, জানিয়ে যায়ও না । কি করুব, হাত ত নেই, হাত থাকলে কি কেউ সোনার পুতুল প্রাণ ধ'রে গঙ্গার ভাসিয়ে দিতে পারে ? এই হয়—এমনি ক'রে সবাই আসে, সবাই ভেসে যায় । হাত কোথায় বল ?

আমি তোমাদের ওখানে যেতে পারি নি, তার কারণ তোমায় ভেঙে বলতে হবে না । কি করুব, সেখানেও আমার হাত ছিল না—আমি দেখছি, সবই এক অনির্দিষ্ট পথে চলেছে—এ-কে ইচ্ছা দিয়ে সব সময় ফেরান যায় না । যদি ইচ্ছা জগতে সব করতে পারত, তবে তাকেও মোড় ফিরিয়ে দিতাম । তা হয় না । সীমার মানুষ, তার কাজও সীমাবদ্ধ । তবে দার্শনিকতা মমতাকে মুহুঁতে পারে না—মরা ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে পারে না ! বা যায় তা যায়, আমরা শুধু হায় ! হায় ! ক'রেই মরি । এ সংসারে আসি একা, বাই একা ; আসি উলঙ্গ, বাইও উলঙ্গ । তবে কার শোক । আসি যখন, তখন আগে ছিলাম ; বাই যখন, তখন পরেও থাকুব ;—সবাই তাই, তবে শোক করি কেন ? মিহির ছিল, এসেছে—মিহির গেছে—আছে, তবে তার জন্তে শোক কেন করি ? সকল শোকাক্ত সকল পরিশ্রান্ত, সকল ক্লান্ত নরন যেখানে মেহকোলে বিরাম শান্তি উপভোগ করে, পরিশ্রান্ত বালক পথ চ'লে যেতে কষ্ট হয়েছে, তাই সেইখানে গেছে ; আমরাও যখন পথ চ'লে যেতে বড় শ্রান্ত হব, তখন সেই মার কোলে গিয়ে শ্রান্তি দূর করুব, তবে শোক করি কেন ? সবাই ত এক জায়গায় যাব । তবে আর শোক কিসের ?

প্রতিক্রমেই ত দেখছি, এই যে রয়েছে, সে আর নেই—যারা ছিল, তারাও নেই, যারা আসবে, তারাও যাবে । আসে যায় । জানি না, এ আসা যাওয়ার পিছনে কি আছে, কে আসে, কেই বা যায় ; সে কে ? তা বুঝি নি । জীবনে তাই শান্তি মেলে না—তাই কীদি, তাই হৃৎক পাই—এ হৃৎকের শেষ করতে পারি নি । এত আঁকড়ে ধাকে ধাকে বুক ক'রে রেখেছিলাম—তাকে আগুনের কোলে সঁপে দিলাম—তখন

মনের ভিতর যে ভাব হয়েছিল, সে বর্ণনাতীত। বলেছিলাম অগ্নিকে—‘হে সর্বসুখ, তোমার ও জ্যোতির্শ্বর তপ্ত বাহু দ্বারা একে বুকে তুলে নাও। হে অগ্নি, যেখানে পিতৃগণ, জরা-মরণের অতীত হয়ে, সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে বিরাজ করছেন, এ বালককেও সেই অমরপ্রতিম রূপ দান কর; এও যেন সেই পিতৃগণের সঙ্গে নির্মল জ্যোতির্শ্বর ধাম প্রাপ্ত হয়।’ ফিরে এলাম, যেন জন্মজন্মান্তরের চেতনা—জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক আমার ভিতর দিয়ে তাকে পৌছতে লাগল। তুমি আমি, মায়ী, এ বিশ্বসংসার সবই অমনি ক’রে যাবে। তবে শোক কেন করি? জন্ম হ’লেই মৃত্যু—আগে আর পরে। ভাববার কথা—তবে কেমন ক’রে জন্ম-মৃত্যুর হাত হ’তে এড়াতে পারা যায়? সেই মানুষের শ্রেষ্ঠ কামনা। জানি না, এ মানুষ তা পারে কি না—যদি জন্ম-মৃত্যুর হাত হ’তে এড়াতে পারা যায়, তবেই হৃৎক বোঝে, নইলে ওই স্বর্গের কামনা—মনের প্রবোধ। হৃৎক-শোক—ভোলবার উপায়। জানি না সত্য কি! এখন দেখছি, ভাবনার কিছু হয় না। এ মহাকালের খেলা—সীমার মাঝে হাসি-কান্না থাকবেই থাকবে। হার মন! ঝরাপাতার ভালবাসায় এত মুগ্ধ হয়! এত তার টান! বা যুহুর্ন্তের, তার জন্তে এমন ক’রে মরি কেন? দার্শনিকতা নয় বন্ধু চাই—সত্য, তা না হ’লে জীবন জীবনই নয়। সত্যের মুখের পানে চোখ তুলে চাইতে সাহস হয় না, তাই এই সত্যে এত ভয়—নইলে মৃত্যু কি? সে সত্য, তাই তার পানে চাইতে ভয়। ভয় পেয়ে পেয়ে এমন হয়ে গেছি যে, মিথ্যা ভয়ে ভয় পাই। ভয়ও মিথ্যা, তা তুলে বাই। এমনি মোহের ভুলে ডুবে আছি। জন্ম হলেই হৃৎক—নইলে যেমন জন্ম, অমনি আঘাত, অমনি কান্না—এই ধরার যেখানে জন্মেই কঁদতে হয়, সেখানে ত চিরদিনই কঁদতে হবে। যখন হুমার, মাঝে মাঝে শিশু হাসে, মা তার সেই হাসি দেখে হাসে। ঘুমঘোরেই হাসি, স্বপ্নেই হাসি—স্বপ্নই সুখ, সুখই স্বপ্ন; তাই ধরার প্রত্যক্ষ সত্য কেলে স্বপ্নের ঘোরে অত ডুবে থাকি, তাই সত্যের কঠিন মুখের দিকে তাকাতে পারি নি—তাই কাপুরুষের দেশে বলতে শিখেছি, অপ্রিয় সত্য বল না—জীবনে, কর্মে, ভাবে, স্বপ্নেও তাই মিথ্যাকে আশ্রয় ক’রে চলেছি। এই ত কণিক জীবন। এই হৃৎক—হৃৎকনিবৃত্তির উপায় চাই; নইলে বার্থ নিষ্ফল ও মনুষ্য-জীবন। কান্নাই যে জীবনের সাক্ষী—সে জীবনে লাভ?

তুমি বলবে, ও গাঁজন গাঁজনতলার গাও—এখানে নয়। এখানেই হয়, তাই বলছি। যে দেহের মধ্যে আমি, সে দেহের মায়ী ত্যাগ করা বড় কঠিন। পুত্র নিজ দেহ হ’তে ভিন্ন নয়—তাই এত মায়ী, তাই এত কান্না। দেহ পেয়েই কঁদেছি, যত দেহ পাব, ততই কঁদব। একটা দেহে যদি এত কান্না হয়, যখন পুত্র-পৌত্র হবে, তখন ত আরও কঁদব। কান্না ত ফুরায় না—তাই খুঁজছি, তাই

ভাবছি, দেহ ছাড়া আর কিছু আছে কি না? কে সে আসে, কে সে যায় কে এমন উষার রঙে খেলা করে, কে এমন আঁধার মেঘে বজ্র হানে, কে এমন শোভন নীল আকাশ রচে, কে এমন ভয়ঙ্করী অমানিশার দিক্ ভুল করিয়ে দেয়। আবার কে এমন ছোট ছোট মনিমানিক্য ছড়িয়ে তারামালা পরে, ধ্রুবতারার টিপ কপালে দিবে, অকুল সমুদ্রে দিক্-হারা বাত্মীকে নীরব অঙ্গুলিতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। ভাবছি তাই, কে সে! তুমি আমি এ রহস্তে ডুবছি, উঠছি, ভাসছি; কে, সে যে আমাদের এমন হাসি-কান্নার মাঝে দোলায় ভাসায়, চুবন দেয়, আর এত বড় ছনিয়াটাকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখি—মুখে বাক্ সরে না, অবাক্ করিয়ে রেখে দেয়। আমার এখন মনে হয়, ও পরিশ্রান্তের শান্তি, ও ক্লান্ত নরনের ঘুম, ও সব আমাদের মনের রচা কথা। এ ছাড়িয়ে যদি যেতে পারি, তবেই যদি মেলে—জানি না, তারও ভরসা আছে কি না? অনেক দিন হ'ল যা গেছে, সে তখন আমি কত ছোট মনে পড়ে অথচ পড়ে না। তখন জানতাম না মৃত্যু কি—ছেলে মানুষের মন বিচার করে না। অত সব জিনিসের সঙ্গে বঁধন দিয়ে সে দেখতে শেখে না। যা সে দেখে, সবই ছাড়া ছাড়া—সবই তার কাছে সম্পূর্ণ—সে অত ধারার খবর রাখে না। শুধু যা হলেই তার হ'ল, তার পর দিন যায়, সংসারের সকলের সঙ্গে সে বঁধন দেয়, নিজেকে জড়াতে আরম্ভ করে। গাছপালা লতা-পাতা, পল্ল-পাখী, মানুষ সবার সঙ্গে তার নূতন নূতন গাঁথনি হয়; তার পর একদিন সেই বহুপূর্বের শিশু মুখ তুলে চায়—দেখে, সবই ওই রেখার মিলিয়ে যাচ্ছে, সবই দূরে, তখন সে বোঝে, জীবন-মরণের পারে কোথায় সে—কি সে—কে তাকে ডাকে, কে আসে যায়, কে ওই ফোটা ফুলে মধু গন্ধ, কে ওই ঝরা ফুলের শুকনো হাসি। জীবনের সন্ধ্যায় বখন রক্তরাগচ্ছটা ধীরে ধীরে মুছে আসে, জীবনের প্রথম পইঠার কঁদে সারা জীবন হাসি-কান্নার ভিতর দিয়ে এসে, শেষ পইঠায় এমন কান্না আসে—যা ভাবায় ফোটে না। চোখের জল তখন সব শুকিয়ে গেছে, শিরার রক্ত তখন অতি ক্ষীণ হয়ে চলেছে, তখনও খুঁজে মরি, কে—কে—কে—কোথায়? তখনও দেখে, নীরব অঙ্গুলি দেখাচ্ছে—পারে—পারে—পারে। তবে আর ভাবি কেন তাই, সবই পারে—পারে। তুমি বলবে, শেষ পইঠে এলে, তখন তো; শেষ পইঠে ত সবাই দাঁড়িয়ে ভাই! কে কখন বাবে, তার ঠিকানা ত নেই। শুধু ওই পারের দিকে সবাই চায়। শীগগির শীগগির সব সুখ সেরে নিতে সবাই চায়—সব দুঃখ তুলতে সবাই চায়। বৈতরিনীর তীরে সবাই দাঁড়িয়ে।—সবাই কেই দেখাচ্ছে পারে—পারে—নইলে চার বছরের শিশু, সেও পারে যার কেন?

ইতি তোমার কবল।

মায়ের ডাক

(১)

ঝিঝিঝিয়ে সাঁজের হাওয়া বইছে নদীর কূলে কূলে,
হাওয়ায় নাচে শাখাগুলি হাওয়ার সাথে ছলে ছলে ;
ফোটা ফুলের সুবাসে তায় উঠছে ভোরে' পরাগখান,
ওই শোনা যায় মনমাতানো দূরের গাছে পাখীর তান ।
এমন সময় নদীর ধারে “যেদিন সুনীল” কে গান গান,
নদীর জলের কুলুকুলু ধ্বনির সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণ !

(২)

জগন্মাতা মা আমাদের, খবর তাঁহার রাখি না তো,
কোথায় তিনি, কেমন তিনি, স্বরূপ তাঁহার জানি না তো ।
জানি না তো মা আমাদের আছেন সে কোন্ দীনের ঘরে,
জানি না তো দেখতে মাকে যেতে হবে কত দূরে ।
মায়ের আদর, ভায়ের স্নেহ, ভুলে গেছি অনেকদিন,
তাই বুঝি আজ কাঁদছে হিয়া—তাই বুঝি আজ শক্তিহীন ।

(৩)

সংসারেরি কোলাহলে, জগতেরি আন্দোলনে,
ভায়ের কথা গেছি ভুলে, মায়ের কথাও নেইকো মনে ।
আঁরাম তরে বিরাম তরে ব্যগ্র অতি আমরা আজ,
মোহের বশে, স্বেধের আশে, ফেলছি ঠেলে আসল কাজ ।
মায়ের বাণী শুনেও মোরা শুনতে কভু নাহি চাই,
ভুবিয়েছি সব বিন্মুতিতে অতীত সকল মহিমাই ।

নারায়ণ

(৪)

মরম তারে বারে বারে বাজছে বীণায় একটি সুর,
“পরকে ভালবাসতে শেখ—স্বার্থটারে কর না দূর।”
গভীর রবে সমান ভাবে বাজে সে সুর হৃদয়-মাঝে,
এখনো কি খেলাধূলা ? কপটতা আর কি সাজে ?
বোধনশব্দ উঠল বেজে, শুনিস্ না কি মায়ের ডাক ?
অকাজ যত জমাট আছে, ওরে অবোধ ! ফেলেই রাখ ।

(৫)

ওরে অবোধ আয় রে ছুটে, রুগ্ন কোথা ? শক্তি নিবি ?
শক্তিময়ী মা আমাদের, তাঁয় ছেড়ে আর কোথা যাবি ?
হাত বাড়িয়ে স্নেহভরে ডাকেন মাতা শোনুরে শোন,
দেশের কাজে দেশের কাজে দেরে সঁপে পরাণ মন ।
মায়ের স্নেহে উঠ'বি বেঁচে, মানুষ হবি মায়ের বরে,
মায়ের নামে মায়ের ছেলে কাজ কোরে যা এ সংসারে ।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ বি, এ ।

ভূতের বেগার

(১)

“মোলেম ভূতের বেগার খেটে ;
আমার কিছুই সম্বল নাই মা গের্টে ।”

শ্রাবণের মেঘমেঘর অপরাহুটা বড়ই নিরানন্দময় হইয়া উঠিয়াছিল। কিম্ব কিম্ব করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, ডোবার পাশে বেঙ ডাকিতেছিল, ঠাণ্ডা পূবে বাতাস বাঁশগাছের মাথা দোলাইয়া বহিয়া বাইতেছিল। এমনি সময়ে পরাণ বারিক ঘরের সামনে ছোট চালাটিতে বসিয়া, কৌচার খুঁটটা গায়ে জড়াইয়া শণের দড়ি কাটিতে কাটিতে আপন মনে গাহিতেছিল,—

“মোলেম ভূতের বেগার খেটে ;
আমার কিছুই সম্বল নাই মা গের্টে ।

নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে,
আমি দিন-মজুরী নিত্য করি পঞ্চভূতে খায় মা বেটে ।”

মোলেম ভূতের বেগার খেটে ।”

“আমি কার বেগার খাট্টি বারিক ?”

একটা ভাঙ্গা টোকা মাথায় দিয়া আহ্লাদী আসিয়া চালার উঠিল, এবং ভিজা কাপড়ের খুঁটটা নিঙ্ড়াইতে নিঙ্ড়াইতে সহাস্য বলিল, “আমি কার বেগার খাট্টি বারিক ?”

পরাণ বাঁ হাতে শণের আগা এবং ডান হাতে ঢেরাটা ধরিয়া, সহাস্য দৃষ্টিতে আহ্লাদীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “আমার ।”

ঠোট ফুলাইয়া আহ্লাদী বলিল, “ইস্, আমার বোয়ে গেছে তোর বেগার খাট্টিতে ।”

পরাণ হাসিয়া বলিল, “তবে বিষ্টিতে ভিজ ভিজ মত্তে এলি কেন ?”

আহ্লাদী বলিল, “মত্তে আসি নাই, তার এখনও দেবী আছে। তোকে বেগার খাট্টিতে এসেচি ।”

“তবু ভাল” বলিয়া পরাণ মুছ হাসিল, তার পর ঢেরার পাক দিয়া বলিল,
“বেগারটা কি রে আহ্লাদি ?”

“খুব শক্ত বেগার ; পারবি ?”

“আমি আবার না পারি কি ?”

“বিশেষ আমার জন্যে ।”

“কেন, তুই কি ?”

“তোমার আঁখির ঘরের মণিক ।”

“দূর পোড়ারমুখি ।”

আহ্লাদী টোকাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, “তবে চলুন ।”

পরান সে দিকে না চাহিয়া, দড়ি গুটাইতে গুটাইতে বলিল, “হা ।”

টোকাটা পুনরায় রাখিয়া আহ্লাদী বলিল, “বিষ্টিটা বড্ড চেপে এসেছে ।”

পরান বলিল, “তবে বোস্ ।”

আহ্লাদী বলিল, “কোথায় বসি ? তোমার ঘরে কি বসবার কিছু জায়গা আছে ?”

পরান খড়ের বিড়টা তাহার দিকে সরাইয়া দিল । আহ্লাদী সেটা পা দিয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, “তুই বোস্ । আমি কি খড়ের বিড়ের বসতে পারি ?”

ঈষৎ হাসিয়া পরান বলিল, “তোমার তরে রাজসিংহাসন চাই নাকি ?”

ঠোঁট ফুলাইয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে আহ্লাদী বলিল, “কপাল তোমার, আমাকে সিংহাসনে বসাবি । নিজে মরিস্ ছেঁড়া চেঁটার স্তরে ।”

“ছেঁড়া চেঁটাই আমার সিংহাসন ।”

“তোমার সিংহাসন তোমারি থাক্, আমি তার ভাগ চাই না ।”

“ভাগ চাইলেও আর পেলি কোথায় ? ভাগ তো পেয়েই ছিলি, কিন্তু বিধি যে—”

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই পরান একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল । আহ্লাদীর মুখখানা ভারী হইয়া আসিল । সে সরিয়া গিয়া হাত বাড়াইয়া ছাঁচার জল লইয়া উঠানে ছড়াইতে লাগিল । পরান জোরে জোরে ঢেয়ার পাক দিতে থাকিল ।

সহসা আহ্লাদী পরানের দিকে ফিরিয়া বলিল, “এমন বাদলার তামাক খাস্ না বে ?”

পরান বলিল, “কে সেজে দেয় ?”

আহ্লাদী ঘাড় নাড়িয়া, চোখ নাচাইয়া বলিল, “ইস্, বাবুকে আবার তামাক সেজে দিতে হবে ?”

মুখ টিপিয়া হাসিয়া পরান বলিল, “আমি কাউকে সেজে দিতে বলি নাই ।”

আহ্লাদী চুপ করিয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিল ; হাঁকার মাথা হইতে কলিকাটা খুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তামাক কোথায় ?”

পরান বলিল, “ঘরের ভিতর চোন্ধার আছে । উনানে আগুন না থাকে তো খড়ের নুঁচী পাকিয়ে—”

“ও সব আমার কাজ নয়” বলিয়া আহ্লাদী বিরক্তভাবে কলিকাটা ঠুকিয়া বসাইয়া দিল, এবং ব্যস্তভাবে টোকাটা তুলিয়া লইয়া উঠানে নামিল। ঈষৎ হাসিয়া পরাণ বলিল, “তোমার তো কাজ নয়, তা জানি, কিন্তু আমার কাজ কি, তা বললে গেলি না?”

আহ্লাদী কিরিয়া দাঁড়াইল; বলিল, “বলুবো আবার কি? ঘরে জল পড়ছে।”

পরাণ। কাল ভাতখাবার ছুটিতে এসে সেরে দেব। খড় আছে?

আহ্লাদী। না।

পরাণ। আচ্ছা, আমিই এক বোঝা নিয়ে যাব।

আহ্লাদী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “তা হ’লে ঐখানেই তো থাকি?”

পরাণ ব্যস্তভাবে বলিল, “না না, খেতে হবে না, আমি খেয়েই যাব।”

আহ্লাদী ভীতদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পরাণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তার পর চড়া গলায় বলিল, “তোমার যেতে হবে না। আমরা অন্য লোক দিয়ে ঘর সারাব, না পারি, জলে ডুব্বো, তোমার যেতে হবে না।”

আহ্লাদী দ্রুতপদে চলিয়া গেল। পরাণ ঢেরাটা ধরিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তার পর ঢেরার পাক দিতে দিতে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল,—

“মোলেম ভূতের বেগার খেটে;

আমার কিছুই সম্বল নাই মা গের্টে।”

(২)

পরাণকে বাস্তবিকই ভূতের বেগার খাটিতে হইতেছিল। সংসারে ভূতের বেগার অনেককেই খাটিতে হয়, কিন্তু পরাণের মত বেগার খাটিতে কাহাকেও হয় নাই। অন্ন-বরসে বাপ মারা গেলেও পরাণের কষ্ট পাইবার মত অবস্থা ছিল না। ছই পাঁচ বিঘা ধান-জমি ছিল, খেয়া ঘাটের জমা ছিল, তিন চারিটা পুকুর ভাগে দেওয়া ছিল। কিন্তু এই ভূতের বেগার খাটিতেই তাহার সব গেল, পাড়ার অপর সকলের মত দিন-মজুরী করিয়া তাহাকে দিন চালাইতে হইল।

কুক্ষণে পরাণ আহ্লাদীকে বিবাহ করিবার জন্য জেদ ধরিয়াছিল। বৃড়া পিসী অনেক বারণ করিয়াছিল, আহ্লাদীর চেয়ে খুব ভাল মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিল, কিন্তু পরাণ বৃড়ীর কথা শুনে নাই। সেই যে সে এক এক দিন শুক মধ্যাহ্নে খেয়া ঘাটে তালপাতার কুঁড়ের ভিতর পড়িয়া একা ঘুমাইত, আর আহ্লাদী চুপে চুপে গিয়া তাহার নাকে খড়ের ডগা গুঁজিয়া দিত, পায়ে শ্রুড়-শ্রুড়ি দিত, আর পরাণ উঠিয়া ধরিতে গেলেই কালো ঠোঁট ছ’টিতে মূহ হাসির তরঙ্গ তুলিয়া চকলপদে

ছুটয়া পলাইত, তাহার মাথার খাটো খাটো চুনগুলিতে বাতাসে চেঁটে খেলিতে থাকিত, কোন দিন শান্ত-শিষ্টে মেয়েটির মত গিরা তাহাকে তামাক সাজিয়া দিত, আবার কোন দিন বা তামাক সাজিতে বলিলে কলিকা আঁড়াইয়া, তামাক ছড়াইয়া, হাঁকা ফেলিয়া একটা কাণ্ড করিয়া বসিত, শেষে পরাণের হাতের চড় খাইয়া, চোখ রাঙাইয়া, ঠোঁট ফুলাইয়া তীব্রদৃষ্টিতে পরাণের দিকে চাহিয়া থাকিত। আর পরাণ বসিয়া মনে মনে একটা সঙ্কল্প আঁটিত।

তার পর বখন আহ্লাদীর বিবাহের কথা উঠিল, তখন পরাণ নিজেই উপবাচক হইয়া আহ্লাদীর পানিপ্রার্থী হইল; বুড়া পিসীদের নিষেধ, প্রতিবাদীদের বাধা কিছুই মানিল না।

তা আহ্লাদীর মায়ের ইহাতে কোন আপত্তি ছিল না। সে আশার অতিরিক্ত সাড়ে পাঁচ গুণ টাকা পণ চাহিয়া পরাণের মত ভাল ছেলের হাতে মেয়ে দিতে সহজেই রাজী হইল। বিবাহের পণ ঠিকঠাক হইয়া গেল। কিন্তু বত গোল বাধাইল তারিণী চৌধুরী।

সেই যে তিন বৎসর আগে চৌধুরী মহাশয় একটা মারপিটের মোকদ্দমার পরাণকে সাক্ষী মানিয়াছিলেন, কিন্তু পরাণ হলপ করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজি হয় নাই, তাঁহার মুখের উপর সাক্ষ জবাব দিয়া তাহাকে অপমানিত করিয়াছিল, সেই হইতে চৌধুরী মহাশয় এই পাজী ছোট লোকটাকে শিক্ষা দিবার জন্য সুযোগ অবেষণ করিতে-ছিলেন। তার পর বখন আহ্লাদীর সঙ্গে পরাণের বিবাহ হইতেছে তনিলেন, তখন তিনি আহ্লাদীর খুড়া বীৰকে ডাকাইয়া বলিলেন, “পরাণের সহিত আহ্লাদীর বিবাহ না দিয়া তাঁহার চাকর খুরীরাবের সহিত বিবাহ দিতে হইবে।” বীৰ ইহাতে মত দিতে পারিল না। কেন না, আহ্লাদীর বিবাহে তাহার মাতারই কর্তৃত্ব, বীরের তাহাতে কোন হাত নাই। একায়ে থাকিলেও অনেকটা হাত থাকিত। কিন্তু বড় ভাই বীৰ বাচিয়া থাকিতেই সে পৃথক হইয়াছিল।

চৌধুরী মহাশয় আদেশ দিলেন, “আহ্লাদীর মাকে বুঝিয়ে ঠিক কর।”

বীৰ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “সে বুঝবার মেয়ে নয় বড় কড়া।”

চৌধুরী মহাশয় রাগে আগুন হইয়া বলিলেন, “না বোঝে, মাগীকে ঘরে বন্ধ ক’রে ঘরে আগুন ধরিয়ে দাও।”

কিন্তু ইংরাজ-রাজত্ব কাহাকেও ঘরে বন্ধ করিয়া পোড়াইয়া মারা যে সহজ অপরাধ নয়, ইহা মামলাবাজ চৌধুরী মহাশয়ের অজ্ঞাত ছিল না, সুতরাং মুখে বলিলেও কানে তিনি এতটা করিতে পারিলেন না। তিনি বীৰকে লইয়া অল্প উপারের উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

উপায় উদ্ভাবিত হইল, কিন্তু বাহিরের লোকে তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। সেই দিন জানিল, যখন পরাণ বরবেশে ঘটের সম্মুখে বসিয়াছে, পুরোহিত ফুলের মালায় আহ্লাদীর হাতের সঙ্গে তাহার রোমাঞ্চিত হাতটা বাঁধিয়া দিয়া মন্তোচ্চারণ করিতেছেন, আর আহ্লাদীর মা সেই দুর্কচাৰ্য্য সংস্কৃত মন্ত্র কোনরূপে উচ্চারণ করিয়া বর কস্তার হস্তে কুণবারি নিক্ষেপ করিতেছে, সেই শুভ বাসরে, সেই নক্ষত্রময় মুহূর্ত্তে বেন ডাকাত আসিয়া পড়িল। দশ-পনেরো জন লোক উন্মত্তভাবে আসিয়া তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দিল। আহ্লাদীর মা চীৎকার করিয়া উঠিল এক জন তাহাকে টানিয়া আনিয়া মুখ চাপিয়া ধরিল; আর এক জন পরাণকে বরের আসন হইতে তুলিয়া দিয়া সেখানে খুদীরামকে বসাইয়া দিল। বীক আসিয়া সম্প্রদাতার আসনে বসিল। তার পর ভীতিকল্পিত পুরোহিতের মুখ হইতে সম্প্রদানের মন্ত্র উচ্চারিত না হইতেই জোরে জোরে শাঁক বাজিয়া উঠিল। খুদীরামের সহিত আহ্লাদীর বিবাহ হইয়া গেল।

উদ্ভেদিত পরাণ পরদিনই আদালতে গিয়া খুদীরাম ও চৌধুরী মহাশয়ের নামে নালিশ রুজু করিয়া দিল। মোকদ্দমা গ্রাহ্য এক বৎসর চলিল। পরাণের যাহা কিছু সম্বন্ধ ছিল, সব বাহির করিল, ধোরাবীর ধান বেচিল, জমি বাধা দিল, তথাপি মোকদ্দমায় জয়ী হইতে পারিল না। গ্রামে সাক্ষী-সাবুদ তেমন পাইল না। শেষ আশা ছিল পুরোহিতের উপর। কিন্তু তিনি যখন সাক্ষীর কাঁঠগড়ার দাঁড়াইয়া হলপ পড়িয়া বিপরীত কথা বলিতে লাগিলেন, তখন পরাণ মুখ নীচু করিয়া আদালতের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। হাকিমের রাগে খুদীরামের সঙ্গেই আহ্লাদীর বিবাহ সাব্যস্ত হইয়া গেল।

রাগের নকল লইয়া পরাণ উদ্ভ্রান্তচিত্তে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়াই গেল, আজ সকালে খুদীরামের মৃত্যু হইয়াছে। এখনও তাহার দাহ হয় নাই, আহ্লাদী ও আহ্লাদীর মার চীৎকারে পাড়ার লোক অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।

পরাণ গিয়া খুদীরামের দাহকার্য্যের ব্যবস্থা করিল।

(৩)

পরাণ কেবল খুদীরামের দাহকার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াই অব্যাহতি পাইল না, আহ্লাদীর ও আহ্লাদীর মারের পেট চলিবার ব্যবস্থাও তাহাকে করিতে হইল। তাহাদের তখন দিন-চালাইবার কোন উপায় ছিল না। খুদীরামের মৃত্যুর পর আহ্লাদীর মা পরাণের নিকট প্রস্তাব করিল যে, পরাণ আহ্লাদীকে লইয়া ঘর-সংসার

করুক, আসল বিবাহ তো তাহার সঙ্গেই হইয়াছে। পরাণ শুনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, “উহু, লোকে কি বলবে।”

তখন আহ্লাদীর মা দেবরকে গিয়া ধরিল; বলিল, “কি হবে ঠাকুরপো?”

বীক বলিল, “মেয়ের সাক্ষা দাও, আমি বর খুঁজে দিচ্ছি।”

আহ্লাদী শুনিয়া ঘুণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, “ছিঃ!”

যখন আর কোন উপায় নাই, তখন পরাণকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপায়বিধান করিতে হইল। সে আহ্লাদীর মাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, “ভয় কি, আমার একমুঠো জোটে তো তোমাদেরও জুটবে।”

পরাণ হুইটা পেট চালাইবার ভার লইল বটে, কিন্তু তখন তাহার নিজের পেট চালানই ভার হইয়া উঠিয়াছিল। জমার জমি সব গিয়াছিল, খাজনা বাকী পড়ায় থেরা ঘাটও অল্প লোকে ডাকিয়া লইয়াছিল; মোকদ্দমার সময় দেখা-শোনা করিতে না পারায় পুকুরের ভাগও ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। এখন শুধু দিন-মজুরীর উপর নির্ভর। এই দিন-মজুরীর উপর নির্ভর করিয়াই পরাণ স্বৈচ্ছায় আহ্লাদী ও আহ্লাদীর মায়ের ভার লইল।

বুড়া পিসী গজ-গজ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার গজ-গজানী পরাণকে বেশী দিন সহ্য করিতে হইল না। শীঘ্রই সংসারের অপর পার হইতে বুড়ীর ডাক আসিল। সে ডাকে বুড়ী চলিয়া গেল, পরাণও অব্যাহতি পাইল।

পরাণ বুড়ীর হাত হইতে অব্যাহতি পাইল বটে, কিন্তু আর একটা ভারী দারে ঠেকিল। আগে পরাণ খাটিয়া আসিয়া এক মুঠা তৈরী ভাত পাইত, এখন কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের পর ক্ষুধার হুঃসহ তাড়না চাপিয়া, রাঁধিয়া খাইতে হয়। সে যে কি নিদারুণ কষ্ট, তাহা পরাণ ছাড়া আর কেহ বুঝিতে পারে না। কোন দিন হাঁড়ি ভাঙ্গে, কোন দিন উনান জলে না, কোন দিন ভাত ধরিয়া যায়; আর অমল্লিষ্ট ক্ষুণ্ণীড়িত পরাণের চোখের জলে বুক ভাসিতে থাকে।

কোন দিন খাওয়া হইত, কোন দিন হইত না। কেবল খাওয়ার ব্যাঘাত নয়, ঘর-দ্বার অপরিষ্কার হইল, উঠানে ঘাস জন্মিল, ঘরে কি আছে না আছে, কিছুই ঠিক রহিল না। ছপুর-বেলা আসিয়া রান্না চাপাইয়া দেখিত, ঘরে মূণ নাই, সন্ধ্যা দিতে গিয়া দেখিত, ভাঁড়ে তেল নাই, জল খাইতে গিয়া দেখিত, কলসীতে জলা-ভাব। পরাণ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। আহ্লাদীর মা প্রস্তাব করিল, পরাণের হাত পোড়াইয়া খাইবার দরকার নাই, তাহাদের ঘরেই খাওয়া-দাওয়া করুক। পরাণ কিন্তু ইহাতে সন্মতি দিল না। আহ্লাদীর ইহাতে রাগ হইল, হুঃখ হইল, পরাণ তাহাতে অশ্রুপ করিল না।

আহ্লাদী কিন্তু রাগ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে মধ্যে মধ্যে আসিয়া পরাণের ঘর ঘর পরিষ্কার করিয়া দিখা যাইত, থালা-ঘটীগুলো নোংরা হইলে মাজিয়া দিত, পরাণের ফিরিতে বিলম্ব হইলে তাহার ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জালিয়া দিয়া যাইত। পরাণ ইহাতে আপত্তি করিলে আহ্লাদী বলিত, “তা হ’লে বারিক, তোর একটা পরসা যদি খাই, তবে আমি বাপের বেটীই নই।” অগত্যা পরাণ আর আপত্তি করিতে পারিত না।

লোকে বলিত, “পরাণ, বিয়ে কর।”

পরাণ উত্তর করিত, “নিজের পেট চলে না, বিয়ে ক’রে কি ক’রবো?”

লোকে বলিত, “নিজের পেট চলে না তো উপরি দুটো পেট চালাকিস্ কি ক’রে?”

পরাণ হাসিয়া উত্তর দিত, “কে কার চালায়; যে চালাবার সেই চালাচ্ছে।”

তাহার এই বিসদৃশ উত্তর শুনিয়া লোকে মুখ মুচকাইয়া হাসিত। আর পরাণ আপনার ছোট চালাটিতে খড়ের বিড়ার উপর বসিয়া আপন মনে গাহিত,—
“মোলেম ভূতের বেগার খেটে।”

(৪)

পরাণ বলিল, “আর ভাল লাগে না আহ্লাদী, তোকে সাঙ্গা করি আর।”

আহ্লাদী উঠান ঝাঁট দিতেছিল; সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সহান্তে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন বল দেখি?”

পরাণ বলিল, “কেন আবার কি? সাঙ্গা হ’লে ছুজনে মিলে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-ঘরকরা ক’রবো।”

আহ্লাদী হাতের ঝাঁটাটা মাটিতে ঠুকিতে ঠুকিতে মুখ নীচু করিয়া বলিল, “তোয় বড় কষ্ট হচ্ছে, না বারিক?”

পরাণ বলিল, “আমার কথা ছেড়ে দে, কিন্তু তোর এই বয়েস—”

আহ্লাদী ঝাড় উঁচু করিয়া রোষক্লক্কর্থে বলিল, “দেখ, মুখ সামলে কথা কইবি।”

পরাণ মুহূ হাসিল, আহ্লাদী জোরে জোরে উঠান ঝাঁট দিতে লাগিল।

পরাণ ডাকিল, “আহ্লাদী!”

আহ্লাদী মুখ না কিরাইয়াই উত্তর দিল, “কি?”

প। আমাদের বিয়েটা যদি সত্যি হতো?

আ। তা হ'লে কি হতো ?

প। তা হ'লে আজ তুই আমার কত আপনায়।

আ। এখন কি আমি পর ?

প। ঠিক পর না হ'লেও তবু তেমনটা নয়। মনে কর, তা হ'লে আজ আমাকে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হতো না, ঘর-দোরও এমন লক্ষীছাড়ার মত হয়ে থাকত না। তা হ'লে আমি খেটে খুটে আসতাম, তুই রেঁধে বেড়ে আমার কন্তে পথ চেয়ে ব'সে থাকতাম। আমি খেতে বসলে তুই কাছে ব'সে—

আহ্লাদী ঝাঁটাটা ফেলিয়া দিয়া ছই হাতে চোখ রগড়াইতে লাগিল। পরাণ জিজ্ঞাসা করিল, “চোখে কি হলো ?”

আহ্লাদী ভারী গলায় উত্তর করিল, “ধুলো উড়ে পড়লো। তোর উঠানে বে ধুলো !”

পরাণ দ্বিধা হাসিল ; বলিল, “সাথে কি বল্চি আহ্লাদি, সাজা করি আর।”

আহ্লাদী চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া তীব্র তিরস্কারের স্বরে বলিল, “আজকাল বুঝি তুই এই সব কুকথা ভাবিস ?”

পরাণ বলিল, “কুকথা নয় আহ্লাদি, খুব ভাল কথা।”

আহ্লাদী রাগিয়া ঘাড় দোলাইয়া বলিল, “তোর ভাল কথা তোরই থাক, তামাকে এ সব মাপিকপীরের গান শোনাতে আসিস কেন বল তো ?”

সহাস্ত্রে পরাণ বলিল, “তোকে শোনাবো না তো আর কাকে আমি শোনাব ?”

“ধমকে” বলিয়া আহ্লাদী মুখ ফিরাইয়া পুনরায় স্বকার্যে মনোনিবেশ করিল।

পরাণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার ডাকিল, “আহ্লাদি।”

আহ্লাদী উত্তর দিল না। পরাণ বলিল, “আচ্ছা আহ্লাদি, আমি যদি একটা বিয়ে করি ?”

আহ্লাদী বলিল, “তা হ'লে আমি পা ছড়িয়ে ব'সে কাঁদি।”

পরাণ। কিন্তু তুই সাজা করলে আমি হাসি।

আহ্লাদী। মাইরি ?

পরাণ। মাইরি।

আহ্লাদী। তবে তো আমাকে শীগ্গির একটা সাজা ক'রে দেখতে হবে।

পরাণ। সত্যি করবি ?

আহ্লাদী। সত্যিই করবো।

পরাণ। আমার দিবি ক'রে বল দেখি।

আহ্লাদী ঝাঁটাটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল ; ক্রোধ-কম্পিতকণ্ঠে বলিল, “এই রইলো তোমার কাজ । তোমার ঘরে যদি আর আসি—”

কথাটা শেষ না করিয়াই আহ্লাদী ছোরে ছোরে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল । পরাণ খুঁটি ঠেস দিয়া বসিয়া মুহু মুহু হাসিতে লাগিল ।

(৫)

পর্যাপ্ত দুই তিন দিন আহ্লাদীর দেখা পাইল না । ভাবিল, “আহ্লাদী রাগ ক’রেছে । তা করুক, তার রাগ বেশী দিন থাকবে না । আবার আপনিই ছুটে আসবে ।” কিন্তু চার পাঁচ দিনেও আহ্লাদী যখন একবারও দেখা দিল না, তখন পর্যাপ্ত নিজেই তাহার সহিত দেখা করিতে গেল । দেখা করিতে গিয়া সে দেখা পাইল না । তনিল, আহ্লাদী তারিণী চৌধুরীর বাড়ীতে ঝগড়ির কাজ লইয়াছে । সারাদিন সেখানে থাকে, রাত্রে ঘরে শুইতে আসে । পর্যাপ্ত ভাবিল, “এ আবার আহ্লাদীর কি খেয়াল !”

রাত্রিতে পর্যাপ্ত আসিয়া আহ্লাদীর সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং তাহার এই অদ্ভুত খেয়ালের কারণ কি জানিতে চাহিল । আহ্লাদী চড়া স্বরে স্পষ্ট কথায় তাহাকে জানাইয়া দিল যে, গতর থাকিতে সে কেন পরের রক্ত-ওঠা পরস্যা বসিয়া বসিয়া থাকিবে ? ইহাতে অর্থ হয়, পাঁচজনেও পাঁচ কথা বলে । ক্ষমতা থাকিতে সে কেন এমন অশ্রদ্ধা কাজ করিবে ? সে আর পরাণের পরস্যা থাকিবে না । পর্যাপ্তও যেন আর তাহাকে সাহায্য করিতে না আসে, তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখে ।

উত্তর শুনিয়া পর্যাপ্ত স্তম্ভিত হইল । সে বুকের ভিতর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া ফিরিয়া গেল ।

পর্যাপ্তের গৃহ অনেক দিন হইতেই শূন্য ; কিন্তু আজ যেন তাহার বড় বেশী বেশী শূন্য বোধ হইতে লাগিল । আজ তাহার চিরপরিচিত ঘরখানা যেন ঘরই নয়, যেন তাহা জনমানবশূন্য শুষ্ক অরণ্যানী । আজ আর সেখানে একটুও আশ্রয় নাই, একটুও আশ্রয় নাই, বিন্দুমাত্র সমতা নাই ; সব যেন একটা প্রলয়ের অগ্নিকাণ্ডে ভস্মভূত হইয়া গিয়াছে, শুধু তাহার ভস্মরূপের ভিতর হইতে একটা প্রচণ্ড উত্তাপ আসিয়া পর্যাপ্তের দীর্ঘ শুষ্ক বুকের কাছে বলসাইয়া দিতেছে ।

ঘরের ভিতর শুইয়া পর্যাপ্ত যেন হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল । সে উঠিয়া আসিয়া ভিজা চালার ধুলার উপর খড়ের বিড়টা মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িল । মেঘের গর্জন, বায়ুর হুহুকার, বৃষ্টির প্রচণ্ড তাণ্ডব, সকলই যেন তাহার নিকট স্বপ্নের একটা বিচিত্র দৃশ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ।

পরদিন পরাণের কল্প দিয়া জ্বর আসিল। জ্বরের সময় তৃষ্ণার প্রকোপে অধীর হইয়া পরাণ কঁাদিতে কঁাদিতে উঠিয়া কলসী হইতে জল গড়াইতে গেল; কিন্তু কলসীতে এক বিন্দুও জল ছিল না। পরাণ রাগিয়া কলসীটাকে মেঝের উপর আছাড় দিল। মাটির কলসী শত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া ছড়াইয়া পড়িল, কিন্তু তাহা হইতে এক বিন্দু জল বাহির হইল না। পরাণ আসিয়া পুনরায় শস্যার উপর শুইয়া পড়িল; আকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল, “একটু জল দে আহ্লাদি, একটু জল দে।”

আহ্লাদী তাহার সে চীৎকার শুনিতে পাইল না। প্রাণঘাতী তৃষ্ণার তীব্র বাতনার পরাণ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

রোগ-শস্যায় শুইয়া পরাণ প্রতিজ্ঞা করিল, “চুলোর যাক্ আহ্লাদী, ভাল হয়ে উঠে আগে বিয়ে করবো, তার পর অন্য কথা।”

রোগমুক্ত হইয়া পরাণ বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিল। একটি এগার বছরের মেয়ে পাওয়া গেল। পরাণ পণের ও বর-খরচার জন্য চিন্তামণি পালের হাতচিঠার ঢেরা সই দিয়া সাড়ে পাঁচ গুণা টাকার সংগ্রহ করিল।

(৬)

“কি হবে বারিক ?”

সে দিন বিবাহ। পরাণ একখানা হলুদমাখা নূতন আটহাতি কাপড় এবং গলায় এক ছড়া নূতন কাঠের মালা পরিয়া, খড়ের বিঁড়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছিল, এবং তামাক টানিতে টানিতে অনেক দিন আগেকার এমনই একটা ব্যগ্রতাপূর্ণ দিনের কথা বৃষ্টি মনে মনে ভাবিতেছিল। এমন সময় আহ্লাদী ধীরে ধীরে আসিয়া দাবার এক পাশে পা বুলাইয়া বসিল, এবং কঁাদ কঁাদ মুখে বলিল, “কি হবে বারিক ?”

পরাণ হাঁকা হইতে মুখ সরাইয়া আল্লাদীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি হয়েছে আহ্লাদি ?”

মুখ নীচু করিয়া আল্লাদী বলিল, “আমার পাপের প্রাচিতির হ’য়েছে।”

পরাণ বিস্মিত দৃষ্টিতে আল্লাদীর দিকে চাহিয়া রহিল। আহ্লাদী বলিল, “তারিণী বাবু আমাদের চাল কেটে তাড়িয়ে দেবে।”

হাঁকাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া পরাণ বলিল, “তোদের অপরাধ ?”

আহ্লাদী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “আমি তার কথার রাজি হই নাই।”

পরাণ জিজ্ঞাসা করিল, “কি কথা আহ্লাদি ?”

আহ্লাদী একবার ছল ছল চোখে পরাণের মুখের দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল পরাণ গর্জন করিয়া বলিল, “সে কি কথা ?”

আহ্লাদী চোখে আঁচল চাপা দিল ; অশ্রুঝঙ্কারে বলিল, “সে বড় মোংরা কথা বারিক, সে কথা আমি তোঁর সামনে—”

আহ্লাদী আর বলিতে পারিল না, কোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরাণ হাঁকাটা রাখিয়া দিয়া স্তম্ভভাবে বসিয়া রহিল।

বসিয়া বসিয়া পরাণ গম্ভীর স্বরে ডাকিল, “আহ্লাদী !”

আহ্লাদী মুখ তুলিয়া চাহিল। পরাণ বলিল, “তুই ছ’দিন আগে কেন বলিলি না আহ্লাদী ? আজ যে আমার বিয়ে।”

আহ্লাদী চূপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “আজ তোঁর বিয়ে ব’লে মনে ছিল না বারিক ! তবে আমি বাই।”

আহ্লাদী চলিয়া বাইতেছিল, পরাণ বলিল, “শোন।”

আহ্লাদী কিরিয়া দাঁড়াইল। পরাণ বলিল, “সাজা করবি ?”

আহ্লাদী দ্বিধা ব্রহ্মবরে বলিল, “কা’কে ? তোকে ?”

পরাণ। যাকে তোঁর ইচ্ছা।

আহ্লাদী। কেন বল দেখি ?

পরাণ। আমি তো ছ’টো সংসার চালাতে পারবো না।

আহ্লাদী তীব্র দৃষ্টিতে পরাণের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “না, তুই একটা সংসারেরই চেষ্টা দেখ্। আমার বরাতে যা আছে, তাই হবে।”

আহ্লাদীওঁর স্বরটা বেন অভিমানে জড়াইয়া আসিল। সে আর দাঁড়াইল না, মুখ ফিরাইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

পরাণ অনেকক্ষণ চূপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর উঠিয়া গলার মালা ছড়াটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল ; হলুদমাখা কাপড়খানা ছাড়িয়া একখানা পুরাতন কাপড় পরিল, এবং ঘরে চাবী দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সেই দিন নির্দিষ্ট পাত্রীর অশ্রু বরের সঙ্কিত বিবাহ হইয়া গেল। পরাণ চিন্তামণি পালের টাকাটা ফেরত দিয়া পুনরায় আগেকার মত মজুরী খাটিয়া দিন চালাইবার সঙ্কল্প করিল। কর্জের টাকার কিছু খরচ হইয়া গিয়াছিল। পরাণ স্থির করিল, এই টাকাটার যোগাড় করিয়া দেনার সমস্ত টাকা একেবারে ফেলিয়া দিবে।

সঙ্কল্প পূর্ণ করিবার আগেই পরাণ হঠাৎ এক দিন বদমায়েসী অজুহাতে পুলিশ কর্তৃক গৃহ হইল। গ্রামের অনেকেই তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। তারিণীবাবু নিজে আদালতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পরাণের বদমায়েসী সবন্ধে এমন কত কথা বলিলেন,

যাহা পরাণের কল্পনাতেও কখনও উদয় হয় নাই। সে সকল কথা শুনিয়া পরাণ তত্ত্বিত হইল। পরাণ তত্ত্বিত হইলেও হাকিম কিন্তু এমন সম্ভ্রান্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য অবিখ্যাস করিতে পারিলেন না। তিনি পরাণের আড়াই শত মুচলেখার তলব করিলেন; মুচলেখা দিতে না পারিলে দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড। পরাণ মুচলেখা দিতে পারিল না, জেলে গেল। তারিণী বাবু বাড়ী ফিরিয়া পাঠা কাটিয়া বিশালাক্ষীর পূজা দিলেন, এবং ছাগ-মাংস ও লুচী-সংযোগে পরিপাটীরূপে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দিলেন। আহাৰাস্তে ব্রাহ্মণগণ দীর্ঘ উদ্‌গারের সহিত তারিণী বাবুর প্রতি এমন সকল আশীর্ষচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, তারিণী বাবুর জীবনে তাহার শতাংশের একাংশ ফলিলেও যথেষ্ট হইত।

(৭)

দুই মাস পরে পরাণ বধন জেল হইতে খালাস পাইয়া বাড়ীতে ফিরিল, তখন আহলাদী তাহার কাছে আসিয়া সঙ্কুচিতভাবে বলিল, “সব শুনেছিষ্ বারিক !”

পরাণ উত্তর করিল, “শুনেছি।”

আহলাদী মুখ নীচু করিয়া পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, “হুখ্য করিস্ না বারিক, দারে পড়েই—”

মান হাসি হাসিয়া পরাণ বলিল, “দারে পড়েই হোক আর ইচ্ছা করেই হোক, সাক্ষ্য ক’রে খুব ভাল ক’রেছিষ্ আহলাদি। আর কোন বেটা বেটা একটা কথা বলতে পারবে না।”

একটু থামিয়া পরাণ বলিল, “সে দিন আদালতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারিণীবাবু যে সব কথা বললে; ছি ছি, ও ভদ্র লোক না ছোট লোক? এমনি তখন ইচ্ছে হলো—”

আহলাদী বলিল, “ও ভদ্র লোক না হাড়ী। তুই জেলে যাবার পর এক দিন রেতের বেলায় বাড়ী চড়াও হ’রে যে কাণ্ডটা ক’রেছিল, ভাগ্যে ভাগ্যে বঁটখানা হাতের কাছে ছিল, তাইতেই রক্ষা। তার পরই ধর্ম্ম রাখবার জন্তে এই কাজ ক’রে ফেলেছি বারিক !”

পরাণ শুন্ম হইয়া বসিয়া ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। সেই দিন গভীর রাত্রিতে একটা বিকট কোলাহলে পরাণের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে উঠিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া বাহিরে আসিল। আসিয়া দেখিল, কারেত-পাড়ার দিক্ হইতে অগ্নির

লেগিহমান প্রচণ্ড শিখা উখিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিয়াছে। পরাণ উর্দ্ধ্বাসে সেই দিকে ছুটিল।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া পরাণ দেখিল, তারিণীবাবুর বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। বড় ঘরের চালুটা ধু ধু শব্দে জলিতেছে, চালের বাশ-কাঠ জলিতে জলিতে ফট্ ফট্ শব্দে ফাটিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ফুলিসরাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, গৌ গৌ শব্দে পর্জ্বন করিয়া অগ্নি বিগুণ বেগে জলিয়া উঠিতেছে।

বাহিরে অনেক লোক জমিয়াছে। তাহাদের মধ্যে তারিণীবাবু মাথায় হাত চাপ্ড়াইয়া পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া চীৎকার করিতেছে, “ওরে, আমার বাক্সটা এনে দে। পাঁচ শো টাকা দেব, আমার বাক্সটা এনে দে, আমার দলীলপত্র সব যায় রে।”

পরাণ একবার তাঁহার দিকে জলন্ত দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিয়া, গৌ ভঃর বাড়ীর ভিতর—প্রজ্বলিত বহিস্তূপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

অল্পক্ষণ পরে কে একজন বাক্সটা তারিণীবাবুর পায়ের কাছে আছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া জনতার মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাহা কেহই ঠিক লক্ষ্য করিতে পারিল না।

পরদিন তারিণীবাবু লোকের কাছে বলিতে লাগিলেন, “এ পরাণ বারিকের কাজ। বেটা কাল জেল থেকে খালাস পেয়ে এসে, রাগে আমার ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কি বলবো, সাক্ষী-সাবুদ নাই, নইলে বেটাকে ফের জেলে পুরে দিতাম।”

পরাণ লোকের মুখে কথাটা শুনিয়া মুহূ হাসিল, কোন প্রতিবাদ করিল না। সে পূর্ববৎ আপনার ছোট চালাটিতে বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে গুণ গুণ করে গাহিতে লাগিল,—

“মোলেম ভূতের বেগার খেটে ;

আমার কিছুই সম্বল নাই কো গোটে।”

ত্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শিশির-বিন্দু

১

ওহে নব শ্যাম দুর্বা
কি মহান্ তব প্রাণ,
পতিতা আমাকে তুমি
বুকেতে দিয়েছ স্থান ।

২

নিজেকে ভাবিনি ছোট
ধরাকে জেনেছি সরা
সুগন্ধ বহিয়া বায়ু
রাখিয়াছে মাতোয়ারা ।

৩

গরবের পরিণাম
পতন পিছনে প্রভু,
আছে যে গো লুকাইয়ে
সে কথা ভাবিনি কভু ।

৪

তৃষাতুরে কোন দিন
দিইনি হৃদয়-বারি,
সেকালি-পতন দেখি
করেছি আনন্দ ভারি ।

৫

তার পর এ কি দেখি
রাখিতে নারিল কেহ,
ছাড়িতে হইল সাথী
মান গর্ব মায়া স্নেহ ।

৬

সারাটি জীবনে প্রভু
তোমারে ভাবিনি আমি
আজি শুখাবার বেলা
তবু বন্ধে নিলে তুমি ।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ পণ্ডিত ।

প্রাচীন রাজগৃহ

পঞ্চ-পর্ষত-বেষ্টিত প্রাচীন রাজগৃহ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। আনুমান্য পাঁচ শত পূর্ব খৃষ্টাব্দে মগধরাজগণ কর্তৃক ইহা রাজধানীরূপে পরিত্যক্ত হয়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান * যখন রাজগৃহে আসিয়াছিলেন, তখন ইহা একেবারে জনশূন্য ছিল। কিন্তু ফা-হিয়ান ও অন্ততম পরিব্রাজক হিউয়েন-সিয়াং এই পঞ্চ-পর্ষত-বেষ্টিত স্থানকেই রাজাবিহিসারের প্রাচীন নগর বলিয়া পরিগণিত করেন এবং উভয়েই ইহার অভ্যন্তরে, অথবা ইহার সহিত বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট চারিটি স্তূপ দর্শন করেন। এই চারিটি স্তূপ বুদ্ধদেবের জীবনের চারিটি ঘটনার চিত্ররূপ নির্মিত হইয়াছিল। সংক্ষেপে এই চারিটিকে নিম্নোক্ত ভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে;—(১) রাজপ্রাসাদের উত্তর-দ্বারের বহির্দেশে যে স্থানে অজাতশত্রু মদোদ্রস্ত হস্তীকে † মুক্ত করিয়াছিলেন, (২) ইহারই উত্তর-পূর্বে যে স্থানে সারিপুত্র ‡ অশ্বজিৎকে ধর্মপ্রচারে ব্রতী দেখিয়াছিলেন, (৩) উত্তরে, অনতিদূরে সুগভীর গর্ভ বা পয়ঃপ্রণালী নিকটে, যে স্থানে শ্রীশূণ্ডের অধিকৃত অবস্থিত ছিল এবং (৪) ইহার উত্তর-পূর্বে নগর-প্রাচীর যে স্থানে বক্র হইয়াছে, তথায় জীবকের § ধর্মপ্রচারার্থ কক্ষের নিদর্শন।

* ‘সমসাময়িক ভারত’ অষ্টম খণ্ড ৯৩ পৃষ্ঠা।

† বুদ্ধকে সংহারার্থ মগধরাজ অজাতশত্রু মদোদ্রস্ত হস্তী প্রেরণ করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন।

‡ বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য। সারিপুত্র নালন্দায় বাস করিতেন। সারিপুত্রের নির্বাণলাভ হইলে বুদ্ধের অন্ততম শিষ্য অনাথপিণ্ডন তথাগতের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক সারিপুত্রের দেহের ভস্মাবশেষ লইয়া উহার উপর প্রাবৃত্তিতে এক স্তূপ নির্মাণ করেন। সারিপুত্র তথাগতের দক্ষিণদিকে বসিতেন বলিয়া দক্ষিণহস্ত প্রাবণ নামে অভিহিত হইতেন। ‘সমসাময়িক ভারত,’ অষ্টম খণ্ড ৪৭, ৯০, ৯৫ ও ১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

§ বিহিসারের পুত্র অভয়ের ঔরসে ও কোন নগরশোভিনীর গর্ভে রাজগৃহে জীবকের জন্ম হয়। জীবক তক্ষশিলার আয়ুর্কোষে অধ্যয়ন করেন। পরে রাজগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া নরপতি বিহিসারের কোন ছশ্চিকিৎস রোগ মুক্ত করেন। এক সময়ে বুদ্ধের আশাশয় রোগ জন্মে। জীবক একটি পদ্মের মধ্যে ঔষধ রাখিয়া ঐ

উল্লিখিত কোন স্থানই এবাবৎ নির্দিষ্ট হয় নাই। প্রাচীন নগর-বেষ্টনকারী প্রাচীর এক্ষণেও যথেষ্ট পরিমাণে অবশিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু এই প্রাচীর-বেষ্টিত স্থান বর্তমানে নিবিড় বনভূমি-পূর্ণ। বস্তুতঃ পক্ষে প্রাচীরের মধ্যস্থলে অবস্থিত মনিয়ার-মঠ নামে পরিচিত স্থান ব্যতীত আর কিছুই বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

সকল পর্যটকই স্বীকার করিয়াছেন যে, এই স্থানে একটি সুপ্রাচীন নগর অবস্থিত ছিল, কিন্তু কেহই সুনিশ্চিতভাবে করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। ডাক্তার বুকানান * নামক সুপ্রতিষ্ঠিত পর্যটক রাজগৃহে ১৮১২ সালের ১৮ই হইতে ২০ শে জানুয়ারী অতিবাহিত করেন। ছুঃখের বিষয়, মন্টোগোমারী মার্টিন এই পুস্তক-সম্পাদনকালে এই অংশ পরিহার করেন। ফলে মুদ্রিত পুস্তকে বুকানান-লিখিত রাজগৃহের বর্ণনার স্বরাংশমাত্রই মুদ্রিত হইয়াছে। “India Office Library”তে বুকানানের সমগ্র পাণ্ডুলিপি আছে। ইহাতে দৃষ্ট হয় যে, বুকানানের পর্যটনকালে নিকটবর্তী অধিবাসিবৃন্দ প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানকে “হংসপুর নগর” নামে অভিহিত করিত এবং তাহার মনে করিত যে, প্রাচীনকালে এই স্থানে এক বৃহৎ নগর ছিল। তথাপি বুকানান তাহার যে সকল সহকারীদিগকে “মনিয়ার মঠ” অনুসন্ধান করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের রিপোর্ট অনুযায়ী এই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, “নগরের আকারের সামান্য নিদর্শন বা নগরের উপযোগী বিন্দুমাত্র চিহ্নও পরিদৃষ্ট হয় না। ইহার চতুর্দিকই শুধু পর্বতমালা। এই স্থানকে বাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী করিয়াছে এবং ইহাও একরূপ সর্ববাদিসম্মত যে, ভারতবর্ষে এই সকল স্থান সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।”

পদ্মটি বুদ্ধকে ভিক্ষণ করিতে দেন এবং ইহাতেই বুদ্ধ ব্যাধিমুক্ত হন। তথাগতের বুদ্ধজন্মাত্তের বিংশতি বর্ষ পরে জীবক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বুদ্ধকে প্রত্যহ তিনবার দেখিতে পাইবেন আশার স্বীয় উদ্ভানে একটি বিহার নির্মাণ করেন। ঐ বিহার তিনি বুদ্ধকে প্রদান করিয়াছিলেন।

* ১৮০৭ সালে গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশের কতকাংশ জরীপ করিবার উদ্দেশ্যে ডাঃ জালিস্ বুকানান নামক এক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। বুকানান পরে বুকানান হার্মিটন্ নামগ্রহণ করিয়াছিলেন। জরীপের সঙ্গে সঙ্গে বুকানান ঐ সকল স্থানের অধিবাসী, ভূভাগের উৎপন্ন জব্য, সামাজিক আচার-ব্যবহার, ধর্ম প্রভৃতি সকল বিষয়েরই তথ্যানুসন্ধান করিয়া এক সুবৃহৎ পাণ্ডুলিপি লিপিবদ্ধ করেন। ১৮১৬ সালে এই পাণ্ডুলিপি বিলাতে পৌছে এবং ইহার সম্পাদনভার মন্টোগোমারী মার্টিনের উপর স্তত হয়। মার্টিন যেরূপা অনুযায়ী “ছাঁটি-কাটি” করিয়া “Eastern India” নাম দিয়া পাণ্ডুলিপির কতকাংশ প্রকাশিত করেন। এই Eastern India বহু মূল্যবান পুস্তক ও অত্যন্ত ছাপা।

যদি ডাক্তার বুকানান্ ছানিটন এই স্থান অন্বেষণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহেই স্বীয় মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইতেন। প্রাচীন গৃহাদির প্রস্তর-ভিত্তি এক্ষণেও বহুস্থানে দৃষ্ট হয় এবং বর্তমান রাজগৃহ গ্রামের রাজপথের উত্তরদিকে এই সকল চিহ্ন প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুকানানের উল্লিখিত পাণ্ডুলিপি পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি স্বয়ং পর্কত-বেষ্টিত স্থানে গমন করেন নাই; কেবল তিনি “সোন্ ভাওয়ার” গুহা এবং উক্ত প্রস্তরবণের সন্নিকটস্থ বিপুর ও বৈভার গিরিধর মাত্র দেখিয়াছিলেন।

১৮৪৭ সালে কাপ্তেন কিট্টো * (Captain Kittoe) উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঐ স্থানকে স্থানীয় লোকে “হংসতোর” বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু, বর্তমানে এই নাম ও বুকানান্-লিখিত “হংসপুর” বিস্মৃতি-গর্ভে গিয়াছে। গিরিরক স্তূপের উর্দ্ধস্থ যে স্তূপকে কানিংহাম + হিউয়েন-সিয়াং-কথিত “হংসস্তূপ” বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহার সহিত এই দুইটি নামের বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। পরলোকগত ডাক্তার ব্রক ‡ কয়েক বৎসর রাজগৃহ-পরিদর্শন-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মতে পর্কত-বেষ্টিত উপত্যকার নগরে সকল সময়ে লোকে বাস করিত না; কেবল বিপদকালেই ইহা ব্যবহৃত হইত।

প্রত্নতত্ত্ববিভাগ হইতে ১৯০৫ সালে একটি মানচিত্র প্রকাশিত হয়। ইহা দুর্লভ হইলেও আমরা ইহার একটি প্রতিলিপি প্রদান করিতেছি। ইহাতে প্রাচীন রাজগৃহের চতুর্দিকস্থ প্রাচীরাদি প্রদত্ত হইয়াছে। নিবিড় অরণ্যাবী-পূর্ণ বলিয়া অভ্যন্তরস্থ প্রাচীন নগরের চিত্র-প্রদান সম্ভবপর হয় নাই। কয়েক বৎসর বাবৎ পাটনাকলেজের অধ্যক্ষ, সুবিখ্যাত, প্রত্নতত্ত্ববিৎ জ্যাক্সন্ এই অরণ্য-বেষ্টিত স্থান অন্বেষণে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, এবং তিনি ১৯১৩—১৪ সালে প্রত্নতত্ত্ববিভাগ হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া নিজব্যয়ে এই স্থান জরীপও করিয়াছেন। খনন (Excavation) ব্যতীত যতদূর সম্ভব, প্রায় সকল স্থানই জ্যাক্সন্ সাহেব নির্ণয় করিয়াছেন। অবশ্য, খনন ব্যতীত এই সকল স্থানসম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ, মৃত্তিকার উপরে অবস্থিত প্রাচীরের ভিত্তিগুলি প্রাচীন নগরেরই অংশভূত বা আধুনিক, তাহা সুনিশ্চিতরূপে বলা যায় না এবং অশুদ্ধ এই শ্রেণীর ভিত্তিগুলি বেক্সপে প্রোধিত, তাহাতে এই সম্বন্ধের সঠিক কোন

• প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অগ্রতম সুপ্রতিষ্ঠিত কক্ষচারী।

+ সেনাপতি কানিংহাম—প্রত্নতত্ত্ববিভাগের “আদিপুরুষ।” ইহার “ভারত-বর্ষের প্রাচীন ভূগোল” ও প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় রিপোর্টগুলি পুরাতন হইলেও বহু মূল্যবান।

‡ অগ্রতম প্রত্নতত্ত্ববিৎ।

নির্দেশ করিতে যথেষ্ট সন্দেহ উদ্ভূত করে। পক্ষান্তরে, ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, পরীক্ষিত স্থানের দক্ষিণদিকে যুক্তি অধিক পুঙ্খভূত হয় নাই। প্রমাণ-স্বরূপ ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অনেক স্থলেই ভূগর্ভস্থ পর্বতভূমির অত্যন্ত সরিকটে অবস্থিত এবং কোন কোন স্থলে ইহা সমতল ভূমির উপরেও দেখা দিয়াছে।

যে মানচিত্র আমরা প্রদান করিলাম, তদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত স্থানগুলির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারিবে।

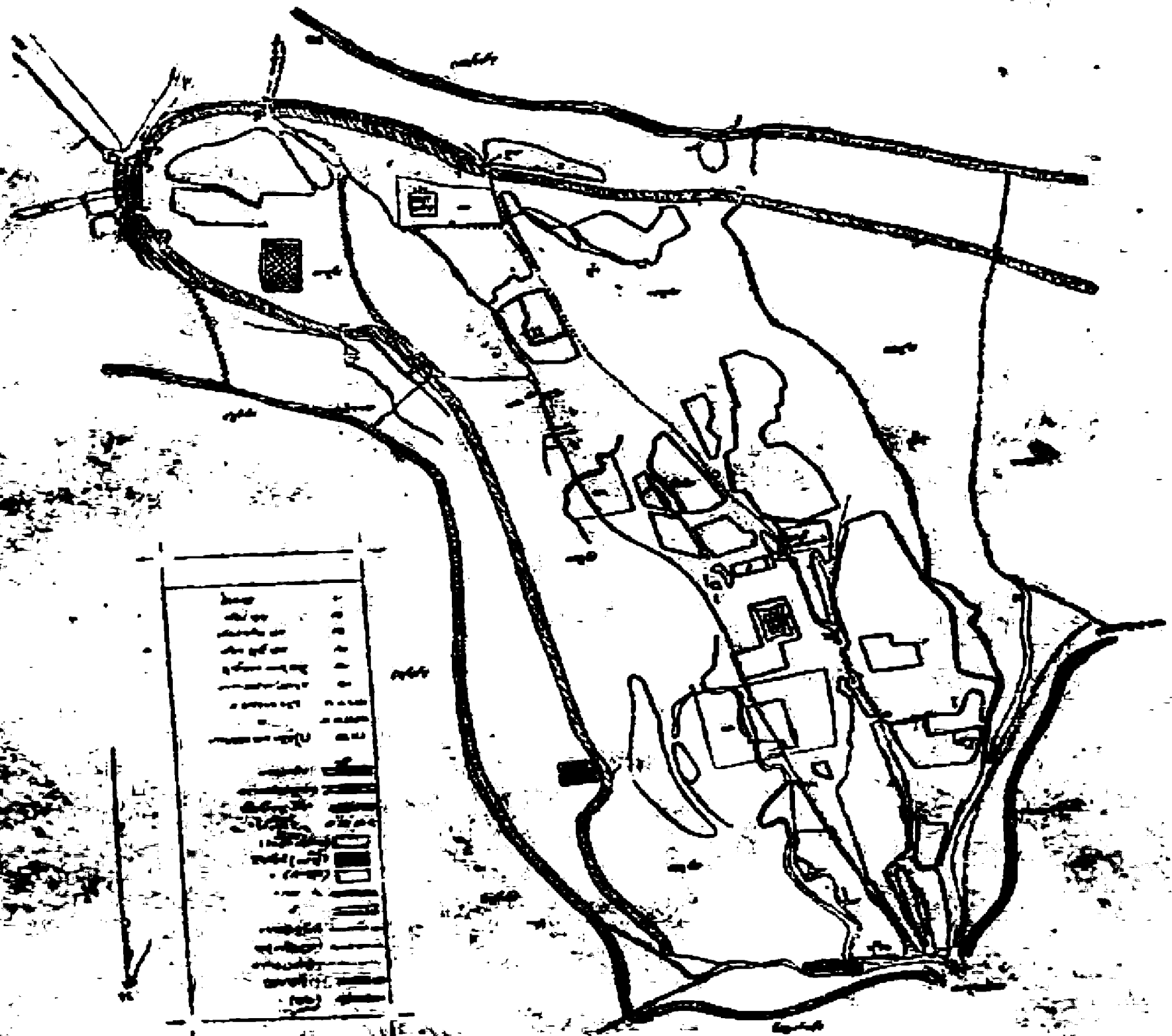
(১) বহির্দেশস্থ প্রাচীর ও দ্বারসমূহ—প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন রাজগৃহের উত্তর-দিকস্থ প্রাচীর বর্তমানে আর নাই—অন্ততঃ ইহা সকল স্থলে দৃষ্ট হয় না। রত্নগিরি ও বিপুরগিরিমধ্যস্থ বর্ষাকালের নদীদ্বারা এই প্রাচীর দূরীভূত হইয়াছে। যে কয়েকটি ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাও ক্ষতবেগে লোকচক্ষুর অন্তরালে গমন করিতেছে। ১৯১৩ সালের অত্যধিক বৃষ্টি প্রাচীরগুলির অত্যন্ত ছুঁদশা করিয়াছে। ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসেও যে প্রাচীরের পূর্বাংশ দেখা গিয়াছিল, তাহাও এই বন-বৃষ্টিতে ধোঁত হইয়া গিয়াছে এবং পশ্চিমদিকেরও অনেকখানি “ধসিয়া গিয়াছে।” ইহার কলে ১৯১২ সালে দৃষ্ট দুইটি স্তম্ভ (খুঁটা) ঢাকিয়া গিয়াছে। এই দুইটি স্তম্ভ যে সুপ্রাচীন, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়।

নগরের উত্তরপশ্চিম কোণের মন্দির-স্তূপের পূর্বদিকে প্রায় ৫০ ফীট দূরে প্রাচীন রাজগৃহের উত্তর-দ্বার ছিল।

সোন্তাণ্ডার * পর্য্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিম-প্রাচীরও লুপ্ত হইয়াছে। দক্ষিণ-বাহিনী সরস্বতীনদীর শাখাই ইহার কারণ। এক্ষণে আর পশ্চিম-দ্বারের কোন নিদর্শনই দৃষ্ট হয় না। এই পশ্চিম-প্রাচীরের অবশিষ্টাংশ এবং দক্ষিণ ও পূর্বদিকস্থ প্রাচীর-দ্বয় সম্পূর্ণরূপেই অতীত কালের চিহ্নস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

দক্ষিণদিকস্থ প্রাচীরই সর্বোচ্চ—উপত্যকা হইতে ইহা ৩০, কোন কোন স্থানে ৪০ ফীট উচ্চ। এই প্রাচীরে তিনটি সুনির্দিষ্ট ছিদ্র দৃষ্ট হয় এবং এই তিন স্থানেই প্রাচীন রাজপথের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সোণাগিরি হইতে সোন্তাণ্ডার পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত বাজিগণের ব্যবহৃত পথ ইহারই একটি ছিদ্র হইতে বহির্গত হইয়াছে। চিত্রে ইহা ৩ নং বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। সম্ভবতঃ জেতবনে যাইবার ইহাই দক্ষিণ-পশ্চিম দ্বার ছিল। এই প্রাচীরের মধ্যস্থলে আরও একটি ছিদ্র আছে এবং নগরের দক্ষিণ-দ্বার বতদূর অনুমিত হয়, এই স্থানেই ছিল। বাণগঙ্গা নদী হইতে

* কেহ কেহ অনুমান করেন যে, রাজগৃহস্থ সঙ্ঘীতির এই গুহার অধিবেশন হইয়াছিল।



প্রাচীন রাজগহ

৮৮৩ পৃষ্ঠা

একটি পথ স্পষ্টরূপে নির্ধারণ করা যায়। ইহা মনিয়ার মঠের পূর্বপ্রাচীর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এই স্থান মানচিত্রে ... করিয়া চিহ্নিত হইয়াছে এবং ইহা অনেকটা সঠিক-রূপে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহা প্রধান রাজপথ ছিল।

আরও পূর্বদিকে (যে স্থান হইতে রাজগৃহের বর্তমান পথ দৃষ্ট হয়) আর একটি ছিদ্র দৃষ্ট হয়। পূর্বে ধারণা ছিল যে, এই ছিদ্র আধুনিক। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, এই স্থানেও প্রাচীনকালে একটি দ্বার ছিল এবং ইহার মধ্য দিয়া যে রাস্তা আছে, বর্তমানে বাহ্মিণ রত্নগিরি আরোহণে যে রাস্তা ব্যবহার করে, বিশেষ তাহার সাহিত ঐক্য আছে।

এই প্রাচীরে আরও একটি ছিদ্র আছে। মানচিত্রে ইহাকে ৬ বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া বর্তমানে সোনাগিরি হইতে নির্গত একটি ধারা প্রবাহিত হইতেছে। এই ছিদ্রটি দ্বারনির্দেশক কি না, বলা যায় না; ইহার অব্যবহিত দক্ষিণে একটি পথ রহিয়াছে; এই পথ পূর্বতের উপরও উঠিয়াছে এবং ইহার সমতল ক্ষেত্রে স্তূপের ও দুর্গাদির ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে।

নগরের পূর্বদিকস্থ প্রাচীর দর্শনীয় অবস্থায় রহিয়াছে এবং জ্যাক্সন সাহেব অনেক জল পরিষ্কার করিয়া এই প্রাচীর পরিদর্শন-যোগ্য করিয়াছেন। এতদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, উদয়গিরি হইতে বিস্তৃত বাধই পূর্বে নগরপ্রাচীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং নগর-প্রাচীরের বহির্দেশস্থ কোন পরিখা দ্বারা গিরিয়ক উপত্যকার জলনিষ্কাশন হইত। স্থান দৃষ্টে মনে হয় যে, এই পরিখা উত্তর-বাহিনী ছিল। পরিখার প্রথম ছয় শত হাত পূর্বত খনন করিয়া নিশ্চিত হইয়াছিল এবং ইহা ১৫ হইতে ২০ ফিট গভীর। জলপ্লাবনে এই বাধের অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং তজ্জন্ত গিরিধারা দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রাচীন নগর-প্রাচীরের ক্ষতি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীনকালে পরিখার উপরে স্থাপিত সেতুও গিরিয়ক উপত্যকা গমনাগমনে একমাত্র পথ ছিল। মানচিত্রে ইহা ৫ নং বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

এই দিকে আর একটি দর্শনীয় দ্রব্য হইতেছে, গৃধকূট পর্যন্ত বিস্তৃত ও একমাইলের অধিক দীর্ঘ বাধ। গৃধকূটে ইহা উপত্যকাস্থিত অন্য একটি বাধের সহিত মিলিত হইয়া “বিন্দুসার রাজপথে”র সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। হিউয়েন-সিয়াংয়ের বর্ণনা পাঠে ইহা পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হয়। কতকাংশ রাজপথের অন্য এবং কিয়দংশ গিরিয়ক উপত্যকা উত্তরদিক হইতে রক্ষা—এই বাধ নিশ্চিত হইয়াছিল। নগর-বহির্ভাগে অবস্থিত হইলেও ধ্বংসাবশেষাদি দৃষ্টে অনুমান হয় যে, এই স্থানে অনেক অধিবাসী বাস করিত।

অধ্যাপক জ্যাক্সন পূর্বদিকস্থ প্রাচীরের অপভ্রংশ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া

উঠিতে সমর্থ হয় নাই। বনভূমি পরিষ্কার করা সম্ভবপর হয় নাই বলিয়াই এরূপ হইয়াছে। রত্নগিরি পর্য্যন্ত বিস্তৃত পথের সহিত সংযুক্ত এই প্রাচীরে যে দ্বার ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। পূর্বতের উর্দ্ধে অবস্থিত জৈন মন্দিরের নিকটস্থ কক্ষে এই পথ শেষ হইয়াছে। সম্ভবতঃ, যাত্রীগণ যে ছিদ্র দিয়া গমনাগমন করে, সেই ছিদ্রই প্রাচীর দ্বারের অবশিষ্ট। এই ছিদ্রের নিকটেই ক্ষুদ্রতর আর একটি ছিদ্র আছে; ইহার পার্শ্বদেশ প্রস্তরমণ্ডিত এবং ইহার মধ্য দিয়া একখানি পাকী অনায়াসে বাইতে পারে। নূতন রাজগৃহের দক্ষিণ-প্রাচীরেও এইরূপ একটি ছিদ্র দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত স্থান রাজগৃহের ডাকবাঙলার নিকটবর্তী। এই প্রাচীরস্থ বৃহৎ ছিদ্রের অব্যবহিত পশ্চিমস্থ বৃহৎ ছিদ্রপথেই বর্তমান রাজপথ চলিতেছে।

পূর্বদিকের প্রাচীরের আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ইহার উত্তরের কোণে একটি পুকুরিণী রহিয়াছে। পুকুরিণীটি প্রাচীরবহির্ভাগে অবস্থিত। সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এই স্থান চৈনিক পরিব্রাজকগণ-উল্লিখিত জীবকের উত্থান বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

(২) নগরমধ্যস্থ উচ্চস্থান-সমূহ—নগরমধ্যে কয়েকটি স্থান অপরাংশ হইতে যে উচ্চ, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। এই সকল উচ্চস্থানে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তর ও গৃহাদির ভিত্তিস্থলের অবশেষ দৃষ্ট হয়। নিম্নস্থান-সমূহে এই সকল চিহ্ন লক্ষিত হয় না। মানচিত্রে যে সকল স্থান জঙ্গলপরিপূর্ণ বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই নিম্ন এবং এই সকল নিম্নস্থানে উল্লেখযোগ্য কিছু দ্রষ্টব্য আছে কি না, তাহা নির্ধারণ করা বহুব্যয়সাধ্য—একপ্রকার দুঃসাধ্য। শুধু নিবিড় বনভূমিপূর্ণ বলিয়া নহে—এই সকল স্থানে যুক্তিকা পুঞ্জীভূত হইয়াছে এবং এই জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি-মধ্য দিয়া যে সকল স্রোতস্বতী প্রবাহিত হয়, তাহারাও এই প্রাচীন স্থানের অনেক পরিবর্তন সাধন করিয়াছে।

উচ্চ স্থানগুলি মানচিত্রে প্রদর্শন করা হইয়াছে। অনেক উচ্চস্থানের শীর্ষদেশে প্রাস্তসীমা-নির্ধারক প্রাচীর রহিয়াছে। ইহার অনেকগুলি কৃত্রিম উপায়ে নির্মিত হইয়াছে এবং এইগুলি দেখিতে প্রাচীন রাজগৃহের চতুর্দিকে যে বহু দুর্গাদি দৃষ্ট হয়, তাহাদেরই স্মারক। অন্তর্গত প্রাচীন ইষ্টকাদি দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। প্রথমোক্তগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ক) মনিয়ার মঠের উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ ভূমি,—ইহা প্রায় পঞ্চদশ শত ফিট দীর্ঘ ও পাঁচশত ফিট প্রস্থ মধ্যস্থলে শুষ্ক পুকুরিণী।

(খ) মনিয়ার মঠের প্রায় আটশত গজ দক্ষিণপূর্বদিকে অবস্থিত চতুর্ভুজা-কারের ভূখণ্ড; ইহার মধ্যে আহীরগণের একটি পীঠস্থান রহিয়াছে, বন্যজন্তুর আক্রমণ

হইতে রক্ষা পাইবার জন্তই তাহারা এই স্থানে পাটদেবীর পূজা করে। প্রাচীন প্রধান রাজপথ হইতে ইহা প্রায় ৩০ ফিট উচ্চ এবং উক্ত রাজপথ এই ভূখণ্ডেরই পশ্চিমে অবস্থিত। এই চতুর্ভূজস্থানের উত্তরে ও পূর্বে নিম্নভূমি রহিয়াছে।

(গ) ইহার সন্নিকটে এবং নগরের দক্ষিণ-প্রাচীরের দক্ষিণে একটি সমকোণ চতুর্ভূজ দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়—এই দুর্গের ইষ্টকনির্মিত প্রাচীর সাড়ে আট ফিট প্রস্থ এবং দুর্গের কোণে গোলাকার বগ্ন রহিয়াছে। দুর্গ জ্যাকসন সাহেবের উদ্ভমে ও ব্যরে আবিষ্কৃত হইয়াছে—পূর্বে ইহা বনভূমিমধ্যে লুক্কায়িত ছিল। ৬০ জন লোক চারি ঘণ্টা অবিরত পরিশ্রমের পরে জঙ্গল কতকাংশে পরিষ্কৃত করিলে প্রাচীরের ভিত্তি-মূলের পরিমাণ লওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহা হইতে জঙ্গলের নিবিড়তা কতক পরিমাণে উপলব্ধি হইবে। এই দুর্গ যে অতি প্রাচীন, তাহা অনায়াসেই প্রতীয়মান হয় এবং প্রাচীন রাজগৃহের কেবল এই স্থান হইতে গৃধকূট দৃষ্ট হয়। স্মরণ্য এই প্রসঙ্গে পুত্র অজাতশত্রু কর্তৃক পিতা বিদ্বিসার কারারুদ্ধ অবস্থায় গৃধকূট পর্বতে বুদ্ধকে দেখিতে পাওয়ার ঘটনাটি উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৩) রাজপথাদি—প্রাচীন-নগরমধ্য দিয়া প্রাচীন রাজপথগুলি নির্দেশে দুইটি বিষয় আমাদেরকে সাহায্য করে। প্রথম, এই পথগুলি প্রাচীন ভগ্নাবশেষগুলির অভ্যন্তর হইয়া যায় নাই এবং এইগুলি অনেকাংশেই প্রস্তরাদিবিহীন। দ্বিতীয়, এইগুলি নিম্নভূমি দিয়াই চলিয়াছে এবং ইহাদের উত্তর পার্শ্বেই উচ্চ স্থান রহিয়াছে। নগর-বহির্ভাগে, সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে যে সকল রাজপথ রহিয়াছে, সেইগুলির উত্তর পার্শ্বেই ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে যে, এককালে ঐ রাজপথসমূহ প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। ১৮১২ সালে, পূর্বলিখিত বুকানান্ নতুন রাজগৃহের দক্ষিণ-দ্বার হইতে উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত দুইটি প্রাচীরের নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল চিহ্ন বর্তমানে দৃষ্ট না হইলেও, প্রাচীন রাজগৃহ হইতে বাণগঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজপথের উত্তর পার্শ্বেও এইরূপ ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়।

নগরমধ্য হইয়া যে প্রাচীন প্রধান রাজপথ রহিয়াছে, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। দুই স্থানে (মানচিত্রের ১১ ও ১২) এই রাজপথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রমধ্য হইয়া অগ্রসর হইয়াছে। সম্ভবতঃ এইগুলি নগরমধ্যস্থ দ্বারদেশেরই চিহ্ন এবং ইহার একটি রাজপ্রাসাদপূর্ণ নগরের উত্তর-দ্বার বলিয়া অনেক মনে করেন। ইহারই পূর্বে আরও একটি রাজপথ রহিয়াছে—এইটি প্রাচীন গৃহ ও প্রাচীরমধ্য হইয়া অগ্রসর হইয়াছে। আরও কিছু পূর্বদিকে আর একটি প্রধান রাজপথের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। ইহা উত্তরপূর্বে বিস্তৃত। এতদ্ব্যতীত নগর-প্রাচীরের পার্শ্ব দিয়া যে আরও রাজপথ ছিল, তাহারও চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এইগুলি প্রায়ই নগরমধ্যে অবস্থিত। কিন্তু, প্রাচীর-বহির্ভাগেও একটি

অনির্দিষ্ট রাজপথ দৃষ্ট হয়। ইহা দক্ষিণ-প্রাচীরের মধ্যদেশ হইতে পূর্বদিকে বিস্তৃত। রাজপথের বহির্ভাগে অপেক্ষাকৃত নীচুও একটি প্রাচীর দৃষ্ট হয়।

(৪) কূপ—মনিয়ার মঠের সন্নিকটেও উহার উত্তরে অবস্থিত একটি কূপ আছে। কিংবদন্তী এইরূপ যে, এই স্থানে ধনরত্নাদি লুকায়িত ছিল। এই কূপ গোলাকার ও ইহার চতুর্পার্শ্ব ইষ্টক-নির্মিত। বাণগঙ্গার নিকটস্থ প্রাচীন রাজপথের পার্শ্বস্থ কূপে একগে ৩ জন রহিয়াছে। আরও কয়েকটি চতুষ্কোণ কূপ আছে। প্রাচীন দক্ষিণ-দ্বারের ঠিক বহির্ভাগে একটি দশ ফিট প্রস্থ ২০ ফিট গভীর কূপ রহিয়াছে। মনিয়ার মঠের নিকটে নিম্নদেশ চতুষ্কোণ ও উপরের এক-তৃতীয়াংশ গোলাকার একটি কূপ আছে।

(৫) প্রাচীর-ভিত্তি—মানচিত্রে প্রদর্শিত প্রাচীরগুলি ৪ হইতে ৪।০ ফিট উচ্চ। এইগুলি সূর্যহং প্রস্তরনির্মিত। সমকোণ ভূমিখণ্ডগুলির সীমানির্দেশকরূপে অনেক প্রাচীর-ভিত্তি দৃষ্ট হয়। মনিয়ার মঠের প্রাচীর ২০ গজ দীর্ঘ ও ৬২ গজ প্রস্থ। ইহার উত্তরপূর্বস্থ খণ্ড মানচিত্রে ১০ বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। মানচিত্রের ১৪ নম্বরের মধ্যস্থিত ষোড়শতী সীমানির্দেশক প্রাচীরের অনেকাংশ লইয়া গেলেও, বাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহাতেই উহার আকার অনুমিত হয়। এই প্রাচীরগুলি পূর্ব-পশ্চিম বা উত্তর-দক্ষিণ হইলেও ঠিক সোজা নহ—মধ্যে মধ্যে দুই হইতে চতুর্দশ ডিগ্রীর ভ্রম দৃষ্ট হয়।

(৬) গৃহাদি—মানচিত্রে গৃহাদির ভিত্তি-প্রদর্শনের বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই। গৃহগুলি সাধারণতঃ ক্ষুদ্রাকারের ছিল—দশ বর্গ-ফিটের অধিক নহে। কোন কোন স্থানে গোলাকার ভিত্তিও লক্ষিত হয়।

দক্ষিণদিকে অবস্থিত প্রস্তর দুর্গের পার্শ্বে আর একটি সুদৃঢ় গৃহ বা প্রাচীর (মানচিত্রের ৯ নং) ছিল। ইহা পশ্চিম প্রাচীরের সন্নিকটে অবস্থিত। এবং রাজগৃহ প্রবেশের দ্বার ও সোন্তাওয়ারের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই স্থানে ভিত্তি প্রায় পাঁচ ফিট প্রস্থ ও এই গৃহ বা দুর্গ ১১ বর্গ-ফিট ছিল। ইহার উত্তরপশ্চিমকোণে ৩৬ ফিট ব্যাসের অর্ধ গোলাকার বগ্নের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

নগর প্রাচীরের উত্তরে সমান্তরালভাবে অত্র একটি গৃহ দৃষ্ট হয়—মানচিত্রে ৭ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা প্রস্থে প্রায় ৭২ ফিট এবং ইহার উত্তরদিকের প্রাচীরে-১৬০ ফিটের নিদর্শন ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(৭) কারুকার্যসম্বিত প্রস্তর—মৃত্তিকাগর্ভে বা ভগ্নাবশেষমধ্যে কারুকার্যসম্বিত কোন প্রস্তর পাওয়া যায় নাই।

(৮) স্থান-নির্দেশ—কা-হিরান ও হিউয়েন-সিয়াং-বর্ণিত চারিটি স্তূপের স্থান নির্দেশের পূর্বে নগর ও জীবকের উদ্ভানের স্থান নির্দেশ করা আবশ্যক। প্রস্তরতত্ত্ববিৎ

কানিংহাম প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের রিপোর্টের মানচিত্রে এই স্থান দুইটি নির্দেশ করিয়াছেন। প্রাসাদ-সম্বন্ধিত নগরের উত্তরের দ্বার তিনি নগর-প্রাচীরের উত্তরপূর্বকোণে অবস্থিত ক্ষুদ্র মন্দির হইতে দক্ষিণদিকে তিনশত গজ অবস্থিত স্থানে, বর্তমান রাজপথের উপরে নির্দেশ করিয়াছেন। এই উত্তর-দ্বারকে তিনি ‘হস্তিনাপুর-দ্বার’ বলিয়াছেন; কিন্তু এইরূপ নির্ধারণের কোন কারণ নির্দেশ করেন নাই। উত্তর-প্রাচীরের বহির্দেশে ও বিপুলগিরির পাদদেশে তিনি জীবকের উদ্ভানের কেন্দ্র বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

যদিও জ্যাক্সন সাহেবের ক্ষরীপে ঐ দুইটি স্থান কানিংহাম-উল্লিখিত স্থানের নিকট-বর্তী বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে, তথাপি প্রাচীন রাজপথেই মন্দিরের ছয় শত গজ দক্ষিণে একটি দ্বারের চিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং সন্নিকটে ইষ্টকাদি ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই ছিদ্র বা গেট প্রাচীন রাজগৃহের উত্তর-পূর্বকোণে অবস্থিত। আমাদের মনে হয় যে, এই ভূখণ্ডই প্রাসাদ-সম্বন্ধিত নগরের স্থান। কারণস্বরূপ দুইটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজপ্রাসাদ অবশ্যই সুরক্ষিত ও নগর-প্রাচীরের দ্বার হইতে যে দূরে অবস্থিত ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, চৈনিক পরিব্রাজকগণের বর্ণনা হইতে দৃষ্ট হয় যে, পর্কতোপরি অবস্থিত নগরের উত্তর-গেট হইতে উক্ত রাজপ্রাসাদ-সম্বন্ধিত নগরের উত্তর-গেট বা দ্বার এত দূরে অবস্থিত ছিল যে, তাহার প্রথমে চারিটি স্তূপের বর্ণনাস্ত্রে ও পর্কতোপরি অবস্থিত নগরের উত্তর-দ্বারের সহিত সংশ্লিষ্ট করণবেণুবন প্রভৃতির বর্ণনার পূর্বে গৃহকূট বর্ণনা করিয়াছেন।

জীবকের উদ্ভানের জন্ত দুইটি স্থান উল্লেখ করা যাইতে পারে। হিউয়েন-সিয়াং উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহা রাজপ্রাসাদ-সম্বন্ধিত নগরের উত্তর-দ্বারের উত্তরপূর্বে অবস্থিত ছিল। কিন্তু অগ্রতম লেখক বলিয়াছেন যে, ঐ উদ্ভান নগর ও পর্কতমধ্যস্থ বেটনীয়মধ্যে অবস্থিত ছিল। যদি উক্ত উদ্ভানটি নগর-প্রাচীরের উত্তরপূর্ব কোণের দিকে বা ঠিক প্রাচীর-বহির্ভাগে (যে স্থানে প্রাচীর বক্র হইয়াছে) অবস্থিত ছিল, তাহা হইলে উপরি-উক্ত দুইটি মতই সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। নিবিড় বন-ভূমির মধ্যে এই দুইটি স্থান-সূনির্দেশ সম্ভবপর নহে। সম্ভবতঃ আমরা পূর্বে যে জল-শূন্য পুকুরিনীর উল্লেখ করিয়াছি, তাহার নিকটেই জীবকের উদ্ভান ছিল।

গেট ও জীবকের উদ্ভানের জন্ত যে স্থান-নির্দেশ করা হইয়াছে, তথায় যাইতে হইলে, একটি স্রোতস্বতী উদ্ভীর্ণ হইতে হয়। এই স্রোতস্বতী মানচিত্রে দেখান হইয়াছে। ইহা অগভীর এবং ইহারই নিকটবর্তী গভীর গর্তকে ক্রীণ্ডপের অগ্নিকুণ্ড বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

রাজগৃহ বৌদ্ধগণের অত্যন্ত পবিত্র স্থান। বুদ্ধ এই স্থানে অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বর্তমানে ইহা জৈনদিগের প্রিয়ভূমি। রাজগৃহের প্রত্যেক প্রস্তর,

প্রত্যেক ইষ্টক, প্রত্যেক ধূলিকণার সহিত মহাত্মারত হইতে বৌদ্ধযুগের শেষ সময় পর্য্যন্ত স্মৃতি বিজড়িত। ভীম ও জরাসন্ধের মল্লভূমির চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আজ রাজগৃহ পরিত্যক্ত, জনশূন্য—কেবল স্মৃতিটুকুই বাকী আছে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদার।

বিজয়া

সেই অতীতের দিন সাগরের তীরে
পূজিবারে চেয়েছিলে দেবী ভবানীরে
নেত্র ইন্দীবর দিয়া ! মনে পড়ে আজ
বিজয়ার পুণ্য সঁকে ওগো রঘুরাজ !
কত কাল কেটে গেছে ; তবু আজো কেন
বিজয়ার বাঁশী বাজে সক্ররুণ হেন
বর্ষে বর্ষে অশ্রু ফুটে নয়নের কোণে ?
বিজয়ের বর লভি জেগেছিল মনে
যে দীর্ঘ বিরহ ব্যথা ; দুটি চক্ষু ভরি
যে অশ্রু ঝরিয়াছিল বিন্দু বিন্দু করি
সেই ব্যথা সেই অশ্রু সে দীর্ঘ নিশ্বাস
বিশ্বমাঝে হেরি আজ সর্বত্র প্রকাশ !

শ্রীমানিক ভট্টাচার্য্য বি, এ।

বেদনার বৈচিত্রি

বেদনার বৈচিত্রি বাখানিব, সে বড়াই রাখি না। এ জগতে এ বৈচিত্রিভোগ কর-
জনের ভাগ্যেই বা ঘটে! করজ্ঞনই বা এর বিরূপ ছেড়ে বিমোহন রূপ দেখতে
পায়? করজ্ঞনই বা এর আঘাতের কাছে আনন্দকে দাবী করতে জানে? অথচ
এ জীবনটা কাটিয়ে দিলাম এই বাহুরের বাহুরী ফেরে। সুখ-শান্তির দিকে
বড় একটা ঘেসতে পেলাম না, ঘেসবার মত মনও আমার ছিল না। কি
জানি কেন, এই শান্তি-সুখের দিবা আরামে ঘুমিয়ে পড়বার ভয়টা আমার
বড় বেশী।

তোমরা ঠোঁট হেলায়ে হাস্ছ; বল্ছ, “কেন, ঘুমনো এত কি দোষের?” দোষ-
শুণের কথা জানি না, কিন্তু ঘুমের ঘোর! উঃ, ভাবতেই আমার আতঙ্ক লাগে। তা
ব’লে কি আমি চোখ চেয়েই থাকি? হুই চক্ষু আর বুজি না? তা হ’লে ত এদিনে
বেদনার আর তরুকা বিকারের হাতে গিয়ে পড়তাম। তা নয়, কেবল কি চোখ
বোজা আর চোখ না বোজাতেই ঘুমন্ত আর জাগ্রতের পরিচয়? প্রেমের ঝাকুনি,
ঝিমুনি, কৈতবের চোখ চাউনি, চোখে হাত বুলানি কত কিছুও ত আছে? আমি ত
কত কত দিন পল্ল-পংক্তি খুলে রেখেই এমন ঘুম ঘুমই যে, ডাকাডাকির সুর-গোল
মোটেই আমার কানে পৌঁছায় না। আবার চোখের পাতা এঁটে-সেঁটে এমন সজাগ
থাকি যে, অবাস্তুর জলের আঙুট পর্য্যন্ত টের না পেয়ে পারি না। তা হ’লে তোমরা
সুখী জনেও কেবল আঁখি মুদে প’ড়ে থাক, এমন কথা আমি বল্বে?

ঘুম বলতে আমি বুঝি, আমার প্রাণের কাছে পাহারার প্রতিবেদ। আপনা
প্রাণের চেয়ে ত প্রিয় বস্তু সংসারে আর দ্বিতীয় নাই (এমন প্রেম-পাগলা তোমাকে
দিরে বাই কেন বলিয়ে নিক্ না) সেই প্রাণের খবরদারি কর’, তাকে চোখে চোখে
রাখা বড় মিঠা-কড়া কাজ। আরেমে তা হয় না। তাতে তজ্জ্বিজ চাই, তাতে
হুঁসিয়ার হওয়া লাগে। তাই ত প্রাণ কবুল করেও এই জাগরণনিষ্ঠের জিম্মায়
আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি।

তা ব’লে কি এর ভুলচুক নাই? সব সময়ই কি এসব বুঝে চলতে জানে?
তা জানে না, বরং আরো উন্ট। কারবারই হ’ল এর প্রাণটাকে নিয়ে। তাতে
কচি প্রাণ, কাঁচা প্রাণ, পাকা প্রাণ, ডব্কা প্রাণ, তাজা প্রাণ, মরিয়া প্রাণ, রসাল
প্রাণ, রস্বীল প্রাণ, বিন্দু প্রাণ, বিনাল প্রাণ, রকমারি ত আছে। তা ওর ঐ এক কথা

“বা না বসালে টেকসই জান্বে কেমন ?” এই বা বসানো নিশ্চই যত সব গলধ !
কত কত সময় একেবারে প্রাণের দফা নিকাশ !

না হবে কেন ? কচি-কাঁচা প্রাণ অমনিতেই দেহের পরবশ ; সেই দেহ, দেহীর ভোগ-
যাতনা দেখে পাঠ ওঠাতে চাইলে আর ত মানা নাই। তখন বেকুব বন্ডে বেদনা-
কেই। আর ডব্কা প্রাণ জানই ত দেহের সাথে আপোসে কাজ চালায় ; একের
ধাক্কা অত্কে সাম্লে নিতেই হয়, দেখেও বেদনা বেত্রহস্তে এদের ধাঁধা নাচন নাচাতে
চার। কিন্তু তাক্সা প্রাণের তাগতের কাছে দেহই বেথানে জুজু হয়ে আছে, সেখানে
বেদনা জুলুম করতে যায় কোন্ সাহসে বল ? তা ছাড়া মরণের দুয়ারে যে প্রাণ
দেহকে বান্ধা রেখে দিয়েছে, সেখানে বেদনার কশাঘাত ত বিজ্রপের ব্যাপার ! তবে
রসাল প্রাণ, রঙ্গীল প্রাণ, এদের নিয়ে এর রঙ্গ চলে বটে, রোখশোধ ত চলে না।
কিন্তু যেখানে পরিণত বিশাল প্রাণের বিবৃতি ব্যাপ্তি লয়ে, তুমি যা খেতে ঘাড় পেতে
দিতে শিখেছ, যখন বেদনাকে ভোগেরি বস্ত্র ছেনে তাকে আকাঙ্ক্ষা করতে পেরেছ,
তখন তার বৈচিত্র্য তার জাগ্রত স্মৃতি মূর্তি তোমরা বেদনার বাদী-ধুমন্তেরা দেখতে
পাবে কেমন ক’রে ? যখনি চোখ খোল তোমরা দেখ তার রুদ্ররূপ, তোমরা দেখ
আপনাদের লাহনাতোগ ! তা মারপিট ওর স্বভাব, কি করবে তুমি ?

কেন ? মেজাজী নিয়ে কি তোমরা কারবার কর না ? কিন্তু এ রুদ্রেরও যে স্বদয়
আছে, সেও যে তোমার শুভ খোঁজে ? না হয় ওর শুভাশুভের আকার আলাদা,
আচরণ বিভিন্ন ।

ধর না, এই না একচোট খুব কান্দালে, যখন দরদর ছ’নয়নে ধারা, যখন ধারায়
ধারায় বক্ষ তোমার ভেসে গেল, যখন বক্ষের স্নিগ্ধ সিক্ত পরলে তুমি নিভৃত প্রাণের
সাড়া পাচ্ছ, তখন অতি সন্তর্পণে নজর-সর্বস্ব-নয়ন তোমার, প্রাণের কাছে এসে ধরা দিল,
দেখ, পরাণে আর নয়নে মিলে এখন কত বেগার খাটছে। তোমাদের আনন্দ উল্লাসেও
নয়ন গলায় বটে, কিন্তু সে গলুনি বক্ষঃস্থল অবধি পৌছায় না যে। শক্তি একরুতি
হ’লে উৎস তার ছোটে কি ? সে জলের কোঁটা পুঁছে ফেললেই আঁধিতে আবার যে
প্রাণ-ফাঁকি-দেওয়া-নজর, সেই নজর। মোট কথা, তোমরা হ’লে চোখ বাঁচিয়ে
মানুষ, আর আমি হলাম চোখের বালাই নিয়ে মানুষ। কাজেই তোমরা বেদনাকে
বেদনা ব’লেই জান, বেদনাতে বেদনাই পাও, তাই বেদনাকে এত তোমরা
ডরাও।

চোখের কোণ ভিজা দেখলে তোমরা অমনি এস আদর ক’রে তা পৌছাতে।
আমি ভাবি, এ কি মমতা ? না নিষ্ঠুরতা ? যে কাঁদিয়েছে, সেই যে মমতার জন
হয়েছে, তা কি এরা জানে না ? কথাই হ’ল, যদি মমতাকে বিশ্ব-জোড়া করতে

চাঁও, তবে দাঁও তাতে বেদনার অশ্রু ঢেলে দেও। মা সন্তানকে কীদার কখন? যখন কীদানো ভিন্ন সন্তানকে বাড়ন্তে ধরে না। মা জানে তার সন্তান বেদনারি দান। সন্তানকে বুকে ক'রে মা বেদনাকেই আঁকড়ে ধরে। তাই ত অনাদি-কাল হ'তে এই বেদনাই বিশ্বজয়ী হয়ে মাকে জগৎমাঝারে সবার উঁচুতে দাঁড় ক'রে রেখেছে। কারো সাধি নাই, এই বেদনার হাত এড়িয়ে মাকে নীচুতে নামায়।

আর বঁধু! তুমি ত জান, বেদনাই বঁধুর প্রাণ, বেদনাতেই তার বেঁচে থাকন। তাই ত বিহ্বল প্রেম এই দণ্ডারীর দণ্ড ছুঁয়ে বন্ডে—

“বঁধু যদি দেয় বেদনা, স্বর্গ-সুখ কি তার তুলনা!”

ঐ দিকে বৈভবের ভোগীকে দেখ না, বেদনা তার সুহৃৎ কি না। সম্পদের রগড়া পথে যদি তার পা কসকেছে, তখন বেদনা ছাড়া তার চেতনা কে রাখে বল? এই বেদনার প্রসাদেই না তাপস যজ্ঞ করছে “দেগো দয়াল! দহন দে, জীবন থাকতে একবার বাচার মত বেঁচে নি।” সে জানে, এ দহনীতে পুড়ে ছাই করে না, এ দহনী যে গরু। কেটে বের ক'রে দেয়। তখন সাঁচা সোনা হয়ে আপনা জিন্নাতে জগৎ মাৎ করছে দেখে তব্বরেরা তাজ্জব।

বল্ব কি, যখনি হৃদয়কে বরখাস্ত ক'রে তুমি স্বার্থের মোসাহেবি করতে লেগে গেছ, তখনি সে ভণ্ড প্রচণ্ড তোমার সব সুপারিসি রত ক'রে হৃদয়কে মোতায়ন রেখেছে। যদি পরাণে তোমার পাষাণের ধাঁত লেগেছে, যদি শীতল অসাড় হয়ে পড়েছ, দেখবে, কোন ফিকিরে সে বাছুর ঐ পাষাণে স্রোত বহারে তোমার দিলকে দরিয়া ক'রে দিয়েছে। আর তুমি সে পূণ্য-প্রবাহে গম্বু ক'রে পূর্বপুরুষের তর্পণ করছ। যে আজ মৃত্যুর সঙ্গে মিত্রতা ক'রে করাল বমের দূত সেজেছে, কাল সে তোমার কোলে ক'রে মৃত্যুঞ্জয়ের স্বরূপ দেখাচ্ছে।

কখনও টানন, কখনো টুটানো। এই বিধিরে বিধিরেই সে তোমার সব ছড়ানোকে একঠাই করছে, এই বিধিরে বিধিরেই সে তোমার সব জড়ানোকে ছত্রঙ্গিণ ক'রে দিচ্ছে। তুমি এই পেয়ে, এই না পেয়ে, যখন হর্ব আর বিষাদের মাঝে পড়ে, মন্ত্রমুগ্ধের মত কেবলি ওঠা-নামা করছ, যখন এই ওঠা-নামায় আর তোমার কোন হাত নাই, তখন কোন মারিক তোমার এই দ্বিধার ঘন্ব ফুঁকিয়ে দিবে, তোমাকে বিশ্বের মাঝে ছেড়ে দিল। তুমি তখন জন্মের বন্ধন, কর্মের বন্ধন, মর্ষের বন্ধন, দৈবের বন্ধন কিছুনি নিশানা পাচ্ছ না!—মুক্ত! মুক্ত! মুক্ত!—

“কে করে আর মানা রে তাই! কে করে আর মানা ;

সকল বাঁধন টুটল যবে, আমোদ তখন একটানা।”

শ্রীজগদম্বা দেবী।

চার-ইয়ারী কথা

(পরিচয়)

চারজন ইয়ার-বন্ধু 'ক্লাবে' ব'সে গতজীবনের যে চারটি ঘটনা বিবৃত করেছেন, তারই নাম 'চার-ইয়ারী-কথা'; সুতরাং বলা বাহুল্য, চারটি গল্পই প্রণয়-মূলক। কিন্তু সাধারণ প্রণয়-মূলক গল্প যা আজকালকার মাসিকপত্রগুলোকে আকর্ষণকর করে তুলেছে, তা থেকে এদের কিছু বিশেষত্ব আছে; তাই গল্পের পরিচয় না দিয়ে সেই বিশেষত্বের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

চারজন বন্ধুই কৃতবিন্যাস, কর্মের পথে অগ্রসর এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশ থেকেই কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। প্রথম-যৌবনের প্রণয়-রাগছটার আর সে উন্মাদনা নেই, কিন্তু তার মধুর স্মৃতিটুকু এখনও তাঁদের স্মৃতিপটে জড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং তাঁরা ভালবাসার মত একটা সনাতন মনোভাবের উপর অশ্রদ্ধ না হ'লেও সেটাকে নিয়ে একটু রঙ্গ-রসিকতা করতে ছাড়েন নি। ভালবাসার পড়াটা মানুষের পক্ষে খুব স্বাভাবিক এবং কারো কারো মতে স্বর্গীয় হ'লেও তার মূলে যে হয় একটু বেশী ভাব-প্রবণতা, না হয় নির্মূল্যতা, না হয় অবকনা ও পাগলামী থাকে, তার ইঙ্গিত প্রতি গল্পেই পাওয়া যায়।

ভালবাসা মূলতঃ এক জিনিস হ'লেও ব্যক্তিগতভাবে তার প্রকৃতির যথেষ্ট বৈষম্য আছে; অর্থাৎ তার অর্থ, উদ্দেশ্য ও অভিব্যক্তি প্রত্যেক লোকের কাছে স্বতন্ত্র। সেই স্বাভাবিকতাকে যিনি চরিত্রের অনুপাতে ভাল করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন হ'তে পারে না।

এখন দেখা যাক, প্রথম বাবু তা পেরেছেন কি না। প্রথমেই আমাদের এটা চোখে পড়ে যে, তাঁর অঙ্কিত প্রত্যেক পুরুষ ও রমণী চরিত্রে একটা জীবন্ত বিশেষত্ব আছে। তাঁদের নৈতিক, সামাজিক ও অন্তর্গত মতামত স্পষ্টভাবে আমাদের না বলা হ'লেও আমরা দেখতে পাই, তাঁদের Psychology যথেষ্ট বিভিন্ন এবং বতাই জটিল হোক না কেন, পরিষ্কৃত।

কিন্তু সে কথা এখন থাক। তাঁদের প্রত্যেকের প্রণয়টি স্ব স্ব প্রধান ও চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গত কি না, তাই দেখা যাক। আমার মনে হয়, এখানে লেখক এমন একটা শিল্প-সৌন্দর্যের পরিচয় দিয়েছেন,—যা নিপুণভাবে মানুষ-চরিত্র লক্ষ্য করবার ফল।

প্রথমতঃ সেন। ইনি ভাবুক ও কবি; অর্থাৎ বিষয়ী লোকের ন্যে ঠিক উন্নত না হলেও উদ্ভাস্ত। সুতরাং এক অলৌকিক চন্দ্রালোকে একজোড়া নীলার মত কোমল চোখের মধ্যে যে ইনি আপনার আদর্শ-সুন্দরীর বা মানসী প্রতিমার সন্ধান পাবেন এবং অতি সন্তুর্পণে, অতি আগ্রহভরে, অতি কবিত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে আপনার মনোভাব বলি বলি ক'রেও বলতে পারবেন না—এইটেই হ'চ্ছে স্বাভাবিক।

সীতেশ অবশ্য একজন সাদাসিদে practical man of the world হাজারে যেমন ন'শ নিরনব্বই জন হয়। ইনি স্বভাবতই একটু রমণী-মোহর্ষোর পক্ষ-পাতী—সুতরাং প্রথম ধূর্ত রমণীর একটু অপাকদৃষ্টি, একটু কেশমুক্ত সুরভি, একটু কৃত্রিম সহদয়তা ও একটু অবাচিত প্রশংসার সঙ্গে মিশ্রিত সঙ্গ-তিরস্কার, ঐকে একেবারে বিলুপ্তসংজ্ঞ ক'রে দিলে। এ রকম আত্মবিশ্বাস অনেকটা মস্তিষ্কেরই বিকার, যাকে হিষ্টোরিয়াও বলা যেতে পারে।

তার পর সোমনাথ ও রিণী। এরা দুজনেই বাক্য চালের লোক, যেমন চতুরঙ্গের ঘোড়া। এঁদের প্রণয়-কাহিনী পড়তে পড়তে কেবল মনে হয়—‘যোগ্য যোগ্যে বুদ্ধিতে’। এঁদের দুজনের মধ্যে স্বৈর্য্য ও চঞ্চলতা, জীবনী ও অবসাদ, গাভীর্য্য ও বাচালতা, মর্যাদা ও নিরতিমান, আন্তরিক পরিবর্তন ও বাহ্য অবিক্রিয়া, ক্ষণে ক্ষণে নূতন তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে এবং সেই তরঙ্গ-হিলোলে দু'জনেই নেচেছেন ও পরস্পরকে নাচিয়েছেন, কতকটা বুঝেছেন, কতকটা বুঝেও বোঝেন নি। এ ভালবাসার অভিনয় করাও শক্ত এবং এর হার-জিত স্পষ্ট বুঝা যায় না। এতে যে শেষ পর্য্যন্ত ধরা দেয় না, সেই বোধ হয় বেশী ক'রে ধরা পড়ে। এ প্রণয়ের তৃপ্তি নেই, পরিসমাপ্তি নেই—এর জীবনেই কেবল আকাজকাতে—গতিতে।

বিছাডের মত তীব্র, রামধনুর মত বিচিত্র এই প্রণয়ের একচুমুক পান ক'রেই সোমনাথ বেন স্কাম্পেনের নেশায় টল্টল্ করেছিলেন এবং আমার বিশ্বাস, যাত্রা বেশী হ'লে এ সীতেশের অষ্টধাতুনির্মিত প্রকাণ্ড দেহকেও ভূমিসাৎ ক'রে দিতে পারতো।

শেষ গল্পে ‘এনের’ ভালবাসাই প্রধান। এ ভালবাসার মাদকতা না থাকলেও চমৎকারিত্ব বেশী। এ যেমন স্নিগ্ধ, তেমন শান্ত, তেমন পবিত্র। এ শুধু দেখবার, সেবা করবার, সুখী করবার কামনা; যাতে ইজির নেই—বা পাতিব্রতের হানিকর নয়—বা নির্মল উদার আকাশেরই মত। এ ভালবাসা ব্যথা নিতে জানে, দিতে জানে না—এ লজ্জার আবরণে সামাজিক দূরত্বের অন্তরালে অর্ধেক চাপা—এ, এ জগতে প্রকাশ হয় না, প্রকাশ হয় পর-জগতের পারে।

রাগের ভালবাসা একপক্ষীয়, সেনের ভালবাসাও তাই। তার মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত বা লোভনীয় ভাবে বলতে গেলে আদান-প্রদান নেই। বিমানবিহারী রাগ তাবের

বেনুনে চ'ড়ে যে, ভালবাসার বায়ুস্তরে সঞ্চরণ করেছিলেন, তা যেমন হাশ্বোদীপক, পরিচায়িকা 'এনের' নিঃস্বার্থ, পার্থিব অথচ বাস্তব প্রেম তেমনি করুণ ও মর্মস্পর্শী।

সীতেশ ও সোমনাথের ভালবাসা অপর ভালবাসার প্রত্যুত্তর, অনেক পরিমাণে তার দ্বারা উদ্দীপিত। তবে এই দুই ভালবাসার মধ্যে প্রভেদ এই যে,—একটি ভ্রান্তি, অপরটি সন্দেহের উপর প্রতিষ্ঠিত, একটি কুপা, অপরটি বিশ্বয়ে পর্যাবসিত।

বিদেশিনীর সঙ্গে বিদেশী যুবকের প্রেম প্রত্যেক গল্পেরই বিষয়। সুতরাং গল্পের পরিণামসম্বন্ধে লেখককে বিশেষ সতর্ক হ'তে হয়েছে এবং experience এর চেয়ে কল্পনার উপর বেশী নির্ভর করলেও, মনে হয়, তিনি প্রত্যেক ঘটনাটিই প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি রিগীর মত একটি অদ্ভুত বিদেশিনী মহিলার হৃদয়-তত্ত্বের প্রত্যেক সূত্র, প্রত্যেক কোমল সুরটি এমন সূন্দরভাবে ধরেছেন যে, মনে হয়, তাঁর অন্তর্দৃষ্টির নিকট কোন রমণী-হৃদয়ের কোন গুঢ় রহস্যই লুকানো থাকতে পারে না। তিনি পর্যবেক্ষণ করতে জানেন ব'লে, তাঁর কল্পনার সৃষ্টিও এত স্বাভাবিক।

চরিত্রাঙ্কন ও ভাব-বিশ্লেষণ সম্বন্ধে দু'এক কথা বলেছি, এবার আট সম্বন্ধে কিছু বলবো। ছোট গল্প তৈরি করতে বড় শিল্পীর প্রয়োজন। অল্প চরিত্র, অল্প ঘটনা, সংঘত বর্ণনা ও পরিমিত মনোভাবের মধ্য দিয়ে একটি সর্বোৎকৃষ্ট-সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করাই ছোট গল্প-লেখকের কাজ; 'তাতে কৃতকার্য হ'তে হ'লে প্রত্যেক শব্দটি বাছাই ক'রে' প্রত্যেক ঘটনাটি যাচাই ক'রে ব্যবহার করতে হবে এবং গল্প-বিকাশের প্রতিপত্তরেই দৃষ্টি রাখতে হবে শেষ লক্ষ্যের দিকে।

চার-ইয়ারীর কথা যে এই শ্রেণীর রচনার একটি সুন্দর আদর্শ তা অস্বকোচেই বলা যেতে পারে। প্রথমতঃ লেখক চারটি গল্পকে একসঙ্গে গেঁথে এক জমির উপর বুনে দিয়েছেন এবং সে জমির রং এমন নূতন ধরণের যে, তাতে প্রত্যেক গল্পের রং নূতন সৌন্দর্য্য ও সজীবতা লাভ করেছে। সেই সন্ধ্যার অস্বাভাবিক মেঘ-চোয়ানো আলোতে কবিত্ব, আবেগ ও রসিকতা এমন ভাবে ফুটে পরস্পরের গারে মিশে গিয়েছে যে, সাধারণ দিনে আলোতে তা কখনই হ'তে পারতো না।

তার পর বন্ধুদের গল্প আরম্ভ হবার আগেই লেখক তাঁদের চালচলন ও কার্য-কলাপের এরকম আভাস দিয়েছেন, যাতে তাঁদের পরবর্তী কথাবার্তার আমাদের মনে একটা চমক, কৌতূহল ও আগ্রহ এনে দেয়। প্রথমেই মনের মধ্যে এই ধারণা এসে পড়ে যে, তাঁরা অনেকটা চিন্তাশূন্য, এমন কি, যাকে "হুর্তিবাক" বলে, সেই প্রকৃতির লোক। কিন্তু গল্পের সূচনা থেকেই দেখতে পাই, তাঁরা ভিতরে ভিতরে অল্প প্রকৃতির লোক—তাঁদের মনের স্তর সাধারণ লোকের মনের স্তর হ'তে অনেক উঁচু।

প্রমথ বাবুর আর্টের আর এক পরিচয় তাঁর গল্পের উপসংহারে। এমন অপ্রত্যাশিত অথচ সম্ভাবজনক পরিসমাপ্তি অতি অল্প বাক্যলাগলেই দেখেছি; এর ফলে কোথাও হাতু, কোথাও করুণ, কোথাও বা বিস্ময় রস এসে মূল রসকে তীব্রতর করে তুলেছে। যারা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরাই জানেন, ব্যভিচারী ভাবের সাহায্যে স্থায়ী ভাবের পোষকতা কাব্যের কত উৎকর্ষজনক।

লেখক তাঁর চরিত্রগুলির সম্বন্ধে নিজেকে কিছুই বলেন নি—তাদের মুখ দিয়েই তাদের কথা বলিয়েছেন। এতে তিনি নিজের উপর এমন একটা কঠিন কাজের ভার নিয়েছিলেন, যা কোন অল্পশক্তি শিল্পী কখনই নিতেন না। তাঁকে প্রত্যেক বক্তার ভাষা ও ভঙ্গিতে স্বতন্ত্র ও বিশেষভাবে সেই বক্তারই উপযোগী করতে হয়েছে। এই জন্তে সোমনাথের গল্পের ভাষা যেমন উপমা-প্রাণ ও উন্নত; রায়ের গল্পের ভাষা তেমনি সহজ ও আড়ম্বরহীন; কারণ, রায়ের গল্প একজন অর্ধশিক্ষিতা পরিচারিকার সঙ্গে কথাবার্তা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

শব্দ-নির্বাচন ও বাক্যগঠনেও লেখক যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন; কিন্তু তা দেখতে হ'লে খুব অভিনিবেশের সঙ্গে গল্পগুলি পড়া দরকার; কেবল গল্পের খাতিরে ভাসা ভাসা পড়লে, তা চোখে পড়বে না। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। “সূর্য্য অস্ত গেলেও তার পশ্চিম আলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেঘের গারে জড়িয়ে থাকে”। এখানে ‘পশ্চিম’ শব্দটি বসাবার আগে লেখককে বোধ হয়, তুল্যার্থ-বোধক অনেক শব্দকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। ‘পরিত্যক্ত’ ‘নিরাশ্রয়’ ‘প্রবাসী’ বা ঐ রকম অন্ত কোন শব্দ ব্যবহার করলে বোধ হয়, লেখকের উদ্দেশ্য অত সফল হ'ত না। ‘পশ্চিম’ শব্দে যেমন পশ্চিম আকাশকে সূচনা করে, তেমনি পশ্চাৎপদ অতএব দলভ্রষ্ট এ ভাবটিও মনের মধ্যে এনে দেয়।

গল্পের প্রাণ বস্তুত্বতা; কিন্তু সে বস্তুত্বতার অর্থ এ নয় যে, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের নির্খুঁত ও নির্ভুল তালিকা দিতে হবে। কিন্তু তার প্রকৃত অর্থ এই যে,—এ রকম ভাবে বর্ণনা করতে হবে—যাতে বর্ণনার বিষয় চোখের সামনে জীবন্ত ও জাগ্রত হয়ে ওঠে। এ উৎকর্ষের পরিচয় প্রমথ বাবুর গল্পে যতটা পেয়েছি, এত আর কোন গল্পলেখকের লেখায় পেয়েছি কি না সন্দেহ। চন্দ্রালোকে গঙ্গাতীর, বর্ষার দিনে বিলাতের রাস্তা প্রভৃতি দৃশ্যের তুলনা নেই। তিনি ছ একটি বর্ণের সাহায্যে, ছ একটি তুলির আঁচড়ে কেমন সুন্দর চিত্র আঁকতে পারেন, নিম্নোক্ত বাক্যগুলি হতেই তা প্রতিপন্ন হবে।

(১) জাহাজের গড়ন যে এমন সুন্দর, তা আমি পূর্বে কখনো লক্ষ্য করি নি।

মনে হ'ল যেন, কোন সাগরপারে রূপকথা-রাজ্যের বিহঙ্গম ও বিহঙ্গমীরা উড়ে এসে এখন পাখা গুটিয়ে জলের উপর শুয়ে আছে—এই জ্যোৎস্নার সঙ্গে সঙ্গে আবার পাখা মেলিয়ে নিজের দেশে ফিরে যাবে।”

(২) “এ গন্ধ ফুলের নয়, কেন না, ফুলের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়, আকাশে চারিয়ে যায়,.....কিন্তু এ সেই জাতীয় গন্ধ যা একটি স্থল রেখা ধরে ছুটে আসে, একটি অদৃশ্য তীরের মত বুকের ভিতর গিয়া বেঁধে।”

(৩) “গলা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া কালো কাপড়পড়া একটি স্ত্রীলোক লেজের ভর দিয়ে সাপের মত ফণা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।”

(৪) “এখানে ওখানে সব জলের টুকরো টাকার মত চক্‌চক্‌ করছে, পারায় মত চল্‌চল্‌ করছে।”

গল্প চারটির ভাষার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও, তার প্রত্যেকটিই ফরাসী-রীতিতে লিখিত; লেখক যে ফরাসী রচনা-পদ্ধতিকে হুবহু নকল করেছেন, তা বলছি না, তবে তাঁর ভাষার উপর ফরাসী রচনার প্রভাব নদীবক্ষে মেঘের ছায়ার মত পতিত হয়েছে—তার ফলে গল্পগুলির ভিতর একটা হালকা স্বচ্ছন্দ-গতি আগাগোড়া বিস্তারিত। সামান্য ঘটনাকে অসামান্য কথার আড়ম্বরে ফেনিয়ে ফেনিয়ে তিনি দীর্ঘ করেন নি;—তাঁর গল্পগুলি পার্শ্বত্যাগ করার মত ঘটনা হতে ঘটনার, উত্তর হতে প্রত্যুত্তরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে এবং উৎকৃষ্ট বারিপুঞ্জ বর্ণালোকের মত নানা চিত্র ও নানা মনোভাব তাকে স্থানে স্থানে রঞ্জিত করে রেখেছে। মোটের উপর চার-ইয়ারী-কথা ছোট গল্প সাহিত্যে এক নতুন সম্পদ এনে দিয়েছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

পাশ্বের প্রতি

(হাফেজ হঠাতে)

ভঙ্গুর-মূল সৌধ আশার,
নগর আরু ভিত্তি যাহার

রচিত চপল পবনে ;

এস চলে' এস ছাড়ি সে ভবন,
চাহ যদি তুমি অমর-জীবন
আন প্রেম-সুখা করি আহরণ

বন্ধুর লাগি গোপনে । ১ ॥

তাহার বালাই নিয়ে মরে' যাই,
তাহার চরণে আপনা বিকাই,

স্বাধীন যাহার জীবনে

নীল আকাশের না ফুটে নীলিমা,
রূপরসাদির রক্ত-গরিমা
রঞ্জিতে নারে শুভ্র-মহিমা

আসক্ত-রাগ-কিরণে । ২ ॥

শুন ভাই ! শুন, হয়ো না বধির,
কানে কানে মোর कहিয়াছে পীর

পাশ্বে-শালায় স্বপনে:—

“সুন্দরী এই বৃদ্ধা ধরার
আশ্রাসে বুক বাঁধিল না আর,
শত শত পতি জান না কি তার

বধিল বাসর-শয়নে ? ৩ ॥

কেন বিহঙ্গ উর্দ্ধ-নয়ন !

ভুলিলে কল্প-বৃক্ষ-ভবন

বিহরি নিম্ন ভুবনে ?

ভ্রমিলে ধরণী সুখের আশায়,
 সুখ না মিলিল, শ্রান্ত হিয়ার
 বিশ্রাম কভু মিলে কি ধরায়
 বসিলে ক্লান্ত চরণে ? ৩ ॥

ছিঁড়ে ফেল এই বাগুরা মায়ার,
 শোন স্রগের মধুঝঙ্কার
 আবাহন-ধ্বনি শ্রবণে ;
 সংসার-দাব-দহন কি আর
 পারিবে দহিতে হৃদয় তোমার ?
 অযাচিত দান সে যে বঁধুয়ার,
 লহ শির পাতি যতনে । ৫ ॥

আজি গো ললাট হইতে তোমার,
 গ্রন্থি মোচন কর ভাবনার,
 বন্ধুর দয়া স্মরণে ;
 মুক্ত করিতে মুক্তির দ্বার,
 বন্ধুর করে চাবিটি তাহার,
 স্বাধীনতা হ'তে অধীনতা তাঁর
 সন্তোষ দানে মরমে । ৬ ॥

মধুর মধুর হাসে যদি গুল,
 সে শুধু ভুলাতে তোরে বুলবুল !
 বাঁধিতে মোহের বাঁধনে ;
 হাসির ফাঁসিতে জড়ায়ো না আর,
 উধাও উধাও ধাও অনিবার,
 যাবত না মিলে চুম্বন-সার
 বন্ধুর মধু-বদনে । ৭ ॥

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী ।

নির্লৌকিকসারচিত্তামণি

উপরে যে পুথিখানির নাম করা হইল, তাহা একখানি সহজিয়া ধর্মের পুথি। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় যে সকল পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ইহা পাওয়া গিয়াছে। বইখানির নাম ইতিপূর্বে সাহিত্যিক মহলে প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বটভগ্নায় ছাপা হইয়াছে কি না, নিঃসংশয়ে বলা যায় না। পুথিখানির যে প্রতিলিপি আমরা পাইয়াছি, তাহা বেনী দিনের পুরাণ নহে—১২৬০ সালে নকল করা হইয়াছিল। নকলকারী শ্রীরামচন্দ্র সেন গুপ্ত ও শ্রীবিষ্ণুস্বরূপ অধিকারী। ইহার ২৫শে কাস্তিক, জগদ্ধাত্রী-পূজার দিনে বেলা আন্দাজ দুই প্রহরের সময় নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া লেখা শেষ করেন। মূল পুথিখানি যে কোন্ সময়ে রচিত হয়, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। সে কালে বোধ হয়, পুথি-চোরের উপদ্রব খুব বেনী ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ পুথির শেষে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়—

“লিখিতং বহুবদ্বেন চৌরঞ্চ নীয়তে যদি।

তস্য মাতা চ সূকরী পিতা তস্য চ গর্দভঃ ॥”

পুথিখানি ১ হইতে ৫৬ পাতায় শেষ হইয়াছে। প্রতি পৃষ্ঠায় পংক্তিবিন্যাসের কোন ধারাবাহিক নিয়ম নাই। দুই জনের হাতের লেখা ইহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ১—৫২ পর্যন্ত পাতাগুলি এক আকারের; শেষের চারিটি পাতা আগের পাতার চাইতে চওড়ায় কম। কাগজ বেনী দিনের পুরাণ না হইলেও অবশ্যে করেকটি পাতার ধার পোকায় কাটিয়াছে। অনেক ভুল থাকিলেও হাতের লেখাটি মোটামুটি মন্দ নহে। অন্তান্ত সহজিয়া পুথির ভাষা ইহারও রচয়িতা কৃষ্ণদাস। বথা—

“শ্রীকৃষ্ণ-রঘুনাথ-পদে জার আস।

নির্লৌকিকসারচিত্তামণি কহে কৃষ্ণদাস ॥”

পুথির প্রতিপাদ্য বিষয় সহজিয়া ধর্ম। বক্তা মহাপ্রভু, শ্রোতা সনাতন গোস্বামী। মহাপ্রভু বধন প্রয়াগে গিয়াছিলেন; তখন সনাতন আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বাহা বলেন, এই গ্রন্থে কৃষ্ণদাস তাহাই সঙ্কলন করিয়াছেন। বথা—

“প্রয়াগে প্রভুর সহে মিলি সনাতন।

প্রভুর কৃপাদৃষ্টে পাইলা প্রভুর চরণ ॥

প্রভু আলিঙ্গন কৈল শক্তি সকারিয়া ।
প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী করে নিভতে বসিয়া ॥

সনাতনে শিক্ষা দিল। প্রশ্নাগে বসিয়া ।
সেই সব তত্ত্ব শুন কহি বিবরিয়া ॥

পুথির আরম্ভে মহাপ্রভুর নমস্কার-শ্লোক এবং প্রতি প্রকরণের প্রথমে “জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়” ইত্যাদি পয়ার আছে। এই পুথির রচয়িতা কৃষ্ণদাস এবং চৈতন্যচরিতামৃতের লেখক কৃষ্ণদাস, পাছে এই উভয় লেখককে কেহ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে করেন, এই জন্ত ইনি বলিতেছেন,—

“চৈতন্যচরিতামৃত করিয়াছি বর্ণন ।
শুকভক্তি কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা(র) কারণ ॥”

ইহার পর মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

“এই সব তত্ত্বকথা শুন সনাতন ।
নাম মন্ত্রে কৃষ্ণপ্রাপ্তি না হয় কখন ॥”

এইখান হইতেই মহাপ্রভু বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং সনাতন গুণিতে লাগিলেন। অপরাপর সহজিয়া বইতে যে রকম অশ্লীলতা ও রসের ছড়াছড়ি, এই পুথিখানিতেও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। স্থানে স্থানে এত বাড়াবাড়ি যে, তাহা তোলা মোটেই নিরাপদ নহে। ১২টি প্রকরণে পুথিখানি শেষ হইয়াছে। প্রথম উপাসক-সাধ্য প্রকরণ, ইহাতে তত গোলার কিছু নাই। উপাসকের কিরূপ উপাসনা কর্তব্য, বৈধী ভক্তি, কর্মকাণ্ড, বেদবিধি—এ সকল কিছুই নহে, ত্রয়ে শ্রীমতীর চরণপ্রাপ্তিই মুখ্য উদ্দেশ্য, এ জন্ত মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, কামবীজ, কামগায়ত্রী এবং নারিক-সাধনের শ্রেষ্ঠতা ও উপায় এই প্রকরণে বলা হইয়াছে। শেষে নারিকার বর্ণনাটি মন্দ নহে, কিন্তু আধুনিক রুচি-সম্মত নহে বলিয়া তুলিলাম না। প্রকরণের শেষে মহাপ্রভু বলেন,—

“জীব যদি শূনে ইহার হয় সর্কনাশ ।
বৈধী ভক্ত শুনিলে করয়ে উপহাস ॥
বৈরাগী বৈষ্ণব বৈধী এই না লইব ।
ধাকু বলিবার কার্য নিম্মা সে করিব ॥”

১২ পাতার ১ম পৃষ্ঠার প্রথম প্রকরণ শেষ এবং দ্বিতীয় প্রকরণ আরম্ভ। প্রকরণের আরম্ভেই সনাতন মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করিতেছেন,—

“সনাতন কহে প্রভু শুন দয়াময় ।
বিস্তার করিয়া কহ ঘুচুক সংশয় ॥
সামান্য শৃঙ্গার কিম্বা কহিবে আমারে ।
প্রেমের শৃঙ্গার কহ কোন তরুসারে ॥”

প্রশ্নের নমুনা দেখিয়াই বোধ হয়, পাঠকগণ এই প্রকরণের আলোচ্য বিষয় কি, তাহা বুঝিয়াছেন। আপনাদের মধ্যে যদি কেহ রসিক থাকেন, তবে তিনি ইহা “অস্তরে” বুঝিয়া লইবেন। অপরের বুঝিয়া কাজ নাই। ওয় প্রকরণের প্রথম কতকটা একটু পদে আছে। এবানে গ্রন্থকর্তা বলেন,—

“তবে সনাতন কহে শুন দয়াময় ।
ভক্তিতরু শুনিতে কিছু ইচ্ছা হয় ॥”

কিন্তু এই ভক্তিতরুর বিগুহতা গ্রন্থকার বেশী দূর রাখিতে পারেন নাই। খানিক পরেই একটি নারিকাকে আনিয়া ইহার সহিত মিশাইয়াছেন। চতুর্থ প্রকরণটি সংক্ষিপ্ত; তেমন কিছু নাই; সংক্ষেপে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-তরু বর্ণনা করা হইয়াছে। পঞ্চম প্রকরণটি একটু কোতূহলজনক। কেন না, এই প্রকরণে দশরথের পুত্র রামচন্দ্রকে আমরা সহজ-সাধনে রত দেখিতে পাই। সীতাহরণের বাপারটিকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়া গ্রন্থকার তাঁহাদের সহজ-রসের কথা বর্ণন করিয়াছেন। তবে তাঁহার এই সহজ সাধন ‘স্বকীয়া’তেই হইয়াছিল; রামচন্দ্রের মত একপক্ষীভূত পুরুষে ‘পরকীয়া’ আরোপ করিতে বোধ হয়, গ্রন্থকারের সাহসে কুলায় নাই। সংক্ষেপে ঘটনাটি এই,—রামচন্দ্র মারীচ বধে গমন করিলেন; কিছু দূর গিয়াই জানকীর মন বুঝিয়া, তাঁহার ছাত্রকে মারীচ-বধে নিযুক্ত করিয়া, তিনি ফিরিয়া আসিলেন। জানকীও কুটীরে নিজের একটি ছাত্রা রাখিয়া রামের সহিত মিলিত হইলেন, এবং ছইজনে সহজ-রসে মগ্ন হইলেন। এ দিকে রাবণ আসিয়া সীতার ছাত্রকে হরণ করিল এবং রামের ছাত্রা মারীচকে বধ করিয়া, লঙ্কার গিয়া রাবণকে সমালম্ব্যে পাঠাইল। খাঁটি রাম-সীতা বা লঙ্কণের কিছুই হইল না; তাঁহারা ঐ সময়ে পঞ্চবটীর কোনও গুপ্ত স্থানে সহজ-সাধনে রত ছিলেন! রাবণ-বধের পর রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন মুনিগণ গিয়া তাঁহার নিকট বর চাহিলেন। কি বর চাহিলেন, তাহা কবির ভাষায় শুনি—

• • মুনিগণ সন্তে তপস্তা করিঞা ।
তপ আস্তে রামচন্দ্রে দর্শন পাইঞা ॥
সহজ প্রার্থনা তারা মাগিলেন বর ।
কায়িক ভজন বর দেহ গদাধর ॥

এ দেহ সপিব মোরা নিগুণ হইয়া ।
নিগুণীর সঙ্গে পাব গুণী তেয়াগিয়া ॥”

রামচন্দ্র ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

“মুনিয়া কহিলা রাম গুণধারী হঞা ।
কি রূপে পূরিব বাহা গুণযুক্ত কারা ॥
ছাপরের শেষে কৃষ্ণ প্রকাশ করিব ।
আমি নিগুণীর সঙ্গে গুণহীন হব ॥
সেই মুনিগণ আসি গোকুল নগরে ।
হইল গোপের কস্তা গোয়ালার ঘরে ॥”

আর অধিক তুলিবার আবশ্যক নাই । ইহার পরে কোন্ কোন্ মুনি কি কি নামে গোপ-ঘরে জন্মিলেন, কাহার কি রূপ, কাহার কি গুণ, এই সকলের বর্ণনা করিয়া, কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের সহজ-সাধন এবং রাসকৌড়ার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । পরিশেষে কৃষ্ণের ননীচুরী, বৃন্দাবনের বর্ণনা, মাহুশ-তত্ত্ব এবং তাহার মহিমা, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া কবি বলিতেছেন,—

“এই গ্রন্থ গোপনেতে রাখিবে ভক্তগণ ।
ব্যক্ত হৈলে বস্তু নাহি হবেক ভজন ॥
অতি গুহ্য কথা এই মুন ভক্ত ভাই ।
প্রকাশ করহ যদি রাখার হুহাই ॥
মাতৃজারক করি রাখিবে অন্তরে ।
যোগ্যপাত্র জানি ইহা সুনাইবে তারে ॥

৬ হইতে ১০ম প্রকরণে কোন বিশেষত্ব নাই । এইগুলিতে সহজধর্মের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, মাহুশ-ধর্ম, তাহার লক্ষণ ও প্রকার-ভেদ, ‘পীরিত্তি’ কাহাকে বলে, তাহার ভাবব্যাখ্যা ও মর্ম্ম প্রভৃতি সহজ-ধর্মের অনেক জানিবার, শুনিবার ও বুঝিবার কথা বলা হইয়াছে । এই সমস্ত তুলিয়া প্রবন্ধ বাড়াইবার কোন প্রয়োজন দেখি না । প্রতি প্রকরণের শেষেই ঐ সকল বিষয় খুব গোপনে রাখিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । একাদশ প্রকরণে চণ্ডিদাসের সহজ-সাধন কথার বর্ণনা আছে । চণ্ডিদাসের নারিকার রজক-ঝিয়ারী রামী কিন্তু এই নাম ছাড়া কান্দাস ও চণ্ডিদাসের পদে তাহার ‘রামতার’ ও ‘তার’ নামও পাওয়া গিয়াছে । এই পুথিখানিতেও ‘তার’ নাম পাইতেছি,—

“তার’ নামে রজকিনী ছিল এক জনা ।
গুণে বর্তমানে (মুত্তিমান্ ?) গুণ রূপে কাঁচা সোনা ॥”

ইহার পর রাজা শিবসিংহ, লছিমা দেবী ও বিজ্ঞাপতির উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।
যথা—

“রাজা শিবসিংহ ভক্ত কৃষ্ণপদে রত ।
লছিমা তাহার রানী অতি রূপবন্ত ॥”

* * * * *

তাহার আশ্রয়ে হৈলা কবি বিজ্ঞাপতি ।
অষ্টাঙ্কর মন্ত্র দিয়া আপুনি শ্রীমতী ॥ ইত্যাদি ।

এই সাধনার কথা বোধ হয়, অনেকেই জানেন । তাই বেশী উদ্ধার করিলাম না ।
তার পর সনাতন মহাপ্রভুর নিকট প্রশ্ন করিতেছেন,—

“সনাতন কহে প্রভু কহিবে আমারে ।
আর কেবা নিজ ভাবে কৃষ্ণভাব করে ॥
প্রভু কহে লীলাগুরু মহাকবির ।
কর্ণামৃতে লিখিলেন ইহার উত্তর ॥”

এইরূপে দেখা যায়, তীর্থ বৈরাগ্যশালী বিবমঙ্গল ঠাকুরও ইহাদের হাতে পড়িয়া
সহজিয়া হইয়া গিয়াছেন । স্বাদশ প্রকরণের নাম স্ববিলাস-বর্ণন । পুথির শেষে একটি
সূচী আছে, কোন্ প্রকরণের কি কি বিষয়, তাহাতে তাহা সংক্ষেপে বলা
হইয়াছে । ইহার পরেই পুথি শেষ হইয়াছে ।

সহজিয়া-সাহিত্যের খবর এ পর্য্যন্ত খুব বেশী পাওয়া যায় নাই বলিয়া সংক্ষেপে
পুথি-খানির পরিচয় দিলাম । পুথিগুলি যতই অলীলতা-মাথা হউক না কেন,
ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে বোধ হয়, ইহাতেও অনেক জানিবার মত জিনিষ
পাওয়া যাইতে পারে । পণ্ডিতেরা যে সকল বিষয় লইয়া অনবরত মাথা ঘামাইয়াও
কোন কুল-কিনারা করিতে পারেন না, ইহার কোন এক পাতার কোন এক কোণের
একটি শব্দে হয় ত তাহার মীমাংসা হইয়া যাইতে পারে । এই হিসাবে এ সকল
পুথিও আমাদের উপেক্ষা করা উচিত নয় । ইহা ছাড়া আরও একটি বিষয়ে আমাদের
মনোযোগ দেওয়া দরকার । আধুনিক সহজিয়া ধর্ম যে, বৌদ্ধ সহজ-যানের পরিণতি,
তাহা মোটামুটি এক রকম স্থির হইয়াছে । কিন্তু কোন্ সময়ে কিরূপ ঘটনা-চক্রে
পড়িয়া ইহা বৈষ্ণব-ধর্মের মতো প্রবেশ করিয়াছে, তাহার বিস্তৃত অনুসন্ধান হওয়া
আবশ্যক । আমরা আগে জানিতাম, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবই সঙ্কীর্ণনের সৃষ্টিকর্তা । কিন্তু
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত বৌদ্ধ
গান ও দোহা গ্রন্থে দেখিতেছি যে, মহাপ্রভুর অনেক আগে বৌদ্ধেরা বাঙ্গালার পদ
বাধিয়া, খোল-করতাল লইয়া কীর্তন করিত । সুতরাং বলিতে হয়, বৌদ্ধরাই সঙ্কীর্ণনের

সৃষ্টিকর্তা এবং চৈতন্যদেব তাহাদের নিকট হইতেই উহা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে দেখা যায়, বিগত গোড়ী বৈষ্ণব-ধর্মেও কিছু বৌদ্ধ-গন্ধ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আজকালও যে বাঙ্গালী-জীবনের ঐত্যেক পরতে পরতে বৌদ্ধ ভাব দুকিরা রহিয়াছে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। সুতরাং সহজিয়া-ধর্মকে অস্বীকার বলিতে পারি, কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্মের পরিণতি বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারি না।

শ্রী তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শেষ বেলায়।

আজ্জকে পথিক ছাড়া পেলে
প্রখর দিনের শেষ বেলায় ;
এবার বল নাম্বে তুমি কোন্ খেলায় ?
কোন্ আকাশের তলে তলে
কোন সাগরের জলে জলে
খুল্বে আবার আজ্জকে তুমি কোন্ ভেলায় ?
এই প্রখর দিনের শেষ বেলায় !

পথিক কি গো আশ মিটেছে
জীবন-তরীর দোল্ দোলায় ?
আশ মিটেছে জীবন-দোলের রাস-লীলায় ?
এবার মরণ-কুঞ্জ-কোণে
লুকিয়ে যাবে সঙ্গোপনে,
শেষ ক'রে কি নেবে তোমার এই মেলায় ?
পথিক কি গো আশ মিটেছে
জীবন-দোলের রাস-লীলায় ?

আবার যখন ভোর বেলায়
ডাকবে তোমায় জীবন-বাঁশীর সুর-লীলায়,
ওগো পথিক ভোর বেলায় !
কুঞ্জবনে ফুটেবে গো ফুল,
গন্ধে বাতাস হবে আকুল,
তখন তোমার হৃদয় ওগো মাত্বে না কি সেই খেলায় ?
ওগো পথিক প্রভাত-বায়ে
জীবন-বাঁশীর সুর-লীলায় !

পথিক কহে—নয় গো নয়
আশ মেটেনি আমার জীবন-তরীর শত দোল-দোলায়,
ফিরবো আবার ভোর বেলায়
জীবন-বাঁশীর সুর-লীলায় ।
মনের বনে ফুটিয়ে ফুল,
গন্ধে হিয়া করি' আকুল,
আবার ওগো মিল'ব এসে জীবন-দোলের রাস-লীলায় ।
ফির'ব আবার ভোর বেলায় !

শ্রী হরেশচন্দ্র চক্রবর্তী :

ছেঁড়া ফুল

ঠিক ছবির মত একখানি ছবি! এক পাশ দিয়া পার্কতা নদী নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। বিশাল পর্বত-বুকে ধরশ্রোতা, উদ্দাম উচ্ছল ও অবিরাম নৃত্য শীলা। নদীর তীর ধরিয়া পার্কতা পথ অঁকিয়া বাঁকিয়া উপত্যকায় গিয়া পড়িয়াছে। দূরে হিন্দুকুশ পর্বতের তুঙ্গ শীর্ষ মেঘে মেঘে ঘোর করিয়া আছে। কাছে পার্কতা খেতমল্লিকা ও গোলাপ বনের রঙ ও গন্ধে ছবিখানিকে যেন প্রাণের হাসি দিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে।

শরতের সন্ধ্যার অশ্রুট আলোকে দূর-বন ঘোর নীলাভ হইয়া ক্রমশঃ সন্ধ্যার রঙের সঙ্গে মিলাইয়া গেল। পর্বতের পাদদেশে নদীতীরে দুইটা তাঁবু পড়িয়াছে। তাঁবুর বাহিরে—সন্ধ্যালোকে তুর্কীসেনা বিশ্রাম করিতেছিল। কেহ বা এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতেছিল। তুর্কী সেনার অধিকাংশই অল্পবয়স্ক ও অধ্বশিক্ষিত। কেহ বা চটুল গানে সমবয়স্কের চোখে মুখে চটুল রসের হাসির ফোয়ারা ফুটাইয়া তুলিতেছিল, কেহ বা নিকটস্থ গ্রামের ভিতরে গিয়া সদ্য-বিজিত পার্কতা জাতির ভয় জাগাইয়া নানা অত্যাচার করিয়া বেড়াইতেছিল। একে তাহার। জঙ্গী জোয়ান, তার উপর ওই পার্কতা জাতিকে তাহার। দমনে রাখিতে আসিয়াছে, অধ্ব-শিক্ষিত বিজ়েতার স্বভাবই এই।

প্রকৃতির বুকের উপর এমনি করিয়া মানুষের অভিনব খেলা চলিতেছিল। একদিকে বিজ়েতার অত্যাচার, অন্যদিকে বিজ়িতের রক্তহীন পাণ্ডু-মুখের ক্রড় কঠোর নীরস শুষ্ক হাসি। কখন কখন বা চাপা অশ্রুট করুণ সুরের গান ‘মোন’ সন্ধ্যাকে মুখর ও বেদনাতুর করিয়া তুলিতেছিল। নাসপাতির বাগানে, আঙুরের বনে, হাওয়া ওলট-পালট খাইতেছিল, বুলবুল তীব্র সুরে ডাকিতেছিল। গ্রামের প্রান্তে বৃক্ষতলে সন্ধ্যার পূর্ব হইতে প্রতিদিন একটি ছোট বাজারের মত বসিত। ছোট ছোট ঘর, পাতায় ঢাকা, ঘারে ঘারে জাকালতার ঘোপ! তাহারি সম্মুখে বৃক্ষতলে ছোট ছোট দোকান। তুর্কী সেনাগণ মেইখান হইতে অনেক জিনিস ক্রয় করিত। একটি খোঁড়া বুড়া, বয়স অনেক হইয়াছিল, সে ফল বিক্রয় করিত, আর তাহার কত্তা ফুল বিক্রয় করিত। বৃদ্ধের আবক্ষ খেতশ্রু, শিথিল পেলী, কোটরগত চক্ষু, শীর্ণ শিরা, কুঞ্চিত লোলচর্মের পাশ্বে ফুলের বাজরা লইয়া

সদ্য-কোটা গোলাপের মত কন্যা দাঁড়াইয়া থাকিত। দেখিলেই মনে হইত, জরা ও যৌবনের মাঝে কি একগাছ। মিনি সূতার মত আছে, যাতে এই দুইকে এক করিয়া রাখিয়াছে। এক বার্কিকোর কাতর ব্যথিত দৃষ্টি, অন্তে যৌবনের মুখর চঞ্চল চাহনি। বয়ঃসন্ধির বিজ্ঞানকটাক্ষ আপনি কুটিয়া উঠিতেছে।

রোজই পিতা ও কন্যা একসঙ্গে আসিত, একসঙ্গে ফিরিত। দূর হইতে তুর্কী সেনার দল দেখিত, কখন আশে-পাশে ঘুরিত, কিন্তু বুকের সেই কাতর দৃষ্টির ভিতর কি অগ্নি ছিল, তাহাদের মনের চাকলা হইলেও, কেমন যেন ভয়ে অগ্রসর হইত না।

একদিন সন্ধ্যায় বৃক্ষ আসিল না। কন্যা একাকিনী ফল-ফুল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্বরায় সৈন্যদল তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিল।

কিশোরীর মুখে কোন চাকলা ছিল না। স্থিরচক্কু বিস্ফারিত, শুধু গাঢ় কাল তারকার স্বচ্ছ উজ্জ্বলতা ও ফুলের বাজ্রার পাশে যেন একটি আগোটা ডালওড় গোলাপ।

“আজ তোমার বাবা কোথায়?”

“তার বড় অসুখ।”

“তবে তুমিই বুঝি এখন থেকে ফল ও ফুল একসঙ্গে বিক্রী করবে?”

“হাঁ।”

একজন হাসিয়া বলিল, “ফুলেই ফলের বাসা।”...

“একজন হাসিয়া কতকগুলি ভ্রাসপাতি ও ছ খোলা আঙুর কিনিল; দাম দিয়া বলিল, “আজকের আঙুর রসে টম্-টম্ করছে, বুড়োর আঙুরগুলো শুখনো যেন কিস্মিস্ হয়ে থাকত।”

একজন তুর্কীসেনা দেখিতে অতি কদাকার। নাকের ডগাটা ছোরার মত বাকান—আর মুখের পরিমাণ অত্যন্ত বড়। চোখ দুটো জর নীচে কোথায় যেন ঢুকিয়া গেছে ও চোখের কোলে কালশিরা পড়ার মত কালো ও নীল মাখান। সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

“এই ফুলটার দাম কত?”

“পরমা জোড়া।”

“বাঃ, খুব সস্তা ত—আর ওই রান্না ঠোঁটের একটি চুমুর দাম?”

কিশোরীর নয়নে আগুন খেলিয়া গেল। মুখ তুলিয়া বলিল, “তুর্কীর বুকের রক্ত।”

“ওঃ, বড় চড়া দাম বটে! কিন্তু আমি বুকের রক্ত দিয়েই কিনব!”

সহসা সেই তুরক মাংসালী তরফুর মত তাহার বাহু দ্বারা সেই কিশোরীকে সবলে

বেষ্টন করিয়া কিশোরীর রক্তপ্রবালের মত অধরে তীব্র আসক্তি-ভরা পিপাসার আলা-
মর চূষন করিল ।

কিশোরীর ঠোঁট দুখানি নীল হইয়া গেল । সে ধীরভাবে বলিল, “কই, কুলের
দাম নিতে কিস্তি ভুলে গেছেন ।”

“তাই ত—হা হা ! এই নাও ! এই নাও !...কিস্তি চুমুর দাম নিতে তুমিও
ভুলে যে !”

“না, তা ভুলি নি ।”

কিশোরী তাহার রঙ্গিল জামার জেবের ভিতর পরস্পর ছুটি রাখিয়া আপোন গাছে
হেলান দিয়া একটু হাসিয়া দাঁড়াইল । মৈনিকগণ হাত-কলরোল তুলিয়া চলিয়া গেল ।
দূর-পর্ষত হইতে ঘরমুখো রাখাল বালকের তীব্র উচ্চ কণ্ঠের সঙ্গে বাণীর রাগিনী বাজিয়া
উঠিল । উপত্যকা অন্ধকারের গাঢ় ছায়ায় ঢাকিয়া গেল ।

পর দিন প্রাতে যখন তুর্কী সেনার হাজিরী লওয়া হইতেছে, তখন দেখা গেল, এক-
জন অসুস্থপন্থিত । সেনাপতি আদেশ করিলেন, “সে আসিলেই তাহার অস্ত্র কাড়িয়া
লইয়া তাহাকে বন্দী করিবে ।”

আর কয়েকজন মিলিয়া অস্বারোহণে খুঁজিতে বাহির হইলেন ।

সেনানিবাস হইতে কিছু দূর গিয়াই, পার্শ্বত্যা পথ সন্ধান হইয়া গেছে, সেইখানে
একপার্শ্বে পর্ষত অতি উচ্চ । পার্শ্ব দিয়া একটি নিব্বার বসুন্ধর পড়িতেছে । অগ্রগামী
স্বয়ং সেনাপতি অকস্মাৎ চমকাইয়া দাঁড়াইলেন । চাঁৎকার করিয়া বলিলেন,
“নাদির ! ও কি ওখানে ?”

সকলে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, সেই তুর্কী সেনানী পড়িয়া । চক্ষু তাকাইয়া আছে,
পলক পড়ে না, মুখ সাদা হইয়া গেছে । বক্ষ দীর্ণ, রক্তে পরিচ্ছদ রঞ্জিত—বক্ষের কপাট
উন্মুক্ত—তাহাতে স্থাপিও নাই । মরণ তাণ্ডব-নৃত্যে যেন তাহাকে দলিয়া গিয়াছে ।

যোষে তুর্কী সেনাপতি কর্তৃক শত্রু-গুহ নাড়িয়া, নাসিকা ক্ষীত করিয়া গর্জিয়া
উঠিলেন ।

দুই জন ঝোলা লইয়া আসিয়া মৃতকে সেনানিবাসে তুলিয়া লইয়া গেল ।

সেনাপতি বলিলেন, “নাদির ! যাও, সকলকে সেনানিবাসে স্বরায় উপস্থিত হ’তে
বল গে ।”

বিজ্ঞাতের মত এই সংবাদ সকলের কাছে চমকাইয়া উঠিল । বিজয়ী তুরক সৈন্ত
প্রতিশোধের জন্য আলার নামে শপথ করিল । সে শপথ নিরীহ পার্শ্বত্যা গ্রামে বজ্রের
মত কড়কড় করিয়া উঠিল ।

সেনাপতি সেই তুরকের সঙ্গে ফলওয়ারীর চূষনের কথা সব শুনিলেন,

কিশোরীর চুষনের মূল্যের কথাও শুনিলেন। গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচারের খাজা আরও বাড়িল।

কিশোরীকে ধরিয়া আনিতে আদেশ হইল।

দলে দলে গ্রাম্য যুবকদের ধরিয়া আনা হইয়াছে। তাঁবুর সম্মুখে সার দিয়া দাঁড় করান হইয়াছে।

তুর্কী সৈন্তগণের চোখে আগুনের হলুকা উঠিতেছিল। কিশোরীকেও সৈন্তরা ধরিয়া আনিল।

সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুই? এই?...তোর মুখে ও চুষ খেয়েছিল?”
“হাঁ।”

“তুই তাকে কি বলেছিলি?”

“সে চুষুর দাম জিগ্গেস্ করেছিল, আমি বলেছিলুম, তুর্কীর বুকের রক্ত।”

“তা হ’লে কে মেরেছে, তুই জানিস?”

“হাঁ, আমি জানি, কে মেরেছে।”

“বা, তোকে দু ঘণ্টা সময় দিলাম, এখুনি তাকে খুঁজে এনে দে, যদি সে না আসে, তবে ওই সব দাঁড় করিয়ে রেখেছি, সব গুলী করব।”

“হাঁ,” বলিয়া কিশোরী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সৈন্তগণ আবার তাহাকে দুই চারটা ইতর ভাষায় গাল ও রসিকতা শুনাইল।

এদিকে গ্রামের সকল যুবককেই প্রায় ধরিয়া আনিয়াছে। সকলেই মরণের জন্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কিশোরী ঘরে কিরিয়া আসিয়া দেখিল, বুড়া বাপ শেষ নিশ্বাস ফেলিয়া বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াছে। চক্ষু মুদ্রিত, বেদনার আর কোন চিহ্নও নাই। মৃতের শিররে একজন দীর্ঘাকার সুন্দর যুবা দাঁড়াইয়া, চক্ষু অশ্রুসিক্ত।

কিশোরী বলিল,—“মুরাদ! বাবাকে কবর দিয়ো তবে—আমি আসি।”

“মতিয়া!” তাহার চক্ষু বাষ্পপূর্ণ...স্বর গভীর ও উদ্বেলিত।

“না—ফুলের বাচ্চু নষ্ট হইয়া গেছে!”

চারি চোখের মিলনে আগুন বলসিয়া উঠিল।

ধীর অচঞ্চল পদক্ষেপে মতিয়া চলিয়া গেল।

মুরাদ একবার ক্ষত ছুটিয়া গিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, আবার থামিয়া নিজের বুক আঙ্গুল কামড়াইল।

মতিয়া সেনাপতির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া, বুকের জামার ভিতর হইতে রক্তাক্ত ছুরিকা বাহির করিয়া কহিল, “আমি খুন করেছি!”

“তুই ? কেন, চুমু খেয়েছিল ব’লে ?”

“হঁ। ! সে চুম্বন অন্যের জন্য ছিল, সে জোর ক’রে কেড়ে নিয়েছে। আমাদের অধিকার, আমাদের দেশ, আমাদের বা কিছু প্রিয়, সব নিয়েছে, শেষ অধরের যে সোহাগ, যে পবিত্রতা, সেটুকু পর্য্যাপ্ত নিলে, তাই স্বপ্নিগের রক্তে তার দাম চুকিয়ে দিতে হয়েছে। আমিই খুনী !”

“আচ্ছা, এখন ওই ওষ্ঠাধরের পবিত্রতা ও মাধুর্য্য কেমন থাকে দেখছি ? নাদির !”

সেনাপতি নাদিরকে কি বলিলেন। নাদির চলিয়া গেল।

মূহূর্ত্ত পরে নাদির লাল ডগডগে লোহার সাঁড়াসী লইয়া আসিল। ছইজনে মতিয়ার হাত জোর করিয়া ধরিয়া রহিল, একজন নষ্টক ছই হাতে চাপিয়া ধরিল। মতিয়া স্থির অচঞ্চল।

গ্রামবাসী যুবকদিগের মধ্য হইতে মুরাদ সিংহের মত লাকাইয়া পড়িল। তুর্কী সৈন্তাধ্যক্ষ সেই নিরস্ত্র যুবককে এক আঘাতে পাতিত করিলেন। মুরাদ বিষম আঘাতে পড়িয়া গেল।

ওদিকে হতভাগিনী মতিয়ার মুখ, ওষ্ঠ, অধর, কপোল সব বলসিয়া নীলমূর্ত্তি ধারণ করিল। আহতা সিংহিনীর মত একবার মাথা তুলিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

সেনাপতি বলিল, “বাও, এইবার আবার চুমুর দাম আদায় কর গে।”

খলিতচরণে মুরাদ একবার উঠিয়া মতিয়াকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ছই হাতে গলা জড়াইয়া সেই দৃঢ় অধরে চুম্বন করিল।

পার্শ্বে পর্বতগাত্রে বন-গোলাপের ডাল হইতে ঝর্-ঝর্ করিয়া গোলাপের পাপড়ি তাহাদের উপর ছড়াইয়া দিয়া, একটা দম্কা হাওয়া হা হা করিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীমতেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

জীবন ও জীবনের ধর্ম

জীবন,—বিশ্ব-জগতের চির-প্রবাহিত এই বাণী! কত আশা, উৎসাহ ও আনন্দ এই তিনটি অক্ষরের ভিতর দিরা কুটিয়া উঠিয়াছে;—অনন্ত বিশ্ব-জগতে এই জীবন-স্রোত নিত্য প্রবাহিত এবং অনন্ত বিশ্ব-জগৎ এই জীবনের জন্ত লাগান্নিত। বস্তুতঃ আমরা সকলেই জীবনের জন্ত লাগান্নিত বটে, কিন্তু জীবন যে কি, তাহা আমরা বথার্থ অনুভব করিতে পারি না এবং এই জীবন-স্রোত বিশ্ব-জগতে চির-প্রবাহিত বটে, কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

আমরা জীবন চাই ও মৃত্যুর নামে শিহরিয়া উঠি—আমরা জীবনের দীপ্ত-আলোকের পশ্চাতে মৃত্যুর করালচ্ছায়া সর্বদাই দেখিতে পাই এবং জীবনের জন্ত ব্যাকুলিত হইয়াও মৃত্যুকেই সচরাচর-আলিঙ্গন করিয়া থাকি। কিন্তু কি যে জীবন, কিই বা যে মৃত্যু, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। প্রিয়জনের উৎক্লম্ব আনন্দ প্রতিনিয়ত আমাদেরকে আনন্দ দান করিতেছে, এই তাহাকে দর্শন করিতেছি, এই তাহার মধুময় বাণী শ্রবণ করিতেছি, এই তাহার বক্ষঃ-স্পন্দন আমরাই বক্ষঃ-স্পন্দনের সহিত একীভূতভাবে অনুভব করিতেছি, কিন্তু কোথা হইতে এক কৃক্ক-ববনিকা পতিত হইল, মুহূর্ত্তে সবই অন্তর্হিত। কোথায় সেই নরনের উজ্জল দৃষ্টি, কোথায় কণ্ঠে সেই শত আশাময় বাণী—কোথায় সেই বক্ষঃ-স্পন্দন। এই কি জীবন?—এই কি মৃত্যু? উভয়ের মধ্যে কোনটাই বা সত্য?—জীবন অথবা মৃত্যু? আমরা ভাবিয়া আকুল হই, কিন্তু কি যে জীবন অথবা মৃত্যুই বা কি, তাহা আমরা বথার্থ উপলব্ধি করিতে অক্ষম। জীবন কি, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না, তাই মৃত্যুর নামে শিহরিয়া উঠি। পৃথিবীতে এক ব্যতীত ছুই নাই, বাহা নিত্য সত্য, তাহাই চির-বর্তমান। আলোকের অভাবই বৈরাগ্য অন্ধকার, বস্তুতঃ অন্ধকারের কোনও পৃথক সত্তা নাই, সেই প্রকার জীবনের অভাববোধই মৃত্যু, বস্তুতঃ এই অনন্ত-প্রবাহিত জীবন-স্রোতে মৃত্যু-নামক কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই। মৃত্যু আমাদের মনঃকল্পিত বিভাবিকা মাত্র, তদতিরিক্ত কিছুই নহে এবং এই মৃত্যু-বিভাবিকাই আমাদেরকে বথার্থ মৃতবৎ করিয়া থাকে।

আমরা জীবনের জন্ত ব্যাকুল, কিন্তু বথার্থ জীবনে জীবিত নহি। এই-যে আমরা চলিতেছি কিরিতেছি, প্রাণ-স্পন্দনে স্পন্দিত হইতেছি, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সজীবিত হইতেছি, এই যে পঞ্চ কর্ম্মজিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেজিয়-সংযুক্ত হইয়া যেন কাহারও করণত

পুস্তলিকার মত ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছি, ইগাই কি জীবন ? এই কি জীবন, যে জীবনে জীবিত হইয়া, আমরা অর্থ-পিপাসায় উন্মত্ত হইয়া একে অপরের সর্বনাশ-সাধন করিতেছি, ভোগ-লালসায় অধীর হইয়া ইহ-পরলোক সকলই ভুলিয়া বাইতেছি, ক্ষণিক সুখের জন্য কানিয়া গুনিয়াও অনন্ত দুঃখের পথে অগ্রসর হইতেছি, এই কি জীবন ? এই কি জীবন, যে জীবনে জীবিত হইয়া আমরা কর্কশ বাক্যে ও নিষ্ঠুর ব্যবহারে অপরকে সর্বদাই বাণিত করিতেছি, আপনাকে সকলের শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া হান্তকর দাস্তিকতা প্রদর্শন করিতেছি, বাক্যে এক এবং কার্যে অন্য পথ অবলম্বন করিয়া সর্বদাই আপনাকে মিথ্যার আবরণে আবৃত করিয়া রাখিতেছি—এই কি জীবন ? এই কি জীবন, যে জীবনে জীবিত হইয়া আমরা সর্বদা মৃত্যু-ভয়ে কম্পিত হইতেছি এবং মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়াও নিজেই নিজের আত্মহত্যা সাধন করিতেছি,—এই কি বিশ্ব-লোক-বাহিত জীবন ? হায় দুর্বল হৃদয়, এই কি তুমি অমর হইতে বাসনা কর ? এই কি তুমি অনন্ত জীবনের জন্য লালসায়িত ?

জীবন যে কি, তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন তিনি—যিনি অশুরের বিরুদ্ধে দেবসংগ্রামের জন্য,—পাপের বিরুদ্ধে পুণ্যের বিজয়-লাভ জন্য অকাতরে আপন অস্থি দান করিয়াছিলেন, সেই লোক-পূজ্য দেব-বরেণ্য দ্বীচী যুনি । জীবন যে কি, তাহা বথার্থ তিনিই জানিয়াছিলেন—যিনি জরা, মৃত্যু ও শোক-পরিপূর্ণ সংসারে প্রাণিগণের দুঃখ-দুর্দশা দর্শন করিয়া করুণা-বিগলিত হৃদয়ে যুহুর্ভে ঐহিক সুখ-সম্পদ অকাতরে তুচ্ছ করিয়া, নানা প্রলোভন পরাজয় পূর্বক ধ্যান-নিরত সমাধিস্থ হইয়া বিশ্ব-জগতেব দুঃখের প্রতীকারের জন্য নির্দোষ-সুখা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ শাক্যসিংহ । জীবন যে কি, তাহা বথার্থ জানিতেন তিনিই—যিনি বিপথগামী জীবগণের জন্য স্বর্গের সমাচার বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, যিনি নির্দয় উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়াও উৎপীড়কগণের জন্য প্রার্থনা করিয়া গিয়াছিলেন এবং পরিশেষে ক্রুণ-বিদ্ধ হইয়া নিজের দেহাবসান করিয়া অনন্ত জীবনের বার্তা ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রাণ খৃষ্ট ।

বথার্থ যে জীবন, তাহা অগ্নিশুলিনের স্তায়, আপনার তেজে আপনিই প্রদীপ্ত এবং চতুর্দিকস্থ যাহা কিছু তাহাকেও উত্তপ্ত করিয়া তোলে । বথার্থ যে জীবন, তাহা নিত্যপ্রবাহিত বায়ু-হিল্লোলের স্তায় আপনি চঞ্চল এবং অপরকে চঞ্চলতা-প্রদানকারী । ওঠ, ছোট, হে মানব, অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান্ তোমার এই জীবন । যে দেহ ছুট, বাতব্যাধি-রোগগ্রস্ত, তাহা বেরূপ দেহপদবাচ্য হইয়াও দেহ নয়,—নিষ্ক্রিয় জড়-পিণ্ড-মাত্র, সেইরূপ সর্বদা মৃত্যু-বিভীষিকায় অভিভূত এই যে জীবন আমরা বহন করিতেছি, তাহা বথার্থ জীবন নহে, জীবনের প্রতিচ্ছায়ামাত্র । আমাদের মধ্যেই বথার্থ জীবনের বীজ নিহিত রহিয়াছে, স্বকীয় চেষ্টায়ই আমরা তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে

পারি। কোনও প্রকারে প্রাণ বাঁচাইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ ও মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হওয়াই তোমার নিয়তি নহে, জল, অগ্নিস্থলিঙ্গের মত প্রজ্জ্বলিত হইয়া বিশ্ব-জগৎ উজ্জল করিয়া তোল, ওঠ, ছোট, বেগবান্ বায়ুর স্তায় দিকে দিকে প্রধাবিত হও, আপনার উৎসাহে অপরকে উৎসাহিত, আপন জীবনে অপরকে সঞ্জীবিত কর।

যথার্থ জীবনে যখন আমরা সঞ্জীবিত হই, তখন মৃত্যু আমাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, ‘তবুই মৃত্যু’, ইহা ঠিক সত্য। আমরা কি দেখিতে পাই না যে, আমরা জীবন—অর্থাৎ আমরা বাহ্যকে জীবন বলিয়া থাকি, সেই তথাকথিত জীবনে জীবিত হইয়াও মৃতবৎ, কিন্তু আমরা বাহ্যকে মৃত্যু বলি, মহাপুরুষগণ সেই তথাকথিত মৃত্যুর ভিতর দিয়াই আমাদের যথার্থ বে জীবন, তাহার সন্ধান দিয়া থাকেন।

কোনও প্রকারে প্রাণ বাঁচাইয়া চলাই জীবনের ধর্ম নহে, মৃত্যুকে অতিক্রম করাই জীবনের ধর্ম। প্রিয়জন-বিয়োগে ব্যাকুল হইয়া যখন আমরা পৃথিবীকে মক্কাভূমির মত দেখিয়া থাকি, যখন আমরা মৃত্যুযবনিকার পরপারে অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই না, তখন যদি আমরা বুঝিতে পারি—জানিতে পারি যে, ঐ যবনিকা কণিক আবরণমাত্র, তখন যদি বুঝিতে পারি যে, ঐ দৃষ্টি-বিলম্ব-কারী তমসার পরপারে চির-উজ্জল আলোক, তবে কি আমরা আমাদের শোক-দগ্ধ প্রাণে বহুল পরিমাণে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হই না? যখন আমরা পাপ ও দুর্গতির পথে অগ্রসর হই, যখন কণিক বর্তমানের মোহে মুগ্ধ হইয়া বাহ্যিক জীবনকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাই, তখন কি আমরা যথার্থ বিশ্বাস করি যে, মৃত্যু কাল্পনিক বিভীষিকামাত্র, তাহার অস্তিত্ব নাই? পরলোক সম্বন্ধে আমরা বহুতর আলোচনা করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা যদি যথার্থই তাহাতে বিশ্বাসবান্ হইতাম, তবে কেন প্রতিনিয়ত হৃৎকের কঠোর স্পর্শে জীবনমৃত অবস্থার থাকিব? আমরা যথার্থই যদি জীবনের জন্ত লালসিত হইতাম, তবে আমাদের হৃদয় সতত উৎসাহ ও আশার পরিপূর্ণ থাকিত, তবে আমরা মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াও জীবনের স্পন্দন অনুভব করিতাম। নটিকেতা যেরূপ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া অমৃতের সন্ধান আনিয়াছিলেন, আমরাও সেইরূপ করিতে সমর্থ হইতাম।

হে অমৃতের পুত্র মানব! চাহিয়া দেখ, একবার এই বিশ্বজগতের পানে একবার প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়া দেখ, এই চির-প্রবাহিত জীবন-স্রোত। ঐ যে তোমার মস্তকোপরি দিগন্ত-প্রসারিত উজ্জল নীল আকাশ দূর চক্রবাল-রেখার মিশিয়া গিয়াছে, এই যে শস্যশ্যামলা ধরণী পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া দীপ্ত সূর্য্য-

কিরণে হাসিতেছে, এই যে বিহঙ্গ-কুল চিরমধুর সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ করিয়া তোমার হৃদয়ে স্বর্গীয় আনন্দের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে কোথাও কি মৃত্যুর আভাস দেখিতে পাও ?

একই আবচ্ছিন্ন জীবন-প্রবাহ সর্বত্র প্রবহমান ; একই অখণ্ড চৈতন্য এই বিশ্ব-জগতের প্রতি রেণু-কণার বর্তমান ; জড়ে তাহা নিদ্রিত অবস্থায়, বৃক্ষলতা এবং মানবেতর প্রাণীতে তাহা ক্রমোন্মেষিত এবং মানবেই তাহা অধিকতর জাগ্রত-রূপে বর্তমান । অধিকন্তু এই মানব-সম্প্রদায়েও আমরা এই চৈতন্য-শক্তির তারতম্য সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি । এই মানব-জীবনেই পশু ও দেবত্বের একত্র সমাবেশ,— আমরা আমাদের স্বকীয় ইচ্ছানুসারেই পশু অথবা দেবত্ব লাভ করিয়া থাকি । এই যে ইচ্ছা-শক্তি, ইহাতেই মানব জীবনের বিশেষত্ব, এই শক্তি যাহাতে প্রবল, তাহার অপ্রাপ্য কিছুই নাই । মানবেতর প্রাণী অথবা বৃক্ষলতা-শুল্ক ইত্যাদিতে এই ইচ্ছা-শক্তির অভাব বলিয়াই তাহারা মানবাপেক্ষা নিকট পর্য্যায়ভুক্ত । তাহারা প্রকৃতি কর্তৃক পরিচালিত হইয়া, প্রকৃতির একান্ত বশীভূত হইয়া জীবন ধারণ করে এবং কাল-অনুসারে জীব-দেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে । কিন্তু মানব-জীবন সেরূপ নহে ; এই জীবনে জীবিত হইয়া মানব স্বকীয় ইচ্ছায় প্রকৃতিকে আপন বশীভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়া থাকে, এবং প্রকৃতির উপর আধিপত্য করিতে সমর্থ হয় । এই ইচ্ছা-শক্তি যাহাতে প্রবল, সে বিশ্ব জয় করিতে সমর্থ । সে অর্থ কামনা করিলে ধনবান হইবে, যশ কামনা করিলে যশস্বী হইবে এবং সে মুক্তি কামনা করিলে মুক্ত হইবে । ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল তাহার করতলভ্রমর । এই ইচ্ছাশক্তি যাহার প্রবল, সে আপন নির্দোষিত পন্থা অনুসারে পশু হইতেও অধম এবং দেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠ হইতে সমর্থ । এই ইচ্ছা-শক্তির যাহাতে একান্ত অভাব, সে মানবদেহধারী হইয়াও প্রকৃতি-পরিচালিত একটি বস্তু ব্যতীত অপর কিছুই নহে ।

মানব-জীবনের অপর বিশেষত্ব হইতেছে প্রেম, এই প্রেমই মানুষকে মহৎ করিয়া তোলে, এই প্রেমই মানব-জীবনে পবিত্রতা, সুখ ও শান্তির উৎস, এই প্রেমের অনুশীলনেই মানুষ-জীবনের সফলতা এবং এই প্রেমই মানুষ মৃত্যুকেও জয় করিয়া থাকে । এই প্রেমই মানব-জীবনে ত্যাগ শিক্ষা দিয়া থাকে এবং ত্যাগই মুক্তির উপায় । পারিবারিক ক্ষুদ্র গভীর মধ্যে এই প্রেমের বাজ নিহিত থাকে,—পরম্পর পরম্পরের প্রতি স্বার্থত্যাগেই ইহার বিকাশ ; এবং ইহাই ক্রমে বর্দ্ধিত ও পল্লবিত হইয়া দিগ্দিগন্তে শাখা বিস্তৃত করিয়া মানব-জীবনকে মহৎ ও মহত্তর করিয়া তোলে । যে আকর্ষণে পক্ষিদম্পতী আপনাদের ক্ষুদ্র নীড় রচনা

করিয়া থাকে ও ঐকান্তিক আগ্রহে আপনাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া স্বকীয় সুখ-সুবিধা, এমন কি, সময়বিশেষে আপন প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া স্বকীয় শাবক-গুলিকে প্রতিপালন করিয়া থাকে, তাহার ভিতরেও আমরা আশ্চর্য্য স্বার্থত্যাগ ও অপূর্ণ মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কিন্তু তাহাদের ঐ আকর্ষণ ক্ষণিক, প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত হইয়াই তাহারা ঐরূপ করিয়া থাকে—একমাত্র মানব-জীবনই প্রেমের লীলাভূমি এবং এই প্রেমের বিকাশের তারতম্য অনুসারেই মানব-জীবনের সার্থকতার তারতম্য। প্রিয়জন-মিলনে তুমি উৎফুল্ল হও, হে মানব! প্রিয়জন-বিচ্ছেদে তুমি ক্রন্দন কর, যে বলে বলুক, উহা শুধুই দুর্দলতা, জ্ঞান ও মোহ মাত্র; আমি তাহা বলি না। যে হাসিতে ও কাদিতে জানে না, সে মৃত, প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত হইয়াও সে জীবিত নহে। তবে কি না, ইহাও সত্য যে, আমরা যে সকলেই প্রেমের বশীভূত হইয়াই ঐ আনন্দ ও বেদনা অনুভব করিয়া থাকি, তাহা নহে, আমরাও অনেকেই ঐ পক্ষিপক্ষীতীরই মত প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়মিত হইয়া থাকি মাত্র।

মহাপুরুষগণের জীবনেই আমরা এই প্রেমের মহত্তম প্রকাশ দেখিতে পাই। ভগবান্ বুদ্ধ ও খ্রীষ্টেতত্ত্বদেবের জীবন এই প্রেমের অগস্ত্য দৃষ্টান্ত। তাঁহাদের জীবন দ্বারা আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই যে, হৃদয়-হীনতাই সন্ন্যাস নহে, বিরক্তি ও ঘৃণায় যে ত্যাগ ও আত্মমোক্ষকামনার যে উদাসীনতা, তাহা স্বার্থ-পূর্ণ। প্রেমমত্তে যে দীক্ষিত, প্রকৃত ত্যাগ শুধু তাহাতেই সম্ভব। আপনাপন পরিজনবর্গকে পরিত্যাগ করিতে উক্ত মহাপুরুষদ্বয় যেরূপ বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই অপরে অনুভব করিতে পারিবে না। একটি ছাগ-শিশুর জন্ত যিনি অকাতরে প্রাণ দিতে উৎসুক,—প্রহৃত হইয়াও যিনি প্রহারকে প্রেমালিঙ্গন দিতে উত্তত, এইরূপ মহাপ্রেমিক বাহারা, তাঁহারা কখনই আপন পরিবারবর্গের প্রতি প্রেমশূন্য হইতে পারেন না। কিন্তু বেদনা যেখানে যত অধিক, ত্যাগে সেখানেই তত মহত্ত্ব। বাহার আছে, সে-ই দিতে পারে, এবং যে অকাতরে আপন সর্বস্ব দান করিতে পারে, তাহারই দান মহৎ। তাই আমরা যখন দেখিতে পাই যে, জগৎ-জীবের কল্যাণার্থ বিশ্ব-প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া ইহারা আপন হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াও সর্বস্ব সমর্পণ করিতেছেন, তখন স্বতঃই আমরা তাঁহাদের চরণ-প্রান্তে প্রণত হই। যুগ-যুগান্তর অতীত হইয়াছে, শতাব্দীর ক্রন্দনে এখনও আমরা অশ্রুতে অভিষিক্ত হইতেছি, আর খ্রীষ্টেতত্ত্বদেব কি সে ক্রন্দনে অসীম বেদনা অনুভব করেন নাই? কিন্তু বিশ্বকল্যাণ-প্রস্থ তাঁহাদের যে অগাধ প্রেম, সেই প্রেমের বেদনাও কত আনন্দপ্রদ, তাহা একমাত্র সেই মহাপ্রেমিকগণই অনুভব করিতে সমর্থ।

বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, “মনে কর—এই জগতের হৃৎকেন্দ্র আমার যদি

হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেবো।” কি মহাপ্রাণ, আপন মুক্তিকামনাও তুচ্ছ করিতেছেন! বিগত প্রেমই এই মহা-প্রাণতা প্রদান করিতে সমর্থ। পৌরাণিক আখ্যানে আমরা রাজর্ষি বিপশিৎকে দেখিতে পাই, তিনি নরকে পাপীর হৃদয় দর্শন করিয়া ব্যথিতচিত্তে আপন পুণ্যফল তাহাদের সমর্পণ করিতেছেন; তদীয় সঙ্গ-লাভে পাপিগণ মুখামুভব করিতেছে বলিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপন প্রাপ্য স্বর্গস্থ ভোগ করিতে যাইতেও তিনি উৎসুক নহেন, তাহাদিগের সহবাসই তিনি কাম্য মনে করিতেছেন। এই যে প্রেম, এই যে আকাশের মত উদার, সলিলের মত স্নিগ্ধ, বায়ুর মত জীবনসঞ্চারকারী, পৃথিবীর মত সুন্দর প্রেম, ইহাই মানব-জীবনের বিশিষ্ট প্রকৃতি।

এই মানব-জীবনেই আমরা জ্ঞানের উন্মেষ ও বিকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। মানবের প্রাণী প্রাকৃতিক সংস্কারবশতঃই সকল কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে এবং বংশ-পরম্পরাক্রমে একই প্রকারে জীবন অতিবাহিত করিয়া যায়। পরন্তু মানব এই জ্ঞানবলেই প্রতি পদক্ষেপে ভূপতিত হইয়াও সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে, প্রত্যেক বিষ ও বিপত্তির তিতর দিয়াই নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছে। এই জ্ঞানই তাহাকে জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিচার-শক্তি প্রদান করিয়া আত্মোন্নতিতে প্রবুদ্ধ করিতেছে। এই জ্ঞানের অমূল্যলভনই মানব-জীবনের লক্ষ্য এবং এই জ্ঞান দ্বারা যখন আমরা স্ব স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই এবং এই জ্ঞানের ক্রমোন্মেষে যখন আমরা এই যে বিশ্ব-জগতে এক অবিচ্ছিন্ন জীবন-স্রোত নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, সেই জীবনস্রোতের সঙ্গে স্বকীয় জীবনকে একীভূতভাবে অমুভব করিতে সমর্থ হই, তখনই আমরা যথার্থ জীবনে জীবিত হইয়া পূর্ণ আনন্দের অধিকারী হইয়া থাকি।

এই জগতের মধ্যে যে শক্তি ওত-প্রোতভাবে বর্তমান, যিনি এই বিশ্ব-জীবন, তাহারই প্রদত্ত ও তাহা হইতেই উদ্ভূত আমাদের এই জীবনে সেই অনন্ত শক্তির, অনন্ত আনন্দের ও অনন্ত জীবনের বীজ নিহিত রহিয়াছে। হে মানব, জাগ্রত হও, তোমার প্রতি রক্ত-কণিকায় সেই তাড়িত-শক্তি অমুভব কর, দেখিবে, তোমার কি অদম্য উৎসাহ, কি অজস্র শক্তি, কি বিশ্ববিপ্লবকারিণী প্রতিভা! তুমি ক্ষুদ্র নহ, তুমি হুর্দল নহ, তোমার প্রবল ইচ্ছার নিকট সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অগ্নিমুখে মধুথের জ্বালা বিগলিত হইয়া যাইবে। একবার শুধু জীবনলাভে সচেষ্ট হও, মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ বাচাইয়া চলাকেই সর্বস্ব মনে করিও না, শুধু নিঃশ্বাস-গ্রহণই জীবন নহে, যথার্থ যে জীবন, তাহা লাভ করিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম কর। তার পর দেখিবে, কি তোমার শক্তি, জীবনই বা কি, তাহা বুঝিবে। তখন দেখিবে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্কর্গ তোমার করতলগত, ইচ্ছা করিলেই তুমি তাহা লাভ করিতে পার। তখন তটিনীর কল্লোলে,

বৃক্ষরাজির পত্রমণ্ডরে, পবনের মৃদু সঙ্গীতে শুধু জীবনের বার্তাই তুমি শ্রবণ করিবে। মেঘের গর্জন, সাগরের কল-নিদ্রা, ঝটিকার ভীম রোল তখন তোমার নিকট জীবনের বার্তাই বহন করিয়া আনিবে। বিশ্বজগতে নিত্য প্রবাহিত যে আনন্দ-স্রোত, তুমি তাহা নিজের প্রতি ধমনীতে অনুভব করিয়া সকলকাম হইবে।

অতএব হে হৃদয়! তুমি জাগ্রত হও, আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ ও আত্মশক্তিতে নির্ভর-শীল হইয়া আপন জীবন সার্থক কর। ভগবৎ-কৃপায় যে সমুদ্র জীবন তুমি লাভ করি-
য়াছ, স্বেচ্ছায় তাহা ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইও না। দূর কর তোমার এই জড়তা,
যাহা তোমাকে এই ক্ষুদ্র গগণের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; দূর কর তোমার ঐ
চোখের আবরণ, যাহা তোমাকে নিজ শক্তি অনুভব করিতে অক্ষম রাখিয়াছে; দূর
কর তোমার ঐ মৃত্যু-বিভীষিকা, যাহা তোমাকে জীবনের আশ্বাস হইতে বঞ্চিত
করিয়া রাখিয়াছে।

তার পর দিকে দিকে এই জীবনের বার্তা ঘোষণা কর, দেখিবে, জীবন ছাড়া আর
কিছুই নাই। যে নিজ জীবন লাভ করিয়াছে, সেই অন্তকে জীবনদান করিতে
সমর্থ; যে মৃত, সে অপরকে মৃত্যুমুখেই টানিয়া লয়। একবার জলিয়া উঠিলে দাবানল
যে রূপে মুহূর্তে কানন হইতে কাননান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সেইরূপ একজন যখন
প্রকৃত জীবনে জীবিত হয়, তখন মুহূর্তে দিগ্দিগন্তে জীবনস্রোত প্রবলবেগে
প্রবাহিত হইয়া থাকে।

গিরি-নিরঙ্কুশ ক্ষুদ্র নিরুপরিণী বেক্ষণ কোনও প্রকারে আপন ক্ষুদ্র গগণী একবার
অতিক্রম করিতে পারিলে প্রবলবেগে প্রস্তররাশি ভাঙ্গাইয়া নিয়া বিশাল হইতে বিশাল-
তর হইতে থাকে ও পৃথিবীকে আপন সলিল-ধারায় স্ত্রামল, স্নিগ্ধ ও উর্বরা করিয়া
ক্রমশঃ সাগরের দিকে প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে সেই অকূল বারিরাশিতে আপন
অস্তিত্ব মিশাইয়া দিয়া থাকে, সেইরূপ আমাদের ক্ষুদ্র জীবনও একবার যদি আপনার
ক্ষুদ্র গগণী অতিক্রম করিতে পারে, তবে মুহূর্তে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রবল
শক্তিতে শক্তিমান হইতে থাকে এবং ক্রমবিস্তৃতি লাভ করত এক অনন্ত জীবনস্রোতে
পরিশেষে আপন অস্তিত্ব মিশাইয়া দেয় ও সমস্ত ধরণীকে আচ্ছাদন করিয়া প্রতিনিয়ত
এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকে;—

‘উত্তীর্ণত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।’ ইহাই মানব-জীবনের চরম পরিণতি
এবং উহাতেই তাহার সার্থকতা।

ত্ৰিআশাসতা সেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮১৭—১৯০৫)

“Vaidantic Doctrines Vindicated” (1845)

দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে, V, D, V, গ্রন্থখানি যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। নারায়ণের বৈশাখসংখ্যার পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রাবণের ‘ভারতী’ আমার V. D. V. গ্রন্থখানির আলোচনা সম্বন্ধে আপত্তি প্রকাশ করিয়া, উক্ত সংখ্যার গোড়া-কার প্রবন্ধেই এক প্রতিবাদ জাহির করিয়াছেন। তজ্জন্ত আমি পুনরায় V. D. V. গ্রন্থখানির আলোচনার বাধ্য হইলাম।

ভারতীর প্রতিবাদকারী লেখকের নাম হইতেছে, ‘ত্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।’ ইনি বেনামী কি বেনামী, তাহা বুঝিলাম না, কিন্তু বাহাই হউন, আমার V. D. V. গ্রন্থের আলোচনার দেবেন্দ্রনাথের জীবনোলেখক ত্রীমজিতকুমার চক্রবর্তীর বিশালকার গ্রন্থখানির যে স্থানে স্থানে আঘাত লাগিয়াছে ও ক্ষত হইয়াছে, ইনি সেই সমস্ত ক্ষতস্থলে প্রলেপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অজিত বাবু আমার বন্ধু। ক্ষত জুড়িয়া গেলে ক্ষতি ছিল না, বরং আমিই তাহাতে সকলের আগে খুসী হইতাম। কিন্তু ওই প্রলেপে বিশেষ কোন ফল হইবে বলিয়া যেন আমার মনে হইতেছে না।

প্রথম প্রশ্ন উঠিয়াছে এই যে, আলোচ্য V. D. V. গ্রন্থখানি কাহার রচনা? শ্রদ্ধের পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ, ইহারা দুইজনে ইহা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, এই গ্রন্থের (প্রবন্ধের) রচনাকালে রাজনারায়ণ বাবু ব্রাহ্ম-সমাজে আসেন নাই, এবং ইহাও একাধিক প্রমাণে স্বীকৃত যে, ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পর্কে রাজনারায়ণ বাবুর প্রথম রচনা হইতেছে, উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ। আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, লিওনার্ড সাহেব যে ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহার মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন রাজনারায়ণ বাবু। যদি রাজনারায়ণ বাবু V. D. V. লিখিয়া থাকিতেন, তবে নিশ্চিতই লিওনার্ড সাহেবকে সে কথা তিনি বলিতেন। আর লিওনার্ড সাহেব যখন তাঁহার নিকট হইতে এত কথা শুনিয়া লিখিয়াছেন, কাজেই এ কথাটা তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গেই লিখিতেন। কিন্তু লিওনার্ড ত রাজনারায়ণ বাবুকে রচয়িতা বলিয়া নির্দেশ করিলেন না, এবং সেজন্য রাজনারায়ণ বাবু বা তাঁহার কেহ কোন আপত্তিও করিল না। অথচ পণ্ডিত শাস্ত্রী

মহাশয় এককাল পরে সমগ্র ব্রাহ্ম-সংস্কারের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া লিখিলেন কি না, দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ এই V. D. V. লিখিয়াছেন।

এইবার ভারতীর ‘ত্রীসত্যত্রয়ের’ প্রলেপের নমুনাটা দেখাইতেছি। প্রলেপ বলিতেছেন হা, হা, শাস্ত্রী মহাশয়ের ইতিহাসই “ব্রাহ্ম-সমাজের একমাত্র ণীটি ইতিহাস।” কেন না—“ঐ ইতিহাসের বহুতথ্য তিনি মহর্ষি মহাশয়ের (?) সমুখাৎ শ্রবণপূর্কক লিখিয়াছেন, সুতরাং উহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য।” বেশ কথা। ভগবানের কৃপায় শাস্ত্রী মহাশয় এখনও জীবিত। তিনিই কেন না হলফ্ করিয়া বলুন যে, V. D. V. সে দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বাবুর রচনা, তাহা তিনি ‘মহর্ষি মহাশয়ের সমুখাৎ শ্রবণ পূর্কক লিখিয়াছেন?’ যদি এই কথা আজ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় হলফ্ করিয়াও বলেন, বাহা তিনি কালী-কলমে লিখিয়া ছাপাইয়াছেন, তবে তাহার উত্তরে আমরা বলিব, হয় দেবেন্দ্রনাথ মিথ্যা বলিয়াছেন, না হয় পণ্ডিত শিবনাথ মিথ্যা শুনিয়াছেন।

ভারতীর প্রলেপ বলিতেছেন,—হা, হা, শাস্ত্রী মহাশয় যে একেবারে নিভুল লিখিয়াছেন, তাহা কি বলি। ভুল আছে—ভুল আছে। তবে ‘হু একটা’। যেমন! যেমন এই রাজনারায়ণ বাবু দ্বারা যে V. D. V. রচিত হইয়াছিল, এইটেই ভুল!! রাজনারায়ণ বাবুই, দেবেন্দ্রনাথের ইংরেজী লেখার ব্যাপারে লিপ্ত এবং নিযুক্ত ছিলেন কি না,— তাই শাস্ত্রী মহাশয়ের এই ভুলটা হইয়া গিয়াছে। আহা!

ইহা হইতে কি প্রমাণ হয়? দেবেন্দ্রনাথের ‘সমুখাৎ শ্রবণপূর্কক’ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়া গেলেও, তাহাতে ভুলের সম্ভাবনা আছে, এবং অন্ত্যস্ত প্রমাণ ব্যতিরেকে “উহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য” নহে। “সর্বসাধারণের নিকট ভক্তিভাজন বাহারা”, আমিও মনে করি, শ্রদ্ধের পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে এক জন। কিন্তু আবার আমি ইহাও মনে করি, “সর্বসাধারণের নিকট ভক্তিভাজন বাহারা”, এবং বাহারা নহেন, এই উত্তরেবাই যদি ইতিহাস লিখিতে গিয়া অজ্ঞানতঃ বা জ্ঞানতঃ মারাত্মক সব মিথ্যা কথা (অর্থাৎ বাহা সত্য নয়) লিখিয়া যান, তবে তাহা যে মিথ্যা, এ কথা বলিয়া দেওয়া ভাল। ‘সর্বসাধারণের নিকট ভক্তিভাজন’দের মিথ্যা উক্তিগুলিকে সত্য বলিয়া নির্বিবাদে মানিয়া লওয়া Bacdu কথিত idols গুলির মধ্যেই ধর্তব্য, তদপেক্ষা বেশী কিছু নহে। কাজেই শ্রদ্ধের পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধে আমি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম এবং এখনও ছঃধের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ‘সংস্কার-যুগের ইতিহাস-লেখকদের মধ্যে তাঁহার মত দারিদ্র্যবোধহীন লেখক আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।’ কেন না, আরতনে তিনিই সব চেয়ে বিরাটকার ইতিহাস লিখিয়াছেন, এবং সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ভুলও, (নানা প্রকারের এবং ‘হু একটা’ নহে।)

আমার বিবেচনায় তিনিই করিয়াছেন। সুতরাং ভারতীয় প্রলেপ আমি এ বিষয়ে মুছিয়া ফেলিতে বাধ্য হইলাম।

তবে V. D. V. এর রচয়িতা কে? লিওনার্ড সাহেব বলেন, চন্দ্রশেখর দেব। আর কেহর নামোল্লেখ তিনি করেন না। ইহাতে দেবেন্দ্রনাথের 'দেড় বছরব্যাপী' জীবনী' লেখক আমার বন্ধু অজিত বাবু বেজার খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু খাপ্পা হইলেই মানুষ সব সময়ে খাপ্পা দিয়া সামলাইতে পারে না। যা হোক, বন্ধু অজিত বলেন, তা চন্দ্রশেখর দেব রচয়িতা হয় হউক, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথও তাঁর সঙ্গে আছেন। বন্ধু অজিত দেবেন্দ্রনাথকে লইলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে, আর চন্দ্রশেখর দেবকে লইলেন, লিওনার্ড সাহেবের কাছ হইতে। কিন্তু তিনি এই উভয়কে যে অপূর্ব সংমিশ্রণে জুড়িয়া দিলেন, এইখানেই তাঁর মৌলিকত্ব। না দিয়া উপায় নাই। গ্রন্থখানি ইংরেজীতে লেখা। দেবেন্দ্রনাথ ইংরেজী লিখিতেন না। কাজেই কেহ একজন ইংরেজী লেখক ত চাই? তা যখন লিওনার্ড সাহেব চন্দ্রশেখর দেবের কথা বলিতেছেন, তখন থাক চন্দ্রশেখর দেবই। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন আর চন্দ্রশেখর দেব লিখিয়াছেন, এইরূপে V. D. V. র উদ্ভব হইয়াছে।

আমি বলিতে চাই, V. D. V. গ্রন্থ চন্দ্রশেখর দেব দেবেন্দ্রনাথের নিকট শুনিয়া তবে লিখিয়াছেন, ইহার প্রমাণ নাই। ইহা বন্ধু অজিতের কল্পনা-মূলক, এবং সেই কল্পনার মূলে কি প্রেরণা কার্য্য করিয়াছে, তাহা আমার অগোচর। আমার কথা এই— (ক) এ বিষয়ে লিওনার্ড সাহেবের গ্রন্থ বিশেষভাবে প্রামাণ্য। কেন না, এই গ্রন্থের মাল-মসলা রাজনারায়ণ বাবু সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। যদি এই গ্রন্থ-রচনায় দেবেন্দ্রনাথের কোনরূপ স্রবণীয় বা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব থাকিত, তবে রাজনারায়ণ বাবু তাহা লিওনার্ড সাহেবকে নিশ্চয়ই বলিতেন। (খ) এমনও কথা শুনিয়াছি যে, লিওনার্ডের এই গ্রন্থ-রচনায় স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ বিশেষরূপে উদ্যোগী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে ও উৎসাহে এই ইতিহাস রচিত হইয়াছে। রাজনারায়ণ বাবু যে এই গ্রন্থের জন্ত মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। (গ) কেশব ও কৈশবদিগের সহিত দেবেন্দ্রনাথের এত বিরোধ হয় যে, ১৮৬৬ খৃঃ কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে পরিত্যাগ করেন। এই বিরোধের সময় যে দলাদলি হয়, দেবেন্দ্রনাথ তাহার এক দলের প্রতিনিধি এবং কেশবচন্দ্র অন্য দলের প্রতিনিধিরূপে দণ্ডায়মান হন। এই উভয়দলের প্রত্যেক দলই বিপক্ষীয় দলকে মিথ্যাবাদী বলিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। লিওনার্ডের ইতিহাস কেশবচন্দ্র ও কৈশবদিগকে অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, দেবেন্দ্রনাথের দলকে সমর্থন করিয়াছেন। কাজেই দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহে, রাজনারায়ণের মাল-মসলা-সংগ্রহে, এবং দেবেন্দ্র

নাথের কার্যাবলীর সম্পূর্ণ সমর্থনে যে ইতিহাস, তাহা কিছুতেই V. D. V. গ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথের কৃতিত্বকে মুছিয়া ফেলিত না ; এবং তৎস্থানে একা চন্দ্রশেখর দেবের নামোল্লেখ করিত না। (ঘ) কাজেই চন্দ্রশেখর দেব একাই V. D. V. প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছেন, আমার এইরূপ বিশ্বাস। (ঙ) উপনিষদের শ্লোকাদির জন্য দেবেন্দ্রনাথের মুখাপেক্ষী হইবার কোন কারণ চন্দ্রশেখর দেবের ছিল বলিয়া আমি মনে করি না। ডফের সহিত বেদান্ত লইয়া যুদ্ধ হইবার প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের সহিত রামমোহনের যে প্রথম বেদান্ত-যুদ্ধ হয়,—Brahmanical Magazine গুলি বাহার সাক্ষ্য ও সাহিত্য,—সেই সাহিত্যে চন্দ্রশেখর দেবের অধিকার ও হস্ত আমরা দেখিতে পাই ; এবং সেই সাহিত্যে উপনিষদ ও তৎসঙ্গে দর্শন, পুরাণতত্ত্বের যে সমস্ত গবেষণা দৃষ্ট হয়,—তাহার সহিত যিনি সুপরিচিত, তিনি নিশ্চয়ই V. D. V. এর মধ্যে উপনিষদের শ্লোক বাছাইয়ের জন্যে দেবেন্দ্রনাথের মুখাপেক্ষী হইবেন না। (চ) Br. Magazineএ চন্দ্রশেখর দেবকে যে সংশ্লিষ্ট দেখা যায়—তাহা হয় ত প্রকৃত চন্দ্রশেখর দেব নয়। রামমোহনই চন্দ্রশেখরের ছদ্ম নাম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন,—এইরূপ আপত্তি উঠিয়াছে। উত্তরে বলিতে চাই যে, রামমোহন এ ক্ষেত্রে চন্দ্রশেখরের ছদ্মনাম গ্রহণ করেন নাই—‘শিবপ্রসাদ শর্মা’ এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর জীবিত এবং সুপরিচিত ও সহযোগী বন্ধুর নাম নিশ্চিতই রামমোহন ছদ্মনামরূপে গ্রহণ করিবেন না। তদ্ব্যতীত চন্দ্রশেখর দেবের সহিত Br. Magazineএর সাহিত্য-সম্পর্কে সম্বন্ধ এই যে, তিনি ইহার প্রকাশের সময় No IIIএর এক সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লেখেন এবং রামমোহনের সহিত সাধারণভাবে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ও বিশেষভাবে এই পাদ্রী-সংঘাত-জনিত সাহিত্যের সহিত তাঁহার সহানুভূতি ও সহযোগিতা হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, Br. Magazineএর ‘বাদান্তবাদে’ চন্দ্রশেখর উদাসীন ছিলেন না,—লিপ্ত ও উৎসাহী ছিলেন ; এবং এই সাহিত্যে সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, দর্শন পাঠ করিয়া, পাদ্রীদের বিরুদ্ধে যে জবরদস্ত জবাব তৈয়ার হইয়াছিল,—তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। এই সাহিত্যে তাঁহার প্রবেশ, অধিকার ও উৎসাহ সত্যই ‘ইতিহাস’। ইহাকে ‘গাঁজাখুরী গল্প’ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া একমাত্র গাঁজার দম দিয়াই সম্ভব, অন্তথা—নহে। সুতরাং ভারতীর এ প্রলেপটিও আমি মুছিয়া ফেলিতে বাধ্য হইলাম।

তদু মাত্র লিওনার্ড সাহেব লিখিয়াছেন বলিয়া নহে, উপরি-উক্ত একাধিক কারণে আমি একা চন্দ্রশেখর দেবকেই V. D. V. গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া মনে করিতেছি, এবং চন্দ্রশেখর দেব যে দেবেন্দ্রনাথের নিকট গিয়া ঐ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার একান্তই প্রমাণাভাব দেখিতেছি। সংস্কার-যুগের ইতিহাস-

সম্পর্কীয় প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত কোন পুঁথি-পত্রেই তাহা পাই নাই,—অবশ্য এক অজিত বাবুর গ্রন্থ ছাড়া। বাহা, বলা বাহুল্য, আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করি না। অজিত বাবুও এই অশ্রুতপূর্ব তথ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, তাহা বলিয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে তিনি যে সমস্ত কল্পনার জালবিস্তারের প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা সত্যের সম্যক্ রূপলাপ ঘটাইলেও,—হাস্তরসাত্মক সন্দেহ নাই।

তার পর প্রশ্ন উঠিয়াছে,—লিওনার্ডের ইতিহাস প্রামাণ্যগ্রন্থ কি না? অজিত বাবুর বেনামী সমর্থনকারী সত্যত্রয়ধারী শর্মা মহাশয় বলিতে চান,—না কিছুতেই না। কারণ?

(ক) “দেবেন্দ্রনাথের কীর্ত্তি ও কাল সম্বন্ধে তাঁহার (লিওনার্ডের) ইতিহাসের তারিখ ও তথ্য প্রায় আগাগোড়াই ভুল।” আমি কিন্তু দেখাইয়াছি, লিওনার্ডের ইতিহাসই—রাজনারায়ণ বাবুর দ্বারা দেবেন্দ্রনাথেরই একটা কীর্ত্তি। এই কীর্ত্তির গৌরব অথবা লজ্জা হইতে দেবেন্দ্রনাথকে রক্ষা করা করমাসী সাহিত্যের পক্ষেও সহজ নহে। সে বাহা হউক, অজিত বাবু কিন্তু তত বড় কথাটা, তাঁহার প্রয়োজন-ধিক বৃহদায়তন দেবেন্দ্রনাথের জীবন-চরিত্র গ্রন্থে, এক ছত্রেও উল্লেখ করেন নাই। তিনি বাহা উল্লেখ করেন নাই, তাঁহার বেনামদার তালু আজ অতি ব্রহ্ম অন্ধরে ভারতীর পৃষ্ঠার ছাপাইয়াছেন। উত্তম!

আগাগোড়া ভুলের মধ্যে অন্ততঃ দু’একটা ভুল তারিখ ও তথ্য দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিওনার্ড কোথায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সত্যত্রয় তুলিয়া দেখান নাই কেন? রাজনারায়ণ বাবু মাল-মসলা জোগাইলেন, অথচ দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তারিখ ও তথ্য আগাগোড়াই ভুল! অথচ এই গ্রন্থ প্রকাশের পর ১৩২৪ শ্রাবণের ভারতী ছাড়া, ইহার কোন প্রতিবাদ বাহির হইল না। আশ্চর্য্য! আমরা জানিতে চাই—দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিওনার্ডের কোন্ তথ্য ও কোন্ তারিখ ভুল?

আমাদের বিশ্বাস—কেশবচন্দ্রের সহিত দেবেন্দ্রনাথের বিরোধ-ব্যাপারে,—দেবেন্দ্রনাথের অবস্থা সমর্থন ও কেশবচন্দ্রের অবস্থা নিন্দা বিবৃত করিতে গিয়া লিওনার্ড দু’একটা ভুল করিয়া থাকিবেন, কিন্তু ইহা খুব নিশ্চিত যে, সে শ্রেণীর ভুল ধরিয়া দেওয়া, কি অজিত বাবু বা কি তাঁহার ভাড়াটীরা সমর্থনকারীর সাধ্য নহে।

(খ) সত্যত্রয় বলেন যে, “লিওনার্ড সাহেব যে সময়ে ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার পক্ষে V. D. V. এর ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথের নাম জানিবার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না।” কেন? “কারণ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত দেবেন্দ্রনাথের নিকট হইতে তিনি তাঁহার কার্যাবলীর বিবরণ সংগ্রহ করেন নাই।” যদি করিতেন, তবে “এরূপ ভুল হইত না।”

দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিওনার্ড কোন্ তথ্যটা ভুল করিলেন, তাহা না অজ্ঞিত বাবু, না তাঁহার ‘শব্দা’ বলিতে ইচ্ছুক অথবা সমর্থ। ভুলটা যে কি, তাহা না বলিয়া এমন গম্ভীরভাবে ভুলের কারণ-সমূহ পর্যালোচনা করার বাহাদুরী আছে, স্বীকার করি।

আমি কিন্তু দেখাইতেছি,—অজ্ঞিত বাবু লিওনার্ডের ইতিহাসের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থে কোন সন্দেহই করেন নাই। আজ সহসা জানি না কেন, তাঁহার বেনামদারের লেখনীমুখাৎ ভারতীবন্ধে, এত দেরীতে তাহা উদ্ঘাটন করিতেছেন। আমি আরও দেখাইতেছি—গ্রন্থ-লেখাকালে অজ্ঞিত বাবু লিওনার্ড সাহেবকে নিতান্তই অন্ধভাবে অনুকরণ করিয়াছেন। কেন না, V. D. V. গ্রন্থের অন্ততঃ লেখক যে চন্দ্রশেখর দেব, ইহা এক লিওনার্ড বাতীত আর কোথা হইতে তিনি পাইয়াছেন, বলিতে পারেন কি? পারেন না। লিওনার্ডই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ও ভরসা। বিনা বিচারে তিনি এক্ষেত্রে লিওনার্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন।

লিওনার্ডের গ্রন্থ যদি ইতিহাস নয়, তার আগাগোড়াই যদি ভুল, তবে কোন্ বিবেচনার লিওনার্ড-কথিত চন্দ্রশেখর দেবকেই তিনি অনন্তগতি হইয়া দেবেন্দ্রনাথের সহিত V. D. V. এর রচনা-ব্যাপারে জুড়িয়া দিলেন?

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় দেবেন্দ্রনাথের কাছ হইতে তাঁহার কার্যাবলীর সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, অতএব তিনি বাহা বলিবেন—তাই। বেশ! কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় ত বলেন, দেবেন্দ্রনাথের সহিত রাজনারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন। উত্তরে ‘শব্দা’ বলেন, ঐ শুধু রাজনারায়ণ ভুল হইয়া গিয়াছে—কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠিক, নিভুল। মাঝে কি বলি—‘গরজ বড় বালাই’।

শাস্ত্রী মহাশয় কেন না প্রকাশ্তে আমাদের জানান,—যে, এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের মুখাৎ তিনি কি বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন? রাজনারায়ণ ভুল, কোথা হইতে আসিল। চন্দ্রশেখর দেবের কথা দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে কিছু বলিয়াছিলেন কি না—এবং বলিয়া থাকিলে তাহা তাঁহার স্মরণে আছে কি না? যদি স্মরণেই থাকিত, তবে রাজনারায়ণ বাবুর নাম লিখিবেন কেন? এইরূপ বলার কহার, শ্রবণে স্মরণে ও বিস্মরণে যে তারিখ ও তথ্যের খিচুড়ী ইতিহাস বলিয়া ‘সর্বসাধারণের ভক্তিতাজন’ এবং অভ্যাজনগণ আমাদের দিতেছেন,—তাহাই ইতিহাস নহে। মিথ্যা তারিখ ও তথ্যের বহু ক্ষত তাহার মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে,—সত্যতথ্যবীর প্রলেপ নিতান্তই ব্যর্থ ও নিফল। মিথ্যাকে সত্যের প্রলেপে কে কতদিন ঢাকিয়াছে? কোন্ ইতিহাসে? কোন্ সাহিত্যে? হার! হতভাগা বাঙ্গালীর বিগত শতাব্দীর সংস্কার-যুগ আর তার ইতিহাস,—আর সেই ইতিহাসের—লেখকবৃন্দ!

শেষ আপত্তি (বিশেষ সাংঘাতিক নহে) অজিত বাবু যে সমস্ত ইন্টারভ্যাল এবং একস্টারভ্যাল প্রমাণ দিয়া দেবেন্দ্রনাথকে V. D. V. গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—আমি সেই একস্টারভ্যাল প্রমাণের (খ) দফার উত্তর দেই -নাই, এবং ইন্টারভ্যাল প্রমাণের (ক) দফার উত্তর দেই নাই। পরন্তু ঐ গুলিকে, ভারতীয় ‘শব্দ’ বলেন, আমি নাকি চাপা দিয়াছি!

আমার বিশ্বাস ছিল এবং এখনও আছে,—যে, ঐ গুলি প্রমাণ-পদবাচ্য নহে। external এবং internal এই বুলীর আওতাতে শূন্য বুলী হইতে ধূলি ঝাড়িলেই তাহা evidence এর সূত্রে মণিগণা ইব দানা বাধিবে না। আচ্ছা, যদি চাপাই দিয়া থাকি, তবে উদ্ঘাটনই করা যাক্।

একস্টারভ্যাল এভিডেন্স, দফা (খ) বলেন, “বইখানি প্রকাশিত হইলে, ইহার প্রণেতা যে কে, তাহার উল্লেখ থাকিল না।” থাকিলে আত্ম আর এ বিপদ উপস্থিত হইত না। কিন্তু ইহার প্রণেতার উল্লেখ না থাকাই কি প্রমাণ যে, ইহা দেবেন্দ্রনাথের রচনা? বরং বলা যায় না কি, দেবেন্দ্রনাথের রচনা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার নামোল্লেখ থাকিত। সে কালের অনেক ঋষিই তাঁহাদের দৃষ্ট ও আবিষ্কৃত মন্ত্রের উপর তাঁহাদের নামের ছাপ দিতেন না। তাঁহারা আপনাদিগকে গোপন করিয়া মন্ত্রকেই প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ত সে কালের বা সে শ্রেণীর ঋষি নহেন। তিনি ত তাঁহার রচিত সকল গ্রন্থের উপরই নিজের নাম প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ হইতে ত তিনি নিজেকে গোপন করেন নাই। সুতরাং V. D. V. তাঁহার রচনা হইলে বা ইহার রচনার তাঁহার উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্ব থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই তাহা গোপন করিতেন না। কাজেই দেবেন্দ্রনাথের নামোল্লেখ যখন তাঁহার সব গ্রন্থেই আছে, তখন এ গ্রন্থে না থাকার ইহাই প্রমাণ হয় যে, ইহা দেবেন্দ্রনাথের রচনা নহে। অজিত বাবুর একস্টারভ্যাল এভিডেন্সের চাপা দেওয়া দফার উদ্ঘাটনে ত এই দাঁড়ায়।

আচ্ছা, দেখা যাক,—ইন্টারভ্যাল এভিডেন্স দফা (ক) কি বলেন। “বেদ যে আশু শাস্ত্র, তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের ভিতরকার মনের ভাবটি এই সময়েই বাহির হইয়া পড়িয়াছে দেখা যায়। বাহিরের প্রমাণ যে প্রমাণ নয়, ভিতরের আত্মপ্রত্যয়াদির প্রমাণই যে আসল প্রমাণ, এ কথা এ সময়েই তিনি বলিয়াছেন। রামমোহন রায় এ ভাবের কথা বলিতেন না!”

উপরোক্ত প্রমাণে বাহ্য প্রমাণ করিতে হইবে, তাহাকে আগে হইতেই স্বীকার্য্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। V. D. V. শাস্ত্রের প্রমাণ সম্বন্ধে যে যুক্তি বা উক্তি আছে.

তাহা যে দেবেন্দ্রনাথের, তাহার প্রমাণ কি? পরবর্ত্তিকালে দেবেন্দ্রনাথ ঐরূপ যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রকে গ্রহণ বা বর্জন করিয়াছিলেন,—এই কথা? তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, V. D. V. গ্রন্থের শাস্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধে মতবাদকে তিনি ইহার ৫১৬ বৎসর পরে গ্রহণ করিয়াছিলেন মাত্র; এবং অধিকতর সম্ভব এই ক্ষণ যে, এই সময়ে বেদের শাস্ত্র প্রামাণ্য লইয়া সবে তর্ক উঠিতেছিল মাত্র; এবং দেবেন্দ্রনাথ তখন পরিষ্কাররূপে শাস্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধে কোন ধারণাতেই পৌছাইতে পারেন নাই। বরং পরবর্ত্তিকালে V. D. V. এর মতবাদ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই বেশী বিশ্বাসযোগ্য।

তার পর কার্ত্তেজ্ঞান দর্শন-প্রণালীর অঙ্ক-অমুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া, এবং হিন্দুদার্শনিক মতবাদগুলির দার্শনিক পরিভাষার আধরণে উক্ত কার্ত্তেজ্ঞান দর্শন-প্রণালীর ভাবগুলিকে প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে দার্শনিক চিন্তায় যে ভাবসঙ্করের উদ্ভাবন দেবেন্দ্রনাথ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত V. D. V. গ্রন্থের শাস্ত্র প্রামাণ্যের যে মতবাদ, তাহার কি সম্বন্ধ, আমি তাহা বুঝি না। “আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিত্তক হৃদয়” আর enlightenment of the human understanding প্রথম দৃষ্টিতে একই কথা বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক ইহাদের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ। understanding এর সহিত বিত্তক হৃদয়ের কি সম্পর্ক? তার পর এই আত্মপ্রত্যয় হইতে সহজ জ্ঞানের রাজ্যে গিয়া দেবেন্দ্রনাথ এই উত্তরের এমন পৃথক্ ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, তাহার মতিস্থিরতার পরিচয় অতি অল্পই আমরা পাইগছি। তাহার সহিত V. D. V. এর মতবাদের সাদৃশ্য আমরা ত বিশেষ কিছু খুঁজিয়া পাই না। তবে সকলের দৃষ্টি সমান নহে, এই বা কথা।

শাস্ত্র প্রামাণ্যে ঐতিহাসিক প্রমাণের অব্যোপাতা ও আত্মপ্রত্যয়াদির যোগ্যতা সম্বন্ধে V. D. V. তে বাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে— তাহা দেবেন্দ্রনাথ বলিয়া দিয়াছেন, এরূপ অমুমান না করিয়া, পরবর্ত্তিকালে দেবেন্দ্রনাথ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ বলিলে কি অধিকতর যুক্তিবৃত্ত হয় না?

রামমোহন এ ভাবের কথা বলিতেন না। ইহা বলা শক্ত। ঐতিহাসিক প্রমাণকে অগ্রাহ্য করিবার মত অজ্ঞতা দেবেন্দ্রনাথের মত রামমোহনের ত ছিল না। আর ঐতিহাসিক প্রমাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার মত পাণ্ডিত্য দেবেন্দ্রনাথের কোথায়? কাজেই তিনি সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের ছায়ার আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু V. D. V. যে consonant to the dictates of sound reason and wisdom এর কথা বলা হইয়াছে, রামমোহন নিশ্চয়ই তাহার অমুমান করিতেন। রামমোহন সম্বন্ধে বা তা যখন তখন বলার অভ্যাসটা বেন ক্রমেই সাহিত্যে সংক্রামক হইতেছে। অথচ

রামমোহন মোটেই সহজ বস্তু নহে। তাহা বাহারা তাঁহার দোহাই দিয়া চলেন, তাঁহারাই সব চেয়ে কম বুঝেন।

সুতরাং ইন্টারন্যাশনাল এভিডেন্সের (ক) দফা আমি অগ্রাহ্য ও অপ্রামাণিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছি। প্রলেপ এখানেও গেল!

ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের শ্লোক আর V. D. V. গ্রন্থের শ্লোক অনেকাংশে এক বলিয়া V. D. V. গ্রন্থকে দেবেন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহাকে ইন্টারন্যাশনাল এভিডেন্সের (খ) দফা বলিয়া ধারিয়া লওয়া যায়।

ইহার উত্তরেও আমি তাহাই বলিব—যাহা (ক) দফার উত্তরে বলিলাম। অর্থাৎ এই সামান্য সাদৃশ্য অন্তর্গত ইহাই প্রমাণ করে যে, দেবেন্দ্রনাথ পরবর্ত্তিকালে এই V. D. V. গ্রন্থের মধ্য হইতে যে সনস্ত শ্লোকগুলি তাঁহার ভাল লাগিয়াছে, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন মাত্র।

কিন্তু আমি পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, এই V. D. V. গ্রন্থের মূল প্রতিপাত্ত বিষয়গুলির সহিত দেবেন্দ্রনাথের সহানুভূতি ছিল। অতথা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাহা একরূপ ভাবে প্রকাশিত হইতে পারিত না।

অসম্ভব নয় যে, তত্ত্ববোধিনী সভার সমস্ত সভ্যদের মধ্যে V. D. V. গ্রন্থের মতগুলি বিশেষ ভাবে আলোচিত হইত, এবং ঐরূপ সমালোচনার delates পরে হয় ত একজন কেহ, এ ক্ষেত্রে চন্দ্রশেখর দেব,—তাহা লিখিয়া উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ করিতেন। কাজেই বহু প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ হইল, তখন কোন এক জন ব্যক্তির নাম ইহার উপরে থাকিল না। তবে যিনি ইহাকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাকেই রচয়িতা বলিয়া নির্দেশ করিতে হইলে—এক চন্দ্রশেখর দেবকেই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। দেবেন্দ্রনাথকে সঙ্গে জুড়িয়া দিবার জন্ত কল্পনার জাল বিস্তার না করাই ভাল।

এই সমস্ত প্রবন্ধে সর্বত্রই 'We' আমরা ব্যবহৃত হইয়াছে। কোথাও 'I' ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা সম্পাদকীয় 'আমরা'ও বুঝাইতে পারে, অথবা তত্ত্ববোধিনী সভার বহু সভ্যের সমবেত গবেষণা ও আলোচনার ফল বলিয়াও হইতে পারে।

তার পর আমি বলিয়াছিলাম যে, V. D. V. গ্রন্থ Brahmnical Magazine কে অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া ধরিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় 'সত্যব্রত' বলেন যে, তাহা না কি ধরে নাই। আমি আগামীবারে তাহারই আলোচনা করিব।

ত্ৰিগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

মহীশূর-ভ্রমণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হারদর আলিই প্রথমে এই উদ্যানের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তৎপরে তৎপুত্র টিপু সুলতান ইহার অনেক উন্নতিসাধন করেন; টিপু মৃত্যুর এক বৎসর পরে ১৮০০ অব্দে ডাঃ বুকানন্ এই লালবাগের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এই উদ্যানটি ভিন্ন ভিন্ন চত্বরক্ষেত্রে বিভক্ত ছিল; এক এক ক্ষেত্রে এক এক প্রকারের ফলের চাষ হইত; কোনটিতে হয় ত গুল্ম গোলাপ, কোনটিতে গুল্ম দাড়িম্ব, ইত্যাদি; ইহার পথঘাটগুলির দুই ধারে সহিপ্রসের শ্রেণী ইহার শোভা বৃদ্ধি করিত। বুকানন্ বলেন, হারদর আলির সময় উদ্যানটি ইউরোপীয় রীতি অনুসারে রক্ষিত হইত; টিপু ইহার পরিবর্তন করিয়া ভারতীয় বা প্রাচ্যরীতির প্রবর্তনা করেন। আমার বোধ হয়, ইহার কারণ টিপু ইংরাজ-বিদ্বেষ। সে সময়ে টিপু মত ইংরাজের শত্রু আর কেহ ছিল না। টিপু মৃত্যুর পরে উদ্যানটি ইংরাজ সরকারের অধীনে আইসে। ১৮৩৬ অব্দে মহীশূরের কমিশনার সার মার্ক কুব্বন্ (Sir mark Cubbun) এই উদ্যানটি Agri-horticultural সোসাইটির হস্তে অর্পণ করেন এবং জেলের কয়েদীদের দ্বারা ইহার অনেক উন্নতিসাধন করেন। ১৮৪২ অব্দে ইহা পুনরায় খাস গবর্ণমেন্টে ফিরিয়া আইসে এবং ১৮৫৬ অব্দে ইংরাজ সরকার ইহাকে Horticultural garden রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া লণ্ডনস্থ Keed উদ্যান হইতে একজন উদ্যান-পরিচালক আনাইয়া তাঁহার হস্তে ইহার রক্ষার ভার অর্পণ করেন। আমি যখন ব্যাঙ্গালোরে ছিলাম, তখন ক্রম্বিগাল্ (Crombigal) নামক একজন জৰ্ম্মান পরিচালকের হস্তে উদ্যানটির ভার ন্যস্ত ছিল। শুনিতে পাই, মহীশূরের বর্তমান মহারাজ ইহাকে অতিশয় অনুগ্রহ ও স্নেহ করেন এবং তাঁহারই অনুরোধে ইংরাজরাজ তখনও তাঁহাকে interned করেন নাই। লোকটিকে দেখিয়া আমার বেশ শুষ্ক হইল; বেশ গম্ভীর অথচ কক্ষ্মঠ; এই উদ্যানটিকে নন্দনকাননে পরিণত করিয়াছেন। সহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক কলিকাতার Eden Gardensর ন্যায় এইখানেই ভ্রমণ করিতে আইসেন।

এই উদ্যানের মধ্যে লৌহক্ষেপে কাচমণ্ডিত একটি প্রকাণ্ড বাটী রহিয়াছে; এত বড় কাচের বাটী আমি কোথায়ও দেখি নাই। ইহার মধ্যে পুষ্পপ্রদর্শনী মেলা বসে; ১৮৯১ অব্দে গ্রিন্স্ আলবার্ট ভিক্টর কর্তৃক ইহার ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হয়।

স্বামীজীরা আমাকে এখানকার জন্মাষ্টমী দেখিরা যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। অম্য ১লা সেপ্টেম্বর বুধবার জন্মাষ্টমী; এ দিন জন্মাষ্টমী-ত্রত স্মার্তমতে, আর তৎপরদিন ত্রিবেদ্য বা রামানুজ সম্প্রদায়ের মতে; আমাদের বঙ্গদেশের নিয়মও এইরূপ; আমাদের বঙ্গীয় পঞ্জিকার মতে ২রা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার গোস্বামী-মতে জন্মাষ্টমী-ত্রত নিষ্পন্ন হইয়াছিল। বঙ্গদেশের ভায় এ দেশেও জন্মাষ্টমী-ত্রতকে জরাজীর্ণ বলে। মঠে আজ বেশ উৎসব। নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত অনেকেই আসিয়াছেন; ইহারা অনেকেই বিশেষ সম্ভ্রান্ত, উচ্চ রাজকর্মচারী। টেম্পেল প্রকোষ্ঠে সভা বসিল, এখানে বক্তৃতা বা তর্ক-বিতর্ক নাই, কেবল সঙ্গীত—কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত। স্বামী অধিকানন্দ তানপুরা লইয়া গুরুকর্কনির্মিতকণ্ঠে সঙ্গীত ধরিলেন।

সকলেই মুগ্ধ, নিস্তব্ধ। এক একটি সঙ্গীত হওয়ার পর আনি ইংরাজীতে তাহা ব্যাখ্যা করিরা বুঝাইতে লাগিলাম। প্রথম সঙ্গীত হইল, শ্রীকৃষ্ণের জন্মসম্বন্ধে—ইহা ভক্ত সুরদাসের। সঙ্গীতে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে মহাদেব তাঁহাকে দেখিতে আসেন; কৃষ্ণকে দেখিরা আহ্লাদে শিলাবাদন করিলেন ও তাঁহার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রোতাদিগের মধ্যে এক জনের কথা আমি না বলিরা থাকিতে পারিলাম না। ইনি একজন ৭২।৭৩ বৎসর-বয়স্ক অবসর-প্রাপ্ত এসিষ্টেন্ট কমিসনার বা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ইনি যখন শুনিলেন যে, শিব কৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছিলেন তখন আহ্লাদে এত অধার হইয়াছিলেন যে, উদ্ভূতের ভায় সকলকে বলিতে লাগিলেন, “খেখেছ, শিব কৃষ্ণকে দেখিতে আসিলেন এবং শিলা বাজাইয়া আবার তাঁহার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বাঃ, কি সুন্দর!” এ গানটি পুনরায় গাহিতে আদেশ করিলেন। আনি ত গায়কের স্মিট কণ্ঠস্বরে ও বৃদ্ধের সরল ব্যবহারে যেন আবিষ্ট হইয়া পড়িলাম; নিকটে এক জন উকীষধারী স্মার্ত ব্রাহ্মণ বসিয়া-ছিলেন; ইনি একজন উচ্চ রাজ-কর্মচারী। ইহাকে যেন তত প্রসন্ন দেখিলাম না। এ দেশে স্মার্ত ও বৈষ্ণবে বেশ মনোমালিন্য আছে। এখানে পূর্বোক্ত বৃদ্ধটির একটু পরিচয় দিই। ইহার নাম তিফ্র মল্লিচার; ১৮৬৫-অব্দে রাজ-কার্যে প্রবেশ করিয়া ইনি ১৮৯৯ অব্দে অবসর লইলেন। বৃদ্ধের পুত্র মহেশ্বর রাজ্যের কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির (Co-operative Credit Society) রেজিষ্টার (Registrar) নাম নারায়ণ আয়েদার। ইহার বয়স ৪৪।৪৫ বৎসর হইবে, বেশ শিক্ষিত। ইনি মহেশ্বর রাজ্যের বর্তমান যুবরাজের গৃহশিক্ষক ছিলেন; লোকটি যেন কৃত-কর্মতার অবতার, যেমন বলিষ্ঠ তেমনিই সরল। পিতা পুত্র উভয়েই গৌরবর্ণ, পোত্র-পোজীরা চম্পকদাম সদৃশ সুন্দর। নারায়ণ আয়েদারের মত সরল ও তেজস্বী ব্যক্তি বড় বেশী দেখা যায় না। ইনি বাজালোর ঘরের প্রাণবদ্ধ। বঙ্গীয় স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি ইহার বিশেষ ভক্তি। নিজের বাড়িতে

বৈজ্ঞাতিক আলোক আনাইয়া মঠের সন্ন্যাসীদের বলিলেন যে, আমার বাটীতে আলোক আনা হইল, আর মাঠ যে তৈল-প্রদীপ জলিবে, ইহা কখনই হইবে না। নিজ হইতে প্রায় পাঁচ শত টাকা ব্যয় করিয়া বৈজ্ঞাতিক আলোর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। মঠের চিরস্থান আয়ের জন্ত কিছু টাকা দান করিয়াছেন। লোকটি যেমন ভক্ত, তেমনই সরল অথচ তেজস্বী।

২রা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার মহীশূর যাত্রা করিবার জন্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। অস্ত্র শ্রীবৈষ্ণবদিগের মতে জন্মাষ্টমী ; কল্যা শ্রীশ্রী ও মাধবদিগের মতে জন্মাষ্টমী হইয়া গিয়াছে ; রাজ্যে স্থানীয় Central Collegeর গণিতের অধ্যাপক শ্রীযুত গোপাল রাও মহাশয়ের বাটীতে স্বামীজীদের নিমন্ত্রণ ; নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া পাছে ট্রেন না পাই, এই জন্ত আমার নিমন্ত্রণ হয় নাই। রাত্রি ১০টার গাড়ীতে যাত্রা করিতে হইবে, ট্রেনের সময়ের ২ ঘণ্টা পূর্বে এত বৃষ্টি হইতে লাগিল যে, ভয় হইল, বৃষ্টি সমস্ত আয়োজন ও বন্দোবস্ত ব্যর্থ হইয়া যার। সৌভাগ্যবশতঃ বৃষ্টি থামিয়া গেল, স্বামীজীরা আসিয়া পৌঁছিলেন ; তাঁহাদের প্রণামাদি করিয়া যাত্রা করিলাম ; সঙ্গে অধিক দ্রব্যাদি লইলাম না, রামেশ্বরম্ বাইবার পথে অধিক জিনিস লইবার কল হাতে হাতে কলিয়াছে। চাউল, ডাউল, ঘৃত প্রভৃতি আহার্য-পূর্ণ বাক্স, সামান্ত ২৪ খানি পরিধেয় বস্ত্র, স্বামীজীসহ উক্ত বস্ত্র, সামান্ত বিছানাপত্র কয়েকখানি প্রয়োজনীয় পুস্তক ইত্যাদি লইয়া পূর্বোক্ত ভৃত্যসহ যাত্রা করিলাম। আমার মনটা আদৌ চঞ্চল হয় নাই ; কেননা, দেশভ্রমণ করিয়া করিয়া এক প্রকার অভ্যাস লাভ করা গেছে। রাজ্যে গাড়ীতে স্থাপত্য-সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিতে করিতে চলিলাম।

পূর্বেই স্বামীজীরা মহীশূরস্থ তাঁহাদের ভক্ত ও বন্ধু কৃষ্ণস্বামী আয়েজার মহাশয়কে আমার গমনবার্তা জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন ; ইনি মহীশূর গবর্ণমেন্টের লোকাল বোর্ডের অডিটর ; মহীশূর ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখি যে, ইনি আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, আমি সরকারী অতিথিভবনে (Govt. Guest house) থাকিব ; তিনি স্বামীজীর পত্রে এইরূপ বুঝিয়াছিলেন। আমি বলিলাম যে, আমি যাত্রীদের বাঙ্গলো বা Traveller's Bungalow তে থাকিব, আমার তথ্য লইয়া চলুন। তিনি মনে করিলেন যে, আমি বৃষ্টি ভ্রমবশতঃ এইরূপ বলিতেছি ; তাঁহারই ভ্রম বুঝাইয়া দেওয়াতে তিনি নিরস্ত হইলেন। আমরা ফিটন ভাড়া করিয়া সহরের উপকণ্ঠস্থিত ডাকবাঙ্গলোর আসিয়া পৌঁছিলাম ; বাঙ্গলোটি নগরের উত্তরাংশস্থিত ঘরেরও বাহিরে।

মহীশূর বাঙ্গলোটি প্রথম শ্রেণীর, প্রকোষ্ঠগুলি বেশ প্রশস্ত ও উচ্চ ; কিন্তু অনেক দিন হইল ইহার জীর্ণ সংস্কার হয় নাই ; অনেকগুলি সারসির কাচ নাই, জানালা-

গুলি উত্তমরূপে বন্ধ করিতে পারা যায় না ; ইহাতে কিছু কালের জলের বেশ বন্দোবস্ত আছে, তবে দিনরাত জল পাওয়া যায় না। কলিকাতা মহানগরীতেই বা এমন সুবিধা কোথায় ? যে আশায় কলিকাতাবাসীর শোণিতসদৃশ অর্থব্যয় করিয়া টালার বিরাট আয়োজনের ব্যবস্থা করা হইল, তাহাই বা তেমন ফলপ্রসূ হইল কই ?

বাক্সলোর বয় বা খান্সামা বেশ জাকাজাক ইংরাজীতে আমার অভ্যর্থনা ও অভিবাদন করিল এবং কি কি প্রয়োজন, তাহা জিজ্ঞাসা করিল। এ লোকটি রোম্যান ক্যাথলিক খৃষ্টান ; ইহারা বংশানুক্রমে বাক্সলোর বয়গিরি করিয়া বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। সেরিংটামে বা শ্রীরঙ্গপত্তনের ডাকবাক্সলোর বাস করিবার সময় ইহার সহোদর ভ্রাতা ডেভিড বয়রূপে আমার বিশেষ আদর-আপায়নে পরিতৃপ্ত করিয়াছে। সে কথা পরে বলিব। ইহারা বেশ ভদ্র ও শিষ্ট।

প্রত্যুষে বাক্সলোর পৌছিয়া একটু চা পান করিয়াই কৃষ্ণ স্বামী মহাশয়ের সহিত পূর্বরাত্রির ট্রেনে-পরিহিত বেশেই নগর-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিয়দূর আসিতেই পুলিশের একজন লোক একখানি পরওয়ানা লইয়া আসিল ; পূর্বেই বাক্সলোর হইতে চিক-সেক্রেটারীর আদেশজ্ঞাপক পত্র আসিয়া পৌছিয়াছে। পুলিশ-কর্মচারী আমার জিজ্ঞাসা করিল, আমার কি কি প্রয়োজন ? আপাততঃ কিছুই প্রয়োজন নাই বলিয়া, তাহাকে বিদায় দিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। ঘণ্টায় চারি আনা হিসাবে এক “বটকা” বা অশ্বখান ভাড়া করিয়া নগর-পরিভ্রমণে বাহির হইলাম।

আমরা কর্জন্ পার্কের মধ্য দিয়া জগন্মোহন প্রাসাদের নিকটে আসিয়া পৌছিলাম। ভিতরে বাইরা গুলিলাম যে, প্রাসাদ-রক্ষক বা Palace Controllerর অনুমতি ও ছাড়পত্র ভিন্ন প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশাধিকার নাই। মহারাজার গৃহস্থলী বিভাগের একজন কর্মী আছেন ; তাঁহার নাম Palace Controller। ইনি ডেপুটি কমিশনার বা জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপন্ন উচ্চ কর্মচারীর মধ্য হইতে নিযুক্ত হইয়াছেন। এখন কিরিয়া বাইরা বিশ্রামান্তে মধ্যাহ্নে কন্ট্রোলার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কৃষ্ণস্বামী মহোদয় উপদেশ দিতে লাগিলেন। বলিলেন যে, এখন তিনি সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছেন, এখন বাইলে ~~হয়~~ ত বিরক্ত হইতে পারেন। আমিও সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়া বলিলাম, “তাহা হইবে না ; আমাকে পূর্বাঙ্কেট দর্শন করিতে হইবে।” তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ কন্ট্রোলার মহাশয়ের বাটীতে বাইলাম ; ইহা প্রায় ১৥০ মাইল দূরে। দ্বারদেশে দেখিলাম, সশস্ত্র গ্রহরী মুক্ত কৃপাণ হস্তে পাদ-চারণা করিতেছে ; আমার কার্ড পাঠাইয়া দিলাম ; আমাকে উপরতলের বৈঠকখানায় লইয়া গেল। গৃহতল কার্পেট-মণ্ডিত। পাছকা না খুলিয়াই প্রবেশ করিলাম ; আমার একটু বিশেষ ধরনের পোষাক পরিধান করা ছিল বলিয়া ও আমাদের দেশপ্রথা

নহে বলিয়া পাছকা খুলিলাম না; প্রায় ১৫ মিনিটকাল কন্ট্রোলার মহাশয়ের অগ্র অপেক্ষা করিবার পর তিনি আসিলেন; তিনি তখন সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতেছিলেন; আমিও ইত্যবসরে তাঁহার গৃহের সজ্জা প্রভৃতি দেখিরা লইলাম; দেখিলাম বেশ বাছা বাছা পুস্তক রহিয়াছে। কার্পেটমণ্ডিত গৃহতলে কোচ গৃহের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে; ভারদেশে জাপানি পর্দা রহিয়াছে ও রবিবর্ম্মার ২।১ খানি সুন্দর পৌরানিক চিত্র গৃহ-ভিত্তি শোভিত করিতেছে। আমাদের বঙ্গদেশস্থ কোন ধনী ব্যক্তির গৃহে যেন বসিরা আছি বলিয়া বোধ হইল। আমার বোধ হয়, ভারতবর্ষের সর্বত্রই এইরূপ ইংরাজী ধরণে গৃহ-সজ্জার ব্যবস্থা করা একরূপ ক্যাসান্ বা রীতি হইয়া দাঁড়াই-তেছে। মহীশূর প্রদেশের মধ্যবিৎ গৃহস্থেরা বোধ হয় আমাদের দেশস্থ মধ্যবিৎ গৃহস্থকে এই বিষয়ে পরাস্ত করিয়াছে। মহীশূর বলি কেন, সমস্ত ডাবিড় দেশেই আমার বোধ হয় বিদেশীয় সভ্যতার জীবনশক্তি জাতীয় মজ্জার মধ্যে অধিকতর দৃঢ়রূপে প্রবেশলাভ করিয়াছে; ইহা চিন্তা করিবার বিষয়।

কিয়ৎকাল পরে দেখিলাম, নগ্নপদ, পুণ্ড্র-শোভিত প্রশস্ত ললাট, মুণ্ডিত প্রায় মস্তক ও শিরোদেশের মধ্যস্থলে সামান্য কেশগুচ্ছ-যুক্ত একজন কৃশকায় গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ একোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার আগমনে বুঝিলাম, ইনিই কন্ট্রোলার মহাশয়। ইনি সাদরে করমর্দন করিলেন; আমি বঙ্গদেশের লাট সাহেবের চিঠিখানি তাঁহার হস্তে দিলাম; আমাকে আপ্যায়িত করিরা জগন্মোহন প্রাসাদ দেখিবার অহুমতিপত্র দিলেন ও বলিরা দিলেন যে ইচ্ছা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তেই তাহা দেখিতে পারি।

মহারাজা যে প্রাসাদে থাকেন, তাহার নাম “হুর্গ-প্রাসাদ” বা Fort Palace; তাহা দেখিবার অহুমতি চাহিলে তিনি বলিলেন যে, সম্ভ্রতি তাঁহার হস্ত হইতে সে ক্ষমতা মহারাজা তাঁহার “হুজুর সেক্রেটারী” (Huzoor Secretary) হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তবে মহারাজার গৃহস্থলীর সমস্ত বিষয়ের ভার তাঁহার উপর; জানিলাম যে, হুজুর সেক্রেটারী মহাশয় তখন মহারাজার সহিত বাজালোরে অবস্থান করিতে-ছিলেন। সেখানে তার করিরা অহুমতি প্রার্থনা করিতে বলিলেন এবং বলিরা দিলেন যে, একরূপ ফিরিকী বা বিদেশীয় বেশে প্রাসাদ দেখিতে দেওয়া হয় না। মহারাজকে সম্মানপ্রদর্শনস্বরূপ নগ্নপদে, কটিদেশে কটিবন্ধ ও মস্তকে উকীষ ধারণ করিরা যাইতে হইবে। তিনি বলিলেন যে, ইহাতে আপত্তির কোন কারণ নাই; দেওয়ান বাহাদুর বা প্রধান অমাত্য মহাশয়কে পর্য্যন্ত এই বেশে যাইতে হয়; বোম্বাইএর প্রসিদ্ধ পার-সীকদিগকে পর্য্যন্ত এই বেশ পরিধান করিতে হয়। আমি বলিলাম, “বিলম্ব, ইহাতে কি আবার কাহারও অসম্মতি হইতে পারে? আমাদের হিন্দু রাজাকে এ প্রকার সম্মান দেখাইব, ইহা ত পরম সৌভাগ্যের কথা। মহারাজা ত আমাদের ভারতবর্ষের

গৌরবস্বরূপ।” কন্ট্রোলার মহাশয় বলিলেন যে, তিনি আমার কটিবন্ধ, উষ্ণীষ প্রভৃতির সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন ও নিজে পরাইয়া দিবেন। যতদূর স্বরণ আছে, বোধ হয়, ইহার নাম রামকৃষ্ণ রাও ; ইনি স্মার্ত ব্রাহ্মণ। ইহার সহিত সেই অবকাশে প্রকৃতক্বে সম্বন্ধে সামান্ত আলোচনা হইল ; শোকটি অনেক সংবাদ রাখেন। মংরচিত পুস্তকের সংবাদ রাখা আছে দেখিলাম। আমার সহিত ভারতীয় স্থাপত্যে গ্রীক প্রভাব-সম্বন্ধে সামান্ত আলোচনা হইল। আমি অনেকদিন হইতে এই মত চূর্ণ করিবার জন্য একটু আধটু গবেষণা করিতেছি ; তিনি আমার মতগুলি শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন, “দেখুন, ভারতবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত—আর্য্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য ; মুসলমান-দিগের অত্যাচার ও আক্রমণে আর্য্যাবর্তে প্রাচীন কীর্তির তেমন উদাহরণ পাওয়া যায় না ; প্রায়শঃ সমস্তই নষ্ট করিয়া দিয়াছে ; কিন্তু দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে ঠিক এরূপ নহে ; এখানে অনুসন্ধান করিলে অনেক প্রাচীন বিষয়ের সন্ধান মিলিতে পারে ; আর এক কথা, এখানে আপনি বিজাতীয় প্রভাব-বিহীন খাঁটি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের উদাহরণস্বরূপ অনেক নূতন জিনিস দেখিতে পাইবেন।” কিয়ৎকণ কথাবার্তার পর করমর্দনে আপ্যায়িত করিয়া আমার বিদায় দিলেন। স্বারদেশে কৃষ্ণস্বামী মহাশয় অপেক্ষা করিতেছিলেন ; তাঁহাকে সমস্ত বলিলে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। আমরা রাজকীয় পাঠাগার, কলেজ, পাবলিক অফিস প্রভৃতি দেখিয়া জগন্মোহন প্রাসাদে আসিলাম। লাইব্রেরী বাটীটি উল্লেখযোগ্য। ইহা উচ্চ পোতার উপর নির্মিত ও একতল ; ইহার ঈষৎ ঘুরাণ সিঁড়িটি কিন্তু বাটীটির উপযুক্ত নহে। ইহার বারাণ্ডার কক্ষের গোচারণ প্রভৃতি পৌরাণিক চিত্র জ্ঞাপক Frieze রহিয়াছে ; এ প্রকার সুন্দর চিত্র সচরাচর দেখা যায় না। কলেজ-বাটীটি অপেক্ষা ক্ষুদ্র লাইব্রেরীটি আমার হৃদয় অধিকতর দ্রব করিয়াছে ; এ প্রকার উন্মুক্ত স্থানে এই ক্ষুদ্র সৌধটি বিশেষ মনোজ্ঞ ; আমি ত বিশেষ মুগ্ধ হইয়া দেখিতে-ছিলাম ; বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া কৃষ্ণস্বামী মহাশয় বিশেষ ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন। লাইব্রেরীর সম্মুখে একটি শুস্তের চারি গায়ে চারিটি অনুশাসন খোদিত রহিয়াছে ; ইহা পাঠ করিতে পারা গেল না ; আমার বন্ধুটি আমারই মত পণ্ডিত ; কি ভাষায় লিখিত, বিশেষ কিছুই বলিতে পারিলেন না ; শুধু বলিলেন যে, বোধ হয় ইহা “হালে কাগাড়ি” ভাষা। ইংরাজী ভাষায় ইহার মর্ম্ম-পরিচয় থাকিলে বিশেষ সুবিধা হইত ; কিন্তু মাদ্রাজ, বেঙ্গোরাড়া ও বঙ্গালোর মিউজিয়াম দর্শন করিয়া আমার একটা ধারণা হইয়াছে যে, এ দেশে ইংরাজী ভাষায় সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া রীতি নহে। আমি মাদ্রাজ মিউজিয়ামের একজন বিশিষ্ট কর্মচারীর নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ করিয়া জানিয়াছিলাম যে, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্তারা নাকি ইহা পছন্দ করেন না ; তাঁহারা করুন আর নাই করুন, ইহা নিতান্তই ক্রোভের বিষয় ; সংক্ষিপ্ত বিবরণীযুক্ত মুদ্রিত তালিকা বা

ক্যাটালগও ত প্রকাশিত করেন নাই। আমাদের কলিকাতা মিউজিয়মের ডাঃ এণ্ডারস্যান্ কত পরিশ্রম করিয়া ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে যে দুইখানি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা অসম্পূর্ণ হইলেও অমূল্য। এখানে বলিয়া রাখি যে, ডাঃ ব্রকের মৃত্যুর পর মিউজিয়মের কর্তারা সম্প্রতি যে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা ৩৪ বৎসর পূর্বেকার তালিকা উৎকৃষ্টতর।

সে সব কথা বাউক ; আমরা “জগন্মোহন প্রাসাদের” দ্বারদেশে আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রাসাদটী “ভূর্গাপ্রাসাদ” বা Fort palaceর উত্তর দরওয়াজার সম্মুখে অবস্থিত। “জগন্মোহন প্রাসাদের” নামের সঙ্গতি আমি ত দেখিলাম না; জগৎকে মোহিত করা দূরে বাউক, আমাকে ত আদৌ মুগ্ধ করিতে পারিল না। এ বাটীটির ছায় বাটী কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীতে আছে বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। তবে এখানে অনেকগুলি চিত্র আছে, যাহা দেখিবার জিনিষ। মহিশূরের কোন মহারাজা এ বাটীটি ইউরোপীয় উচ্চ কৰ্মচারীদের প্রীত্যর্থ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় সময় আসিয়া এ সৌধ, তাণ্ডব নৃত্য ও সঙ্গীতে মুগ্ধরিত করিতেন ও ফেনিনোচ্ছল সুরাতরঙ্গে নিমজ্জিত হইয়া প্রণয়িনীর প্রেমে আত্মহারা হইতেন; এই বাটীতেই বর্তমান মহারাজার শুভোদ্যাহ ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়; তখন প্রধান অমাত্য ছিলেন সার শেবাঙ্গি আয়ার। এই বিবাহের সভা একখানি চিত্রে চিত্রিত রহিয়াছে দেখিলাম; সার শেবাঙ্গি ঠিক যেন দ্বারবানের ন্যায় একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; বৃদ্ধ অনেক চেঁচা ও পরিশ্রম করিয়া মহীশূর রাজাকে ভারতের দ্বিতীয় রাজ্যের আসনে পৌছাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মত কূট ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক ইউরোপের যে কোন রাজসভা অলঙ্কৃত করিতে পারিত। বর্তমান মহারাজের পিতা তাঁহাকে গুরু ও শাস্তার ন্যায় ভয় ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ১৮৮১ অব্দে মহিশূর রাজ্য যখন বর্তমান রাজবংশে অর্পিত হয়, তাহার মূলেও সার শেবাঙ্গি। ইনিই প্রথম দেওয়ান নিযুক্ত হন। বর্তমান মহারাজার পিতা একটু উচ্ছৃঙ্খল হইলে সার শেবাঙ্গি তাঁহাকে শাসাইয়াছিলেন যে, তিনি যদি রাজকার্যের উপযুক্ত না হইতেন, ইংরাজের করে রাজ্য প্রত্যর্পিত করিবেন। ইনি বর্তমান মহারাজাকে পৌত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন ও কি উপায়ে তাঁহার ও রাজ্যের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি হইবে, তাহা তাঁহার ধ্যান ধারণার বস্তু ছিল; ক্রমশঃ সে সব কথা বলিব। সমগ্র মহিশূরের লোকে তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করে; এত ভক্তি আমরা ত কাহাকেও করি না। এই জন্যই আমাদের এই দুর্দশা। রাজা রামমোহনই ইউন, আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ইউন, আমরা সকলকেই সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। হায় দুর্ভাগ্য, একটি লোক কি নাই—বাঁহাকে আমরা

সমগ্র হৃদয়ের ভক্তি ও প্রজ্ঞা দান করিতে পারি। ইহা না হইলে জাতির অত্যাখান কোন কালেই হইবে না। সার শেবাজি মহাশয় যে সমস্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এখনও ক্রমশঃ ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণত হইতেছে। তাঁহার এমনই ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল।

জগন্মোহন প্রাসাদের অন্তরে একটি ক্ষুদ্র উদ্যানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; এই উদ্যানে season flower or ষতুপুষ্পগুলি কেমন সুন্দর ভাবে রোপিত করা হইয়াছে দেখিলাম। প্রাসাদের সম্মুখস্থ গৃহটী বেখানে বর্তমান মহারাজার বিবাহোৎসব ব্যাপার নিম্নায় হইয়াছিল, তাহা বেশ কারু-কার্য্য যুক্ত হইলেও অতিশয় অবহেলা রহিয়াছে। প্রাসাদের প্রথম তলে মৃত মহারাজার অনেক প্রকারের কারুকার্য্যযুক্ত বসি, দূরবীক্ষণ যন্ত্র, হস্তিদন্তখচিত বাক্স ইত্যাদি দ্রব্য রহিয়াছে। একশত বৎসরের অপেক্ষাও প্রাচীন চিত্র দেখিলাম; তাহাতে আমাদের দেশস্থ রাণীগঞ্জ টালির মত টালিযুক্ত ঘর রহিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এ প্রকার টালি বাহা এ দেশের Burn কোম্পানি রাণীগঞ্জ টালি নামে এবং ম্যাকালোরের Bassel mission ম্যাকালোর টালি নামে চালাইতেছেন, তাহা এ দেশেরই নিজস্ব জিনিষ। ইহার পরে আমি ম্যাকালোরস্থ প্রত্নতত্ত্ব অফিসে বাইরা মহিস্মরাস্তর্গত চিত্রলপূর্ণ হইতে আবিষ্কৃত খুঁটাকের পূর্বকার সময়ের ঠিক এই প্রকারের টালি দেখিয়াছি।

আর একখানি চিত্র আমার আকৃষ্ট করিল, ইহা পূর্ণাইয়ার। টিপুসুলতানের মৃত্যুর পর যখন হিন্দুরাজ্যের পুনরায় অত্যাঘর হয়, তখন পূর্ণাইয়া প্রধান অমাত্য নিযুক্ত হন; টিপু সময়েও ইনি একজন অমাত্য ছিলেন। ইনি খুঁট চূড়ামণি। মহীশূর রাজ্যের সমস্ত অমাত্যগুলির চিত্র রহিয়াছে। দ্বিতলের চিত্রগুলির মধ্যে টিপু সহিত ইংরাজের যুদ্ধজ্ঞাপক যে সমস্ত steel engravings রহিয়াছে, সেগুলি সর্কোপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বোধ হইল; এই ছবিগুলি পূর্বে অনেকবার কলিকাতায় Victoria memorial প্রদর্শনীতে দেখিয়াছি; যে চিত্রে টিপু মৃতদেহ প্রদর্শিত, তাহা দেখিয়া হৃদয়ে বেদনা-বিদ্ধ হয় না। এমন নিষ্ঠুর ব্যক্তি বোধ হয় অল্পই আছেন। এক খানি চিত্রে শ্রীরঙ্গপত্তনের সেতুর উপর দিয়া ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল আর্থার ওয়েলেসলি ইংরাজ বাহিনী লইয়া টিপুকে আক্রমণ করিতে যাইতেছেন, বেশ বিশদভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। এ সব অনেক কথা শ্রীরঙ্গপত্তন বর্ণনা কালে বিবৃত করিব। অনেকগুলি চিত্রে প্রাচীন কালের যুদ্ধ ও শোভাযাত্রা বেশ নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত; সে সময়ে কত প্রকারের কোতুকাবহ যুদ্ধাঙ্গ ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কতিপয় শ্রেণীর বলিষ্ঠ বোদ্ধারা কেমন নগ্ন-গায়ে প্রাচীনকালের অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিতেছে, দেখিলে শুদ্ধ যে

কৌতূহল স্পৃহা চরিতার্থ হয় তাহা নহে, অনেক পুরাতন কথা জানিতে পারা যায় ।

জগন্মোহন প্রাসাদটি বেশ উচ্চ ; তাহার উপরতলে গিয়া মহীশূর নগরের শোভা নিরীক্ষণ করিলাম । অদূরে চামুণ্ডা পর্বত, সম্মুখে দুর্গপ্রাসাদ, ও পশ্চাৎ-সংক্রান্ত উদ্যান, মধ্যে মধ্যে খেত রক্ত পীত প্রভৃতি নানাবর্ণের সৌধশ্রেণী, দূরে—বহুদূরে পর্বতসঙ্কুল, বনৈশ্বৰ্য্যগর্ভিত ধূসর প্রদেশ দিক্‌বদলে মিলিয়া এক অপূৰ্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে ।

মধ্যাহ্ন প্রায় অতীত হইলে জগন্মোহন প্রাসাদ হইতে ফিরিলাম ; ফিরিবার সময় টেলিগ্রাম আফিসে বাঙ্গালোরস্থ হুজুর সেক্রেটারীকে একখানি প্রিপেড্‌ আরজেন্ট তার করিলাম । যাহাতে দুর্গপ্রাসাদ দেখিবার অনুমতি দেওয়া হয় । এ দেশের কেমন অভিসম্পাত আছে যে, ২৬ মাসে বৎসর । সময়ের প্রকৃত মূল্য আমরা এখনও শিখি নাই । কবে যে শিখিব, তাহা কে জানে ! জরুরি বা আরজেন্ট প্রিপেড্‌ তার করিলাম ; উত্তর পাইলাম তিন দিন পরে । তার পাইবার পূৰ্ব্বে দিন রাত্রে Fort palace অঙ্গনে ভ্রমণ করিবার সময় জানিলাম, সেইদিনই মহারাজা সদল বলে বাঙ্গালোর হইতে মহীশূরে আসিয়াছেন ; তখনই ভাবনা হইল যে, আর প্রাসাদভ্যন্তর দেখা হইবে না । তৎপর দিন তার পাইয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম । হুজুর সেক্রেটারি মহোদয় বাঙ্গালোর হইতে দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে, বাহিরের লোককে প্রাসাদভ্যন্তর দেখিতে দেওয়া হয় না । মহীশূরে বসিয়া এ সংবাদ পাইলাম । তাঁহার বাঙ্গালোর হইতে মহীশূর নগরে ফিরিবার পরদিন আমিও হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, কেননা মন হইতে একটা ভাবনা দূর হইয়া গেল । পুরাতন প্রাসাদ ভগ্নসংগ্ৰহ হওয়ার কয়েক বৎসর হইল এ প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছে ; ইহার কোন অংশ প্রাচীন নহে বা ভারতীয় স্থাপত্য পরিচায়কও নহে, ইহাতে কোনও বিশেষ নির্মাণ-রীতির প্রচলন নাই ; আমি বাহির হইতে একরূপ দেখিয়া লইয়াছি । তবে ইহার মধ্যে নানাপ্রকারের বিলাস সামগ্রী আছে । কৃষ্ণস্বামী মহাশয় বলিলেন যে, কিছুদিন হইতে বাহিরের লোককে প্রাসাদ দেখিতে দেওয়া হয় না ; ইহার একটি কারণ প্রচলিত আছে শুনিলাম । তিনি বলিলেন যে, প্রায় এক বৎসর পূৰ্বে অর্থাৎ এখন হইতে দুই বৎসর পূৰ্বে, যখন বরোদার গাইকোয়ার মহোদয় তাঁহার মৃতবন্ধুর পুত্র বর্তমান মহারাজকে দেখিতে আসেন, তখন নাকি অবিমিশ্ররীতি-বিবর্জিত নব-নির্মিত প্রাসাদ দেখিয়া অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করেন ; সেই অবধি বাহিরের কাহাকেও প্রাসাদ দেখিতে দেওয়া হয় না ; জানি না ইহা কতদূর সত্য । যাহাই হউক, ইহার অন্তস্থলে রাজকীয় কোন গুপ্তনীতি প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া বোধ

হইল। নিজামরাজ্যে ভ্রমণকালে গোলকুণ্ডা দেখিবার জন্য রেসিডেন্সিতে বাইলে, সহকারী রেসিডেন্ট মহাশয় এই প্রকার রাজনীতিমূলক মিষ্ট কথার আশায় বিশেষ-ভাবে আপ্যায়িত ও সম্মানিত করিয়াছিলেন। আমি উজ্জ্বল চির-কৃতজ্ঞ! হার বাঙ্গালি!

জগন্মোহন প্রাসাদ দেখিয়া বাঙ্গলার কিরিতে প্রায় ১টা বাজিরা গেল; তাড়াতাড়ি আহাৰ সারিয়া পুনরায় বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে ভয়ানক বৃষ্টি হইল; এ বেন আমাদের বাঙ্গালা দেশের বৃষ্টি। কৃষ্ণস্বামী মহাশয় তাঁহার অফিসে আসিতে বলিয়া দিয়াছিলেন; ইনি একজন লোকাল ওয়ার্কস্ অডিটর বা আয়-ব্যয়-পরীক্ষক। ইহার অফিস মহীশূর নগরের টাউনহলে; এ বাটীতে মিউনিসিপ্যাল অফিসও অবস্থিত। হেল্প অফিস দিতলে; দেখিলাম বারান্ডার দেওয়ালে বিজ্ঞাপনের দ্বার স্বাস্থ্যসংক্রীয় মূল নীতিগুলি লিখিত রহিয়াছে;—যথা, (১) মশক হইতে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি, এই কারণ মশারি ব্যবহার করা উচিত, (২) দুগ্ধ সর্জন্য উষ্ণ করিয়া পান করা উচিত, কারণ তাহা না হইলে শীতল দুগ্ধে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অনেক ভীষণ দেহে সংক্রামিত হইয়া নানাবিধ ব্যাধির সৃষ্টি করে, (৩) টীকা লইলে বসন্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ইত্যাদি।

এ প্রকারে জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা বেশ সুন্দর, আমরা সাধারণকে কোন-কালে শিক্ষা দিবার বা তাহাদের সু-সংস্কারগুলি দূর করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিব না, অথচ এ দেশবাসীরা স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন বলিয়া অভিযোগ করিব। আমি সভ্য-অভিমানী কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কথাই বলিতেছি; এখানেও জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে তেমন কোন চেষ্টাই দেখা যায় না; কেবল আইন কাহূনের স্বল্পজালে চেষ্টাকে সরল সহজ না করিয়া জটিলই করা হইয়াছে।

টাউনহলে অনেক অফিস বসে; এখানকার হলে একটি থিয়েটারের ঠেজ বাধা আছে; তাহার সম্মুখে গ্যালারী; ঠেজের দুই ধারে সরস্বতীর দুইটী সুন্দর চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে; বাঙ্গালা দেশের মত বিকৃত ক্রটিসম্পন্ন নহে। এ দেশের লোকেরা শিল্প-কলাকে নিজ জাতীয়তার মধ্য দিয়া আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করে।

এতক্ষণ ধরিয়া অতিশয় বৃষ্টি হইতেছিল; কৃষ্ণস্বামী মহাশয়ের অফিসে বাইরা তাঁহার সহকারী ও উপরিত্তন কর্মচারীর সহিত নানি গল্প করিতে লাগিলাম; শেষোক্ত কর্মচারীর অনুমতি লইয়া কৃষ্ণস্বামী মহাশয় আমার সহিত বাহির হইয়া পড়িলেন। আমরা চামুণ্ডা পর্বতের উদ্দেশে বাহির হইয়া অবশেষে পশুশালায় বাইলাম, কেন না এ বৃষ্টিতে পর্বতারোহণ বিপত্তিজনক। কলিকাতার ভায় এখানকার পশু-

শালার দ্বারদেশে দর্শনী দিয়া প্রবেশ করিতে হয় ; বৃষ্টি হইয়া যাওয়ার জন্য অতিশয় শীত করিতেছিল ; আমি ত শীতে কাঁপিতে ছিলাম । এখানকার পশুশালায় এক সুন্দর নিয়ম দেখিলাম ; এক এক পশুর পুরুষ ও স্ত্রীকে একত্রে মিথুনভাবে থাকিতে দেওয়া হয়, এক এক পিঞ্জরে ব্যাঘ্র-ব্যাঘ্রী, সিংহ-সিংহী, একত্র রহিয়াছে । ইহাতে তাহারা বেশ সুখে থাকে । আর একটা বিশেষত্ব দেখিলাম ; এখানে শুক্রবারে মাংসাশী পশুদিগকে জল ভিন্ন কিছুই আহার করিতে দেওয়া হয় না । পশুরক্ষকেরা বলিল যে, ইহারা ঐ দিন জুম্মা বা শুক্রবার পালন করে । অন্ত শুক্রবার বলিয়া পশুদিগকে কিছুই খাইতে দেওয়া হয় নাই । শুনিলাম, ইহাতে নাকি তাহাদের শরীর ভাল থাকে—প্রাণিবিদেরাই জানেন ইহা কতদূর সত্য । এখানে খেত হস্তী, বার্ড অফ প্যারাডাইস, খেত কাক, কুস্তীর প্রভৃতি অনেকগুলি জীব দেখা গেল ; আমার এত শীত বোধ হইতেছিল যে, আমি অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না ; এদিকে সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিল । আমরা বাহিরে আসিলাম ; দুর্গপ্রাসাদের পরিখার পার্শ্ব দিয়া কৃষ্ণস্বামী মহাশয়ের বাটীতে আসিলাম ; তাঁহার বাটীতে তাঁহার অহুরোধে কিছু জল-বোগ করিয়া বান্সলোর প্রত্যাবৃত্ত হইলাম ।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ।

সামর্থ্য

দ্বারকার রাজসিংহাসন, ভাগ্যবান, বক্ষে ধরি' যবে

বিশ্ব-রাজ ব্রহ্মেন্দ্র-নন্দনে,

বংশীধারী কংসারি সে যবে সংসারীর ছলে বন্ধ হেন

ঐশ্বর্যের বিলাস-বন্ধনে,—

একদিন দেবেন্দ্র-বিজয়, রত্নময় পর্যাক-শয্যায়,

অঙ্কলক্ষ্মী রুক্মিণীর সহ,

অনুরক্ত বিশ্রান্ত-কোতুকে, পরস্পরে মান অভিমান—

প্রণয়ের আগ্রহ-নিগ্রহ ;

● আশ্রয়কান্তি সহসা নীরস কহে কৃষ্ণ এ কি প্রিয়ে মোর

ঘটিল বিষম শিরঃশূল,

আচম্বিতে, কেন আজি হেন, নিদারুণ দৈব-বিড়ম্বনা,

যন্ত্রণায় অন্তর আকুল ?

শশব্যস্তে, রুক্মিণী অমনি, মৃদু হস্তে, স্পর্শ করি' ঘন

ব্যথিত সে শিরোদেশ তার,

মন্দ মন্দ বীজ্ঞনী সঞ্চারি' কহে, নাথ, “কহ কিসে হয়

এ ব্যাধির আশু প্রতীকার ?”

চক্রধর কহে, “শুচিস্মিতে, কি কহিব, অসহ যাতনা,

বাহু বিশ্ব ঘাইতেছি ভুলি’,

প্রতীকার একমাত্র বটে আছে তোমা কহি, স্নুলোচনে,

সতী-রমণীর পদধূলি ।”

কহে রাণী, “কহ, হৃদয়েশ, কে সে সতী, কিবা নাম তার,

কোথা রহে সেই ভাগ্যবতী ?”

কৃষ্ণ কহে, “নহে আর কেহ, দ্বারকায় নারী-শিরোমণি

কৃষ্ণপ্রিয়া রুক্মিণী সে সতী ।”

“পরিহাস রাখ, রসরাজ, কহ সত্য, কেবা সে কামিনী,

তব তরে ব্যথা বাজে প্রাণে ;

হরি কহে, “যা কহিনু, প্রিয়ে, এস স্বরা, যুচাও এ জ্বালা
 তোমার চরণ-রেণু-দানে ।
 অসম্ভব এ কি কথা, নাথ, পতি চির-আরাধ্য সতীর,
 ধন্য সতী পতি-পাদোদকে,
 রুগ্নিণী কি হেন পাপীয়সী বিশ্ব-বন্দ্য-শিরে পদ রাখি’
 চিরতরে মজিবে নরকে ?”
 দ্বারকা-লীলার পুরোভাগে, নটরাজ ব্রজমাঝে যবে
 বসি’ শ্যাম বমুনার তটে,
 মাধুর্যের হেম-তুলিকায় আঁকিতেন নিত্য নব ছবি
 গোপিকার চিত্র-চিত্রপটে,
 লীলাময় এমনি একদা, নিভৃত-নিকুঞ্জ-বন-মাঝে,
 শিরোব্যথা রাখারে জানায় ;
 শক্তিশেল সম রাখিকার বক্ষে বাজে নির্ম্মম সে বাণী,
 পতিপ্রাণা উন্মাদিনী-প্রায় ।
 “কহ স্বরা, কহ, রাখানাথ, উপশম কিসে হয় ব্যাধি,”
 কহে রাখা ভাসি’ আশি-নীরে ;
 কৃষ্ণ কহে, “কৃষ্ণ-প্রাণাধিকে, সুস্থ হই, দাও যদি সতি,
 তব পদরজঃ মোর শিরে ।”
 প্যারী কহে, “জীবন-বল্লভ, আমার যে সরবস্ব তুমি,
 ভাল মন্দ কিছু নাহি জানি ;
 তোমার সুখের তরে, বঁধু, কি না পারি এ বিশ্ব-মাঝারে ;
 পদধূলি অতি তুচ্ছ বাণী !
 এই শিরে দিনু পদধূলি, কৃষ্ণ-কলকিনী নাহি ডরে,
 জগত্তের নিন্দা অগৌরব ;
 সুস্থ তুমি, কহ একবার, হাসিমুখে যেচে লই আমি
 জন্ম জন্ম অনন্ত-রৌরব ।”
 শ্রীবল্লভ গোস্বামী ।

শকুন্তলার মা

শকুন্তলার মা মেনকা। স্বর্গের অপ্সরা। অপ্সরাদের সেরা। ইন্দ্রের আচ্ছাদকারী। বিশ্বামিত্রের ভয়ানক তপস্তা দেখিয়া ইন্দ্র ভয় পাইয়াছিলেন। তিনি মেনকাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, “উহার তপস্তার বিরূপ কর।” মেনকা আপনার অপকৃপ রূপ লইয়া বিশ্বামিত্রের কাছে আসিয়া উপস্থিত। বিশ্বামিত্রের তপস্তাভঙ্গ হইল, মেনকার এক কস্তা হইল। কস্তাটিকে তিনি ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। কথমুনি মেয়েটিকে কুড়াইয়া আনিয়া পালন করিলেন। সেই মেয়েটিই শকুন্তলা।

মহাভারতে এই গল্পটি একটু অন্তরূপ। মেনকা বাইতে চাহেন না। কেন না, ঋষি বড় রাগী লোক, পাছে রাগ করিয়া শাপ দিয়া বসেন, সেই ভয়ে তিনি বাইতে চাহেন না। ইন্দ্র পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। মেনকা বলিলেন, “দেখুন, আপনি বাহার ভয়ে অস্থির, আমার তাহার কাছে পাঠাইতেছেন কেন? তিনি জোর করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। বশিষ্ঠকে নিঃসন্তান করিয়াছেন। আপনার শৌচের জন্ত তিনি এক প্রকাণ্ড নদী বহাইয়া দিয়াছেন। বাহার দুর্গে মহর্ষি মতঙ্গ ব্যাধ হইয়া, আপনার ক্রীপূজা-গণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় যিনি আশ্রমে আসিয়া পান্না নামে নদী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি মতঙ্গের জন্ত বজ্র করিলে, আপনি ভয়ে তথার সোম-পানের জন্ত বাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যিনি নক্ষত্র দিয়া অপর একটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ত্রিশমুকে, শুক শাপ দিলে, তিনি তাঁহাকে অস্ত্র দিয়াছিলেন; এবং তাঁহাকে স্বর্গের রাজ্য পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। যিনি এমন প্রবলপ্রতাপ, আপনি আমার কোন্ সাহসে তাঁহার কাছে পাঠাইতেছেন?” ইন্দ্র আরও পীড়াপীড়ি করিলেন; মেনকা রাজি হইলেন; কিন্তু সন্ত রহিল যে, আমার সঙ্গে মদন ও বায়ু যাইবেন। মেনকা ঋষির নিকটে গিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বায়ু তাঁহার কাপড় উড়াইয়া লইয়া বাইবার চেষ্টা করিলেন; তিনি সেই কাপড় ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে দুজনের মিলন হইল ও শকুন্তলার জন্ম হইল। মেয়েটিকে ফেলিয়া মেনকা স্বর্গে গেলেন। ঋষিও সরিয়া পড়িলেন। পাখীরা দেখিল, এমন মেয়েটি হিমালয়ের নিবিড় জঙ্গলে পড়িয়া আছে, এখনই বাধে খাইয়া ফেলিবে। তাহার ঘেরিয়া লালন-পালন করিতে লাগিল। তাই তাহার নাম শকুন্তলা। পাখীরা একদিন কথমুনিকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া মেয়েটিকে তাঁহার হাতে সঁপিরা দিল। শকুন্তলা শব্দের এই ব্যুৎপত্তি আমরা মহাভারতেই পাই; অভিজ্ঞান-শকুন্তলার ইহার নামমাত্রও নাই।

কিন্তু মেনকা কি শকুন্তলাকে ভুলিয়া ছিলেন ? তাহা ত বোধ হয় না। শকুন্তলার গল্প পড়িলেই মনে হয়, একটা-না-একটা অলৌকিক শক্তি তাঁহার অদৃষ্টে ফিরাইয়া দিতেছে ; তাঁহার গতিবিধি দেখিতেছে ও বাহাতে তাঁহার ভাল হয় করিতেছে। মহাভারতে ছেলে হইবামাত্রই দেবতারা আশীর্বাদ করিয়া গেলেন, আবার রাজা তাড়াইয়া দিলে দৈববাণীতে দেবতারা বলিয়া দিলেন যে, এ ছেলে তোমারই। তুমি শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়াছিলে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলে গোড়া হইতেই আমরা এই অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাই। প্রথম অঙ্কে রাজা যেন নিয়তি-প্রেরিত হইয়াই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বিতীয় অঙ্কে রাণীদের নিমন্ত্রণও যেন সেই নিয়তিরই খেলা। চতুর্থ অঙ্কে দৈববাণীও নিয়তির কাজ। বনদেবতাদের হাত বাহির করিয়া গহনা দেওয়া অলৌকিক শক্তির বিকাশ-মাত্র। পঞ্চমে ত জ্যোতিষধারী একটি জ্যোতিষ শকুন্তলাকে লইয়া উপরে চলিয়া গেল। ষষ্ঠে মেনকার এক সখী সর্বদাই উপস্থিত। সপ্তমে মেনকা স্বয়ং মারীচের আশ্রমে উপস্থিত আছেন। অতএব মেনকা মেরেটিকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারেন নাই। স্বর্গ হইতে তাহার মঙ্গলের জন্ত সর্বদাই উহার উপর চোখ রাখিতেন। অপ্সরা-মঙ্গলের সকলেই জানে, শকুন্তলা মেনকার মেয়ে। সকলেই শকুন্তলার মঙ্গলকামনা করিত।

শাক্ত-রব যখন শকুন্তলাকে কুলটা বলিয়া তাহাকে পতিগৃহে দাস্ত করার কথা বলিলেন, তখন রাজা বলিলেন, “আপনারা কেন উহাকে ঠকাইতেছেন ? চাঁদ কুমুদিনীকেই চার, সূর্য্য কমলিনীকেই চার ; ভদ্রলোকের মন কখনই পরের জ্যোতিষকেই চার না।” অর্থাৎ শকুন্তলা আমার জ্যোতিষ নহে, আমি উহাকে বাড়ীতে দাস্তবৃত্তি করিতেও দিতে রাজী নহি। তখন শাক্ত-রব আবার বলিলেন, “আচ্ছা, যদি আপনারই ভুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি হইবে ?” তখন রাজা পুরোহিত সোম-রাতকে মধ্যাহ্ন মানিলেন ; বলিলেন, “আপনাকেই আমি মধ্যাহ্ন মানিতেছি, বলন দেখি, আমিই ভুলিয়া গিয়াছি, অথবা এই মিথ্যাকথা কহিতেছে ;—এইরূপই যখন সন্দেহ—তখন আমি কি করি ? জ্যোতিষ করিয়া পাপী হইব অথবা পরজ্যোতিষ গ্রহণ করিয়া পাতকী হইব ? এই ছুইএর মধ্যে কোন্টা গুরু আর কোন্টা লঘু, আপনিই আমার উপদেশ দিন।” পুরোহিত মহাশয় একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, “সাধুরা বলিয়া গিয়াছেন, আপনার প্রথম সন্তানে চক্রবর্তী রাজার সব লক্ষণ থাকিবে। যদি কণ্ঠমুনির দোহিত্রের—আপনার পুত্র বলিতে যখন আপনি সন্দেহ করিতেছেন, তখন কর্ণ মুনির দোহিত্র বলাই ঠিক সেই সব লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে ইহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে পারেন ; নচেৎ ইনি বাপের বাড়ীই যাইবেন ;

এখন ইনি আমার গৃহেই থাকুন।” রাজা তাহাতে রাজী হইলেন; কিন্তু তাঁহার সন্দেশ গেল না, তিনি খুসী হইলেন না।

শকুন্তলাকে লইয়া পুরোহিত চলিয়া গেলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তপস্বীরাও গেলেন। রাজা এই চিন্তায়ই মগ্ন হইয়া ধানিক বসিয়া রহিলেন। এমন সময়ে নৈপথে শব্দ হইল —“আশ্চর্য্য।” রাজা চমকিয়া উঠিলেন; দেখিলেন, পুরোহিত মহাশয় আসিয়াছেন; তাঁহার মুখে বিষ্ময়ের চিহ্ন। ক্রমে তিনি ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন, “কণ্ঠ শিষোরা চলিয়া গেলে মেয়েটি আপনার অদৃষ্টের নিন্দা করিতে লাগিল আর হাত তুলিয়া তুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। আর অমনি অঙ্গরাদের যে ঘাট আছে, সেইখান হইতে একটা জ্যোতিঃ নামিয়া আসিল; জ্যোতিটার আকার একটি জ্বীলোকের মত। সে উহাকে লইয়া উপরদিকে উঠিয়া গেল।” রাজা বলিলেন, “ও কথার আর কাজ কি? আপনি বিশ্রাম করুন গে, আমিও বড় আকুল হইয়াছি, শুই থিরা।”

এখন সকল বড় বড় নগরেই অনেক ঘাট থাকে। হস্তিনার শতীর ঘাট ছিল। সেইখানেই গৌতমী বলিয়াছিলেন যে, শকুন্তলার আঙটা হারাইয়া গিয়াছে। আর একটি ঘাট ছিল, তাহার নাম অঙ্গরা-তীর্থ। সেখানে, আমরা পরে জানিতে পারিয়াছি, পালা করিয়া অঙ্গরারা পাহারা দিত। মেনকার মেয়ের এই দুর্দশা দেখিয়া সেদিনকার অঙ্গরা তাহাকে লইয়া গ্রহণ করিল; মেনকার কাছে তাহাকে দিয়া আসিল। বিষম সঙ্কটসময়ে মেনকার দ্বারাই শকুন্তলার উদ্ধার হইল।

শকুন্তলার মা কি এই উদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন? তাহা নহে। তাহার জন্ত সকল অঙ্গরাই ব্যস্ত —কিসে রাজবাড়ীর খবর পাইব; কেমন করিয়া রাজা শকুন্তলাকে আবার গ্রহণ করিবেন। একদিন অঙ্গরা-তীর্থে সাধুমতী অঙ্গরার পালা ছিল। সে পালা খাটিয়া মনে করিল, “বাই; রাজবাড়ীর খবর লইয়া বাই। মেনকার সম্পর্কে শকুন্তলা ত আমার মেয়েরই মত। মেনকা ত আমার বলিয়াই দিয়াছেন যে, তুমি সর্বদা রাজার বাড়ীর খবর লইবে। আচ্ছা, এই ত বসন্তকাল পড়িয়াছে; এই সময় ত উৎসব হয়; আজ তাহার নামও নাই কেন? আমি ধ্যানে জানিতে পারি; কিন্তু তা হলেও এ খবরটা চোখে দেখাই ভাল। কারণ, তা হলে মেনকার উপর আদর দেখান হইবে। যা হোক, আমি অদৃষ্ট থাকিয়া এই মালিনীর ব্যাপারটা দেখি। মালিনীরা উৎসবের জন্ত আমার বোটল তুলিতেছে আর গল্প করিতেছে ও বোটল দিয়া মদনের পূজার আয়োজন করিতেছে।” এমন সময়ে কক্কী আসিয়া তাহাদের তিরস্কার করিয়া বলিল, “তোরা বোটল ছিঁড়্‌চিস্‌ যে? জানিস্‌ না, উৎসব বন্ধ, রাজা নিজে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন?” তাহার বলিল, “আমরা নূতন আসিয়াছি, জানি না। হাঁ মহাশয়, কেন রাজা এমন হুকুম দিলেন?” সাধুমতী মনে মনে বলিল, ‘কোন

গুরুতর কারণ অবশ্যই থাকিবে।’ কক্কু কী বলিল, “আপনার একটি আঙুটি পাইয়া রাজার ঠিক মনে হইয়াছে যে, ঋষির যে কস্তাটিকে সে দিন তাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহাকে সত্য সত্যই বিবাহ করিয়াছিলেন। তাই তাহার মনে বড় কষ্ট হইয়াছে। সেই জন্তই উৎসব বন্ধ।” মালিনীরা চলিয়া গেল। সেইখানে রাজা আসিলেন, বিদুষক আসিলেন, আর প্রতীহারী আসিলেন। রাজাকে দেখিয়াই সান্ন্যমতী মনে মনে বলিলেন, “তাড়াইয়া দিলেও শকুন্তলা যে আজও রাজার জন্ত ঝোরে, তা ঠিক।” রাজা যখন বলিলেন, “আহা, সে বেচারী আমার মনে করাইয়া দিবার জন্ত এত চেষ্টা করিল, তখন ত আমি বুঝিলাম না, এখন মনে হওয়াটা কেবল অমুতাপেরই কারণ হইল।” সান্ন্যমতী শুনিয়া মনে মনে বলিল, ‘বেচারার ভাগ্যই এমনি।’ রাজা সেখান হইতে মাধবীলতাকুঞ্জে গেলেন; সান্ন্যমতীও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। রাজা যখন অত্যন্ত কান্দাকাটি করিতে লাগিলেন, তখন সান্ন্যমতী একটু খুসী হইলেন; কিন্তু বলিলেন, “আমরা এমনি স্বার্থপর যে, এ বেচারী কান্দিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, আর আমার আনন্দ হইতেছে।”

রাজা যখন বলিলেন, ‘শকুন্তলার মা মেনকা, তাই বোধ হয়, কোন অপরা তাহাকে লইয়া গিয়াছে,’ তখন সান্ন্যমতী বলিলেন, “ইহার যে ভুল হইয়াছিল, সেইটাই আশ্চর্য্য; মনে পড়া ত কিছু আশ্চর্য্য নয়।” রাজা যখন অনুরীটিকে তিরস্কার করিলেন, সান্ন্যমতী বলিলেন, “এটি যদি আর কাহারও হাতে পড়িত, সত্যই তিরস্কারের যোগ্য হইত।” রাজা যখন বলিলেন, “এই আঙুটি হাতে পরাইবার সময় বলিয়াছিলাম, আমার নামের অক্ষরগুলি রোজ একটি একটি করিয়া গুণিতে থাক; যে দিন শেষ হইবে, সেই দিনই আমার লোক তোমায় লইতে আসিবে।” সান্ন্যমতী বলিলেন, “এমন সরস্তও ভাঙে।”

বিদুষক বলিলেন, “জেলের মাছের মধ্যে গেল কি করিয়া?” রাজা বলিলেন, “শতীতীর্থে স্নান করিতে গিয়া হারাইয়া গিয়াছিল।” সান্ন্যমতী বলিলেন, “এই জন্তই রাজার বিবাহে সন্দেহ হইয়াছিল। কিন্তু বেধানে এত ভালবাসা, সেখানে কেন অভিজ্ঞান চাহিতে হইবে, বুঝি না।” চতুরিকা যখন শকুন্তলার ছবি আনিয়া রাজার হাতে দিল, সান্ন্যমতী বলিলেন, “বাঃ, রাজা ত বেশ আকৃষ্ট হইলেন। সখী যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।” রাজা যখন ছবিটির আলোচনা করিতে লাগিলেন, সান্ন্যমতী বলিলেন, “রাজার যেমন স্নেহ, যেমন মমতা, তার মতই আলোচনা হইতেছে।” বিদুষক যখন বলিল, ‘এ তিনটির মধ্যে কোনটি শকুন্তলা?’ তখন সান্ন্যমতী মনে মনে বিদুষককে ধিকার দিতে লাগিলেন। সে যখন বলিল, “এমন ছবি, ইহাতে আবার কি লিখিবে?” তখন সান্ন্যমতী মনে করিলেন, ‘সখী যে সকল জায়গা ভালবাসে ও তাহার যে সাজ বনবাসে সাজে, এ সব না লিখিলে ত

ছবিখানা পূরা হয় না।' এইরূপে সানুসমতী দেখাইতেছেন, তাঁহারা অঙ্গরারা, ছবি আঁকার এক এক জন বৃক্ষ বৃহস্পতি। কিন্তু দেখিতে দেখিতে রাজাও তন্নয় হইয়া গিয়াছেন, সানুসমতীও তন্নয় হইয়া গিয়াছেন। রাজা ভোমরাটাকে শাস্তি দিবার চেষ্টায় আছেন, এমন সময় বিদূষক বলিল, “এ যে ছবি, কর কি?” তখন সানুসমতী বলিলেন, “আমারই ভ্রম হইয়াছিল; রাজার ত হবেই; ইনি যে নিজে ভেবে লিখেছেন।” রাজা মনে করিতেছিলেন, সত্য সত্যই শকুন্তলা সামনে রহিয়াছেন। এখন ওটা ছবি শুনিয়া তিনি একেবারে ছটফট করিতে লাগিলেন। সানুসমতী বলিলেন, “রাজার এ বিরহটোর গতি বুঝা যায় না; এর আগার সঙ্গে গোড়ার মিল নাই।” রাজা বড়ই বিলাপ আরম্ভ করিলেন, সানুসমতী বলিলেন, “সখীকে তাড়াইয়া দিয়া রাজা যে দুঃখ দিয়াছেন, সে দুঃখটা এখন মুছে ফেলা উচিত।” দেবী সানুসমতীর উপর রাজার ভাব দেখিয়া সানুসমতী মনে করিলেন, ‘রাজার মন এখন অস্ত্রের উপর হইলেও রাজা আগেকার ভালবাসা ভুলেন নাই।’ রাজা যখন ‘আমারও ছেলে নাই’ বলিয়া কাদিতে লাগিলেন, তখন সানুসমতী কহিলেন, “তোমার বংশ এখন লোপ করে কে?” আবার যখন আপনি নিঃসন্তান বলিয়া রাজা মুচ্ছা গেলেন, তখন সানুসমতী বলিলেন, “কি কষ্ট, দীপ রহিয়াছে, পক্ষীর দোষে অন্ধকার দেখিতেছেন। আমি এখনি ইঁহাকে স্মৃতি করিতে পারি, কিন্তু দাক্ষারণী শকুন্তলাকে আশ্বাস দিবার সময়ে একদিন বলিয়াছিলেন যে, দেবতার শীতাই মিলন করাইয়া দিবেন। দিনকতক যাক না। কিন্তু এই সব কথা আমার মুখে শুনিলে তাঁহার নিশ্চয়ই আশা হইবে।” এই বলিয়া সানুসমতী অদৃষ্ট অবস্থাতেই উপরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

এই যে সানুসমতীকে অদৃষ্ট করিয়া আনা, ইহাও কালিদাসের একটা ভারি গুণগণা। ইহাতে রাজার কোন উপকারই হইল না, তাঁহার উৎকর্ষা-নিবৃত্তি হইল না। না হওয়াই ভাল। যিনি অত সাধ্যসাধনার পরও শকুন্তলাকে নিলেন না, তাঁহাকে মিথ্যাবাদী কুলটা বলিয়া গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন, তাঁহার যে একটু শাস্তি হয়, এটা সকলেই চায়। সানুসমতী বলিয়াছেন, ইঁহার দুঃখে আমার সুখ হইতেছে। যারা ধিরেটোর দেখিতে গিয়াছে, তাহাদেরও মনের ভাব তাই। কিন্তু সানুসমতীকে এই ভাবে আনিয়া কালিদাস প্রেমিকবর্গের উৎকর্ষাটা অনেক পরিমাণে দূর করিয়াছেন। আবার রাজাকে শকুন্তলার খবর না দিয়াও শকুন্তলাকে রাজার খবর দেওয়াইয়া তাহার মনেও আশার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। কালিদাস এ কৌশল কোথায় পাইলেন, জানা যায় না। ভাস কবির অবিমারক নামক নাটকে কতকটা এইরূপ কৌশল আছে। একটি আঙুটা ডান হাতে পরিলে

তাঁহাকে দেখা বাইত, আবার বাঁ হাতে পরিলে দেখা বাইত না। তাই থেকে যদি কালিদাস এই কৌশল লইয়া থাকেন, তাহা হইলে এটা এক রকম নূতন সৃষ্টিই বলিতে হইবে। কালিদাস কোথায় পাইয়াছেন, না জানিতে পারিলেও ভবভূতি যে কালিদাসের এই সাহুমতীর অনুরূপ থাকা লইয়া একটি অদ্বিত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ভবভূতি একজন সখীর সহিত সীতাকে অনুরূপ করিয়া আনিয়াছেন এবং রামের অবস্থা দেখাইয়া নিজের দুঃখ ভুলাইয়া দিয়াছেন। কালিদাস যেটা পরম্পরা সম্বন্ধে করিয়াছেন, ভবভূতি সেইটাই সাক্ষাৎসম্বন্ধে করিয়াছেন।

আমরা কোথাও মেনকাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাই না। কিন্তু তাঁহার কার্য্য সর্বত্র দেখিতে পাই। অনেক জিনিস তাঁহার কার্য্য নাও হইতে পারে। কিন্তু কালিদাস মেনকাকে বাহির না করিয়া, এমনি কৌশল করিয়াছেন—যাহা তাঁহার কার্য্য নহে, তাহাও তাঁহার বলিয়া বোধ হয়। মারীচাপ্রমেও মেনকাকে আমরা দেখিতে পাই না; কিন্তু দাক্ষায়ণী বলিয়াছিলেন, তিনি এইখানেই আছেন। কেন আছেন? যে হেতু, আজ রাজার সহিত শকুন্তলার মিলনের দিন—আর মেনকা—শকুন্তলার মা।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

—

বিজয়া

রাগিণী—মলিত

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে,
ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার ।
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে অঁধার ॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, ঘারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা ডাকে বার বার ॥
তব দেহ হে পাষণ, এ দেহে পাষণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ, না হলো বিদার ॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় এ কি বিড়ম্বনা বিধাতার ॥
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি-রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা স্তধার ॥

রামপ্রসাদ সেন ।

বাল্যসঙ্গ

(অগ্রহায়ণ ১৩২৩ হইতে কার্তিক ১৩২৪)

৩য় বর্ষের সূচীপত্র

(বিবরণে বর্ণানুক্রমিক)

বিষয়	পৃষ্ঠা
অচেনা দূতী (কবিতা)	৬২১
অদৃষ্ট	৭১০
অনাহুত (কবিতা)	৪২৭
অশোকের ধর্মশিক্ষা	২৩
আগমনী	৮১৫
আদিরস	৫৭০
আর একবার (কবিতা)	১৫২
আহ্বান	৬৮২
ইউরোপীয় ট্রাভেলি ও ভারতীয় কল্পনা	৪২২
উত্তরাধিকারী	৫৭৮
উর্জী-বিদায়	২৪২
একটি মোকদ্দমার রায়	৬২২
কণ্টক	২১৪
কথের কোমল সৃষ্টি	৬৫২
কথের কঠোর সৃষ্টি	৮৪২
কমলের ছঃখ	৪২, ১০০, ২২২, ২৭৭ ৩৬৫, ৪৩৫, ৫২৬, ৭০৩, ৮০৪, ৮৫১
কোমলে কঠোর	৬২৩
কৃষ্ণনাম (কবিতা)	২১৩
গদা চাঁড়াল (গল্প)	১৬১
গান	৮৩, ১৭০, ৩২৬, ৩৩২, ৪০২, ৮১৪
ঘাটের কাব্য (কবিতা)	১২২

বিষয়		পৃষ্ঠা
চলিত ভাষা ও সাধুভাষা	...	২
চল্লিশ বৎসর পূর্বে	...	২১৬
চার-ইয়ারী কথা	...	৮২৬
চিরসঙ্গী	...	৮৪১
ছেঁড়া ফুল	...	২১০
জয়দেব (কবিতা)	...	৭৮০
জানালার কাব্য-কবিতা	...	২০
জীবন ও জীবনের ধর্ম	...	২১৫
ভাঙ্গমহল (কবিতা)	...	৪৭২
ভিহুর মা	...	৫৩৮
দিউয়ান-ই-মদকী কি জেবউন্নিসার ?	...	২৬২
দীক্ষিতের নিবেদন (কবিতা)	...	৩৫০
ছনিয়ার ছদিন	...	৬৩৮
দোসরা নম্বর	...	৭২২
দোল-পূর্ণিমা	...	৩০৫
ধর্ম প্রচারে রবীন্দ্রনাথ	...	৫৬৫
নারায়ণ	...	১
নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম	...	৪৫৫
নিধু গুপ্ত	...	৭৪১
নিঝুম রাতে	...	৫৬২
নিবেদন (কবিতা)	...	২২
নূতন বিজ্ঞান	...	৪১৫
নির্লোকে সার চিন্তামণি	...	২০৩
পন্ন-আহারী বাবা (কবিতা)	...	৪৮১
পাছের প্রতি (কবিতা)	...	২০১
পাগল	...	২৪৬
পাগল মাঝির গান (কবিতা)	...	২২৭
পাগল রাতে (কবিতা)	...	৪৫৩
পুরীর চিঠি	...	৪১০
পূজার বিষ (কবিতা)	...	২৭৫

বিষয়			পৃষ্ঠা
প্রতীকার (কবিতা)	...	...	২৫৫
প্রথম দর্শনে (কবিতা)	...	...	৪১২
প্রাচীন রাজগৃহ	...	...	৮৮৩
প্রার্থনা (কবিতা)	...	...	২৬১
প্রেমের সংশয় (কবিতা)	...	...	৪০৮
বঙ্গভাষা ও বাংলাভাষা	...	...	৭৮১
বঙ্গ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ	...	...	৮৪
বর্ণ-ভিখারিণী (কবিতা)	...	...	৫৭
বাহু বিরহিতা	...	...	৪১
বাকলার গীতি-কবিতা	...	...	১১৬
বাকলার কথা	...	...	৪৮৫
বাংলার চিত্রকলা	...	...	৬৯১
বিদ্যায় (কবিতা)	...	...	৮১
বিকাল (কবিতা)	...	...	২৬৫
বিমাতা	...	...	৩৫৪
বিরহে পাগল	...	...	৫৫২
বিজয়া	...	...	৮৯২, ৯৫০
বুদ্ধিমানের কণ্ঠ	...	...	৭৮৯, ৮১৫
বেদনার বৈচিত্র্য	...	...	৮৯৩
বৈষ্ণব মহাজন ও বাঙ্গালী মহাজনপদ	...	...	১৭১
বৌদ্ধধর্ম	...	...	২০৪, ৩৩৬, ৪০৩
ভিকুর বিয়ে	...	...	২৬৬
ভক্তিহীনা (কবিতা)	...	...	৭৫৩
ভূতের বেগার (গল্প)	...	...	৮৬৯
মনের খোঁরাফী	...	...	২০৯
মন্ত্রপূজা (কবিতা)	...	...	২৮৬
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৩৪০, ৪৬৪, ৬১০, ৭১২, ৯২২	
মহাজনপদের ঈশ্বরতত্ত্ব	...	...	৩১৭
মহাজন সিদ্ধান্তে পুরুষ ও প্রকৃতি	...	...	৩৭৯
মহীশূর ভ্রমণ	...	...	৪৭৬, ৯৩১

বিষয়	পৃষ্ঠা
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৬৪৪
মানস বৃন্দাবন	৫২৫
মায়াবতী পথে	৬২, ১৫৩
মায়ের সাধ (কবিতা)	৩৬১
মায়া (কবিতা)	৪৫৮
মায়ের ডাক (কবিতা)	৮৬৭
মেদিনীপুর পরিষদে সভাপতির কথা	৭৩১
শকুন্তলার মা	২৪৪
শেষবেলার (কবিতা)	২০৮
শিশিরবিন্দু (কবিতা)	৮৮২
শোধ	৪৫২
শ্রাম না এল (কবিতা)	৬০৮
ত্রিকালগুণী পূর্ণিমা	২২৮
শ্রীমঙ্গল রসকারিকা	৪৭৮
সমুদ্রতীরে (গল্প)	৭৮
মানারে (গল্প)	৫২
সাধু (কবিতা)	৩১০
সামর্থ্য (কবিতা)	২৪২
সাহিত্যে অনধিকারী	৩১১
সাহিত্যে স্বাভাব্য	৫৪৬
সাহিত্যে রূপান্তর	৭২২
সে আসিল না (কবিতা)	৮৫০
স্বামী বিবেকানন্দ ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ	২৮৭
স্বামী	৭২, ৭৫৫
রূপান্তরের কথা	৩৮৭
রূপান্তর	৬৪২

সূচীপত্র

লেখক ও লেখিকাগণের বর্ণানুক্রমিক নাম

লেখক বা লেখিকা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অপ্রকাশিত লেখক		
শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখাৰ্জী	কণ্টক (কবিতা)	২১৪
শ্রীঅপর্ণা দেবী	বিমাতা	৩৫৪
	অদৃষ্ট	৭১০
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়	নিধু ও শূণ্ড	৭৪১
শ্রীআশালতা সেন	জীবন ও জীবনের ধর্ম	২১৫
শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়	বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ	৮৪
	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৬৪৪
শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	জানালার কাব্য (কবিতা)	২০
ঐ	মায়াবতী পথে	৬২, ১৫৩
শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী	স্বামী বিবেকানন্দ ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ	২৮৭
ঐ	সাহিত্যে অনধিকারী	৩১১
ঐ	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৪০, ৪৫৪, ৬১০, ৭১২, ৯২২
ঐ	দোসরা নম্বর	৭২৯
শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	বর্ণভিষারিণী (কবিতা)	৫৭
ঐ	আর একবার (কবিতা)	১৫২
ঐ	পাগল মাঝির গান (কবিতা)	২২৭
ঐ	বিকাশ (কবিতা)	২৬৫
ঐ	মন্ত্রপূতা (কবিতা)	২৮৬
ঐ	প্রথম দর্শনে (কবিতা)	৪১২
ঐ	আহ্বান (কবিতা)	৬৮৯
ঐ	ভক্তিহীনা (কবিতা)	৭৫৩
শ্রীচাক্রচন্দ্র বসু	অশোকের ধর্মলিপি	২৯
শ্রীচিরঞ্জন দাশ	রূপান্তর	৬৪২
শ্রীজগদম্বা দেবী	মনের খোঁরা	২০৯

লেখক বা লেখিকা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীকৃষ্ণদাস দেবী	ছনিয়ার ছদ্ম	৬৩৮
ঐ	বেদনার বৈচিত্র্য	৮২৩
শ্রীকৃষ্ণদাস সেন	নির্ভর ও সংগত ব্রহ্ম	৪৫৫
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ	নিরুপমা রাতে (কবিতা)	৫৬২
শ্রীজ্ঞানানন্দ চট্টোপাধ্যায়	মানস-বৃন্দাবন (কবিতা)	৫২৫
ঐ	জয়দেব (কবিতা)	৭৮০
শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়	সমুদ্রতীরে	৭৮
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	নির্লোকসার চিন্তামণি	২০৩
ঐ	দরবেশ ঘাটের কাব্য (কবিতা)	১২২
শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী	অচেনা দূতী (কবিতা)	৬২১
ঐ	পদ্ম-অহারী বাবা (কবিতা)	৬৮১
শ্রীনঃ—	শ্রাম না এল (কবিতা)	৬০৮
শ্রীনবী গোপাল মজুমদার	চল্লিশ বৎসর পূর্বে	২৫৬
শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ	প্রতিকার (কবিতা)	২১৫
শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	চলিত ভাষা ও সাধু ভাষা	২
ঐ	ইউরোপীয় ট্রাজেডি ও ভারতীয় কল্পরস	৪২২
ঐ	সাহিত্যে স্বাভাৱ্য	৫৪৬
ঐ	বঙ্গভাষা ও বাংলাভাষা	৭৮১
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীকৃষ্ণদাস পূর্বিকা	২২৮
ঐ	শ্রীমদলরসকারিকা	৫৮৮
শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	মানারে গল্প	৫২
ঐ	গদা চাঁড়াল	১৬১
ঐ	ভিকুর বিয়ে	২৬৬
ঐ	তিহুর মা	৫৩৮
ঐ	উত্তরাধিকারী	৫৭৮
ঐ	ভূতের বেগার	৮৬২
শ্রীনিত্যানন্দ দাস	পাগল	২৪৬
শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	দোলপূর্ণিমা	৩০৫
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত	দীক্ষিতের নিবেদন (কবিতা)	৩৫০
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ	মায়ের ডাক	৮৬৭
শ্রীবলাই দেবশর্মা	পূজার বিয় (কবিতা)	২৭৫

লেখক বা লেখিকা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীবহুবল্লভ গোস্বামী	সামর্থ্য	২৪২
শ্রীব্রজমাধব রায়	প্রার্থনা (কবিতা)	২৬১
শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	দিউয়ান-ই-মখফী কি জেবউন্নিসার ?	২৬২
শ্রীবামাচরণ দত্ত	বিদ্যারে (কবিতা)	৮১
শ্রীবানী দেবী	অনাহুত (কবিতা)	৪২৭
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	বৈষ্ণব মহাজন ও বাংলা মহাজনপদ	১ ১
ঐ	মহাজনপদের ঐশ্বর্যতত্ত্ব	৩১৭
ঐ	একটি স্তোত্র	৩২৭
ঐ	মহাজনসিদ্ধান্তে পুরুষ ও প্রকৃতি	৩৭২
ঐ	আদিরস	৫৭০
ঐ	সাহিত্যে রূপান্তর	৭২২
ঐ	বুদ্ধিমানের কর্ম	৭৮২, ৮১৬
শ্রীভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী	বাহু বিরহিতা (কবিতা)	৪১
ঐ	নিবেদন (কবিতা)	৯৯
ঐ	কৃষ্ণনাম (কবিতা)	২১৩
ঐ	পাছের প্রতি	৯০১
শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	মহীশূর ভ্রমণ	৪৭৬, ৯৩১
শ্রীমানিক ভট্টাচার্য্য বি, এ.	বিজয়া (কবিতা)	৮৯২
শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ	একটি মোকদ্দমার রায়	৬২৯
যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	প্রাচীন রাজগৃহ	৮৮৩
৮রজনীকান্ত সেন	গান (কবিতা)	৩৩৯
রামপ্রসাদ সেন	আগমনী	৮১৫
	বিজয়া	৯৫০
শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	স্বামী	৬৭২, ৭৫৫
শ্রী:—	শৌর্য্য	৪৫৯
ঐ	ধর্মপ্রচারে ব্রহ্মীন্দ্রনাথ	৫৬৫
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক	চার ইয়ারী কথা	৮৯৬ .
শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	কমলের ছাঁখ ৪২, ১০০, ২২৯, ২৭৭, ৩৬৫, ৪৩৫, ৫২৬, ৭০৩, ৮০৪, ৮৫১	
ঐ	ছেঁড়া-ফুল	৯১০
	গান (কবিতা)	৩২৬, ৪০২, ৮১৪



লেখক বা লেখিকা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদক	নারায়ণ	১
ঐ	গান	৮৩, ১৭০
ঐ	বাঙ্গলার গীতি-কবিতা	১১৬
ঐ	রূপান্তরের কথা	৩৮৭
	বাঙ্গলার কথা	৪৮৫
শ্রীসরলাবালা দাসী	মারের সাধ	৩৬১
শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী	প্রেমেব সংশয় (কবিতা)	৪০৮
শ্রীসুধাময়ী সেন	সে আসিল না (কবিতা)	৮৫০
শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়	বাংলার চিত্রকলা	৬৯১
শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	মায়া (কবিতা)	৪৫৮
ঐ	তাজমহল (কবিতা)	৪৭৯
ঐ	চিরসঙ্গী (কবিতা)	৮৪১
ঐ	শেষ বেলায় (কবিতা)	৯০৮
শ্রীহঃ	পুর্বীর চিঠি	৪১০
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	বৌদ্ধধর্ম	২০৪, ৩৩৩, ৪০৩
ঐ	উর্ধ্বশীবিদ্যায়	২৪৪
ঐ	বিরহে পাগল	৫৫২
ঐ	কোমলে কঠোর	৬২৩
ঐ	কথের কোমল মূর্তি	৬৫৯
ঐ	মেদিনীপুর পরিষদের সভাপতির কথা	৭৩১
ঐ	কথের কঠোর মূর্তি	৮৪২
ঐ	শকুন্তলার মা	৯৪৪
শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	সাধ (কবিতা)	৩১০
শ্রীহরেন্দ্রনাথ পণ্ডিত	শিশিরবিন্দু (কবিতা)	৮৮২
শ্রীক্লিষ্টীশচন্দ্র সেন	পাগল রাতে (কবিতা)	৪৫৩